কালকূট
কালকূট
রচনা
রচনা
সমগ্র
সমগ্র

কালকূট রচনা সমগ্র

[ষষ্ঠ খণ্ড]

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

মৌসুমী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রাগ্

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, কথাটা আজ অন্য একটা কথার খেই ধরিয়ে দিল। ধরিয়ে দেওয়া খেই কথাটা অবিশ্যি বিপরীত। না-তে আছে হ্যাঁ। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। অনেকবার শোনা, আর অনেকবার বলা সেই কলিটাই তাই ফিরে আসে বারে বারে, মন চল যাই ভ্রমণে। কিন্তু কোন্ ভুবনে?

এরকম একটা ধন্দ কখনো কখনো আমাকে পেয়ে বসে। তবে সচরাচর না। ভুবনের কথা এলো যে! না, লোটা কম্বল নিয়ে, আর কপনি এঁটে—যাকে বলে 'আপনি আর কপনি' সেইরকম, সংসারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, 'ব্যোম্ ভোলানাথ!' হেঁকে আমি কদাপি দৌড় মারিনি। কেননা, ওটা আমার কাছে দৌড় মারার মতোই। বুলি হলো, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

না, পিতা পিতৃপুরুষের নাম, আমি আমার বাঁচার থেকে ছোট করে ভাবি না। ভাবিওনি। ক্ষয় লয় মৃত্যু, অনিবার্য বলে তাকে জেনেছি। 'এই' জানাটা যে কেবল নিজের এই জীবনকালের মধ্যে, তা যেমন সত্যি, তার থেকেও গভীরতর সত্যের কথাটা না বলে থাকতে পারছি না। ক্ষয় লয় মৃত্যুর সে-এক মহিমময় বর্ণনা, বিষ্ণুপুরাণের ধরণীগীতায় উক্তি করেছেন পরাশর। বলেছেন:

তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাচ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥

আহ্, ওহে জীবন, তুমি আবার আমাকে দিয়ে পুরাণের শ্লোক আউড়িয়ে নিচ্ছ কেন। এ ভাষা আমার অর্জিত না। চলো যাই পণ্ডিতের পদতলে, যিনি ভাষার সিংহদ্বার ভেঙে, গম্য স্রোতে ভাসিয়েছেন পরাশরের সেই মহিমময় বেদনাভিভূত বাণী, বাঙলা কথায় ধরণীগীতার সেই সব উক্তি:

'যে-পুরুষপ্রধানগণ উর্ধ্ববাহু হয়ে অনেক বর্ষ যাবৎ তপ আচরণ করেছিলেন, অতি বীর্যশালী যে বলবান ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, কাল তাঁদের সকলকেই কথাবশেষ করেছেন। যে-পৃথু অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে

বিরাজ করতেন, যাঁর চক্র শত্রুদের বিদারিত করত, তিনি কালবাতাহত হয়ে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিমূল তুলার মতো বিনষ্ট হয়েছেন। যে-কার্তবীর্য সমস্ত দ্বীপ আক্রমণ করে, শত্রুমণ্ডল বিনাশ করে রাজ্য ভোগ করেছিলেন, এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম উত্থাপিত হলে, সন্দেহ হয়, তিনি বাস্তবিক ছিলেন কী না। ধিক্! দশানন অবিক্ষিত রাঘব প্রভৃতি দিঙ্মুখ উদ্ভাসিতকারী রাজগণের ঐশ্বর্যও কি কালের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হয়নি! মান্ধাতা নামে যে-ভূমণ্ডলের চক্রবর্তীরাজ কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর কাহিনী শুনে, কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন, যে মন্দচেতা হয়ে নিজের প্রতি মমত্ব করবেন। ভগীরথাদি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সকলেই ছিলেন, এ কথা সত্য। মিথ্যা না। কিন্তু এখন তাঁরা যে কোথায়, (হায়!) আমরা জানি না।'···জানি না, কিন্তু ছিলেন—এই সত্যের বিনাশ নেই। পরাশরের লোটা কম্বল কপনি ছিল কি না, ওতে আমারও বেজায় ধন্দ। কারণ, জানি না। তথাপি দেখছি, সেই প্রাচীন পুরুষপ্রধানদের তিনি ভুলতে পারছেন না। আপনি বাঁচো, বাপের নাম ভোল, আর আপনি কপনি করে দৌড় মারো, আর ধুনি জ্বালিয়ে বেল-কাঠ বেহ্মচারীর মতো গায়ে মাখো ছাই, তিনি যে তা ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁরই উক্তি। যাঁদের অস্তিত্বের নশ্বরতা বিষয়ে তিনি উক্তি করেন, তাঁদের স্মরণের, তাঁরা ছিলেন, এ দায় থেকে মুক্তি পান না।

মুক্ত আমিও না। যদিও জানি, আমার বাঁচার থেকে পিতৃপুরুষগণকে ছোট করে ভাবতে পারি না, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ কেউ রেখে যাননি এই বংশধরটির জন্য। সংসারকে নিরঙ্কুশ দুঃখের আগার ভাবি না। আর সুখ? প্রয়াগের সেই ঘর-ছাড়া পাগলাবাবার কথা মনে পড়ে যায়। যে-কথা এমন স্পষ্ট করে কোনো গীতায় উচ্চারিত হয়নি। তার আগে একটা কথা কবুল না করলে, নিজেকে যেন কেমন ছলনাকারী লাগছে। সংসারের বাইরের পথে যাঁরাই কপ্‌নি এঁটে বেরিয়েছেন, মাথায় জটা উঁচিয়ে, গায়ে ছাই মেখে ক্ষ্যাপা হয়ে ফিরছেন, তাঁদের সবাইকে আমি কখনো দৌড় মারার রঙিলা ব্রহ্মচারী বলিনি। তা হলে আমার জীবনে অনেক দর্শন, অনেক বচনবাচন দেখা আর শোনো হতো না।

প্রয়াগের সেই জটা খোলা, উদলা গা, হাসকুটে মানুষটি আমাকে শুনিয়েছিলেন, 'সুখ দুঃখটা কেমন জানিস? প্রয়াগে তীর্থ করলে, আর পকেট ভরে পুণ্যি নিয়ে গেলেই সব শেষ না। সুখদুঃখের মাপ জ্ঞানটা থাকা দরকার।

পৃথিবীটাকে দেখে নিয়েছিস্। আহ্, সেই দেখার কথা হচ্ছে না, ঘরে বসে ভূগোল ম্যাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ তো। তার তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কেমন কী না। ওটাই হলো সুখ দুঃখের ভাগ। তিন ভাগ জলের মতো দুঃখ, স্থলের এক ভাগ সুখ।'

কত কাল আগের কথা? তেইশ-চব্বিশ বছর তো হলো প্রায়। তখন পশ্চিমের 'মিথ্ অফ সিসিফাস' জানা ছিল না। কথাটা এমন করে মরমে বিঁধেছিল, জীবনের কত জায়গায়, কত ভাবে যে কথাটা বলেছি, নিজেরই কোনো হিসাব নেই। কথাটা এই কারণে মরমে বেঁধেনি, জীবনটা একান্তই দুঃখের অকূল সমুদ্র। বড় অসহায় বোধ করেছিলাম। জীবনকে দেখার সেই দৃষ্টিভঙ্গি, নিদারুণ মনে হয়েছিল। তখনো সুখ বিষয়ে মনের মাত্রাজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষার ভাগটা ছিল অনেক বড়। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল, জীবন হলো দুঃখের দ্বারা বেষ্টিত। তাকে পাশ কাটিয়ে যাই, এমন কোনো পথ ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্যতার প্রমাণটা একটা প্রতীক। তিন ভাগ জলের ধারা প্রবাহিত স্থলের অভ্যন্তরে নানা নদ ও নদী। তার ওপরে, পন্থ বড় বন্ধুর হে, পন্থ বড় বন্ধুর। তিন ভাগ জল ছিল এক গভীর অর্থবহ সংবাদ। দুঃখ জীবনের সমগ্রতায় অনতিক্রমণীয়। সুখ থাকে দুঃখের কুণ্ডলীতে। নাম তার ঝলকিত দ্যুতি। সামান্য জীবনকালের কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত মাত্র।

পরবর্তী কালে পশ্চিমের 'মিথ্ অফ্ সিসিফাস' পড়ে, তিন ভাগ জলের প্রতীকটাকে সমার্থক মনে হয়েছিল। আরো পরে বুঝেছিলাম, দুটো ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটো বিশ্বাস আলাদা, অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। অভিশাপ আর বিশ্বের নিয়মের অনিবার্যতায় বেবাক ফারাক।

প্রয়াগের সাধু আমাকে শুনিয়েছিলেন, বিশ্ব নিয়মের একটি অনিবার্যতার কথা! পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জীবনের তিন ভাগ দুঃখ, এক ভাগ সুখ। এর নাম মন্ত্র তন্ত্র না। দার্শনিকতা? কেউ দাবী করেনি। ভারতের ঘাটে মাঠে গাছতলায়, এক শ্রেণীর সর্বত্যাগীর (সর্বহারা বলা যায় কী?) মুখে মুখে জন্ম নেয়। এখন বোঝ হে কথা, যে জ্ঞান সন্ধান। কারোর মাথার দিব্যি নেই।

কিন্তু তথাপি মনে একটা খটকা, প্রাণে লাগে একটা ধন্দের দোলা। এই যে কেবল ভারত ভারত করি, কেবল কি ভারতের মাঠে ঘাটে গাছতলাতেই এমন কথার জন্ম হয়! জগতের আর কোথাও না? ঘাড় ঝাঁকাতে পারি না। শিরে টান ধরে। প্রয়াগের গাছতলা কি প্রাগে নেই? প্রাগের ঘাট

সাইবেরিয়ায় ? সাইবেরিয়ার মাঠ সাংহাইয়ে ? কাসপিয়ানের কূলে কিংবা অতলান্তিকের বেলাভূমে ?

সত্যি মিথ্যা জানি না। অবুঝ মন বলে, আছে। বোঝদার বললে কেউ 'অংখারি' ভাবে, তাই। তবে নিতান্ত অবুঝ মনের কথা না। সেই মহান মেষপালক, গায়ে ছেঁড়া আলখাল্লা, আর এক মুখ দাড়ি নিয়ে মাঠে ঘাটেই তাঁর কথার জন্ম দিয়েছিলেন।

খেই হারালাম নাকি ? না। কথা হচ্ছিল, 'মরিতে চাহি না…।' বলতে চাইছিলাম, না-তে আছে হ্যাঁ, অন্য কথায়। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। কিন্তু কোন্ ভুবনে ? ভুবনের কথাটা এলো, আমার ধন্দটাও, অতএব। সেই কারণেই লোটা কম্বল কপনির প্রসঙ্গ। কথাটা অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, ভ্রমণে যাবো। কিন্তু সংসারটাকে ছাড়িয়ে যাবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিন ভাগ জলের সত্যকে জেনেছি বটে, উপলব্ধি অন্য কথা। সেই জানা থেকেই, আমার এক কথা, আমি লোটা কম্বলধারী না। পরিব্রাজক যাঁদের বলে, প্রব্রজ্যা যাঁদের পরিভ্রমণ, আমার মন চল যাই ভ্রমণের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও। বৈরাগ্য যে কখনো অন্তরকে গ্রাস করে না, সে-কথা বলা কঠিন। বৈরাগী হতে গেলেই, সংসারের ধিক্কারটা বড় কঠিন হয়ে বাজে।

তাই কি ? আসলে বৈরাগী যে হতেই চাইনি কখনো। সন্ন্যাস আমার জন্য না। লোটা কম্বল নিয়ে যদি দৌড় দিতে পারতাম, তবে আমার থেকে কার বিবেক আর বেশি সাফ্ সুরত্ থাকতো ? মনের কথাটা তো গোড়াতেই বলেছি। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। কথাটা আরশিতে ফেলে দেখতে গিয়ে তাজ্জব! দেখি, লেখা রয়েছে, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' এই চাওয়া আর না চাওয়ার মধ্যে, যদি আনন্দের ধ্বনি বেজে থাকে বাজুক না কেন। আরো কি বাজে কোনো আর্তস্বর ? অথবা এরই মধ্যে জীবনের অলঙ্ঘিত বিধি, সম্যক জ্ঞানের ধারায় নিয়ে চলে ?

না না না, এ বড় পয়জার হে। মনের নানা ব্যাজ। উসব থাকুক গা মনের রাঙচিতের বেড়ায় ঢাকা। আমার এক কথা, ভ্রমি অনুরাগে। আমার হলো অনুরাগের ভ্রমণ। কিন্তু ওই ভুবনে এবার আমার ঠেক লেগেছে। মন নিয়ে কথা। ঠেক ধন্দ যে কতো, আজ'তক বলে বলে তার ইতি করতে পারলাম না।

একটা মজার কথা বলি। ছেলেবেলার কৃষ্ণযাত্রার কথা, মন তখনো

কুসুমকলি। বিরহিণী রাধার কাছ থেকে কৃষ্ণ বিদায় নেবেন। কিন্তু বিদায় নেবার ইচ্ছা নেই। মানভঞ্জনটা হয়েছে। রাধার দুই সখী দু পাশে। কৃষ্ণ বললেন, 'এবার তা হলে যাই।' বলে পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'যাই নয়, আসি।'

কৃষ্ণ ফিরে এসে দাঁড়ালেন। রাধা এবং সখীরা অবাক! কী হলো? কৃষ্ণ বললেন, 'বললে যে যাই না আসি। তাই এলাম।'

সখী হেসে বললেন, 'যাই বলতে নেই, যাবার বেলায় আসি বলতে হয়।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তাই বুঝি? এবার তা হলে আসি।' যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'এসো।'

কৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন। রাধা এবং সখীরা আবার অবাক! কৃষ্ণ বললেন, 'এসো বললে, তাই এলাম।'

রাধার অনুরাগ আর বিরহ কাতরতা যুগপৎ বাড়ে। সখীরা হাসেন। কৃষ্ণ-যাত্রার কেষ্টঠাকুরটি বরাবরই চতুর রসিকলাল। আমাদের ক্ষেত্রে বিটলেমি। বুঝতে পারছি না, আমাকে সেই বিটলেমিতে পেলো কী না। ভুবনের ঠেক লাগলো এই কারণে, ভ্রমণে যাবো কোন ভুবনে। হিসেব দেখছি, ভুবন তিনটি। ত্রিভুবন যাকে বলে।

অনুরাগের ভ্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য, ডানায় কাঁপন লেগে যায়। নিষ্পত্র গাছপালা আর বরফের দেশ ছেড়ে পাখিরা যেমন পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় চিরবসন্তের দেশে। তা বলে কি আমার ভ্রমণ কাসপিয়ানের কূল থেকে কুরু পাঞ্চালে? ইস! টিকিটবাবুরা হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই? মনের পাখায় কাঁপন যতোই লাগুক, আকাশযান জলযান স্থলযান, ব্যতিরেকে উড়বো কিসে? আর সেইসব যানবাহী হলে ফুঁকো ট্যাঁকে মনের পাখনায় মরণ ধরে। সবাইয়ের এক বুলি, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি যে আমার বড় আপন গো!

না, অমন দূর দূরান্তরের ভ্রমণ আমার কপালে নেই। আমার হলো দশজনকে নিয়ে ঘর করতে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠা "মন চলো যাই ভ্রমণে/কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।" কৃষ্ণ হেথায় প্রতীক, এক অরূপ রূপের ঠাঁই। তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, নগর পুরী জনপদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ঘরের হাতায় মাঠ থেকেই মোটর বাসে চেপে বসে, ঘরেরই আর একপিঠে গিয়ে নামো। কোনো এক গাঁয়ের পথে, নয় তো কোনো এক খোয়াইয়ের ঢালুতে। কুন্তী নামেও তো এক নদী আছে, অথবা ক্ষীণধারা

সরস্বতীর কূলে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ভ্রমণে চলে যাও। নাহুরের পুকুর ধারে, নয় তো ছাতনার ঝোপ ঝাড়ের জঙ্গলে। সোনামুখীতে না গিয়ে, পাঁচমুড়ার গাঁয়ে গিয়ে বসো। থেলো হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে, পোড়ামাটির শিল্পী কারিগরদের উঠোনে বসলে কেউ তোমাকে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করবে না। গুলবাজী? না। কসম? কসম! এমন অনেক জায়গার নাম করতে পারি। সবই মনে হবে কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান।

যে যায় এমন ভ্রমণে
কৃষ্ণ থাকেন তার সনে।

আবার কৃষ্ণ? আবার কেন, বারে বারে। বললাম না, ওই নাম হলো প্রতীক। পাবার আশায় সেখানে কেউ যায় না। নিজেকে একটু ধোয়া মোছা সাফসুরৎ করতে যাওয়া। এত কথা কিসের। বলছি, প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ুর ভারি চাপ। প্রাণে বায়ু চালাচালির নামই ভ্রমণ।

'তা যেন হলো।' তিনি বলেছিলেন, 'ভ্রমণে তোর সঙ্গে না যেতে পারলেও মনটা হালকা হল। কিন্তু খাস কি?'

'খাই কি?'

'হ্যাঁ, খাস কি?'

একে বলে জিজ্ঞাসা! প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ু চালাচালি তো করছো বাপু, মহাপ্রাণীটির ব্যবস্থা কী? দাঁতকপাটি? যে তাঁর বচন শোনেনি সে বুঝবে না, জিজ্ঞাসায় ঝাঁজ কেমন। তারপরেই আবার পাল্‌টা জিজ্ঞাসা, 'গেরস্তের বাড়িতে পাত পাতিস?'

'আজ্ঞে সে কখনো সখনো। সব জায়গার সব গেরস্ত তো সমান না। আশেপাশের দোকান থেকে চিড়ে মুড়ি মুড়কি কেনা যায়। ময়রার দোকান থাকলে তো কথা নেই। দই মণ্ডা মেঠাইও কিছু মেলে।'

'তুই একটা আস্ত গাধা।'

'আজ্ঞে?'

'হ্যাঁ, বইলছি, তুই একটা কুঁড়ের বাদশা। ওতে না আছে মজা, না ভরে পেট। খেটে খেতে পারিস না?'

সেটা কী রকম? জিজ্ঞাসা করিনি, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়েই তাকিয়েছিলাম।

'রেঁধে খেতে পারিস না?'

'রেঁধে?'

'হ্যাঁ রে বাঁদর, রেঁধে। তোর বয়সে আমি ওরকম অনেক, ঘর করতে

উঠ্‌বন্দী প্রজার মতন বেরিয়ে পড়তাম। সেইজন্যই তোর বেরিয়ে পড়ার খবরে আমি খুশি। কিন্তু আমি তোর মতন ওরকম চিড়ে মুড়ি মণ্ডা মেঠাইতে ছিলুম না, বুঝলি?'

'কিসে থাকতেন?'

'ক্যানে, দোকানে চাল ডাল মেলে না? নুন লঙ্কা তেল? হাঁড়ি মালসা, গেরস্তের বাগানে কলাপাতা?'

'তা তো মেলে।'

'মেলে মানে? মিলবেই। তোকে তো আর কেউ শিল নোড়ায় বাটনা বাটতে বলেনি। বলেছে কি? ত? যা, সব কিনে কেটে যোগাড়জাত্‌ করে, গাঁয়ের বাইরে গাছতলায় যেয়ে বস্‌। গাছের শুকনো পাতা ডাল কুড়িয়ে আন্‌। কিছু না পাস মাটির ঢ্যালা বসিয়েই উনোন সাজা। জল নিয়ে টিপটিপিনি আছে নাকি?'

'আজ্ঞে?'

'বইলছি পেট রুগীদের মতন, এ জল খাব না, সে-জল খাব, ওসব হ্যাপা নাই ত?'

'না।'

'ওইটেই বাঁচোয়া। তবে যা, কাছেপিঠে যেখানে পুকুর টিউবকল যা পাবি, হাঁড়িতে করে জল নিয়ে আয়। চালে ডালে বসিয়ে দে। মালসায় তেলের ছিটা দিয়ে, লঙ্কা ভেজে নে, হাঁড়িতে ঢেলে দে। গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়। ঠিক মতন ফুট খেয়েছে? তা হলে এবার গরম গরম কলাপাতায় ঢাল, আর খা। কেমন লাইগছে?'

'আজ্ঞে জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'তব্যা? তা না চিড়া মুড়ি মেঠাই মণ্ডা। এখন তোর আশেপাশে কারা আছে বল্‌ দিকিনি?'

'আজ্ঞে, কই? কেউ নেই তো।'

'গাধা! নিদেনপক্ষে চার-পাঁচটা গাঁয়ের অনাহারী কুকুর তোকে ঘিরে বসে নেই? কাক শালিকের কথা বাদই দিলাম।'

'ইস! সত্যিই তো, মনেই ছিল না দাদা।'

'মনে না রাখলে শিখবি কেমন করে? এবার নিজে খা, ওদের দে। তারপর কী করবি?'

'গাছতলায় শোব?'

'তা শুবি না আরামখোর! শোবার জন্যে তখন একটা জাজিমের কথা মনে পড়বে, তারপরে একটি দাসী।' মনে আছে, হেসে জিভ কেটেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর মনে, 'ঢ্যালা মেরে উনোন ভেঙে হাঁড়ি মালসা ভেঙেচুরে, আর পেছনে তাকানো নয়, চলে যা, নিজের পথে। তোর বয়সে আমি যখন বেরিয়ে পড়তাম, এইরকম করতাম। বেরিয়ে পড়লেই, গায়ে গতরে খাটবি না, পোকা পড়বে যে! তবে ওই দিনান্তে একবার। হাত পুড়িয়ে খাবি, মুখে অমৃতের স্বাদ পাবি। চড়ুইভাতি কি কেবল দঙ্গলে হয়? জঙ্গলে একলা হয় না?'

হয় না আবার? হাতে কলমে পরখ করে দেখেছি। কেবল কি অমৃতের স্বাদই পেয়েছি? আর কিছু না? আরো কিছু। একলা সেই অনুষ্ঠান, এক যজ্ঞের মতো। সেই যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে যেন অনেকখানি চিনে নেওয়া যায়। আহা, জানি তোমরা কি ভাবছো। আর তা জেনে আমার এমনি করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'পাঠক! তোমাদিগের মনের অবস্থা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি। যে-ব্যক্তির সঙ্গে আমার উক্ত প্রকার আলাপাদি হইয়াছিল, তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য, তোমাদিগের কৌতূহল অতি তীব্র হইয়াছে।' বচনদারের বচনেও যদি না বোঝা গিয়ে থাকে, তবে বলি, তিনি কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি দিঙ্‌উদ্ভাসিত সাহিত্য রচয়িতা তারাশঙ্কর—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশরীর প্রাপ্ত হওয়া মানে কী? পণ্ডিতমশাইয়ের কাছ থেকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়া হয়নি। কথাশরীর প্রাপ্ত কি কেবল মৃত্যু? সম্ভবত না। যিনি এখন ইতিহাস তিনি কথাশরীর প্রাপ্ত হন। দাদা (এই নামেই তাঁকে ডাকতাম। দাদার আগে নাম ধরবার, অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যেতো। সেটা তাঁর বয়স এবং ব্যক্তিত্ব।) এখন সৃষ্টি জগতের ইতিহাস।

কিন্তু 'আমার সাধ না মিটিল/আশা না পুরিল।' বড় ইচ্ছা ছিল, তাঁর সঙ্গে একবার ভ্রমণে যাই। গ্রামের বাইরে গাছতলায় চাল ডাল হাঁড়ি মালসা নুন তেল যোগাড়জাত করে গিয়ে বসি, মাটির ঢ্যালায় উনোন সাজিয়ে, হাঁড়ি চাপিয়ে দিই। আমি শুকনো কাঠ পাতায় আগুন উস্‌কে তুলবো, তিনি গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়বেন। আর তখন কি গুনগুন করবেন, 'জীবন এত ছোট ক্যানে?'

এই দেখ, আমার প্রাণের বায়ুর ঘরে কেমন হাহাকার করে উঠেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কারণ, সে-উপায় যে আর ছিল না। সাধ মেটাতে পারিনি। কালের স্রোত তখন তাঁকে অন্যদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। একলা চড়ুইভাতির

দিন শেষ অভিজ্ঞতাগুলোকে হৃদয়ের জারিত রসে রূপায়ণের একনিষ্ঠ শিল্পী। কর্তব্য আর বয়সের দায় তাঁকে ঘরবন্দী করেছে।

তা-ও বা কতোটা? ঘরে বন্দী হবার লোক কি তিনি ছিলেন। আর একটা ঘটনা বলে নেবো নাকি? এই দেখ, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, কথায় বলে। আমার সেই অবস্থা। আমি খেই হারাতে বসেছি। তবু মন বলছে, খেদ রেখো না বাপু, যা বলবার ঝটপট বলে ফ্যালো।

হ্যাঁ, তাই বলি। একবার দাদার সঙ্গে গিয়েছি সাঁওতাল পরগণার শিমুলতলায়। আরো অনেকে ছিলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত, সে-সব কথা থাক। আবহাওয়াটা দঙ্গলের চড়ুইভাতির মতোই। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে, ঠিক হলো তিন মাইল দূরে তিলুয়াবাজারের হাটে যাওয়া হবে বাজার করবার জন্য। আসলে সেও এক ভ্রমণ।

হাটে একটি সাঁওতাল মেয়ে, খাঁচায় পুরে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি পায়রা। নতুন পাখনা গজানো নধর পায়রা। সচকিত ভীরু পায়রাগুলো, খাঁচার মধ্যে হাটের ভিড় দেখে ছটফট করছিল। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, অনেককাল পায়রার মাংস খাওয়া হয়নি। দাদাকে বললাম, 'পায়রা ক'টা কেনা যাক, মাংস খাবো।'

দাদা তাঁর মোটা লেন্সের চশমায়, খয়েরি উজ্জ্বল চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'পায়রার মাংস খাবি?' তারপরে পায়রাগুলোর দিকে তাকালেন। পায়রাদের থেকে চোখ তুলে সাঁওতাল মেয়েটির দিকে। আমাকে বললেন, 'তা হলে কিনে ফ্যাল।'

কিনে ফেলেছিলাম। দাম শুনে তো নিজেকে মনে হয়েছিল, 'ড্যানচিবাবু'। দাদা হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'দেখি।'

খাঁচাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'পায়রার মাংস খাবি? খা!' বলে একটি একটি করে পায়রাকে ধরে বাইরে, আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাহাকার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার হেমন্তের আকাশে পড়ন্ত বেলার রোদে, চিত্রগ্রীবের দল কেমন রঙ বাহারে উড়ে গিয়েছিল। দাদা তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। না, অনুশোচনার কিছুমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না তাঁর চোখে মুখে। বরং মিটিমিটি হাসি। বলেছিলেন, 'আরো পায়রা কিনবি নাকি? চল্ দেখি, হাটে নিশ্চয় আরো পায়রা এসেছে।'

বিক্রয়িত্রী সাঁওতাল কন্যাটি, আর তার আশেপাশে, ইস্তক আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরাও তখন হাসতে আরম্ভ করেছে। ভ্রমণে এলাম আমি। আকাশ বিহারে গেল কবুতরেরা! কিন্তু হাসিটা তখন আমার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়েছে। সেই হলো আর এক রকমের কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে ভ্রমণ!

সত্যি খেই হারালাম নাকি? কথা হচ্ছিল, ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। ভুবনের কথা এসে গেল, গোলমালটা সেখানে। ত্রিভুবনের কোন্ ভুবনে যাবো? ঝোলা কাঁধে নিয়ে, রেলগাড়িতে বা মোটর বাসে চাপলেই কি ত্রিভুবনের কোনো এক ভুবনে যাওয়া যায়? এবারে আমার ঠেক লেগেছে সেইখানে। এই ত্রিভুবনের সংজ্ঞাটা একটু ভিন্ন রকমের। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ভ্রমণের এই ত্রিভুবন এবার আমাকে ডাক দিয়েছে। আর এই ত্রিভুবনে যেতে হলে, ঝোলা কাঁধে নিয়ে কোনো যানবাহনে চেপে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

বুঝতে পারছি, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নামেই অনেক বাংরেজ বাবাজীর মাথায় লগুড়াঘাত লাগলো। অথবা কালকূটের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। নয় তো হাসি পাচ্ছে। পেতে পারে। তাতেও, হাসতে গেলে কপাল ব্যথার আশংকা আছে, নিবেদন করে রাখছি।

ভেবেছিলাম সরাসরি যাত্রা করবো দ্বারাবতী, যে-স্থানকে লোকে জানে দ্বারকা নামে। স্থান যদি দ্বারাবতী, কাল তবে কলি-সন্ধ্যা, অর্থাৎ দ্বাপরান্তর। কিন্তু কাল এবং যুগের এই বিচারটা বোধহয় অনেকেরই হালে পানি পাবে না। আধুনিক ইতিহাসের কাল গণনার বিচারটা, আমার অনেক আগের পুরুষ থেকেই ভিন্ন পথগামী। যদি বলি পৌরাণিক মতে অষ্টাবিংশ যুগ, তবে এই নিশ্চিত ও অমোঘ কাল গণনা অনেকের কাছে ধাঁধার মতো লাগবে। কারণ দোষ কারো নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। সাহেবরা যে আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন, পুরাণ মানে মাইথলজি, ইতিহাস না। অতএব সে-কাল গণনা অনেকটা রূপকথার মতো। হ্যাঁ, মিথ্যার স্বর্গবাসেও সুখ আছে বই কি! সুখ এই, মেনে নিলে আর পরিশ্রম করতে হয় না।

কিন্তু এ তো হলো তর্কের কথা। ইতিহাস প্রমাণ চায়। তাই প্রমাণ দিই। কাঁধ থেকে ঝোলাটা রেখে, এবার মন চল যাই দ্বারাবতী। সেখানে কে আছেন? বাসুদেব। যাদবশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নরপতি নন, কালান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কালের হিসাবটা কী? তাঁর জন্মকালের হিসাবে সময়টা

এক হাজার চারশো আটাত্র খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবটা আধুনিক ঐতিহাসিক কাল গণনা। পুরাণের অষ্টাবিংশ যুগ, কলির সন্ধ্যা। কেউ বলেছেন দ্বাপরান্তর। যীশু খ্রীষ্টের মতো যদি কৃষ্ণ জন্মাব্দ বা কৃষ্ণাব্দ গণনা হতো, তা হলে এই যীশু জন্মের উনিশশো সাতাত্তর সালকে বলা যেতো তিন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ সাল।

বিশেষ কাল নির্দেশে আরো কিছু অতীতে যাবো নাকি? কিন্তু পণ্ডিত মশাইদের ভ্রূকুটি আর তর্ককে যে বড় ভয় লাগে! এই সেদিনই তো রাম-রামায়ণ নিয়ে তর্ক বিতর্কের ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। ধুন্ধুমার! কথাটা কতো সহজেই না আমরা কাজে লাগিয়ে ফেলেছি। আসলে ধুন্ধু নামক দৈত্যের যিনি নিধনকারী, তাঁরই নাম ধুন্ধুমার। ধ্বনির গুণ বটে। বিশেষণকে লাগিয়ে দিলাম ক্রিয়াবাচক শব্দে। তবে আমার প্রণাম সদ্য স্বর্গত আচার্য স্নুনীতি-কুমারকে। প্রণাম রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক মহাজনকে এবং আরো সকলকে। কিন্তু আমি তর্কে নেই। বিদগ্ধজনের রচনার পথ ধরে আমার এবারের যাত্রা।

দেখছি, শ্রীরাম ছিলেন দুই হাজার একশো চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তা হলে রামাব্দ ধরতে হয় চার হাজার একশো এক সাল। আর রামের থেকে কৃষ্ণ ছিলেন ছশো ছেষট্টি বছরের ছোট। কিন্তু কী লাভ আমার এই গণনায়? আমি অযোধ্যায় যাবো না। আমার যাত্রা দ্বারাবতীর পথে।

এই যাত্রার আগে, আমাকে আর একবার সেই বাউলের গানে ফিরে যেতে হবে। গানে দেখছি, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে, 'বাগানে পাঁচজনা মালী/যে যাঁর ঠাঁইয়ে বস্যে আছেন/পাঁচ মাথার মোড় আগুলি।'··· এখন এই বুঝহ রসিকজন, এই পাঁচজনা মালী কারা, পাঁচ মাথার মোড় আগলিয়ে বসে আছেন? কথায় ধন্দ আছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই, এয়াঁরা হলেন বাউলের প্রতীক পঞ্চেন্দ্রিয়। দেহতত্ত্বে এমন প্রতীক বিস্তর। আমার এক কলসীতে নয়টি ছিদ্‌রি/কেমনে জল ধরি ভরা কলসীর ভিত্‌রি।··· এও বোধ হয় সেই নবম দলের নয়টি নাড়ির প্রতীক। এমন প্রতীক কথায় কথায়। ষোল ঘর থেকে চৌষট্টি ঘরও মেলে। আবার ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে মীন ধরবার জালও বাঁধে।

আসলে, এসব হলো, মূলে যাবার প্রস্তুতি। সিদ্ধির প্রমাণ-পথের দ্বারের যথাযথ খেলা বন্ধ। বলবো নাকি, সাধনার মুখবন্ধ? তা হলে আমার গীত গাইবার স্নবিধা হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বারাবতী যাবার আগে, পুরাণ যে ইতিহাস, তার যুক্তির ধন্দ কিঞ্চিৎ কাটানো দরকার। কাটান করবার আমি কেউ না, স্বয়ং পুরাণকাররাই তার কাটানদার। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি

বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালের বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।

জ্ঞানীর সঙ্গে আমার মতো আর্বাচীনের ফারাক হলো, আমি সংশয়ী। আমার যুক্তি চাই। প্রমাণটা চাই আগে নিজের। খুঁজতে গিয়ে দেখছি, খ্রীষ্টজন্মকালকে যাঁরা কালবিন্দু হিসাবে ধরেছেন, কৃষ্ণজন্মকালকে তাঁরা খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভাবতে আপত্তি করছেন। এ আপত্তিটা কুসংস্কার, কারণ পুরাণকার দেখছি যুগমানের দ্বারা কাল নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁদের বি-সি এ-ডি নেই। একজন বলেন এক হাজার ছেষট্টি খ্রীষ্টাব্দে রাজা উইলিয়ম ছিলেন। আর একজন বললেন কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে ছিলেন।

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত পুরাণের কাছে এই পাঁচ বিষয় ইতিহাসের মূল উপাদান। তার বিশ্বাস, যে দেশ প্রথম সৃষ্ট হলো, তখন থেকেই তার হিস্টরি (পুরাণ) বা ইতিবৃত্ত লেখা হওয়া উচিত। ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত কেউ কেউ নিওলিথিক ও পোলিওলিথিক অধিবাসীদের দিয়ে শুরু করেছেন। তারও আদিমকালের অতীতে যেতে হলে, ভূতত্ত্বের কথা আসে। ওয়েলস্ তাঁর ইতিবৃত্ত সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। অনেকটা পুরাণের মতোই। কিন্তু হিসাবের কালবিন্দু যীশু জন্মকাল। পুরাণের কি কোনো কালবিন্দু নেই? নেই। তার আদিবিন্দু আছে, তাকে বলা হয়েছে মানব-কল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভুব মনুকাল, পাঁচ হাজার নশো আটাম্ন খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই। থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি।

মুশকিল! বলে তো যাচ্ছি ইতিবৃত্ত। বিষয়টা কী? পণ্ডিত বলছেন, ইতিবৃত্ত শব্দের অভিধা ইতিহাস শব্দের অনুরূপ হওয়ায়, তা হিস্টরি অর্থে অচল। হিস্টরির সংস্কৃত অর্থ ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শব্দের অর্থ, সংস্কৃতে আর বাঙলায় ভিন্ন। পুরাণের বিচারে ভুলের সম্ভাবনায় ভরা। ইত অর্থে যা গত হয়েছে, বৃত্ত অর্থে বর্ণনা। ইতবৃত্ত, এই পারিভাষিক প্রয়োগে ভুলের সম্ভাবনা নেই।

দ্বারাবতী ভ্রমণে যাবার দেখছি বিস্তর ঝকমারি। পথঘাটের নিশানা পাওয়া ভারি দুষ্কর। পথ চিনে যাওয়ার হাজার হাজার বছরের কাঁটা। কাঁটা না, কালের স্তর। অথচ ঠিক ঠিক পথে যাচ্ছি কি না, সে-সংশয়ে হোঁচট খাচ্ছি বারে বারে। কিন্তু সংশয় না ঘুচিয়ে উপায় নেই। দিঙ্‌নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতএব পথ বন্ধন করো। যার নাম যুক্তিতে হদিস।

আমি নৈয়ায়িক না, ন্যায়শাস্ত্রের কূট চালেও নেই। পুরাণের ইতিবৃত্তের

পথই আমাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। পুরাণকারের কথা আগেই বলেছি, তাঁদের ইতিবৃত্তের লক্ষণ বা উপাদান সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত। সর্গ বোঝায় বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিসর্গ প্রলয়। রাজা ঋষি প্রধান ব্যক্তিগণ দেবতা দৈত্যগণের বংশের উৎপত্তি স্থিতি বিলোপ আর বংশানুক্রম। বংশ শব্দের অর্থ ইংরেজিতে কি ডাইনাস্টি? হ্যাঁ একেবারে সম্যক বংশ বর্ণনা। মন্বন্তর এখানে 'দুটো ভাত দাও মা' দুর্ভিক্ষের অর্থে না। মন্বন্তর মনুকাল। কাল গণনার জন্যই যুগকাল আর মনুকাল পুরাণকারেরা ধরে নিয়েছেন।

এই ইতিবৃত্তকারগণ কারা? দেখছি, পুরাকালে প্রত্যেক রাজার নিজের ইতিবৃত্তকার থাকতেন। এঁদের বলা হতো মাগধ। এঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করতেন সূতগণ। এই সূতেরাই হলেন খাঁটি লোক, কোনো বিশেষ বংশের পোঁ ধরা ছিলেন না। মিথ্যাকে কাট-ছাঁট করতে জানতেন। তাঁদের বিবরণ পুরাণের মূল ভিত্তি। তাঁরা একজন ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। সূত ঋষিগণকে বলছেন, আপনাদের দ্বারা পুরাণ কথনে প্রণোদিত হয়ে আমি নিজেকে পবিত্র আর অনুগৃহীত বোধ করছি। আমার স্বধর্ম, দেবতা আর ঋষিগণের, অমিততেজসম্পন্ন রাজাদের, খ্যাতনামা মহাত্মাদের বংশবৃত্তান্ত জানা এবং ধারণ করে রাখা। কিন্তু বেদে আমার কোনো অধিকার নেই। অথচ পুরাণ বেদসম্মিতম্।

বেদের আগে পুরাণ। আমি আদি পুরাণে যা শুনেছি, মহাত্মা ঋষিগণ যা বলেছেন, পরাশরপুত্র গুরু দ্বৈপায়ন অতি কষ্টে যা নির্ণয় করে গিয়েছেন, ঠিক যেমনটি শুনেছি, তেমনটি আপনাদের শোনাই। আমাকে (আমাদের) বলা হয়েছে, অতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদ্বান লোমহর্ষণ সূত। আমি যে-কথা যেমনভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবেই বলি। আমার স্বধর্মের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য সত্যব্রতপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা। আমি নির্ভীক, ক্ষমতাবানদের ভয় করি না। রাজনৈতিক কারণে, কোনো নেতা রাজা বা বংশের কাছ থেকে ঘুষ খাই না।

আমি সাধারণের উপযোগী আর লোকহিতার্থে, ভাষাকে যথাসম্ভব সরল করি।

আহা, বুঝেছি হে। পুরাণের অতিরঞ্জন আর অত্যুক্তির কথা বলবে তো? ভ্রূকুটি সন্দেহ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। দেখ, পক্ষপাতবশে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ইতিহাস' লেখকগণ যে-সব অতিরঞ্জন কথা বলেন, এঁদের বলার গুণে মিথ্যা সহজে ধরা পড়ে না। আমাদের অতিরঞ্জন

একেবারে জলজল করে, ধরিয়ে দিতে হয় না। সেইজন্যই এত সন্দেহ। কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মানবে তো? আমাকে তুমি চসার সাহেব বলে ধরে নিলে সব গোলে হরিবোল্ হয়ে যাবে। ধরো, আমি বললাম, রাম পনরো বছর বয়সে সীতাকে বিয়ে করলেন, সাতাশ বছর বয়সে বনে গেলেন, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তারপর? তারপরেই বললাম, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গারোহণ করলেন।

তোমার যতো সন্দেহ আর অবিশ্বাস, এই শেষের কথায়, কেমন না কি? বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। তারপরেই একেবারে এগারো হাজার বছর! কেন, তোমরা কি কীর্তিমানকে আশীর্বাদ বা গৌরব করে বলো না, 'হাজার বছর পরমায়ু হোক!' পশ্চিমের লঙ্লিভ-কে তোমরা তোমাদের প্রিয়জন অমুক গান্ধী আর তমুক বসুকে, খুশির উত্তেজনায় বলো, যুগ যুগ জীও। ভালোই জানো হাজার বছরের পরমায়ু নিয়ে কেউ জন্মায় না, যুগ যুগ জীইয়েও কারোকে রাখা যায় না। তবু তো বলা। আর বলাটা শিখিয়েছি আমরাই। মহত্ত্ব বীরত্ব সুকৃতি অতুলনীয় কীর্তির গৌরব করতে হলে, আমরা এমনই অতিশয়োক্তি করি। তাহলে রামের মতো একজন রাজার এগারো বছরের রাজত্বের আশ্চর্য ঘটনাবহুল কীর্তিকে এগারো হাজার বলতে দোষ কী?

'পুরাণের অতিরঞ্জনের এটি একটি চাবিকাঠি বলে জানবে। এই 'হাজার' হলো উপলক্ষণ প্রয়োগ। যেমন আরো দু-একজনের কথা বলি। কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। হাজারের উপলক্ষণ সরিয়ে দেখবে, কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। এও কীর্তিরই গৌরব। যে-দেশে, যাদের যেমন। পৃথিবীর আর কোন দেশে তুমি এমন আশীর্বাদ শুনেছো, হাজার বছর বাঁচো। শত পুত্রের জননী হও।

'আর একটা কথা তোমাদের শোনাই। 'দিবি আরোহণ' বলে একটা কথা আছে। এসব শুনলে, তোমার কুসংস্কার ঘুচবে, সত্যকে জানতে পারবে, পুরাণকে বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রণাম জানাতে শিখবে। এর নাম জ্ঞান। দিবি আরোহণ, মানুষেরই দেবত্বলাভের কথা। উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার আশ্চর্য সূত্র হলো, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হন, তারপরে তিনি দেবতা হন, তারপরে তাঁকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়।

'যেমন ইন্দ্র একাধিক এবং সকল ইন্দ্রই প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে দেবতা

তারপরে সূর্য। দিবি আরোহণের এই সূত্র না মানলে ঋক্‌বেদের ইন্দ্র বিষয়ক সমস্ত সূক্তগুলোর সরল অর্থ পাওয়া যাবে না। মানুষ দেবতা আর সূর্য এই তিনরকমেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ ঋক্‌বেদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। ধ্রুব মানুষ, ধ্রুবই আবার জ্যোতিষ্ক। সূক্তগুলোকে যিনি জ্ঞান আর বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পাঠ করেন, তিনিই দেবতার মনুষ্যত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম।

'তোমার যাত্রা দ্বারাবতী। তোমাকে আমি কয়েক হাজার শ্লোক শোনাবো না। দেবতা কারা, স্বর্গ কোথায়, এই পথ বন্ধন করে নিতে পারলে তোমার যাত্রা যথার্থ হবে। আগে দেবতার পরিচয় হোক। আমি প্রাকৃতিক শক্তির অভিমানিনী দেবতার কথা বলেছি। এখন যে-দেবতার কথা বলছি, তাঁরাই দেব দৈত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত। তোমরা এখন সকল জাতিকেই মানুষ বলো। আমি মনুবংশীয়দের প্রতি একমাত্র মানুষ শব্দ প্রয়োগ করেছি। অন্যান্য জাতি হলেন, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প নাগ সিদ্ধ যক্ষ রক্ষ ইত্যাদি। অসুরেরা ছিলেন দেবতাদের জ্ঞাতি ও বন্ধু। 'সিস্‌ক্ষোর্জঘানাৎ পূর্বমসুরা জাজ্ঞিরে ততঃ, ততঃ পুরা।' স্বয়ম্ভুব মনুর আদিবিন্দু থেকে আমরা ব্রহ্মাকেই সৃষ্টিকর্তা বলে জেনেছি। তিনি প্রথমে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্লোকটা তাই শোনালাম। তারপরে দেবতা, পরে পরে পিতৃগণ, মানুষ, যক্ষ রক্ষ সর্প গন্ধর্ব। ঋক্‌বেদে কোনো কোনো জায়গায় ইন্দ্রকে অসুর বলা হয়েছে। অনেকটা, তোমরা যখন কারোকে বলো, লোকটা অসুর সেইরকম ভাবে। অসুরেরা ছিলেন অতি শক্তিশালী জাতি। দেবতাদের কোনো কোনো জ্ঞাতিবর্গ পরবর্তীকালে নিজেদের অসুর বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু দেবতাদের দায়াদ বন্ধু বললেও অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ইন্দ্রত্ব নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ প্রায়ই লেগে থাকতো।

'আমি কী বলি জানো? পুরাণের সাহায্য ছাড়া বেদের অর্থ কখনো সুগম হয় না। আমি সূত, আমি যদ্দৃষ্টং বর্ণনা করি, যথাশ্রুতি বলি, ঋষি লেখেন। আমি বলি, যে পুরাণ জানে না, বেদ তার কাছে প্রহৃত হবার আশংকা করেন।

'আমি তোমাকে একজন ইন্দ্রের কাহিনী বলবো। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি এঁর ওঁর ঘাড়ে চেপে অনেক সময়েই গোল বাধিয়েছে। আমি যাঁর কথা বলছি এঁকে বলা হতো, বৃত্রহন্তা বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র। বিরাট যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংসকারী। অসুরদের অনেক নগর ইনি ধ্বংস করেছিলেন।

'ঝটিতি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তোমাদের কালে কোনো

কোনো পণ্ডিত মহেন-জ-দরো সভ্যতাকে প্রাক্ আর্য দ্রাবিড় সভ্যতা বলে দাবী করেছেন। না জেনে করেছেন, আসলে ভিত্তিহীন অনুমান এবং আন্দাজ। অনুমানে প্রমাণসিদ্ধি হয় না। মহেন-জ-দরো আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। তখন স্বর্গ এবং ইন্দ্রদের ইতিবৃত্ত আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরো বলে রাখি, দেবতারা মানুষ ছিলেন। কথাটা আগেও বলেছি। পুরন্দর ইন্দ্রও একজন বীর মানব। জাতিতে দেবতা।

'তোমাদের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ঋক্‌বেদ সংহিতার অনুবাদক রমেশ-চন্দ্র দত্ত, মানুষ ইন্দ্রের দেবত্ব বিষয়ে অনেকগুলো ঋকের অনুবাদ করেছেন। আমি কয়েকটি তোমার সামনে তুলে ধরছি :

'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হয়ে স্তোত্র গ্রহণ করতে এস। এই সোম অভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদের অন্ন ধারণ কর।'

'হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোম পান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর।'

'হে শতক্রতু, এই সোম পান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের বিনাশ করেছিলে। যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে।'

'হে ইন্দ্র, দৃঢ় স্থাপনে ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদের সঙ্গে তুমি গুহায় লুকিয়ে রাখা গাভী সমুদয় খুঁজে উদ্ধার করেছিলে।'

'যুবা মেধাবী প্রভূতবলসম্পন্ন সকল কর্মের ধর্তা বজ্রযুক্ত বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

'বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কাজ করেছিলেন, তাঁর সেই সব কাজের বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করেছিলেন, পরে বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলেন, বহনশীল পার্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করে দিয়েছিলেন।'

'সব সূক্তগুলো শোনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। দ্বারাবতী যাত্রার জন্য তুমি অতি ব্যস্ত হয়েছ। এবার আমি আর কয়েকটি সূক্ত শোনাবো, তারপরে ব্যাখ্যা করব, এসব সূক্তের অর্থগুলো। এবার শোনো, ইন্দ্রও নিজের বজ্র নিজে হেনে, কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তখন তুমি অহির কোন হন্তার জন্য অপেক্ষা করছিলে, যে ভয় পেয়ে শ্যেন পাখির মতো নবনবতি নদী ও জল পার হয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সঙ্গে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে, তুমি অতিথি-বৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করেছিলে। তুমি

মহান অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা আক্রমণ করেছিলে, অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছ।'

'ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করেছেন, এবং তাঁর পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করেছেন।'

'ইন্দ্র পৃথিবীর ওপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে-চারটি নদী জলপূর্ণ করেছেন, তা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম।'

'তিনি বৃত্রকে বধ করে তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করেছিলেন।'

'তিনি সুদর্শন, সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরি নামক অশ্বযুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হাতে লৌহময় বজ্র স্থাপন করলেন।'

'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচির (মূলে ঋষি নামের উল্লেখ নেই) অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করেছিলেন।'

'নদীসমূহ যার নিয়মানুসারে বহে যায়।'

'যিনি মহতি সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র।'

'তিনি বজ্রের দ্বারা নদীর নির্গমদ্বার সকল খুলে দিয়েছিলেন।'

'ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করেছেন।'

'তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করেছ।'

'আমি সূত, পুরাণকারের একমাত্র বাহন। আমি বলি, এই যে আশ্চর্য বলবীর্যশালী পুরুষ, স্বাভাবিক দিবি আরোহণের ফলে, ইনিই আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হন। যেমন তাঁদের অনেকের পরে রাম বা কৃষ্ণ ভগবান হয়েছিলেন। যেমন পরে তোমরা দেখেছ, নবদ্বীপের নিমাই মিশ্র নিজ মহিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছিলেন। এখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবান। আমি তো দেখি, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসবের তুলনায় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বসুর জন্মদিনের উৎসব আয়োজন পূজা কিছুমাত্র কম নয়।

'এখন এই পুরন্দর ইন্দ্রের বিষয় বুঝতে পারলে? তাকে বিশেষভাবে বৃত্রহন্তা বলা হয়। এই বৃত্রকে বলা হয়, হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা ও মহর্ষি ত্বষ্টার ছেলে। আমি জানি, ত্বষ্টা নামে একাধিক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, ত্বষ্টাপুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। কিন্তু তার আগে বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে আঠারোবার পরাজিত করেছিলেন। স্বর্গের সম্রাটদের 'ইন্দ্র' বলা হয়, অতএব তাঁর কাছে এই পরাজয় ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক ও হৃদয়বিদারক।

'আমার মনে হয়, পুরন্দর ইন্দ্রের বিশেষ কীর্তিসমূহ শোনাবার আগে

তোমাকে স্বর্গের অবস্থানটা জানানো দরকার। আমি সূত, স্বর্গের ঠিকানা আমার জানা আছে। ভারতের উত্তরে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে হেমকূট, তার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষধের উত্তরে 'ইলাবৃতবর্ষ'। ইলাবৃতের উত্তর-সীমা নীলাচল।

'এই ইলাবৃতবর্ষ, তোমাদের এখনকার মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আধুনিক পামির পূর্বতুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। এই ইলাবৃতবর্ষেরই অপর নাম "স্বর্গ"। তোমাদের কে একজন কবি যেন লিখেছেন, 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর/মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।' আসলে এই কবিও স্বর্গ নরকের একটা কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ভৌম স্বর্গের ভৌগোলিক অবস্থান জানতেন না।

'পুরাকালে এই ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। পরে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে, নদনদী শুকিয়ে তথাকার সভ্যতা লুপ্ত হয়। আরো একটা কারণ, আমি অনেকবার বলেছি, তেত্রিশ কোটি দেবতা। তার মানেই, স্বর্গ অত্যন্ত জনাকীর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। অতএব ভারতবর্ষে আগমন।

'আমি জানি যেখানে বলি যজ্ঞ করেছিলেন, সেই সুবিস্তৃত প্রদেশের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই স্থান দেবগণের জন্মস্থান। তাঁদের বিবাহ, যজ্ঞ, জাতকর্ম, কন্যাদান প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ আধুনিক তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্যাচলের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। তারপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও অগ্রসর হন। বলতে গেলে, আস্তে আস্তে তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি এই-ভাবে ভাগ করি, ইলাবৃতবর্ষ কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়-ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল নামে পরিচিত। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বাস করেন তাই তার অপর নাম পিতৃলোক।

'দেবগণ যখন প্রথমে ভারতে এলেন, তখন তাঁরা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। ভারতে তখন কেউ রাজা ছিলেন না। দেবগণ ভারতে এসে মানব জাতি হলেন, কারণ ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হলো মনু বা প্রজাপতি। পরে ভারতে রাজা হয়ে, বেণরাজা প্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ইলাবৃতবর্ষই যেহেতু আদি বাসস্থান, অতএব পবিত্র তীর্থভূমি বিবেচিত। যুধিষ্ঠিরের সময়েও স্বর্গে তীর্থযাত্রার প্রচলন ছিল। স্বর্গের পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে পড়ে। আর দিবি আরোহণের ফলে, স্বর্গ মৃত পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান কল্পিত হয়েছে, দেবযান

পরিণত হয়েছে নক্ষত্রবীথিতে। এখন স্বর্গপ্রাপ্তি মৃত্যুর নামান্তর। আমি মৎস্যপুরাণে একজন ইন্দ্রকে "হীনচেতা" বলেছি, কারণ সে সামরিক কারণে, যখন থেকে বজ্র দ্বারা স্বর্গপথ রোধ করেন, তখন থেকে লোক সকলের স্বর্গমার্গ নিবারিত হয়। তার মানে পাহাড় ধ্বসিয়ে পথরোধ করা হয়। এই পথ ছিল মধ্য এশিয়া আর ভারতে যাতায়াতের বণিকপথ। কিন্তু স্বর্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অমর, অতএব দেবযান পথ বন্ধ হয়ে গেলেও বদরীনারায়ণ আর মানস-সরোবরের পথে অনেকে স্বর্গে যেতো। যুধিষ্ঠিরকে এই পথেই যেতে হয়েছিল। এই সেই কৈলাসপতি রুদ্র—অর্থাৎ শিবের রাজত্ব। তিব্বতে চিরকালই ভূত প্রেতের নাচ প্রসিদ্ধ। এরা শিবের অনুচর। ইন্দ্রের অনেক পরে শিবও ঋষিদের যজ্ঞভাগী হন।

'মনে রেখো, স্বর্গেরও উত্তর কুরুতে ছিল ব্রহ্মলোক আর বিষ্ণুলোক। আর ভারতীয়দের মতোই, স্বর্গের দেবতাদের আকাঙ্ক্ষণীয় তীর্থ ছিল ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-লোক। দেবতারা নিজেদের সেই লোকেরই অধীন মনে করতেন। এখন তুমি এই দুই লোকের সন্ধানে কাসপিয়ান সাগরের কূল কিংবা সাইবেরিয়ায় যেতে পারো, সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। স্বর্গের নেতা অধিপতি ইন্দ্রগণ বিপদে পড়লে বিষ্ণুর পরামর্শ নিতেন। একাধিক ইন্দ্রের মতো, বিষ্ণু বরুণ মিত্রও একাধিক।

'ভারতের বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত্য। পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগ পাতাল। পাতালকে আমি ভূবিবর বলেছি, দক্ষিণদেশও বলেছি। পাতালেরও সাত ভাগ আছে। আমি পাতালের সাত ভাগে দেখেছি বহু সুন্দর নদ নদী উপবন আর নগর। নারদ বলেছেন, পাতাল স্বর্গাপেক্ষাও মনোরম।

'দ্বারাবতীর কোন উপাখ্যান তুমি বলবে, জানি না, কিন্তু পাতালের বর্ণনা শুনে রাখো। অতল—ময়পুত্র মহামায়ার রাজত্ব। বিতল—হাটকেশ্বর হর। সুতল—বৈরোচন বলি। তলাতল—ময় ত্রিপুরাধিপতি। মহাতল—সর্পজাতি। রসাতল—দানবজাতি। পাতাল—নাগজাতি। অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ—সুতল। আমি পাতালের অধস্তন প্রদেশে সংকর্ষাগ্নি দেখেছি। যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরির কথা মনে রেখো। একটা হিসাব দিয়ে রাখি, বলির রাজ্যকাল, তিন হাজার চারশো সাতার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কপিল পাতালবাসী ছিলেন।

'পুরাণের ইতিবৃত্ত প্রমাণের একটি আশ্চর্য ঘটনা এখানে শোনাই। সগরের বংশধর ছেলে অসমঞ্জ এবং আরো ষাট হাজার ছেলে পাতালে কপিল শাপে

বিনষ্ট হয়, এ আমারই কথা। ষাট হাজার অশ্ববাহিনীকে আমি যজ্ঞীয় অশ্ব বলি। সগর অশ্বচোরের সন্ধানে যাদের পাঠালেন, তারা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখে দেখে, কপিলের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাকেই চোর ভেবে ধরতে গিয়ে কপিলের অগ্নিপিঙ্গল বর্ণের দিকে তাকিয়েই অভিশপ্ত হয়ে মারা গেল। তখন সগর পৌত্র অংশুমানকে অশ্বের সন্ধানে পাঠালেন। অংশুমান সাবধানী, তিনি কপিলকে খুশি করে যজ্ঞীয় অশ্বসকল নিয়ে পিতামহকে ফিরিয়ে দিলেন। অংশুমানের ছেলের নাম দিলীপ। দিলীপের ছেলের নাম ভগীরথ।

'জানো তো ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। আসলে, তোমাদের ভঙ্গিতে বললে, বলতে হয়, ভগীরথ একজন ইরিগেশনের বীর এঞ্জিনীয়র যিনি গঙ্গাকে খাল কেটে সুদীর্ঘ পথে সাগরে মিশিয়েছিলেন। সগর বংশের এইটি একটি মহান কীর্তি। সগর খাল কাটিয়ে গঙ্গাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য প্রথমে বংশধর পুত্র অসমঞ্জ এবং আরো ষাট হাজার অশ্বারোহী পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য রেখো, অসমঞ্জ 'বংশধর পুত্র', বাকীরা কেবলই 'পুত্র'। এটাই আমাদের—সূতদের বৈশিষ্ট্য। ষাট হাজার খননকারী কর্মীকেও আমরা সগর পুত্র বলে উল্লেখ করলাম, কিন্তু বংশধর পুত্র বললাম না।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, অসমঞ্জ, তারপরে অংশুমান। তারও পরে অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ আবার সেই খাল খননের কাজে লাগলেন। কিন্তু কে কপিল। কিসে এত বিস্তর লোক মারা গেল?

'কৃষ্ণ একবার বলরাম আর প্রদ্যুম্নকে সঙ্গে করে বাণরাজ্য থেকে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহেশ্বর জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বাণরাজ্য আধুনিক আসাম। মাহেশ্বর জ্বর শুনলেই ব্যাধির নাম মনে আসে আর সেই ব্যাধি অতি ভয়াবহ দৈত্যের থেকেও ভয়ঙ্কর।

'বাঙালীরা দক্ষিণের ম্যালেরিয়ার কথা কখনো ভুলবে না। যকৃতের দোষ, চোখ হলদে আর বিভীষিকাময় জ্বর। পিঙ্গলবর্ণ কপিলের ইঙ্গিত সেখানেই। ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছিল, ষাট হাজার খননকারী মরে পড়েছিল। অতএব কপিলকে সাধনা করেই সাধ্যায়ত্ত করতে হয়। অসমঞ্জ থেকে ভগীরথ তিন পর্যায়কাল ব্যবধান—আমার হিসাবে পঁচাশি বছর সময় লেগেছিল। তাই আমি গঙ্গাকে একটি নতুন নাম দিলাম ভাগীরথী। সগরের নামানুসারে, সমুদ্রকে সাগর। এই বিশাল আর পুণ্য কর্মের জন্য গঙ্গাসাগর বিন্দুকে তীর্থ বোধ করলাম, আনন্দে অবগাহন করলাম। কিন্তু কপিলের স্থান তাই দুরন্ত শীতে পৌষ সংক্রান্তির দিন ধার্য। অন্য কোনো ঋতুতে নয়, কপিল ক্রুদ্ধ হতে পারেন।

'মনে রেখো, এই কপিল, সাংখ্যকার কপিল মুনি নন। ব্রহ্মা তাঁকে জন্মাতে দেখেছিলেন সৃষ্টির আদিতে। ইনি মানুষ নন। সৃষ্টির আদিতে যে হিরণ্ময় অণ্ড জন্মেছিলেন আমরা তাঁকে তারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেছি। এক এক অস্বাস্থ্যকর সংক্রামক রোগের স্থানে, সগর সন্তানদের মতো অনেক মৃত্যুর খবর তোমরাও জানো। মীরজুমলার দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্য আসামে গিয়ে জ্বরে মারা গিয়েছিল।

'আমি জানি, পুরাকালে অনেক ব্যক্তি খাল খনন পূর্তাদি কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জানি, গঙ্গাকে খনিত খাল ভাবতে তোমার বিশ্বাসে আঘাত লাগছে। কিন্তু মানুষের কীর্তিই পুণ্য, তাঁর দিবি আরোহণ সেখানেই। এই বিশাল কর্মকে প্রণাম করি, পুণ্যাবগাহন করি।

'তোমার দ্বারাবতী যাত্রা আর সবুর সইছে না। অথচ এসব না জেনে, যাত্রাটাও ঠিক হবে না। আসলে তোমার বাইরে ত্বরা, অন্তরে তুমি তন্ময়। এবার তোমাকে পুরন্দর ইন্দ্রের কয়েকটি কথা বলি। বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়ে খুবই অশান্তি বোধ করেছিলেন। বৃত্র যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ইন্দ্র আর তাঁর প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করার জন্য, পাহাড় ধ্বসিয়ে চারটি নদীপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করে বজ্রাঘাতে পর্বতকে বিদীর্ণ করে রুদ্ধ নদীপথ খুলে দিয়েছিলেন। তাই তিনি পর্জন্যদেব, জলমোচনকারী। সূক্তগুলোর কথা মনে করো।

'কিন্তু মানুষ কেমন করে বজ্রকে ধারণ করবেন? না, প্রাকৃতিক বজ্রকে কেউ ধারণ করতে পারেন না। তথাপি আমি দেখছি, বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ। এই বজ্র তোমাদের বন্দুকের মতোই এক অস্ত্র ছিল। এই বজ্র সুদূরপাতী। এই অস্ত্রটির জন্য ইন্দ্র হতাশ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু বললেন, 'এই বৃত্র অস্থিময় বজ্রের দ্বারা নিহত হবে।' ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জীবের অস্থি দিয়ে এই বজ্র তৈরি হবে? গজ, শরভ বা অন্য কোন জন্তুর অস্থি আবশ্যক আমাকে তা বলুন।'

'বিষ্ণু বললেন, 'সুরাধিপ, সেই জীব শত হস্ত প্রমাণ, মধ্যে ক্ষীণ দুই পার্শ্বে স্থূল ছয় কোণ অর্থাৎ পলযুক্ত ভীষণাকৃতি হওয়া চাই।' ইন্দ্র হতাশ হয়ে বললেন, 'আমার পরিচিত ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোনো প্রাণীই যে দেখি না।'

'আমি তোমাকে এখন আর রূপকের কথা বলবো না। সরাসরি বলবো। বিষ্ণু বললেন, 'সরস্বতী তীরে যে বিশাল দধীচি আছেন তিনি এর দ্বিগুণ। ইন্দ্র সরস্বতী তীরে গিয়ে দধীচির দেখা পেলেন। আমি অবিশ্যি এখানে দধীচিকে

বিপ্র বলেছি, এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্র গিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে বিপ্র, আপনি ভিন্ন এত বিশাল প্রাণী আর দেখি না।' অতএব ইন্দ্র দধীচির অস্থি গ্রহণ করলেন। তাঁর করোটি অশ্বমস্তকের ন্যায় দেখতে ছিল। অস্থির অন্ত অংশ না মস্তকটি চাই, আর তার জন্য ইন্দ্রকে, পাহাড়ে লুকানো শরণাবতে সরোবরে তা খুঁজে পেতে হয়েছিল।

'তোমার চোখের সামনে কি প্রাচীন প্রাণী ডাইনোসোরাসের ঘোটক জাতীয় করোটি ভেসে উঠছে? উঠলেও আমি কোনো মন্তব্য করবো না। কিন্তু অস্থি পেলেই তো হবে না। বারুদ চাই, নির্মাণ করা চাই সেই ভয়ঙ্কর আয়ুধ। তখন ইন্দ্র গেলেন আর একজন ত্বষ্টা নামক জ্ঞানীর কাছে। ইনি বৃত্রের পিতা ত্বষ্টা নন। এই ত্বষ্টার বারুদ বিষয়ে জ্ঞান ছিল। আর বারুদ তৈরি করতে জানতেন, ইলাবৃতবর্ষের সংলগ্ন ভদ্রাশ্ববর্ষে, তোমরা এখন যাকে চীন বল, সেই দেশের বিশিষ্ট গুণধরগণ।

'তোমাদের আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা, পূর্বতুর্কীস্থান আর তার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে, প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল, কিছুকাল আগেও আবিষ্কার করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল বলতে, আমি সর্বদাই স্বয়ম্ভূ মনুকালের পূর্বের কথা বলি। বিলিতি বি-সি এ-ডি ইত্যাদির কথা বলি না। যে-প্রাণীর দ্বারা দেব ও মানবজাতির ইষ্ট হয়, আমরা সেই প্রাণীকেও ঋষিতুল্য জ্ঞান করি। আধুনিককালের ইতিহাস লেখকগণের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলত তফাত এইখানে।

'যাই হোক, বজ্রায়ুধ সৃষ্টিকারী ত্বষ্টা ভদ্রাশ্ববর্ষ থেকেই বারুদ তৈরি করতে শিখেছিলেন। তিনি দধীচির অশ্ব করোটির ন্যায় সুবিশাল মস্তক দিয়ে যে বজ্রাস্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা ছিল দীর্ঘ নালিক অস্থির সঙ্গে যুক্ত। বারুদ ধাতুখণ্ড প্রস্তরাদি ঠাসা সেই বিশাল অস্ত্রের বর্ণনায় বেদ বলেছেন, বজ্রটি প্রকাণ্ড, শতপর্ব, চারপলযুক্ত।

'তোমার নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হচ্ছে, বৃত্র কোন্ কোন্ নদীপথ, কোথায় অবরোধ করে, ইন্দ্রকে এবং তেত্রিশ কোটি দেবতাগণকে কষ্ট দিচ্ছিল? স্বাভাবিক। আমি সে কথাও বলেছি। মানস-সরোবরের কাছে বৃত্র দুটি নদীপথ অবরুদ্ধ করেছিল। বিপাশা আর শুতুদ্রী। আমি নদীদ্বয়ের মুখ দিয়েই বলিয়েছি, 'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগৎপ্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হয়ে গমন করছি।' এই নদী দুটির তোমরা

আধুনিক নাম দিয়েছে, বিয়াস আর সট্‌লেজ।

'অবিশ্যি পরবর্তীকালে অর্বাচীন সূতগণের দ্বারা এই দুটি নদীই চারটি হয়েছে, তারপরে সাতটি। এ সবই গৌরবে বহুবচন। অর্বাচীনেরা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, আর জ্ঞানী তার ভিতর থেকেই সত্যকে অনুসন্ধান করে আত্মসাৎ করেন।

'এইবার সেই সূক্ত মনে কর, যখন বজ্রবাহু সেই বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তার শব্দ এমনই বিশ্বপ্রকম্পিত, অগ্নি ও ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিল, পর্বত ধ্বসিয়ে দিয়েছিল, অবরুদ্ধ নদীদ্বয় আকাশের মতো উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, স্বয়ং ইন্দ্র ভয়ে বহুদূর পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম, স্বর্গ লয় পেতে বসেছে। কিন্তু নদী দুটির প্রবল বহমানতা, বৃত্রের অনুচরগণসহ মৃত্যুর সকলই যখন প্রত্যক্ষ হল, সবাই গিয়ে ইন্দ্রকে খবর দিলেন। এই জন্যই ইন্দ্রকে আমরা বলি, জলমোচনকারী। এই কারণেই তাঁর দিবি আরোহণের পরে তিনি জলবর্ষণকারী আন্তরীক্ষ দেব হয়েছেন। বৈদিক দেবতাই হলেন শত্রুবিমর্দক পরাক্রান্ত যোদ্ধা।

'আমরা সকলেই সেই স্বর্গের অধিবাসী, কোনোকালেই সেখানকার দেব-দেবীদের, সেই সুন্দর স্থানের কথা ভুলতে পারি না। তোমাদের এখন যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনা সভা হয়, আমরাও সেইরকম সভা উৎসব করতাম। আমরা তাকে বলতাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করা হতো। তাকেই প্রথম পাদ্য অর্ঘ্য সোম ও অন্ন নিবেদন করা হতো, এবং সকলেই সেই যজ্ঞে সামিল হয়ে, তাঁর স্তুতি করতাম। এক সময়ে গৃৎসমদ বলছেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' অতএব জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি বলছেন, 'যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র। যিনি অহিকে (বৃত্রকে) বিনাশ করে সপ্তসংখ্যক (দুই) নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি গো উদ্ধার করেছিলেন, যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তিনিই ইন্দ্র।' এ কথাগুলো থেকে বুঝতে পারবে, ইন্দ্রগণ লুপ্ত হবার পরে তাঁদের নরত্ব কি করে আস্তে আস্তে অদৃশ্য দেবত্বে পরিণত হয়েছে। অতএব আমরা এখনো যজ্ঞভূমিতে তাঁকেই আহ্বান করি, তাঁর উদ্দেশেই সোম ও অর্ঘ্য নিবেদন করি।

'জানি, তোমার দ্বারাবতী যাত্রার ভূমিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলো। কিন্তু তোমার যাত্রা এত দীর্ঘতর, তুলনায় এ ভূমিকাকে দীর্ঘ বলা যাবে না। পুরাণের ইতিবৃত্তীয় সংকেত ও ইঙ্গিতগুলো পেলে, মানুষ ও তার দিবি আরোহণের ফলে

দৈবত্বের সংবাদ পেলে।

'তোমার যাত্রার আগে, আর একটু সহজ কথা বলি। পৃথিবীতে সব দেশের, সব জাতির নিজেদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। আন্তর্জাতিকতা সেখানেই মহিমময় যখন সকলের সব বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পরের যোগসূত্রে বিশাল ও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয়দেরও নানান বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে। আমি একজন সূত হিসাবে দেখলুম, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকে। পুরাণ তাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, কিন্তু আমি যদি কেবলমাত্র 'ইতিবৃত্ত' বলি, তা হলে তারা রক্ষা করবে না। অতএব আমি বললাম, পুরাণ ধর্মপুস্তক। এই পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করা, লিখে দান করা, পাঠ করে অপরকে শোনানোর মতো পুণ্য আর কিছু নেই। সেইজন্যই পুরাণ এখনো বর্তমান আছে।

'কিন্তু কালের প্রবাহকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। গৃৎসমদ ঋষি কতকাল আগেই বলেছিলেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' ভারতীয়রাও সেইরকম বহু বহিরাগতদের শাসনে, শিক্ষায়, প্রলোভনে, আপন জাতীয় ইতিবৃত্তকে ভুলতে বসেছে। হাম্পটিডাম্পটির ড্যাডরা তো পুরাণকে জানেই না, বিশ্বাসও করে না। তোমার এই দ্বারাবতী যাত্রার উদ্যমে আমি হৃষ্ট, কারণ তুমি জাতীয় ইতিবৃত্তেরই একটি অধ্যায় তুলে ধরতে যাচ্ছো। প্রকৃত ইতিবৃত্ত, নর ও দেবের ইঙ্গিত, তোমার দরকার ছিল। এখন তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সহজগম্য হবে। আমার মনে হয়, পরেও আমাকে তোমার দরকার হবে। ডেকো, আসবো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

এবার মন চল যাই ভ্রমণে, বাসুদেবের অঙ্গনে। ঠিকানা কী? দ্বারকানগরী। ইতিবৃত্তে বাসুদেব একজন থাকারই কথা। যিনি যেখানেই গমন করতেন, গমনের আগে তাঁর রীতি ছিল, শঙ্খ নিনাদের দ্বারা জ্ঞাতি বান্ধব আর নগরবাসীদের জানানো। যদুবংশের কয়েক শাখার মধ্যে যিনি বৃষ্ণি গোষ্ঠীর নেতা বার্ষ্ণেয় সেই বাসুদেব তাঁর যাত্রার ঘোষণা এভাবেই করতেন। তার আগেই তাঁর রথের যিনি সারথি, তিনি দুর্মদ অরি নিধনকারী কৃষ্ণের আয়ুধাগার থেকে, রথে তুলে রাখতেন তাঁর ব্যবহারের বিশেষ অস্ত্র গদা শার্ঙ্গপানি এবং চক্র।

বংশপরম্পরার তালিকা, সে-ভারি জটিল জালের বিষয়। তবু একটা

ধরতাই থাকা ভালো। যে-পথে ভ্রমণ করছি, এ-যাত্রায় এ-সবের কিছু কিঞ্চিৎ দরকার। যদুকে পেলে, যদুবংশের একটা হিল্লে হয়। মন খোলসা করে, ব্যক্তিকে নির্ণয় করা যায়। অতএব এবারে খোঁজ করি, যদু কে? যাত্রা পথের ধূলা উড়িয়ে দেখছি, যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর গর্ভে যদু আর তুর্বসুর জন্ম দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু আর পুরুকে। এঁদের নিয়ে আপাতত আমার দরকার নেই। দেখছি, ইতিবৃত্তের ধূলার নীচে লেখা রয়েছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু। তারপরের জটিল বংশমালা দেখে আমার মাথা ভিরমি যাচ্ছে। যাত্রার আগে যদুকে নিয়েই দু-এক কথায় বংশপরিচয় সাঙ্গ করি।

দেখছি, এই যদুরই বংশধরেরা কালে কালে সাত্বত, বৃষ্ণি যাঁদের বলে, অন্ধক, ভোজ নানা শাখায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। একে বোধ হয় শরিকানার ভাগাভাগিও বলা যায়। এঁরা নিজেদের মধ্যে বিস্তর ঝগড়া বিবাদ করেছেন। সে-কথা আপাতত যাক। বরং তার চেয়ে বলা ভালো বিভিন্ন শাখার এই যদুবংশ দীর্ঘকাল নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পেরেছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের কালের প্রবাদ কাহিনীর সেইরকম জ্ঞানী বৃদ্ধরা যদুবংশে ছিলেন যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, এক গাছি কঞ্চিকে অনায়াসে একজন ভাঙতে পারে; একগুচ্ছ কঞ্চিকে পারে না। অতএব ওহে যাদুগণ এককাট্টা হয়ে থাকো। এ ক্ষেত্রে বয়সে বৃদ্ধ না হয়েও যদুবংশের রাজসিংহাসনে আরোহণ না করেও যিনি সমগ্র গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংহত করে রাখতে পেরেছিলেন, তৎকালের লোকেরা তাঁকে বিশেষণ দিয়েছিলেন বৃষ্ণিসিংহ। যিনি আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত।

নাম তাঁর বহুতর। ছেলেবেলায় আসন্ন ভোরের বিছানায় শুয়ে মায়ের মুখেই তাঁর শতাধিক নাম উচ্চারিত হতে শুনেছি। ইনি অগাধ কীর্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। পুরানো ঐতিহ্যের কথা কে ভোলে? আমরা ভুলি না। আমি ভুলি না। ইলাবৃতবর্ষে দেবতা জাতির যে-সব কীর্তিশালী ব্যক্তিরা বীর যোদ্ধা মেধাবী শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের যেমন দিবি আরোহণ ঘটতো, রূপান্তরিত হতেন ভগবানে, কৃষ্ণেরও সেই দিবি আরোহণ ঘটেছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু তাঁর এই অগাধ কীর্তির একটা পশ্চাদ্‌পট ছিল। সাত্বতদের—অর্থাৎ বৃষ্ণিকুল সম্পর্কে ইতিবৃত্ত দেখছি অতি মুখর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কীর্তন করেছেন, সাত্বতগণকে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ না। বৃষ্ণি বংশীয়রা যুদ্ধে লব্ধলক্ষ্য হয়ে অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন…এঁদের তুল্য বলবান ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর

হয় না। এঁরা জ্ঞাতিদের অবজ্ঞা করেন না, বৃদ্ধগণের আজ্ঞা পালন করেন। …সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানরত মহাত্মা, প্রচুর বিত্তশালী হয়েও অহংকার করেন না।…বিপদের সময়ে সমর্থ ব্যক্তিদেরও উদ্ধার করে থাকেন। এঁরা দেব-পরায়ণ, দাতা… এই সব গুণের জন্যই তাঁদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না।'

কীর্তিমানদের গুণের কথা এখানেই ইতি করা যেতো। আর একটু যোগ করলে, একটি বিশেষ সংবাদের সঙ্গে আশ্চর্য একটি চিত্রও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। শূরসেনদের মথুরাবাসী বলা হয়। জ্ঞানী বৃদ্ধরা বলেছেন, 'এঁরা দীর্ঘদেহী, ক্ষিপ্রকারী আর নৌচালনাপটু। এঁদের সর্বদা যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করবে।'…

আমার চমকটা লাগলো 'নৌচালনাপটু' শব্দটিতে। নৌচালনা? তা হলে মহেন-জ-দরো-র "অনার্য-কীর্তি" যুক্তিগুলো টেকে কেমন করে? না, আমি এসব পণ্ডিতি তর্কে নেই। ওতে বিস্তর ফাঁদ পাতা। কে কোথা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবেন, কে জানে। আন্ কথায় কী কাজ? কাজের কাজ করো। তবে তোমাদিগের নিকট যাজ্ঞা করি, এই নৌচালনাপটু সংবাদটির কথা মনে রেখো। দ্বারাবতী গমনের সময় সংবাদটির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

কিন্তু যে-কথা বলতে গিয়ে এত কথার উৎপত্তি, সে-এক ঝকমারি। কারণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুমতি দিতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখ থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, বঙ্গ পুণ্ড্র কিরাতদেশের অধিপতি, জরাসন্ধের অনুগত, তার নাম আর আমার নাম এক। কিন্তু সে নিজেকে কেবল বাসুদেব বলেই ক্ষান্ত নেই। যে বিশেষণের দ্বারা তোমরা আমাকে ভূষিত করেছ, সে নিজেকে সেই পুরুষোত্তম বিশেষণে ভূষিত করে থাকে। এমন কি মোহবশত সে আমার চিহ্নসমূহও সর্বদা ধারণ করে থাকে। আসলে ভূমণ্ডলে তার প্রকৃত পরিচয়, মহাবলপরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক।

এই বিষয়টিকেই আমি ঝকমারি বলছিলাম। ঘটনাটা ইতিবৃত্তীয় সত্য। এখন দেখছি, কীর্তিমানদের অনুকরণ করার ইচ্ছা আর অভ্যাসটা নিতান্ত একালের না। রূপোলী পর্দার অমুক কুমারকে আপাদমস্তক নকল করার মতো স্পৃহা হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। রকমফেরটা অবিশ্যিই মানতে হবে। আমাদের কালে, রূপোলী পর্দার নায়ক নকলবাজরা নিজেদের সাচ্চা বলে চালাবার চেষ্টা করে না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই রোগটি ছিল, কারণ সে কৃষ্ণের বীরত্ব বুদ্ধি আর কৌশলকে ঈর্ষা করতো। অতএব শঙ্খ গদা চক্র তারও

থাকতে হবে। কৃষ্ণের মতো মণিকুণ্ডল তারও চাই। উপরন্তু প্রচার করা চাই, সে নিজেই পুরুষোত্তম বাসুদেব।

ঈর্ষা নামক ইন্দ্রিয়টি একবার মস্তিষ্কে বিঁধে গেলে, তখন রক্তক্ষরণের পালা শুরু হয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই অবস্থা হয়েছিল। কারণ সে ছিল প্রাগ-জ্যোতিষপুরের অসুররাজ নরকের বন্ধু। কৃষ্ণের অপরাধ, তিনি সেই দর্পী প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি নরককে হত্যা করেছিলেন। নরকের লালসালয় থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন ষোল হাজার রমণীকে। পুরাণকাররা হিসাবটাকে কেউ কেউ ষোল হাজার একশো বলেছেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত কিছু থাকাটা আশ্চর্যের না, ইতিপূর্বেই স্বয়ং সূত আমাকে এ কথা শুনিয়েছেন। তবে ষোল হাজারের সঙ্গে একশো জোড়া আর না জোড়াটা, যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্নর মতোই মনে হয়। তেমন একটা ইতর বিশেষ নেই। কিন্তু নরকের ভোগগুহা থেকে মুক্ত ষোল হাজার রমণীকে সহসা ব্রজরমণীদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। ওখানে হিসাবের একটু খটোমটো আছে। বৃষ্ণি-সিংহ বাসুদেবের সঙ্গে গোপরমণী রাধার কথায় আমি আদৌ নেই। সেই তো আমার কথা, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়।' কৃষ্ণ বলে কথা! বহু ধারায় তাঁর যাতায়াত।

একটা কথা এ সময়েই কবুল করে রাখি। দ্বারাবতী আমার যাত্রা বটে। বাসুদেবেরই সান্নিধ্যে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে যাত্রা, সেই উদ্দেশ্যের তিনি একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। কিন্তু তিনিই দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্রষ্টা, তাঁর জীবিত-কালের মধ্যে তিনিই প্রধান পুরুষ, সেই জন্য তাঁকে ছেড়ে আমার উদ্দেশ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যে। অতএব বাসুদেবায়ঃ শরণং। রাধা অন্য ধারায় আছেন, আমি অন্য ধারায়।

আমি যে-ধারায় চলেছি, সেখানে বাসুদেব শ্রী ও কীর্তিসম্পন্ন অতিমাত্র শত্রু সংহারক, বন্ধুদেব ইষ্টাকাঙ্ক্ষী ঐক্যবদ্ধকারী সংগঠক। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা শেষ করি। নরককে কৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন বলে পৌণ্ড্রক ক্ষেপে উঠেছিল। বলতে গেলে, তখন থেকেই যদুবংশের যশস্বী বার্ষ্ণেয়কে নিয়ে তার মোহের সঞ্চার, নামের অনুকরণ, আয়ুধ আর চিহ্নসমূহ ধারণের পাগলামি। অথচ রাজাকে যে-সম্মান দেওয়ার রীতি ছিল, সব ক্ষেত্রেই তা তার প্রাপ্য ছিল। আর সেগুলোকে সে কাজে লাগাতো একমাত্র বাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঞ্চালে আসছেন। পৌণ্ড্রকও গেল। ধুলা উড়িয়ে পরতে পরতে লেখা দেখছি, উদ্দেশ্য একমাত্র, কোনো রকমে একটা

গোলমাল লাগাতে পারলে কৃষ্ণের সঙ্গে লেগে যাওয়া। কিন্তু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব, সব ভেস্তে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে লাভ, হায়! সেই কৃষ্ণের। জীবনে যাঁদের কখনো চোখে দেখেন নি, অথচ কানাঘুষা শুনছিলেন, পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা যায় নি, আর মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, যেন কোনোরকমে তাঁদের দেখা পান, সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তটি এসে গেল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই। পৌণ্ড্রকের জানা উচিত ছিল, 'গোলেমালে গোলেমালে পীরিত করো না।' অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি করতে যেও না। কৃষ্ণ গোলমাল থেকে দূরে ছিলেন, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়ে দিল।

কিন্তু সে-কথার জালবিস্তার আপাতত না। পৌণ্ড্রক জরাসন্ধের অনুগত হাওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, উপস্থিত হয়েছিল। ইতিবৃত্তকার ঘটনা লেখেন, সূত বলেন, তুমি তোমার ধারণা মতো ইঙ্গিত ও সংকেতগুলো চিনে নাও। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় কে ছিলেন? জরাসন্ধ। আর এই জরাসন্ধের প্রবল পরাক্রমের ভয়েই তো স্বয়ং কৃষ্ণের মথুরা ছেড়ে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে আশ্রয়ের সন্ধান। অতএব জরাসন্ধের মতো যারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আসতে পারেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই। কৃষ্ণ বিরোধী প্রচার, কৃষ্ণের নিন্দা, কৃষ্ণকে অবজ্ঞা দেখানো এবং সুযোগ পেলে কৃষ্ণ নিধনেও আপত্তির কোনো কারণ ছিল না।

রাজসূয় যজ্ঞে যাঁরা এসেছিলেন, জরাসন্ধ হত্যাকাহিনী তাঁদের অজানা ছিল না। জরাসন্ধ জীবিত থাকতে, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা কি সম্ভব ছিল? কৃষ্ণের অভিমত, কখনোই না। আগে জরাসন্ধ বধ, তারপরে রাজসূয় যজ্ঞ।

কেন কৃষ্ণ এ পরামর্শ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন? সূত বলেন, ঋষি লেখেন, তুমি ইঙ্গিত আর সংকেতগুলো চিনে নাও। কেবল শ্রবণ আর পাঠে পুণ্য নেই, পুণ্য অনুভবে। পুণ্য-ভাবনা, আমার কাছে জীবন-জিজ্ঞাসা। মহাবল জরাসন্ধ কৃষ্ণবধে কৃতসংকল্প ছিলেন। এইরূপ প্রচার ছিল, তিনি ছিয়াশিজন রাজাকে কারাগারে বন্দী করেছেন। একশো পূরণের জন্য আর চৌদ্দজন বাকি। যদুবংশে কৃষ্ণ কখনোই রাজ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। যদুর বংশ-পরম্পরায় ভোজক শাখার উগ্রসেনই রাজা হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কংস, তাঁকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন, আর জরাসন্ধের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

না, বরং বলা যায় জরাসন্ধই যদুবংশকে আপন শক্তির সীমায় রাখার জন্য, কংসের সঙ্গে অস্তি আর প্রাপ্তি নামে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিটা কাজে লেগেছিল। জরাসন্ধের মত মহাবল শ্বশুর পেয়ে কংসের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। তিনি পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেছিলেন। আর যদুবংশের রথী মাহরথীদেরও পীড়ন করে পায়ের তলায় রেখেছিলেন।

উগ্রসেনের ভাই দেবকের মেয়ে দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়েছিল। বসুদেবের ছেলে, বাসুদেব। তাঁর কংসবধের ঘটনায় আমি যাবো না। যদিও যাবো না যাবো না করে দ্বারাবতীর পথের অলিগলি ঘাঁটতে বিস্তর ধূলাবৃত কাহিনী এসে পড়ছে। বলতে চেয়েছিলাম, জরাসন্ধের বাকি চৌদ্দজন শত্রুর মধ্যে, একজন অন্তত রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বৃষ্ণিসিংহ। জরাসন্ধ জামাই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, অতি দুরন্ত শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণ তা জানতেন, অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছিলেন। কেবল সমর্থনই করেছিলেন? পাণ্ডবদের ক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠার মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। অর্জুন যে-মুহূর্তে পাঞ্চালীকে লাভ করে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কামারশালায় গিয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলরামকে সঙ্গে করে সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথমেই পরিচয় কুন্তীকে—তুমি আমার পিসীমা। যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন আমার পিসতুতো ভাই।

যদুবংশের জ্ঞানী ও বীর, বন্ধু ও কর্মী বাসুদেবের আত্মীয়তাও কম নয়। সেই থেকে শুরু। ক্রমবর্ধমান বলশালী বিত্ত ও ক্ষমতাশালী পাণ্ডবদের অন্তরের ভাষা তিনি পড়তে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি মহান। ইতিবৃত্তের প্রতিটি পংক্তিতে আমি দেখছি, লিখিত ভাষার গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাসুদেবের মহিমময় ভবিষ্যৎকীর্তির ইঙ্গিত। মুখ ফুটে না বললেও, যুধিষ্ঠিরের অন্তরে রাজসূয় যজ্ঞের বাসনা তিনিই জাগিয়েছিলেন। অতএব অনুমতি প্রার্থনা মাত্রই, যজ্ঞের সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে জরাসন্ধ বধ নিশ্চিত হতে হবে।

দুর্মদ শত্রুনিধনকারী কৃষ্ণ কি আগে থেকেই ভেবে রাখেন নি, জরাসন্ধকে মহাসমরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে ডেকে নিয়ে এসে নিধন করা, সসাগরা ধরণীর সকলের পক্ষেই অসম্ভব ছিল? ভেবেছিলেন। ইতিবৃত্তের লেখায় তা প্রচ্ছন্নরূপে রয়েছে। কিন্তু জরাসন্ধ বধ কাহিনীতে কী দরকার?

দরকার একটি সংশয়িত জিজ্ঞাসার জন্য। মহাসমরের বদলে, কৃষ্ণ

জরাসন্ধকে, ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিলেন ? না কি তিনি, ভীম এবং অর্জুনসহ নিতান্ত স্নাতকের বেশে, মগধ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন ? এবং তারপরে গুপ্তহত্যা ?

না, প্রাচীন ইতিবৃত্তকে আমি এতোটা অপরিচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবতে পারি না। সংশয়টা এই কারণে জাগে, যে-ধুরন্ধর মহাবল জরাসন্ধের ভয়ে স্বয়ং কৃষ্ণকে সকল যদুবংশের প্রধানগণকে নিয়ে মথুরা থেকে সুদূর পশ্চিমের দ্বীপান্তরে চলে যেতে হয়েছিল, তাঁকে হাতের কাছে পেয়েও জরাসন্ধ ছেড়ে দিলেন কেমন করে ? স্পষ্টতই তিনি জরাসন্ধের রাজপুরে প্রবেশের জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভীম অর্জুনকে নিয়ে স্নাতকের ছদ্মবেশে জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে, তিনজনের যে-কোনো একজনের সঙ্গে জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

দেখছি, দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতিটা প্রাচীন ভারতেও ছিল। সাহেবরাই কেবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন না। কৃষ্ণের সকল মহানুভবতাকে মেনে নিয়েও এই মুহূর্তে জরাসন্ধকে আমার সত্যবদ্ধ রাজা বলে মনে হচ্ছে। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বীরের যা ধর্ম। ভীমকেই তিনি প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভীমই প্রথম এবং শেষ। জরাসন্ধ অর্জুন আর কৃষ্ণের সঙ্গে লড়বার অবকাশ পান নি, নিহত হয়েছিলেন ভীমের হাতেই। কৃষ্ণ কি একথাও জানতেন, জরাসন্ধ ভীমকেই প্রথমে বেছে নেবেন ?

তবে হে বাসুদেব, তোমার তুলনা তুমিই ! অন্যথায় যে-কোনো ছদ্মবেশেই হোক কোন্ সাহসে তুমি জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলে ? যাঁর ভয়ে তুমি সুদূর পশ্চিমে চলে গিয়েছিলে ? সবই দেখছি, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা, পাণ্ডবগণের পরিচয় লাভ, তোমার দূরদৃষ্টি, তোমার মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করেছিল। শত্রুকে তো নিধন করাই শ্রেয়ঃ !

দ্বারাবতীর পথ ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানটুকু শেষ করি। সে জানতো কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজা মহারাজা বলবান ব্যক্তিরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যাবেন। শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি ধনুক, যার নাম শার্ঙ্গ সেই শার্ঙ্গপানি, গদা-চক্রধারী কৃষ্ণই নিশ্চয় যজ্ঞস্থল রক্ষা করবেন। যুধিষ্ঠির পূজা ও পাদ্যঅর্ঘও নিশ্চয় কৃষ্ণকে দেবেন। তখন একটা গোলমালের সম্ভাবনা নিশ্চিত।

আবার সেই গোলেমালে গোলেমালে···। ঘটেছিল সেইরকমই। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, পূজা পাবার ক্ষেত্রে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি নিখিল বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী, নিরহংকারী, জ্যোতিষ্ক মধ্যে উজ্জ্বলতম।···

অনেকের সঙ্গে সব থেকে বেশি বাদ সাধলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তাঁর মতো মহীপতি থাকতে, কৃষ্ণ কেন পূজা পাবেন? তিনি কৃষ্ণের নামে অতিমাত্রায় কুৎসা গীত করলেন. বাসুদেবকে নীচাশয় থেকে শুরু করে, কোনোরকম খারাপ কথা বলতেই বাদ রাখলেন না। যজ্ঞস্থলে গোলমাল লেগে যাবার দাখিল।

কিন্তু যজ্ঞস্থলে কি হত্যার প্রচলন ছিল? ছিল। অন্যথায় কৃষ্ণ তাঁর আয়ুধসকল নিয়ে যজ্ঞস্থলে যেতেন না। শিশুপাল যখন যজ্ঞে এবং কৃষ্ণপূজায় বাধা দিয়ে সব ভেস্তে দেবার তাল করলেন, তখন কৃষ্ণ রুখে রেগে ওঠেন নি। বরং উপস্থিত সকলের সামনে শিশুপালের পূর্ব অপরাধের কাহিনীগুলো বলেছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে বড় অপরাধ যাদবগণের অশেষ অনিষ্টসাধন। বিচিত্র এই, শিশুপালও ছিলেন সম্পর্কে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কৃষ্ণ যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে নরককে হনন করতে গিয়েছিলেন শিশুপাল সেই অবকাশে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। দ্বারকাপুরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শিশুপালের অপরাধ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মৃত্যু তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে এসেছিল। তিনি অন্যান্য মহীপালদের প্ররোচনায় নিজের ক্ষমতার প্রতি অতি বিশ্বাসে, রাগে অহংকারে এতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃত সংগ্রামের ক্ষমতা তিনি হারিয়েছিলেন। কৃষ্ণ অবিশ্যি বলেছিলেন, শিশুপালের মা তাঁকে তাঁর পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করতে বলেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সেই শত অপরাধ অতিক্রান্ত হয়েছিল, অতএব কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তকটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কথা হচ্ছিল মেকি বাসুদেবকে নিয়ে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কৃষ্ণবিদ্বেষী। নামের ফের নিয়েই বিষয়টার সূত্রপাত হয়েছিল। শিশুপাল হত্যা দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল, গোলেমালে গোলমাল। কৃষ্ণের ক্ষতি করা গেল না। কিন্তু সে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চায়, পুরুষোত্তম বাসুদেব বলে। কৃষ্ণের চিহ্ন এবং আয়ুধ সেও ধারণ করে বেড়াতো।

কৃষ্ণ এ ব্যাপারে রূপোলী পর্দার কুমারদের মতোই নির্বিকার ছিলেন। কাকেরা ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলে কী করা যায়? কিছু করা যায়? পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিষাদরাজ একলব্যকে এবং আরো কিছু কৃষ্ণবিদ্বেষীকে নিয়ে দ্বারকার আশেপাশে তক্কে তক্কে রইল, কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারাবতী ধ্বংস করবে। এই নকল বাসুদেব দেখছি সব বিষয়েই নকল করতে চায়। কৃষ্ণ যখন নরককে হত্যা করতে গিয়েছিলেন, শিশুপাল সেই অবসরে দ্বারকা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। নকল বাসুদেবও তাই করেছিল। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সে গভীর রাত্রে

দ্বারকা আক্রমণ করেছিল। দ্বারকার যাদবেরা সারা রাত্রি লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধটা খুব ছোটখাটো হয় নি। কিন্তু কৃষ্ণ এসে পড়েছিলেন রাত পোহাতেই। নকল বাসুদেব এবার আর রেহাই পেল না। সে কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল। একলব্য পালিয়ে বেঁচেছিল, অবিশ্যি পরে একলব্যও কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল।

কিন্তু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কোথা দেখি নাই। নকল বাসুদেব থাক। এখন আসল বাসুদেবের দ্বারাবতী যাত্রা ত্বরা করো হে। যাত্রা ত্বরা করো। ঠিকানা খোঁজ। ধূলা উড়িয়ে চলো।

চলবো, কিন্তু পথ বড় গহন। এ যাত্রা কাঁধে ঝোলা চাপিয়ে ঠেলাঠেলি করে রেল গাড়িতে যাওয়া না। যদিও এ যাত্রায়ও দেখছি বাঁশী বাজে, নিশান ওড়ে, তবে সেটা এই আমলের ভেক পাতলুন পরা গার্ড সাহেবের নিশান বাঁশী কিছু না। এ বাঁশী প্রাণের কোথায় যেন বাজে, সুরে ডাক দিয়ে ঘরের বাহির করে নিয়ে যায়। নিশানটা চোখের সামনে চিত্রের মতো ভাসে। রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণনীল মহীরুহের মাথা ছাড়িয়ে যেন সেই নিশান পত্‌পত্‌ করে ওড়ে।

না, রেলগাড়ির ঝুকঝুক শব্দে কিংবা মোটর গাড়িতে এমন কি হাওয়াই জাহাজেও আমার গন্তব্য দ্বারাবতী যাওয়া যাবে না। আমাকে পথ পরিক্রমা করতে হবে স্বয়ম্ভুব মনু কাল থেকে রচিত ইতিবৃত্তের বর্ণনা থেকে। কারণ আগেই সূতের মুখে শুনে এসেছি স্বয়ম্ভুব মনুকালই আদি কালবিন্দু গণ্য করা হয়েছে। বিলেতের ঐতিহাসিকরা যেমন যীশু জন্মের তারিখকে আদি কাল-বিন্দু ধরে বি সি আর এ ডি-র হিসাব কষেছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের ব্যাখাকার পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভুব মনুকাল থেকে অনায়াসেই যীশুর জন্ম সালকে হিসাবে আনতে পেরেছেন। সন্দেহ আর তর্ক? শ্রম করে এসো গিয়ে। দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে এলে ক্ষমতা থাকার দরকার। কোনো কোনো সাহেবিয়ানার হিসাব যথার্থ, বাকিরা সব ধূলায় যাবে তা হয় না।

কৃষ্ণের জন্মকাল আমাদের সুবিধাজনক প্রচলিত মানের হিসাবে এক হাজার চারশো আটাশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল এক হাজার চারশো ষোল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই হিসাবে দেখছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ

বৎসর। আদি কালবিন্দু থেকে একে একটি যুগকাল বলা হয়েছে। যুগকাল মানেই, এক একটি যুগের সংক্রান্তি। যাওয়া আর আসার মধ্যবর্তী সময়।

এইখানটিতে এসে আমার মনে একটা খটকা লাগছে। আমি যে-সূতগণের ইতিবৃত্তকে অনুসরণ করছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, ইতিহাসের বিচারক। তাঁর সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, এই উনিশশো আটাত্তর খৃষ্টাব্দ থেকে ধরলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, ৫০৭৮ বছর আগে। এ ক্ষেত্রে মনে করি, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়, সূতগণের ইতিবৃত্তীয় সংকেতকে আমার থেকে অনেক বেশি সম্যক অনুমান করেছিলেন। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল সহদেব ৬৯। কৃষ্ণকে যদি অর্জুনের সমবয়সী ভাবা যায়, বা অন্য মতে এক বছরের কনিষ্ঠ, তা হলে সেই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর অথবা উনসত্তর।

ইতিবৃত্ত রচনা আমার লক্ষ না। কিন্তু ইতিবৃত্তীয় লক্ষণগুলো আবশ্যক। অতএব উভয় মতই বলে রাখলাম। পাঠকদের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কৃষ্ণের জন্মকালে পুরাণকাররা দেখছেন দ্বাপরের অংশে ক্ষয় ধরেছে। এই সময়টিকে বলা হয়েছে কলির সন্ধ্যাকাল। তবে তখনো সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশমধ্যবর্তী কলিযুগ পড়ে নি। কৃষ্ণের জীবিতকালের মধ্যেই কলিযুগ এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যদুগণের কীর্তিবর্ধনকারী বাসুদেবের জীবিতকাল পর্যন্ত কলির প্রাদুর্ভাব স্পষ্টত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। এ কথায় কি একটু বেশি গৌরব প্রকাশিত হয় নি? সূতেরা এবং ঋষিরা মানুষ ছিলেন। ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে তাঁরা যতোটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকবারই চেষ্টা করেছেন। সেইজন্যই ইতিবৃত্তের বর্ণনার গভীরে প্রচ্ছন্ন সংকেত আর ইঙ্গিতগুলোর কথা আমি বারে বারে বলেছি।

কৃষ্ণ যে কলির যাবতীয় লক্ষণগুলোকে প্রকটিত হতে দেখেছিলেন, ইতিবৃত্তে নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক আগেই তাঁর মা সত্যবতীকে ঘোষণা করেছিলেন, 'যুগক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অমঙ্গলের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোর দুর্দিন আসন্ন। যে-সব পশুপক্ষীরা দিনের আলোয় নিজেদের স্বর ও আকৃতি গোপন রাখতো তার ব্যতিক্রম ঘটছে। লোকক্ষয় অনিবার্য। মানুষের বিশেষত সদ্বংশীয় রাজপুরুষদের চরিত্র নষ্ট হতে বসেছে। জ্ঞাতিগণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত

হচ্ছে। এ সবই ধ্বংসের লক্ষণ।'

একদিকে যখন বৃষ্ণিসিংহের অশেষ গুণকীর্তন হচ্ছে, তখনই যুগক্ষয়ের কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু আপাতত আমি ইতিবৃত্তের সে-পথে যাত্রা করতে চাই না। যদি মনে করি দ্বাপরের অংশক্ষয়ের কালে, কৃষ্ণই দ্বাপরের শেষ পুরুষ, তবে তাঁর আলোর বৃত্তেই যাত্রা করি। সেই আলোর বৃত্তের ঠিকানা দ্বারাবতী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যদি কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ হয়, তাঁর বয়সের হিসাবে বয়সটাকে যুবকাল বলা যায়। তা হলে মথুরা থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাওয়ার ঘটনা তার মধ্যেই ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে আমি কৃষ্ণের বয়স হিসাব করতে যাবো না। কারণ অন্য মতের কথা আগেই বলেছি। বিয়াল্লিশ না হয়ে উনসত্তর হলেও আমার সার বক্তব্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমি ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছি মাত্র। নির্ঘাৎ ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি। একে কি ইতিবৃত্তাশ্রয়ী কাহিনী বলে? যা বলার তোমরা বলো, আমি পথ চলি। দেখছি, মথুরা থেকে কৃষ্ণ সহজে নড়েন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো অক্ষৌহিণী। সম্রাট জরাসন্ধের একলারই ছিল কুড়ি অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী। আর যদুকুলে তখন ছিল আঠারো হাজার বীরপুরুষ। কৃষ্ণসহ কিছু রথীবৃন্দ। জরাসন্ধ বেশ কয়েকবার মথুরা অবরোধ করে যাদবদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের সেনাপতিত্বে প্রত্যেকবারেই জরাসন্ধ প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছেন। কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাক্রমশালী যোদ্ধা হংস, ডিম্বক, এমন কি কালযবনের মতো বীরও মারা পড়েছিলেন।

কিন্তু এভাবে কতোকাল কাটানো যায়? প্রতি মুহূর্তে শত্রুসৈন্যের অবরোধ আর আক্রমণে, সকল যাদবেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা গোটা যদুবংশের ক্ষয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। অতএব, তাঁদের একটি মন্ত্রণাসভা নিশ্চয় বসেছিল, সেখানে স্থির হয় যাদবরা তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ভাগাভাগি করে যা পারেন, সব নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাবেন। সন্দেহ নেই, এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বাসুদেব স্বয়ং।

তিনি কি আগেই পশ্চিমের সমুদ্রোপকূলে রৈবতক পর্বতের সেই দেশটি দেখে এসেছিলেন? নির্বাচন করেছিলেন সেই স্থান? কোথায় সে দ্বারকা? কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের যে শহরকে এখন জুনাগড় বলা হয়, সেখানেই কী? গির্নারের পর্বতমালাই কি রৈবতক? রৈবতক পাহাড়ের

ওপরে কুশস্থলী নামক যে সুদৃঢ় পুরী তৈরি করেছিলেন সে স্থান কি আজকের গুজরাটের দ্বারকা?

সন্দেহ আছে। এই সন্দেহটি খণ্ডনের সংকেত পুরাণেই আছে। পুরাণ-কারেরা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, নদীসমূহের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, এ তো আমরা একালেও কম দেখলাম না। তা প্রলয়ঙ্কর না হতে পারে, কালে কালে, অতি ধীরে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা প্রাচীন ইতিবৃত্তের সঙ্গে আজকের ভৌগোলিক স্থানগুলোর প্রভেদেই আমরা পেয়েছি।

পুরাণ বা ইতিবৃত্তের মতামতগুলো তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। দধীচির কথা আমি ইতিপূর্বেই শুনেছি। জলাশয়ের বিশাল প্রাণীটি মুনি নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। ধ্বংস বা সৃষ্টি সব কিছুর কারণকেই একটি রূপ দান করা হয়েছে। চোখের সামনে যে-রূপে দেখা গিয়েছে, সেই রূপের ওপরেই তাকে একটি বিশেষ মূর্তির পরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছে। পাতালসমূহের শেষভাগে বিষ্ণুর শেষনামা তামসী মূর্তিকে অনন্ত বলা হয়েছে। এই অনন্ত-র শক্তি ও বীর্যের বর্ণনা দেবতারাও দিতে সমর্থ ছিলেন না।

কেমন দেখতে সেই অনন্ত? তিনি সদাঘূর্ণিত লোচন, অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা পান। তিনি (যেন) মদনোন্মত্ত। পরিধানে নীলবাস (সমুদ্র?)। তাঁর এক হাতে লাঙ্গল, আর এক হাতে মুষলের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মুখ সমূহ থেকে উজ্জ্বল বিষানলশিখাযুক্ত সঙ্কর্ষণনামা রুদ্র নির্গত হয়ে ত্রিভুবন ভক্ষণ করেন। তিনি যখন সদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভা পরি-ত্যাগ করেন, তখন সমুদ্রসলিলে কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। এঁর অগ্নিময়ী সহস্র ফণা আছে।

তা হলে ইনি ভূগর্ভস্থ অগ্নি? ঋষিগণ ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখেই এই কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরি-ভাগস্থ কঠিন স্তর ধারণ করে আছে। অভ্যন্তর অগ্নিময়। সেই আগুনের হাজার জিহ্বার সঙ্কোচন প্রসারণেই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির উৎপাত ঘটে। বাসুকী নাগের কল্পনার সঙ্গে এর কোনো অমিল নেই। আগ্নেয়গিরি থেকে যে ভস্মরাশি ছড়িয়ে যায়, তাকেই স্তবের গৌরবে বলা হয়েছে, সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিলবর্ণের হরিচন্দনের রেণু। এসব তুলনা। ভূকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনিকে সঙ্কর্ষণের স্বস্তিক চিহ্নের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। মাটি ফেটে চৌচির হওয়া ধ্বংসকে, লাঙল আর মুষলের ইঙ্গিতে

বোঝানোর চেষ্টা।

দেখছি 'যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব আর সকল নিমিত্ততত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন', সেই গর্গই ছিলেন ভূকম্পবিৎ। কিন্তু পুরাণের ব্যক্ত করার ভঙ্গি ও ভাষা এইরকম, তিনি সেই অনন্তের আরাধনা করেই, সঙ্কর্ষণের আরাধনা করেই জ্যোতিঃতত্ত্ব আর নিমিত্ততত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

আমাদের আধুনিক ভাষায় কী বলা যায়! বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে জয় করলেন। পুরাণে অবতার কল্পনা একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণভ্রাতা বলরামকে তেমনই একজন অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কেন? এই প্রকৃতির সঙ্গে কি তাঁর প্রকৃতির কোনো মিল ছিল? ছিল। বলরামও সর্বদাই সদাঘূর্ণিত-লোচন মদমোত্ত থাকতেন। লাঙল মুষলও তাঁর হাতে থাকতো, হয়তো তাঁর আয়ুধ ছিল সেইরকম। তিনি যে প্রায় সময়েই মদিরাপানে লিপ্ত থাকতেন তা তো দেখাই গিয়েছে। ক্রোধে হুংকারপ্রবণতা ছিল। তাঁর বিক্রমকে সবাই ভয় করতেন।

এখন বৃন্দাবনের ধারেই যমুনা। বর্তমান মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যেতে মোটর-যানে সময় লাগে এক ঘণ্টারও কম। কিন্তু কংস-দূত অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম যে বৃন্দাবনে ও মথুরায় গিয়েছিলেন, তার ইতিবৃত্তীয় বর্ণনা অন্য এক ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয় দেয়। বিমল প্রভাতে, অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা' করলেন। মধ্যাহ্নে এসে উপস্থিত হলেন যমুনার ধারে। সেখানে স্নানাদি সেরে আবার রথে উঠলেন। অক্রূর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালিয়ে, অতি সায়াহ্নে অর্থাৎ সায়াহ্ন অতীত হলে, তাঁরা মথুরায় পৌঁছুলেন।

বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল যেতে পারে। এটা আমার হিসাব না, ব্যাখ্যাকারের। তা হলে বিমল প্রভাতে বেরিয়ে মধ্যাহ্নে যমুনার ধারে পৌঁছুতেই চল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছিল! তারপরে অতি সায়াহ্নে মথুরা মানে আরো চল্লিশ মাইল। একুনে আশী মাইল দূরত্ব! আরো একটা কথা এখানে অনিবার্য ভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, অশ্বযুক্ত রথসমূহ নিশ্চয়ই নৌকাযোগে পারাপার করার ব্যবস্থা ছিল। নৌচালনাপটু কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো।

তা হলে যমুনা তীরে বৃন্দাবন এলো কী করে? নাকি যমুনাই বৃন্দাবনের তটে এসে ঝাঁপ দিয়েছিল? কারণ কী? ভূমিকম্প?

হ্যাঁ, ভূমিকম্প। পুরাণকারেরা তা দেখেছিলেন, আর এইভাবে তা ব্যক্ত

করেছেন। একদা বলরাম বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল আর ঘর্মাক্ত হয়ে স্নান করতে চাইলেন। তিনি যমুনাকে ডেকে বলেন, হে যমুনে, তুমি এইখানে এসো। বলভদ্রের মাতলামিতে কান না দিয়ে যমুনা আপন মনে নিজের প্রবাহেই চললেন। তখন লাঙ্গলী বলদেব রেগে আগুন হয়ে, লাঙল দিয়ে যমুনাকে আকর্ষণ করে বললেন, রে পাপে, আসবে না? এবার যাও দেখি, কেমন যেতে পারো? যমুনা আসতে বাধ্য হলেন।

বলভদ্রের বর্ণনাটা কীরকম? তিনিও সঙ্কর্ষণের মতো নীলবাসযুক্ত, এক কুণ্ডল, মালা, মুষল ও হলধারী। বলরামকে সঙ্কর্ষণের অবতার রূপে কল্পনাটা পরবর্তীকালে। ভূমিকম্পটা ঘটেছিল আগেই। পুরাণকার পরবর্তীকালে বলরামের প্রকৃতি, আচরণ আর বীবত্বের সঙ্গে একটি তুলনা দিয়েছিলেন। ওটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

বিষয়টি উল্লেখ করলাম এই কারণে, জানা গেল, এ-বৃন্দাবন সে বৃন্দাবন নয়। যমুনার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সেই বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়েছিল। এ বৃন্দাবন পরবর্তীকালে মথুরার কাছে প্রতিষ্ঠিত। এ সবেরই উদ্দেশ্য অবিশ্যি দ্বারাবতী যাত্রাপথের হদিস করে নেওয়া। তা হলে, এই মুষল ও হলধারী প্রদত্ত বলরামকে নিয়ে আর একটি ঘটনাও বলে নিই।

কৃষ্ণের ছেলে জাম্ববতীতনয় বীর শাম্ব দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে বলপূর্বক হরণ করেন। ফলে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। কর্ণ, দুর্যোধন আরো অনেক কুরুবীরেরা শাম্বকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে পরাজিত করে বন্দী করেছিলেন। যদুবংশের সন্তান শাম্ব। বলভদ্র নিজে শাম্বকে ফিরিয়ে দেবার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন। জবাবে, দুর্যোধন তাঁকে নানা কটু কথা শুনিয়ে অপমান করেছিলেন। তখন হলায়ুধ ক্রোধে মত্ত ও আঘূর্ণিত হয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে বসুধা বিদারিত করেন। তিনি মদলোলাকুলকণ্ঠে বললেন, কুরুকুলাধীনা হস্তিনানগরীকে, কুরুগণসহ উৎপাটিত করে ভাগীরথী মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। বলে মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণার্বোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিঁধিয়ে টান দিলেন।

নগরী সহসা আঘূর্ণিত হতে দেখে কৌরবগণ, 'হে রাম, রক্ষা করো' বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি শাম্বকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে নিস্তার। কেবল শাম্বকে না, তাঁর বলপূর্বক হরণ করা গিন্নি লক্ষ্মণাসহ মুক্তি দিলেন। সেই থেকে হস্তিনা নগরীকে যাঁরাই দেখেছেন, দেখেছেন গোটা নগরীটি যেন মোচড়ানো। ইঙ্গিত একটাই, সেই ভূমিকম্প! যদুবীর বলরামকে সেই

কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত করা।

কিন্তু আমি ভাবছি শাম্বর কথা। বন্দী অবস্থায় হঠাৎ ভূমিকম্প। বোধহয় ভাবতেই পারেন নি, লক্ষ্মণাকে লুঠ করে আনতে গিয়ে, কুরুদের সঙ্গে এরকম একটা লড়াই লেগে যাবে, আর তারপরেই সেই ভূমিকম্প। তখন কি তিনিও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিলেন? লক্ষ্মণা থাক, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! না, আসলে বোধ হয় শাপে বরই হয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটি নগরী রেঁকেচুরে মোচড় খেয়ে গেল, লোকেরা হা রাম! করে দিকে দিকে দৌড়। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। এদিকে যদুবংশের বীরেরাও এসে পড়েছিলেন। অতএব শাম্বর মুক্তি পেতে আর বাধা কোথায়?

হিন্দু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমনও হতে পারে, কুরুরা ভেবেছিলেন শাম্বকে বন্দী করার মধ্যে কোনো অশুভ ইঙ্গিত ছিল। এইক্ষণেই একটি কথা বলবার অবকাশ এলো। বলেছিলাম, যাত্রা আমার দ্বারাবতী, কিন্তু কৃষ্ণ আমার পার্শ্বচরিত্র। আমি শাম্বকে দর্শনেই বেশি ব্যাকুল। পিতা পুত্রকে একসঙ্গেই দেখতে চাই। বেশি চাই, অপরূপকান্তি এবং বীর শাম্বকেই। কৃষ্ণ ছাড়া নাম নেই, কিন্তু শাম্ব আমাকে আকর্ষণ করেছেন বেশি।

ত্বরা করো হে; ত্বরায় চলো। চলবো তো, অনেক প্রস্থ ধূলা উড়িয়ে পথের সন্ধান নিতে হচ্ছে। তার আগে একটা নির্ঘাৎ বিষয় বলা দরকার। বলভদ্র যে হস্তিনানগরীকে ভাগীরথীতে ছুঁড়ে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন, ঘটনাটা ঘটেছিল তা-ই। যুধিষ্ঠিরের সাত পুরুষ পরে, রাজা নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভেই চলে যায়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার, দ্বারকার কুশস্থলী সুদৃঢ় পুরী? সেই রমণীয় রৈবতক পর্বত, কাননাদি ও সুমিষ্ট মনোহর জলাশয়, কোথায় ছিল সেসব? প্রভাসতীর্থও তো কাছাকাছিই ছিল মনে হয়। পাণ্ডবগণ তীর্থ করতে বেরিয়ে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়েছিলেন, তখন যাদবেরা তাঁদের সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিলেন। কৃষ্ণ তো বটেই!

ইতিবৃত্তের এক স্থানে দেখছি রৈবত ককুদ্মি নামে এক রাজা কুশস্থলী পুরীর স্রষ্টা ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সেখানেই দ্বারকাপুরী স্থাপন করেছিলেন। রৈবত রাজবংশ কোনো কারণে রাজ্যচ্যুত অথবা বংশহীন হয়েছিল। বলা হয়েছে রাজ্যচ্যুত রৈবতগণ সঙ্গীত ললিতকলা নিয়েই কালযাপন করতেন।

আমার এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার যাত্রা কৃষ্ণের দ্বারকায়।

আমি হালের ভারতীয় ম্যাপে, মথুরা থেকে, বর্তমান দ্বারকার একটা দূরত্বের হিসাব করেছি। না, রেলপথ বা আধুনিক রাস্তা ধরে না। মথুরা থেকে একেবারে সোজা দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে যাওয়া। তার মধ্যে পাহাড় পর্বত নদনদী আছে। রেখাটা টেনেছি সরল রেখায়, তার ওপর দিয়েই। হিসাবে পাচ্ছি সাড়ে ছশো মাইলের মতো। কিন্তু এ দ্বারকাকে সেই দ্বারকা বলে জানি না। প্রাচীন বৃন্দাবনের মতোই সেই নগরীকে খুঁজে নিতে হবে পশ্চিম সাগরের জলের তলায়। মাউন্ট আবু বলো, আর গির্নারের পর্বত বলো, আসল রৈবতক এখন কচ্ছের কাছাকাছি কোথাও হেথা হোতা কিঞ্চিৎ মাথা তুলে থাকতে পারে। সিন্ধুদেশে অনেকবার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে। পুরাণ-কাররা সে-কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মহর্ষি উতংক বলেছিলেন, 'সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে।' এই ধুন্ধু ছিলেন বলরামেরও আগে অনন্তের অবতার। উতংকের আশ্রম সিন্ধুদেশেই ছিল, এবং তিনি একটি বিশাল তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ অগ্নিময় স্থল দেখেছিলেন আর সেখান থেকেই আগুন বালি ভস্ম পাথর ধোঁয়া নির্গত হয়ে, মহীতল আঘূর্ণিত করতো। উতংকের কথায়, তৎকালীন রাজা কুবলায়শ্ব (৩৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) একুশ হাজার লোক দিয়ে, সেই ভূকম্পনপীড়িত কেন্দ্রটিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সকলেই মারা যায়।

আধুনিক কালের আঠারোশো উনিশ খৃষ্টাব্দে দেখছি, কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে গিয়েছিল, আর প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা, দশ মাইল চওড়া ভূমি নতুন করে জেগে উঠেছিল। কচ্ছের রান্ বা রন্ বলে বিশাল এক জলাভূমি রয়েছে। রান বা রন গুজরাতী ভাষার একটি শব্দ। যার অর্থ নোনা জলময় অস্বাস্থ্যকর স্থান।

এই ভৌগোলিক পরিবর্তনটি আধুনিক হলেও, আমাকে একবার স্মরণ করতেই হলো। কেননা আমার যাত্রাটা একেবারেই অত্যাধুনিক কালে। কৃষ্ণ এবং যাদবগণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরীর সঠিক স্থান নির্ণয়ে এই ঘটনাটি আমার যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করছে। কিন্তু আধুনিক কালের এই দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে যাওয়ার অনেক আগেই নিশ্চয় প্রাচীন দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবেছিল। সিন্ধু এবং কচ্ছ প্রদেশের এই সব অঞ্চল প্রায়ই প্রলয়ে ওঠা নামা করেছে, এটা বোঝা যায়। তবে কৃষ্ণ জীবিত থাকতে তাঁর দ্বারকা এবং রৈবতক পর্বতের ওপর সুদৃঢ় কুশস্থলীপুরী সমুদ্রগর্ভে যায় নি। গেলে পুরাণ-

কারের লেখনীতে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো।

কতো বৎসর কৃষ্ণ দেহধারণ করেছিলেন? এখানে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। এক মতে, তিনি বেঁচেছিলেন একশো পাঁচ বছর। আর এক মতে একশো এক বছর। চার বছরের সমস্যা। সমস্যাটা তেমন একটা বড় না। কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত না, এইটি ভাববার বিষয়। যে-হিসাব থেকে কৃষ্ণের জন্মকাল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পেয়েছি, সেই হিসাব বলছে, বাসুদেব একশো পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। পুরাণের এই মতটিই আমি গ্রহণ করছি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল থেকে এই উনিশশো সাতাত্তরে দাঁড়াচ্ছে, তিন হাজার তিনশো তিরানব্বই বছর। সিন্ধু দেশে কুবলয়াশ্বের ভূমিকম্পজনিত সংবৎসরের প্রলয় কাল তিন হাজার ছশো খৃষ্টপূর্বাব্দ। এই বর্তমান বছর ধরলে পাঁচ হাজার পাঁচশো সাতাত্তর বছর। কৃষ্ণের দ্বারকার অনেক আগে। পুরাণকার বলছেন, কৃষ্ণের দেহাবসানের পরে অবশিষ্ট অক্ষম যাদবগণ, রমণীগণ, বালকগণ এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদিসহ সম্পত্ত্যাদি নিয়ে অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করে-ছিলেন। কৃষ্ণের দেহে যখন অস্তগামী আসন্ন ছায়াপাত ঘটেছে, তখন তিনি নারদকে এক সময়ে বলেছিলেন, জ্ঞাতিদের অর্ধেক ঐশ্বর্য দান করে, তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাঁদেরই দাসের ন্যায় রয়েছি। যাদবদের আত্মকলহ পরস্পরের সংঘর্ষ তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে অর্জুন ভোজকুলের কামিনীগণ ও তনয়দের মার্তিকাবতনগরে পাঠিয়েছিলেন। অন্যান্য বালক বৃদ্ধ আর স্ত্রীগণকে, সাত্যকিপুত্রসহ সরস্বতী নগরীতে পাঠিয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার মানে, একদা কৃষ্ণের নেতৃত্বে যাদবেরা যে-ভাবে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চ'লে গিয়েছিলেন, সেটা ছিল নিরাপদ সুদৃঢ় আশ্রয়ের সন্ধান। তারপরে সম্ভবত সত্তর পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই আত্মকলহে ধ্বংসপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট যাদবেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বারকা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

শুধুই এক পরিত্যক্ত নগরী? না, সিন্ধুদেশের ভূমিকম্পপ্রবণতাই কৃষ্ণের দ্বারকাকে গ্রাস করেছিল? তা না হলে সম্ভবত কৃষ্ণের কুশস্থলী পুরীর কোনো না কোনো নিদর্শন, কাথিয়াবাড়ে, গিরিনগরে (গির্নারে) বা জুনাগড়ে খুঁজে পাওয়া যেতো। অনুমিত হয়, জরাসন্ধের পক্ষে অগম্য কিংবা আক্রমণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কৃষ্ণের দ্বারকা ছিল, মূল ভূমিখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্রের কোনো রমণীয় দ্বীপে। নৌচালনাপটুত্বের কথাটা এ সময়েই বিশেষ করে মনে আসে। অশ্বসমূহযুক্ত রথসমূহ নিয়ে, যে-কোনো সময়েই মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে

লবার জন্য নৌবাহিনী তৈরি থাকতো।

আঠারোশো' উনিশ খৃষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার মাইল সমুদ্রগর্ভে যাবার আগের কোনো সাক্ষীর বিবরণ আমার গোচরে নেই। তা হলে হয়তো কৃষ্ণের দ্বারকার কোনো সংবাদ পেলেও পাওয়া যেতে পারতো। তবে যাদবগণ যে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো যদুবংশের পরিচয়েই ছড়িয়ে আছেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন কেবল দ্বারকাবৃত্তান্ত। নারদ মুনি দ্বারকায় চলেছেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে, প্রভাসতীর্থেই ভ্রমণে এসেছিলেন। এত কাছে এসে দ্বারকায় গিয়ে একবার যাদবদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাওয়াটা তাঁর যথার্থ মনে হলো না। না, তিনি আদৌ ঢেঁকিতে চেপে ভ্রমণ করছিলেন না। নিজের রথেই তিনি ভ্রমণ করছিলেন।

নারদ নামে কি একজন মুনিই ছিলেন? অথবা একাধিক ব্যক্তি? নারদ নামে কি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় আছে? নারদীয়গণ যাঁদের বলা হয়, তাঁরাই হয়তো সেই সম্প্রদায়ের। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিভিন্ন রাজা এবং গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা তাঁরা পূজিত হতেন। এই মন্তব্য ইতিবৃত্তের একটি সংকেত। তবে পুরুবংশীয় কৌরবদের ও যাদবদের, উত্থান পতনের কালের মধ্যে নারদ মুনি একজনই। ইনিই সেই নারদ। ইনিই যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভেদনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতিসমূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। ইনিই বিধান দিয়েছিলেন কুরুবংশীয়, পাণ্ডুতনয় পাণ্ডবদের, পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাই কোন্ প্রথায় দাম্পত্য জীবন কাটাবেন। ইনি অশেষ গুণশালী, চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনি সমগ্র বর্ষগুলো পরিভ্রমণ করেছেন। কিম্পুরুষবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, মধ্যস্থল, অন্তরীক্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কৈলাস কোনো জায়গা বাদ নেই। দেবতা, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানুষ সকলের সঙ্গে মিশেছেন, জীবনযাত্রা ও ধারণপ্রণালী দেখেছেন। এই সবই তাঁকে অশেষ জ্ঞানী ও গুণী করেছিল। যে-কোনো বিষয়েই তাঁর প্রীতিভাজন রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিতে সক্ষম, কেবল যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া। তিনি নিজে ক্ষত্রিয় নন, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ নন, কিন্তু শত্রুদমনের কৌশল, নগররক্ষা, গুপ্তচরাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সীমান্তরক্ষা, পাত্রমিত্রে ভেদাভেদ, প্রয়োজনে ছলনা ও চাতুরি, রাজকোষে অর্থাগমের বিধি, ব্যয়ের নিয়ম, নগরের বেশ্যা ও অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি অসঙ্গতি, এমন কি গৃহে ও অন্তঃপুরে

পরিচারক পরিচারিকাদের সম্বন্ধে যথার্থ খবর রাখা, যাবতীয় বিষয়েই সম্যক উপদেশ দানের জ্ঞান ছিল তাঁর।

পরবর্তীকালে মগধের নন্দবংশ ধ্বংসের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই কৌটিল্যের মধ্যেই নারদের গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। সেই অর্থে মহর্ষি নারদও কুটিল। কুটিলতা এ ক্ষেত্রে নীচতা না। ন্যায় এবং অন্যায় বিষয়ে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। যার পক্ষে যা অনাচরণীয়, তার প্রতিই নারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে এবং সে-সব তাঁর কাছে অন্যায় প্রতীয়মান হলে, তিনি ক্ষুব্ধ হতেন।

এরকম ব্যক্তিকে কি রগচটা বলা চলে? বোধ হয় না। রগচটা বলতে গোঁয়ার বোঝায়। মহর্ষি আদৌ তা নন। কিন্তু তাঁর কাছে যা অন্যায় বলে বোধ হয়, তার বিহিত না করে ছাড়েন না। এ কথাটা সর্বজনে বিদিত ছিল বলেই, নারদ বা নারদ ঋষিদের সম্পর্কে সকলেরই মনে একটা ভয়ের ভাব ছিল। কেবল সাধারণ মানুষের না, সমস্ত রাজা এবং অমাত্যগণেরও। আর কুটিল হলেই ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মহর্ষি প্রভাসতীর্থ ভ্রমণের মধ্যেই, যাদবদের গূঢ়পুরুষদের সম্যক চিনে নিতে পারছিলেন। গুপ্তচরদের আচার আচরণ চলাফেরা ভঙ্গি দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন। এখন অবিশ্যি যাদবদের বাইরের শত্রুর ভয় আর নেই। তথাপি রাজ্য পরিচালনায় সর্বদাই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যাদব গুপ্তচরদের দেখে, তিনি মনে মনে তাঁদের প্রশংসাই করলেন। খুশি হলেন, বিনা পরিচয়েই তারা সকলে অতি ব্যাকুল ব্যস্ততায় মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করে, নিজেদের ধন্য ঘোষণা করলো। মহর্ষির পরিচয় অতি ব্যাপক, অতএব প্রভাসতীর্থে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে সহজে নিস্তার পেলেন না।

মহর্ষি মনে মনে সুখীবোধ করলেন। সবাইকে যথাবিহিত আশীর্বাদ জানিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। সময় মতো পৌঁছুলেন দ্বারাবতীতে। যে-নৌকারোহণে তিনি ও তাঁর শকট দ্বারাবতী পৌঁছুলেন সেই নৌচালকেরা চিৎকার করে তীর-বর্তী যাদবগণকে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। মহর্ষি তীরে পা দিতে না দিতেই, ভোজক, অন্ধক ও বৃষ্ণি শাখার যাদবদের গৃহে গৃহে সাড়া পড়ে গেল। কুশস্থলীপুরী আর রৈবতক পর্বতের বিভিন্ন হর্ম্যতলে, কাননে কাননে, ক্রীড়াভূমিসমূহে সর্বত্র তাঁর আগমনবার্তা পৌঁছে গেল। তাঁর আসা মানেই, নানা দেশের নানা সংবাদ জানা, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। অন্তরে বাহিরে কোনো সংকট থাকলে তাঁর উপদেশ লাভে তার নিরসন করা। সেইজন্য তিনি সর্বত্র পূজিত নিমন্ত্রিত।

পার্বত্য নগর প্রাকারের এবং প্রবেশদ্বারের রক্ষীরা সকলেই তাঁকে ভূমি নত হয়ে অভিবাদন করলো। মহর্ষি দু হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। অন্ধক ভোজক বৃষ্ণি গোষ্ঠীর অনেকেই নানাদিক থেকে প্রণাম ও সমাদর করতে ছুটে এলেন। মহর্ষি খুশি আর আনন্দিত চিত্তে সকলের মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদাদি জানিয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে এগিয়ে চললেন।

কালের একটা হিসাব দরকার। মহর্ষির এই আগমন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কতো বছর পরে? যুদ্ধের পরেও তিনি ইতোমধ্যে কয়েকবার দ্বারাবতী ভ্রমণ করে গিয়েছেন। এই ক্ষণের কালটি ঠিক কখন? কৃষ্ণের বয়স আচরণ ইত্যাদি দিয়েই হিসাব করে বলা যায়, ভারত যুদ্ধের দশ বছরের বেশি বোধহয় না। তা হলে কৃষ্ণের বয়স এখন প্রায় বাহাত্তর কিংবা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিচারে উনআশি। তবু এখনো তাঁর নীলোৎপল দেহে জরা বা বার্ধক্যের কোনো লক্ষণ নেই। তাঁর জীবনসায়াহ্নের অস্তরাগে, এখনো সেই বিমর্ষ ম্লানতার কোনো ছায়া পড়ে নি। যে-সময়ে তিনি নারদকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'জ্ঞাতিবর্গকে ঐশ্বর্যের অর্ধেক দান করে, সর্বদা তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাঁদের দাসের মতো বেঁচে রয়েছি।'...

আমার বলতে ইচ্ছা করছে, জীবন এইরকম। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তো বিশ্বের কতো রথী মহারথীর অতি ভয়ংকর আর বিষাদজনক পরিণতি দেখলাম। তুলনা আমি কারো সঙ্গেই কারোর করবো না। কারণ, আমি মনে করি, এই সব অতিমানুষ ব্যক্তিগণ সকলেই আপনিই আপনার একমাত্র তুলনা। একজনের চরিত্রের আলোকে আর একজনকে বিচার করা যায় না।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। মহর্ষিকেই অনুসরণ করি। যদুবংশে যদিও ভোজক কুলের উগ্রসেন বংশধরেরাই রাজসিংহাসনে আরোহণের অধিকারী তথাপি ন্যায়াধীশ বীর এবং কুশলী, সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হলেন, বৃষ্ণিবংশাবতংসাবতার বাসুদেব। অতএব মহর্ষি কুশস্থলীপুরীতে, আগে কৃষ্ণ সমীপে যাওয়াই স্থির করলেন। অতি রমণীয় পর্বতের ওপর কুশস্থলীপুরীর যে-অংশে কৃষ্ণ বাস করেন, সেই অংশের কাছাকাছি হতেই বৃষ্ণিবংশীয় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সন্তানসন্ততিরা মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এলেন। অবিশ্যি একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, মহর্ষি সচরাচর একলা কোথাও তেমন যেতেন না। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই কিছু জ্ঞানী ঋষিগণ থাকতেন। তাঁরা মহর্ষির শিষ্য এবং জ্ঞানমুগ্ধ। মহর্ষির সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ানো, একটি অতি আনন্দজনক বিষয়।

মহর্ষি কি তা বলে কখনো একলা কোথাও যেতেন না? নিশ্চয়ই যেতেন। সেরকম বিশেষ প্রয়োজন হলে তিনি ঋষিগণ সহ বিহার করতেন না। মহর্ষি কৃষ্ণ-অঙ্গনে আসা মাত্র, প্রদ্যুম্ন এবং আর আর যুবক বৃষ্ণি যাদবেরা তাঁদের নানা বিলাস, আলাপন, ক্রীড়া, অন্তঃপুরে ও বাইরের কানন ছায়ায় নারীগণের সঙ্গে নানা হাসিমুখর চতুর বাক্যালাপাদি ত্যাগ করে দ্রুত মহর্ষি সমীপে এসে তাঁকে যথাযোগ্য সমাদরসহ প্রণাম করলেন। কৃষ্ণও অন্তঃপুরে সংবাদ পাওয়া মাত্র, ত্বরিত গতি উত্তাল জলস্রোতের ন্যায় নানা সম্ভাষণ করতে করতে ছুটে এলেন। তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও পূজা করার জন্য নতশিরে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে বললেন, 'মহর্ষি, আমার অশেষ সৌভাগ্য, বিশ্ববিহারী আপনি আমাকে দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। আসুন, উপযুক্ত আসন গ্রহণ করুন।'

মহর্ষি এবং তাঁর সঙ্গীরা বাসুদেবের এবং অন্যান্য বংশধরগণের আচরণে সত্যি খুব খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি চোখে একটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো। বাঁ দিকে, কিছু দূরেই একটি ছায়াঘন, বিবিধ বর্ণাঢ্য ফুলের কেয়ারি ও লতাপাতায় কিছুটা আচ্ছন্ন, কানন মধ্যে অপরূপ রূপবান কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে দেখলেন, তিনি একবারের অধিক মহর্ষির দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না। কেন, এত ব্যস্ততা কিসের?

শাম্ব সত্যি আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না, কারণ তখন তাঁর কাননবিহারিণী সহচরীদের মধ্যে একজনের মদির চোখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দেহ সম্ভোগ বিষয়েই আমোদজনক নানা কূট তর্ক হচ্ছিল, যে-তর্কের মধ্যেও মনে স্ফূর্তি জাগে, প্রাণ হিল্লোলিত হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপুত্রদের মধ্যে শাম্ব সর্বাপেক্ষা অধিক রূপবান পুরুষ। কাঞ্চনের অধিক উজ্জ্বল বর্ণে, তাঁর দেহে যেন, পারিপার্শ্বিক সকলেই প্রতিবিম্বিত হয়। তা সে কানন কুঞ্জ জলাশয় আকাশ পর্বত নারী যাই হোক। তাঁর অতি আয়ত চোখে সর্বদা কামনার বহ্নি অনল প্রজ্বলিত হয় না, কিন্তু তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটি চিত্তজয়ী দুর্বার আকর্ষণ আছে, রমণী মাত্রেই তাঁর দর্শনে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ হিসাবে তাঁর রূপ এমনই অসামান্য, তিনি নগরের পথে বের হলে, মাতা ও মাতৃপ্রতিম দুই চারি মহিলা ছাড়া সকল যাদবরমণীগণই, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন যে-কোনো অলিন্দে গবাক্ষে বা সোপানে তাঁকে একবারটি দেখবার জন্ত ছুটে আসেন।

দ্বারকার রমণীকুলে শাম্ব সম্পর্কে বহুতর কৌতূহল, নানা আকাঙ্ক্ষা। সকলেই জানেন, প্রণয়োদ্দীপ্ত ভাষণে ও আলাপে তিনি তুলনাহীন। অথচ

শোচনা ইন্দ্রর জায়া তিনি উচ্চারণ করেন না। তাঁর রতিকলাকুশলতা বিষয়ে রমণীগণ নানা কাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, অতি কামনায় অবশাঙ্গ ও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সকল রমণীগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত আছেন। যথাস্থানে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। ভ্রাতৃবধূদের প্রতি প্রীতি, কনিষ্ঠ কুলরমণীগণকে স্নেহের দ্বারা সুখী করেন। পুরুষরাও সকলেই প্রীত, কারণ শাম্বর আচরণ, আলাপাদি শ্রদ্ধা প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের মন! শাম্বর পুরুষোচিত রূপ যৌবনে অনেক যাদবগণের অবচেতনেই ঈর্ষা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শাম্ব এখন যে সহচরীটির মদির চোখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছেন, সম্ভবত সে একজন গোপবালা। সর্বজনবিদিত, যাযাবর গোপরমণীরা অন্যান্যদের তুলনায় স্বাধীনচেতা। তাদের স্ব-ইচ্ছাগমন বিষয়ে সকলেই অবগত আছে। প্রণয়সহচরীরূপে তাদের ভূমিকা অদ্বিতীয়। শাম্ব কুঞ্জ মধ্যে সেই রমণীটির দিকে কেবল অভিভূত হয়ে তাকিয়ে নেই, যেন হতবাক বিস্ময়ে, অথচ কামনাবিহ্বলতায় স্তব্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে আরো কয়েক যুবতী, যারা পীনবক্ষ, ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্ব এবং সুগৌরী। সকলেই অবিন্যস্ত, বস্ত্রাদি স্খলিত, সকলেই অপরূপদেহধারী শাম্বের অঙ্গ স্পর্শে ব্যাকুল হয়ে তাঁরা নানা অঙ্গ নিজেদের হাতে ধারণ করে আছে। শাম্বের সঙ্গে সকলেই সুরাসব পান করেছে। এখনো করছে।

শাম্ব খালি গা। তাঁর অতি উজ্জ্বল দেহে বক্ষভাগ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। গলায় কবচযুক্ত মুক্তাহার, কানে কুণ্ডল, দুই নিবিড় আয়ত চোখ সুরাসবের গুণে রক্তিম। সকলের সঙ্গেই তিনি নানা প্রণয়সম্ভাষণে লিপ্ত ছিলেন। তার মধ্যে দেহ সম্ভোগের নানা গূঢ় রহস্য ও চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের খেলা চলছিল। বেণীবন্ধনহীন আলুলায়িতকেশ পীনোন্নত বুকের ওপর লুটিয়ে, যে-রমণী এখন নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে মদির চোখে শাম্বকে দেখছে সে সহসা একটি কূট প্রশ্ন করেছে। বাসনাতাড়িতা রমণী যদি উড়ন্ত মরালীর মতো চক্রাকারে উড়তে উড়তে পূর্ণ বৃত্তাকারে অবস্থান করে শাম্ব-সঙ্গলাভে অভি-প্রার্থিনী হয়, তা হলে শাম্ব কীরূপ আসন গ্রহণ করবেন?

এক গন্ধর্বী সুন্দরী মাথার ওপরে হাত তুলে দেহকে অর্ধচক্রাকারে রেখে ভূমিতে হাত রেখেছিল। উদ্দেশ্য শাম্বকে দেহের বৃত্তাকার কৌশল দেখাবে। প্রশ্নকর্ত্রী বাধা দিয়েছে। অন্যান্য সহচরীরাও বাধা দিয়েছে। রমণীর সেই বৃত্তাকার দেহকে কল্পনা করুন এবং আপন আসনের কল্পনা ব্যাখ্যা করুন।

সহচরীদের মৃণালব পানে ও হাতে, বুক মুখরিত। তারাও যেন অভি-প্রার্থিনী হয়ে, সকলেই নিজেদের বৃত্তাকারে কল্পনা করে শাম্বলজ্জাতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শাম্ব কয়েক মুহূর্ত ভেবেই, সহসা প্রণয়াকুল হয়ে প্রশ্নকর্ত্রী সহচরীকে দু হাতে বুকে টেনে নিলেন, চুম্বন সোহাগে স্পর্শের দ্বারা তাকে আহ্লাদিত করে বললেন, তুমি প্রকৃতই চতুরা। শুনলে মনে হয়, তোমার প্রশ্ন অতিশয় কঠিন ও কূট। আসলে সহজ। ঘুরিয়ে বলেছো।

সকল সহচরীরাই শাম্বর জবাবের প্রত্যাশায় তাঁকে সর্বাঙ্গে ঘিরে ব্যূহ রচনা করলো। তাঁর পত্নী লক্ষণাও সহচরীদের মধ্যেই রয়েছে। শাম্ব বললেন, রমণীর বৃত্তাকার দেহধারণ আগে নয়, পরে। বলো ঠিক বলেছি কী না?

প্রশ্নকর্ত্রী আলুলায়িতকেশিনী পীনোন্নত সুগৌরীবালা ভুরু কুঁচকে তাকালো। কিন্তু তার ঠোঁটের তটে নিটুট হাসি তরঙ্গে ঢেউ তুললো। চোখের কালো তারা দ্রুতসঞ্চরণশীল ভ্রমরের মতো ঝিলিক দিল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না। শাম্বর মুখ থেকেই সে এবং সকলেই জবাব শুনতে চায়।

শাম্ব বললেন, আমি যে-রমণীকে ধারণ করি, একমাত্র সে-ই তখন সেই অবস্থায় নিজের কোমল অঙ্গে বৃত্তাকার রূপ ধারণ করতে পারে।

প্রশ্নকর্ত্রী তৎক্ষণাৎ নত হয়ে, শাম্বর জানুদেশে মাথা রাখলো। অন্যান্য রমণীরা সোল্লাসে হেসে উঠলো। কিন্তু এই সব প্রণয়োদ্দীপ্ত রঙ্গ খেলায়, শাম্ব এই মুহূর্তে কার কোপে পড়লেন, তা জানতে পারলেন না। দূরান্তের সমুদ্রমধ্যে পর্বতবেষ্টিত এই রমণীয় নগরে যাদবেরা এখন নিশ্চিন্তে জীবনধারণ করছেন। শত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধবিগ্রহের কোনো সম্ভাবনা নেই। বলতে গেলে পাঞ্চালরাজ, পাণ্ডব, যাদবরাই এখন ভূ-ভারত শাসন করছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্যের কোনো অভাব নেই। পরাজিত রাজন্যবর্গ সকলেই আত্মসমর্পণ করে স্ব স্ব রাজ্যে এঁদেরই নেতৃত্বে বাস করছেন। কোথাও কোনোরকম ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের সংবাদ নেই। বড়রকমের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে নি। সারা দেশে এখনো আকাশে বাতাসে শোকের যেটুকু চিহ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশাল ক্ষয় ও ক্ষতি। এখন চারদিকে শান্তি ও স্বস্তি। একা শাম্ব না, সকল যাদব সন্তানেরাই এখন নানা ক্রীড়াকৌতুকে সময় অতিবাহিত করেন।

কিন্তু প্রদ্যুম্নের মতো, শাম্বর দৃষ্টি ও চিন্তা যদি জাগ্রত হতো তা হলে তিনি মহর্ষির আগমনকে কখনো ভুলে থাকতে পারতেন না। সকল যাদব শ্রেষ্ঠগণের মতোই ছুটে আসতেন। শাম্ব আচরণবিধি জানেন না, এমন না। তবু ভুলে গেলেন। প্রেম প্রণয়লীলা এমন ভুলের সৃষ্টিও করে। মানুষ মাত্রেরই ভুল

হয়। আর মানুষ মাত্রকেই তার মূল্য দিতে হয়।

শাম্ব প্রণয়-লীলা করুন। মহর্ষিকে দেখি।

মহর্ষি, কৃষ্ণ, পুত্র প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি সকলের দ্বারা আপ্যায়িত ও পূজিত হয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসা ও আশীর্বাদ করলেন। কৃষ্ণ নানাস্থানের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। মহর্ষি সবই তাঁকে বললেন। কিন্তু শাম্বর আচরণে তাঁর অন্তরে আগুন জ্বলছে। তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস যেন বিষানলশিখাযুক্ত হয়ে, শাম্বকে আঘাত করতে চাইছে। সেই মুহূর্তেই তা প্রকাশ না করে নানা দেশ জনপদ আশ্রম তপোবন রাজা ও ঋষিদের বহুতর সংবাদ বললেন। কিন্তু নিজেকে তিনি অপমানিত বোধ করে ভাবতে লাগলেন, বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান বংশধরটিকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়।

মহর্ষি নারদ কৃষ্ণের আতিথেয়তায় যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করে অন্যান্য যদুবংশীয়দের গৃহে গমন করলেন। ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের কাছে শাম্ব সম্পর্কে দু-একটি প্রশ্নও করলেন। শাম্বর নিন্দা কেউ করেন নি। কিন্তু মহর্ষির ক্ষুব্ধ চিত্ত তাতে বিন্দুমাত্র শান্ত হলো না। দ্বারকাত্যাগ করার আগেই, শাম্বকে একটা কোনো শিক্ষা দিতে না পারলে, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছিল না। তিনি বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তাৎক্ষণিক উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ পটু। ভেবে দেখলেন, একমাত্র কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারলেই শাম্বকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে কুপিত ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারলেই এক্ষেত্রে মহর্ষির মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে। সমগ্র দ্বারকায় যাদবগণের মধ্যে শাম্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত। শাম্বর বিরুদ্ধে যদুবংশকে বিবাদে প্রবৃত্ত করা সম্ভব না। বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে পিতা পুত্রের মধ্যেই। আর তার হেতু স্বরূপ, শাম্বর অসামান্য রূপই যথেষ্ট।

মহর্ষি কি কৃষ্ণচরিত্র জানতেন না? খুব ভালোই জানতেন। পাণ্ডবদের সংগঠিত করে সমগ্র দেশে শত্রুদের বিনাশসাধনে গভীর ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়ক্ষয়ে বিমুখ, আচ্ছন্ন ম্রিয়মাণ অর্জুনকে শত্রুরূপী জ্ঞাতিহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার অসামান্য কীর্তি এই সব কিছু সত্ত্বেও কৃষ্ণ কি পরিপূর্ণ অসূয়াহীন? অতি কীর্তিমান মহামানবও মানুষ! জীবধর্মের এইটি একটি বিশেষ লক্ষণ। তাঁরও কতকগুলো সুপ্ত বোধে থাকে, অসূয়া অহংকার সম্ভোগেচ্ছা, আপনশক্তিতে বিশ্বাসী নিশ্চিন্ত কালাতিপাত। আঘাত সেখানেই হানতে হবে।

মহর্ষি দ্বারকাত্যাগের আগে, কৃষ্ণের সঙ্গে একান্তে একবার সাক্ষাৎ করলেন।

বললেন, 'বাসুদেব, আপনার বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া দেখে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি।'

প্রশান্ত কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে বললেন, 'আমার বংশে গ্লানিময় পাপের ছায়া? আমার চোখে পড়ে নি?'

মহর্ষি হেসে বললেন, 'চোখে পড়লে তো আপনি জানতেই পারতেন। ওপরে শান্ত জলরাশি, অথচ তলের গভীরে খরস্রোতের মতো সেই পাপের ধারা বহে চলেছে। তির্যগযোনিসম্ভূত অনার্যরাজের কন্যা, জাম্ববতী তনয় শাম্ব তার কারণ।'

কৃষ্ণ অধিকতর বিস্ময়ে বললেন, 'শাম্ব? তার বিষয়ে যদুবংশে কোনো মালিন্য নেই। আমার এই রূপবান সন্তানটি সকলের প্রিয়।'

মহর্ষি বিদ্রূপে কুটিল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শাম্ব সকলের প্রিয়, কিন্তু সে প্রিয়তম পুরুষ আপনার ষোল হাজার রমণীর! যে-ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করে, আপনি ভর্তাস্বরূপ তাদের গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রতি প্রেমবশতঃ স্যমন্তক মণি আপনি ধারণ করতে পারেন নি, সেই ষোল হাজার রমণী শাম্ব সঙ্গলাভে ব্যাকুল। শাম্বই তাদের ধ্যানজ্ঞান। এ কি পাপ নয়?'

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরমমুহূর্তেই দৃঢ়স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, পাপ, কিন্তু আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। মহর্ষি, আপনি ত্রিভুবন-খ্যাত, সীমাহীন আপনার অভিজ্ঞতা। তবু বলি, আমার পুত্র ও প্রেয়সীদের বিষয়ে এই অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না। শাম্বর সদাচার বিশ্বস্ততা পিতৃ-ভক্তি প্রশ্নের অতীত। আমার ষোল সহস্র স্ত্রী সহচরী রমণীদের বিষয়েও আমার মনে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই।'

মহর্ষি গম্ভীর হয়ে উঠলেন, তাঁর অন্তরের কোপানল বর্ধিত হলো। বললেন, 'আমি ত্রিভুবনখ্যাত, আমার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। কিন্তু বাসুদেব, আপনার অন্তর্দৃষ্টি গভীর ও ব্যাপক, অতুলনীয়। যে-কোনো বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের সাধনার বস্তু। রমণীর চরিত্র আর মন সম্পর্কে আপনি এমন দ্বিধাহীন হচ্ছেন কেমন করে?'

'কারণ আমি সত্যাশ্রয়ী।' কৃষ্ণ বললেন, 'মহর্ষি, আপনি জানেন, এই ষোল হাজার রমণী দ্বারকায় যদৃচ্ছ বিচরণকারিণী। আমাদের বংশের পুত্রগণ ব্যতীত, যাদবশ্রেষ্ঠগণের অনেকেই এই রমণীদের প্রার্থনা করে থাকেন, যথোচিত সমাদরের দ্বারা সঙ্গলাভও করে থাকেন। তা কোনো দূষণীয় বিষয় না। এদের মধ্যে আপনি বাদ দেবেন রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, গান্ধারী

(ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী নন) হৈমবতী, শৈব্যা, প্রস্বাপিনী, রুক্মিনী এই আটজনকে। এই রমণীরত্নগণ আমার মহিষী। ষোল হাজার রমণীরত্নও স্বর্গের অপ্সরাতুল্য একান্ত আমার দ্বারাই রক্ষিত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায় দায়িত্ব আমার। আমি তাদের গতিবিধি আচরণ সবই জানি।'

মহর্ষি বিমর্ষ মুখে বললেন, 'আপনি যা বললেন, সবই আমারও জানা আছে। আপনি পুত্রগণ ব্যতীত বললেন। কিন্তু শাম্ব আপনার পুত্রই।'

কৃষ্ণ বললেন, 'অবশ্যই। সেই জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। শাম্ব এবং ষোল হাজার রমণী বিষয়ে আপনার অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না।'

মহর্ষির মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললেন, 'প্রমাণ পেলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'প্রমাণ পেলে, তখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে? চাক্ষুষ ঘটনাই তো বিশ্বাস।'

মহর্ষি কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'তবে তাই হবে। প্রমাণের সুযোগ এলে, আবার আপনার কাছে আসবো। আজ বিদায় নিচ্ছি।'

কৃষ্ণ মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে, মস্তক আঘ্রাণ করে বিদায় নিলেন।

কৃষ্ণের চিত্তে কোথাও সন্দেহের কোনো ছায়া ছিল না। অবিশ্বাসও তাঁর হৃদয়কে কিছুমাত্র বিচলিত করে নি। মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তবু মনটা যে বিচলিত না হলো তা না। কারণ মহর্ষি সহসা কোনো কথা বলবার পাত্র নন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে। কেন তিনি শাম্ব এবং ষোল সহস্র প্রিয়দর্শিনী প্রণয়শীলা রমণীগণকে কেন্দ্র করে এমন একটি অমূলক অভিযোগ করলেন? শাম্ব কি কোনো কারণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেজাজী মহর্ষির বিরক্তি উৎপাদন করেছে? অথবা রমণীগণ কেউ তাঁকে দেখে কোনোরকম হাস্যপরিহাসাদি করে নি তো?

কিন্তু কৃষ্ণ কারোকেই মহর্ষির অভিযোগের বিষয়ে কিছু বললেন না। কৌতূহলবশত শাম্বকে কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখলেন। ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য কিছুই চোখে পড়ল না। শাম্ব একজন যুদ্ধবিশারদ দৃঢ়কলেবর মহাবীর। এক্ষণে নারী সঙ্গ, প্রণয়লীলা ও নানা রঙ্গরস ক্রীড়াকৌতুকে শাম্বর আসক্তি কিঞ্চিৎ বেশি। সে তার স্ত্রী ও রমণীদের সঙ্গে যেমন ক্রীড়াকৌতুকে কাল কাটিয়ে থাকে, তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লো না।

কৃষ্ণ কি ষোল সহস্র রমণীর অন্তরের কথা জানবার প্রয়াসে, তাদের মধ্যে

উৎকর্ণ ও সজাগ দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করেছিলেন? করলেও, তিনি কি কিছুই অনুমান করতে পেরেছিলেন? তিনি দুরন্ত মহাবল অরিনিধনকারী বাসুদেব। নরককে বধ করে তিনি এই রমণীদের কেবল উদ্ধার করেন নি। জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন। সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করেছিলেন। স্যমন্তক মণি যে-কোনো পুরুষের ধারণের অতি আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু ষোল হাজার রমণীকে নরকের পীড়ন থেকে উদ্ধার করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিল সত্যভামা করুন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী। যা কৃষ্ণ পারেন না, তা তিনিও পারেন না। সেই ষোল সহস্র রমণী কি কখনো কৃষ্ণপুত্র শাম্বের প্রতি আসক্তিবোধ করতে পারে?

কৃষ্ণের একমাত্র সিদ্ধান্ত, এমন ঘটনা কদাচ ঘটতে পারে না। সঙ্গীতাচার্য মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি কোনোরকমেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিশ্বাস করলেন না, এবং তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন, মহর্ষি কখনোই তাঁর অভি-যোগ প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব জনার্দন অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষির অভিযোগের কথা বিস্মৃত হলেন। যথাবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনে কাল কাটাতে লাগলেন। যদিচ তাঁর এই কাল ক্রমশঃ বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়ছিল, আর সেই সঙ্গে যদুবংশের মধ্যে নানারকম বিবাদ বিরোধ দেখা দিচ্ছিল।

কৃষ্ণ নিজে বিশ্বাস করতেন, জীবনকালের মধ্যে দুইটি ভাগ সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। বনবাসে জীবনধারণ, অথবা রাজ্য ও সমৃদ্ধিলাভে পরাক্রান্ত সৌভাগ্য-শালী হওয়া। এর মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ভোগে কাল যাপন মানুষকে অধঃপতিত করে। বনবাসে নিরিবিলি সামান্য ধনে জীবনযাপনে শান্তি থাকে। রাজ্য-সমৃদ্ধি ইত্যাদি লাভের মধ্যে মানুষের বলবিক্রম নানা নীতি ও কূটকৌশল যুদ্ধকর্মাদিতে ব্যাপৃত থাকা, ক্রিয়াশীল জীবনের লক্ষণ। এই দুই জীবন প্রবাহের মধ্যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। মধ্যপন্থা মানুষকে কিছুই দেয় না। অলস বিলাস ব্যসন এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তখন আর নতুন করে বিকাশের কিছু অবলম্বন থাকে না। মানুষের বলবিক্রম বা তপশ্চর্যা সব কিছুই সৃষ্টিশীল। নব নব রূপে তা উদ্ভাসিত হয়।

কৃষ্ণ কি যদুবংশের মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে সেই মধ্যপন্থা অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন? যখন সকলেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ দলাদলি পরাক্রম বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও আস্ফালন করছিলেন?

গৌরব বর্ধিত হচ্ছিল না। অতএব সম্পদও বর্ধিত হচ্ছিল না। কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা ভালো জানতেন, ক্ষয় ও লয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি কি তারই অশুভ ছায়া যদুবংশে দেখতে পেয়েছিলেন?

কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

নারদ দ্বারকা ত্যাগ করলেও শাম্বের অবহেলা তিনি ভুলতে পারেন নি। কৃষ্ণের অবিশ্বাস তাঁর মর্মমূলে গাঁথা ছিল। কিন্তু কেন? তিনি কি সত্যি বিশ্বাস করতেন তাঁর অভিযোগ সত্য? অসামান্য রূপবান পুরুষ শাম্বর মনে হয়তো নিজের সম্পর্কে কিছু অহংকার থাকতে পারে। সে-অহংকার কিছু কিঞ্চিৎ প্রদ্যুম্ন বা চারুদেষ্ণ, কার মধ্যেই বা না ছিল? এবং মহর্ষির এ-অনুমানও হয় তো আদৌ মিথ্যা না, বাসুদেব একান্তরূপে ঈর্ষাহীন ছিলেন না। মহামানবের গৌরবও চিরকাল তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে শাম্ব প্রণয়লীলায় কখনোই অতি আসক্ত নন। কিন্তু তাঁর প্রণয়-সম্ভাষণ, কৌতূহলোদ্দীপক প্রেমলীলা, প্রণয়িনীগণের সঙ্গে তাঁর প্রণয়োদ্দীপক নানা ক্রীড়াকৌশল যা একান্ত অনায়াসসাধ্য নয়, বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদির অপেক্ষা রাখে তা যাদব রমণীগণের মধ্যে সুখকল্পনায় গুঞ্জরিত হতো। সেটা তার কোনো অপরাধ না। কিন্তু মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে, এত বড় একটা গুরুতর অভিযোগ তুললেন কেমন করে? তাও পিতার রমণীগণ বিষয়ে পুত্রকে অভিযুক্ত এবং সে অভিযোগ পিতাকেই! মহর্ষির কি কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল এই অভিযোগের?

সম্ভবতঃ ছিল। দ্বারকায় ইতিপূর্বে তিনি অনেকবার এসেছেন। যাদবদের বিভিন্ন গৃহে গমন করেছেন। এবং এমন একটি ধারণা করবার মতো সঙ্গত কারণ তাঁর ছিল, রূপবান শাম্ব যাদবরমণীগণের অতি প্রিয় পুরুষ। তিনি কি কখনো কারোর মুখে শুনেছেন, কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণীগণ শাম্বকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অভিলাষপূর্ণ প্রণয়ালাপ করছে?

মহর্ষি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞাত ছিলেন। অথবা কেবলমাত্র রমণীর মন বিষয়ে, নানা দেশের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত দান করেছিল, কৃষ্ণকে সেই গুরুতর অভিযোগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানব সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণের আচরণের নানা রীতি ও বৈপরীত্য বিষয়ে অবগত আছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহর্ষি আবার দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকা ত্যাগ করে গেলেও আদৌ কি তিনি দূরান্তরে কোথাও গমন করেছিলেন? মনে হয় না। সম্ভবতঃ নিকটে থেকেই তিনি একটি বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। নানা শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁর কোনো সংবাদদাতা ছিলেন না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি এ যাত্রায় দ্বারকায় এসেই আগে গেলেন রৈবতকের পর্বতের গহনে কৃষ্ণের প্রমোদকাননে। রৈবতকের সেই প্রমোদকাননে নানা বৃক্ষে বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ। ভূমিসকল নানা পুষ্পপল্লবিত বীথি ও মনোহর সবুজ ঘাসে আস্তীর্ণ। প্রমোদকাননে বিশাল সুমিষ্ট স্বচ্ছ জলাশয়।

নারদ দূর থেকে দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোলসহস্র রমণীগণসহ জলকেলিতে সুখে মগ্ন। বাসুদেবকে ঘিরে জলমধ্যে নানা রমণী নানা ক্রীড়া-কৌতুকে, মরালীর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ কৃষ্ণকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, কেউ জল মধ্যে বিহার আকাঙ্ক্ষায় মীনসমূহ যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন বৃক্ষের চারপাশে খেলা করে সেইরূপ করছিল। কেউ কেউ সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা হয়ে নানারূপ প্রণয় কথা উচ্চারণ করছে। অন্যান্য বান্ধবীদের পৈষ্টী ও সুরাসবের পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বাসুদেবকে অনুভব করছে। স্বভাবতই প্রমোদকানন ও জলাশয়ে রমণীরা উচ্চহাস্যে প্রগলভ কথাবার্তায় প্রমত্তা। জলাশয়ও তাদের কেলি উদ্দামে অতি উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত।

কৃষ্ণ স্বয়ং অতি উদার ও প্রমত্ত বাঞ্ছায় প্রিয় রমণীগণের সহবাসে সকলের ইচ্ছাপূরণ ও আহ্লাদিত করছেন। এই অতি প্রেমোচ্ছল জলকেলিতে বৃক্ষের পাখীরা নানা স্বরে রব করছে। বিচিত্র বর্ণের পতঙ্গসমূহ কাননের শোভা বর্ধন করছে। রমণীগণের সঙ্গে মরালীরাও জলাশয়ের অন্যপ্রান্তে নিজেদের মধ্যে কেলি করছে।

নারদ দেখলেন, সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা রমণীগণের অঙ্গের বসনভূষণ সকলই শিথিল ও স্খলিতপ্রায়। নিজেদের নগ্নতা বিষয়ে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। থাকবার কথাও না। কারণ রৈবতকের এই প্রমোদকাননে ও জলাশয়ে একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ ছাড়া কারোরই উপস্থিতির কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণের প্রমোদকানন ও জলকেলি স্থান কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য এ কথা দ্বারকায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার অর্থ এই না, কৃষ্ণ কোনো প্রয়োজনে সেখানে কারোকে ডেকে আনতে পারবেন না। বিলাস অবকাশেও অনেক সময় কর্মজীবনের জরুরী প্রয়োজন ঘটতে পারে।

নারদ দেখলেন, এই তাঁর সেই প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। রমণীরা সুরাসব পানে ও যৌবন সম্ভোগেচ্ছায় অতি প্রমত্তা, হাস্যে লাস্যে কৌতুকে কেলিতে প্রমোদকানন মুখরিত। তিনি নগরের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদের কাছাকাছি কুঞ্জমধ্যে শাম্বকে তাঁর সহচরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় খুঁজে পেলেন। রূপবান শাম্বকে রমণীর সোহাগে অধিকতর রূপবান দেখাচ্ছিল। নারদ কিছুটা দ্বিধা ও সংকোচ করে বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে সুখে বাধা দিতে চাই না। বাসুদেব এখনও তাঁর রৈবতকের প্রমোদকাননে রয়েছেন। সেখানে তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন।'

শাম্ব তৎক্ষণাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। মহর্ষি বাক্য কখনো মিথ্যা হবার না। পিতা স্মরণ করেছেন শোনা মাত্র তিনি দ্রুতগতি হয়ে, প্রমোদকাননে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ এমন অসময়ে, তাঁর প্রমোদকাননে কেলিস্থলে শাম্বকে দেখে অবাক হলেন। কিন্তু তাঁর ষোলসহস্র রমণীগণ, রূপবান শাম্বকে দেখে উল্লাসে মেতে উঠলো। তাদের সকলের আরক্ত সিক্ত চোখ মুখ কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। কামোচ্ছ্বাসে তারা সকলে নির্বাক হয়ে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণের উপস্থিতি সত্বেও শাম্বের রূপ নিয়ে তারা প্রগল্‌ভ গুঞ্জনে মেতে উঠলো।

নারদ বুঝলেন, এটা প্রথম ধাপ। রমণীরা এখনো তাদের যৌবনপ্রস্ফুটিত দেহ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি সকল রমণীর মধ্যে তিনজন কৃষ্ণের নিকটবর্তী হয়ে অধোবদন ছিলেন। তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী, সত্যভামা। তাঁরা অবাক ও গম্ভীর হয়ে ছিলেন। মত্ততা দূরের কথা, কোনো প্রকারের বিকার তাঁদের ছিল না। নারদ এতক্ষণ অন্তরালে ছিলেন। এবার কৃষ্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

মহর্ষিকে দেখা মাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সকল নারী জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। নারদকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে রমণীগণ শাম্বকে তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো। তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বিবিধ ভঙ্গিসহকারে শাম্বর সামনে এমনভাবে উচ্ছিত হলো যে, সকলের কামোচ্ছ্বাস অত্যন্ত প্রকটিত হলো। অতিমাত্রায় সুরাসবপানে, মত্ততাপ্রসূত, তারা শাম্বর প্রতি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাদের উজ্জ্বল রূপলাবণ্যরাশি অনাবৃত করলো।

নারদের সঙ্গে কৃষ্ণের একবার দৃষ্টিবিনিময় হলো। পরমুহূর্তেই মর্মাহত বাসুদেব ক্রোধে ও গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের দিকে তাকালেন। নারদকে

তাঁর আর কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না। বলবারও ছিল না। মহর্ষি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি অতি নির্মম ভাবেই করেছেন। এখন তিনি পরিণতি দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। কৃষ্ণ রমণীদের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করে ধিক্কার দিয়ে অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলেন, 'তোমরা আমার রক্ষিত হয়েও অতি নিকৃষ্ট আচরণ করেছো। অতি প্রমত্তা হয়ে তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছো, আমার মৃত্যুর পরে, তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।'

কৃষ্ণের অভিশাপ যাঁদের ওপর বর্ষিত হলো না তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী এবং সত্যভামা। অন্য সমস্ত রমণীগণ মুহূর্তে তাদের অপরাধ অনুভব করে আর্তস্বরে বাসুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। প্রমোদকাননের জলকেলি, হাস্য মুখরিত লীলাক্ষেত্র সকলই বিষাদে ডুবে গেল। কৃষ্ণ রমণীদের বললেন, 'ভবিষ্যতে দালভ্য ঋষির কাছে তোমাদের সম্যক জীবনধারণের উপায় জানতে পারবে।'

কৃষ্ণ অতঃপর তাকালেন বজ্রাহত বিস্মিত ভীত অধোমুখ শাম্বর দিকে। শাম্বর অসামান্য রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হলো। পুত্রকে তিনি অভিসম্পাত করলেন, 'তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'

শাম্বর সর্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিত হলো। তিনি করযোড়ে নতজানু হয়ে বাসুদেবের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে, কাতর স্বরে বললেন, 'পিতা, আমি স্বইচ্ছায় কখনোই আপনার প্রমোদকাননে আসি নি। আমি আমার জন্মমুহূর্ত থেকে আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক। পিতা, আপনি জগদ্বিখ্যাত বাসুদেব। হে পুরুষোত্তম জনার্দন, হে বৃষ্ণিসিংহাবতার, এই জগতীতলে, কী বা প্রকৃতি কী বা মানুষ, আপনি সকলের অন্তর্যামী। বিশ্বচরাচরের যা কিছু অমোঘ পরিবর্তনশীলতা অথবা মানুষের অন্তরের কথা কিছুই আপনার অগোচরে থাকে না। আপনাকে কোনো কারণে অসুখী দর্শনের চেয়ে আমার পক্ষে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। কিন্তু আপনি জানেন আমি নিষ্পাপ। আমি আপনার ঔরসজাত সন্তান, সংসারে এর তুল্য সুখ ও অহংকার আমার আর কিছুই নেই। আপনার অন্যান্য পুত্রদের ন্যায় আমার দ্বারা কখনো কোনো নীতি-বিগর্হিত কাজ সম্ভব না। আপনার সন্তাপ হতে পারে, এমন কোনো কুরুচিপূর্ণ আচরণের সাহস আমার কদাপি মনে ছায়াপাতও করে নি। হে সর্বজ্ঞ পিতা, আপনি আমাকে কেন এই নিদারুণ অভিসম্পাত করলেন?'

কৃষ্ণ সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারলেন না। বজ্রপাতের পরমুহূর্তে যেমন স্তব্ধতা নেমে আসে, তিনি সেইরূপ মৌনতা অবলম্বন করলেন। মহর্ষি, পুত্র, রমণীগণ, প্রমোদকানন কোনো কিছুর প্রতি কারো প্রতিই যেন তাঁর দৃষ্টি নেই। অথচ তাঁর বিশাল চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি শূন্য না। তিনি যেন স্থাণুর গভীর ধ্যানমগ্নতায় ডুবে আছেন।

মহর্ষি মনে মনে হাসছিলেন আর মনে মনেই উচ্চারণ করছিলেন, অসূয়া অসূয়া! হে বাসুদেব আপনার জ্ঞানই আপনাকে সর্বজ্ঞ করেছে। জ্ঞানী হয়েও রমণীর চরিত্র ও মন আপনি এই বয়সে আর একবার অনুধাবন করলেন। অতি নির্মমরূপে অনুভব করলেন রূপবান আত্মজের সামনে নিজের রমণীগণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে কী দুঃসহ ঈর্ষায় অন্তর বিদীর্ণ হয়। হে পুরুষোত্তম, আপনিও তখন আপন প্রিয় পুত্রকে নির্মম অভিশাপ না দিয়ে পারেন না। আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, আমি প্রমাণ দিয়েছি। আমি মিথ্যা কথা বলে শাম্বকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি, তা ছাড়া চাক্ষুষ প্রমাণের আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু শাম্ব নিরপরাধ আপনি জানেন। জেনেও এই অভিশাপ। অমোঘ এই অন্তরের বিকার, হে বাসুদেব। আমি আর ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করবো। শুধু সেই পরিণাম দেখে যাবো, পুত্রের কাতর প্রার্থনায় আপনার অভিশাপ থেকে মুক্তিদান করেন কী না। যদি করেন তা হলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। শাম্বকে আমি যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম, তা ঘটবে না।

শাম্ব তখন কৃষ্ণের পদতলে পড়ে কাতর প্রার্থনা করে চলেছেন, 'পিতা, আপনার কোনো পুত্রই কখনো আপনার অবাধ্যতা করে নি, আমিও করি নি। শৈশব থেকে আপনার ও আমাদের বংশের অন্যান্য অস্ত্রবিদদের কাছে অস্ত্র-শিক্ষা লাভ করেছি। যুদ্ধবিশারদ রূপে আমার যদি কোনো খ্যাতি থেকে থাকে, তবে তা আপনারই দান। আপনার নির্দেশ ও নেতৃত্বে, জরাসন্ধের মহাবল সেনাপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনার অনুপস্থিতিতে এই দ্বারকানগরী যতোবার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যদুবংশের সকল বীরদের সঙ্গে আমিও প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। প্রদ্যুম্ন আর আমি অতিবলশালী শাম্বর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে দ্বারকার দূরপ্রান্তে তাড়িয়ে এসেছি। আপনার মহিমময় কীর্তি, সৌভনগরে গিয়ে সেই শাম্বকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। রাষ্ট্র সমাজ পরিবার বিষয়ে যাবতীয় শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছি। রমণীদের কার প্রতি কী আচরণ করতে হয়,

সেই সুনীতিজ্ঞান আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। পৃথিবীতে আপনি সেই পুরুষ, যিনি বিশাল রমণীকুলের ভর্তা ও ত্রাতা। আমাকে ক্ষমা করুন পিতা, আমাকে অভিশাপ দেবেন না।'

কৃষ্ণের স্তব্ধ মৌনতা ভাঙলো, তিনি তথাপি কয়েক মুহূর্ত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন। তারপর বললেন, 'শাম্ব, আর তা সম্ভব না।'

শাম্বর অতি উজ্জ্বল কান্তি স্বেদসিক্ত হয়ে বারে বারে প্রকম্পিত হলো। নারদ তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন। শেষ কথা যা শোনার, তা তাঁর শোনা হয়ে গেল। তিনি প্রমোদকানন ছেড়ে, নগরীর দিকে চলে গেলেন। কৃষ্ণ একবার সেদিকে দেখলেন। বিষাদের ছায়া তাঁর মুখে। জাম্ববতী, রুক্মিণী ও সত্যভামার চোখে জল। অন্যান্য রমণীগণ দ্বারকানগরীর অনন্ত বিলাস ব্যসন ও সুখের পবিবর্তে, অভিশাপ ভয়ে কাতর হয়ে তখন কেবল সেই ভয়াবহ অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। আর মনে মনে দালভ্য ঋষির নাম জপ করছে।

কৃষ্ণের চোখে, মুখে, বক্ষে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় কোথাও কোনোরকম ক্রোধের অভিব্যক্তি নেই। তিনি বললেন, 'শাম্ব, একমাত্র অভিশাপ দিয়ে যদি সকল সংকটের মুক্তি হতো তা হলে আমাকে গদা আর চক্র ধারণ করে শত্রু নিধন করতে হতো না। অভিশাপ কেবলমাত্র মনস্তাপ থেকে স্ফুরিত হয় না। সাধারণ মানুষ পরস্পরকে যে-রকম অভিশাপ দিয়ে থাকে, আমার অভিশাপ তদ্রূপ না। যা ঘটে যায়, যা ভবিতব্য তা-ই অভিশাপরূপে উচ্চারিত হয়। তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে তা উচ্চারণ করেছি মাত্র। তোমার কোষ্ঠীর কাল অনুযায়ী, তোমার ব্যাধির প্রকটরূপ প্রকাশের সময় আসন্ন। বিম্ব ফলের ন্যায় তোমার দেহের এই রক্তাভ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফীতি, কিছুই আর স্বাভাবিক নেই। শরীরের এই লক্ষণগুলো তোমার চোখে পড়ে নি। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাকে দেখে রমণীদের যৌবনোচ্ছ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়েই তোমাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।'

শাম্বের স্বেদসিক্ত কলেবরের কম্পন কিছু স্থির হলো। তিনি তাঁর নিজ দেহের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিতা, তাই যদি সত্য তবে বলুন আমার আরোগ্যের উপায় কী?'

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি, মহর্ষি নারদকে তুমি রুষ্ট করেছো। তুমি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাও নি।

আমার মনে হয়, তোমার ব্যাধি প্রকটিত হলে তাঁর কাছেই তোমার যাওয়া উচিত। তিনি দেবভূমি থেকে সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। বহু বিচিত্র স্থান ও সম্প্রদায়কে তিনি চাক্ষুষ করেছেন। একদিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক ব্যাপক। সম্ভবত তিনিও চান, তুমি তাঁরই দ্বারস্থ হবে। আমিও তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, তুমি যথাসময়ে মহর্ষির সন্ধানেই যেও।'

শাম্ব এখন অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করলেন, 'পিতা, যা অমোঘ এবং অনিবার্য হয়ে জীবনে নেমে আসে, তাকে আমরা ভাগ্য বলে মানি। এই অভিশাপ আমার অদৃষ্ট। এই বয়সের মধ্যেই আমি ভাগ্যের উত্থানপতন কম দেখি নি। এককালে যদুবংশকে মহাবল সম্রাট জরাসন্ধ সংখ্যান্ন করেছিলেন, ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিলেন। আজ কোথায় জরাসন্ধ। যদুবংশ সগৌরবে অবস্থান করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি যুদ্ধার্থী কৌরবগণ প্রায় নিশ্চিহ্ন। পাণ্ডবেরাও লোকবলে ক্ষীণপ্রাপ্ত হয়েছেন। তথাপি কেউ নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি। আমার ভাগ্যের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও, আমিও নিশ্চেষ্ট থাকবো না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাবো। আমাকে আপনি বিদায় দিন।'

শাম্ব পিতার পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। কৃষ্ণ শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে মুখ ফিরিয়ে জাম্ববতীর দিকে তাকালেন। জাম্ববতী তখন অশ্রুজলে ভাসছিলেন। শাম্ব নিজে কাছে গিয়ে, মা জাম্ববতীকে প্রণাম করলেন। রুক্মিণী এবং সত্যভামাকেও প্রণাম করলেন। জাম্ববতী শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে শিশুর ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করলেন। পুত্রস্পর্শে মায়ের স্তনধারা যেন সন্তানের জন্য অজস্র ধারায় বিগলিত হলো। তিনি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বৎস, আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও। তোমার সেই জনচিত্তবিমোহিতকারী রূপ আবার লাভ কর।'

অভিশাপ ভয়ে ভীতা ষোল সহস্র রমণীগণও এই দৃশ্য দেখে অশ্রুমোচন করলো। যে-কারণে তারা বাসুদেবের দ্বারা অভিশপ্ত, তাদের সেই রমণীচিত্ত শাম্বদর্শনে এখনো বিমোহিত। রূপবান পুরুষের প্রতি রমণীর চির আকাঙ্ক্ষা, এই অভিশাপের দ্বারাই চিরস্থায়ী হলো। শাম্ব প্রমোদকানন থেকে বিদায় নিলেন।

শাম্ব ফিরে এলেন নগরীতে। এখন তাঁর অঙ্গ স্বেদকম্পিত না। অস্থিশঙ্কু পুরুষ এখন আত্মমগ্ন হয়ে, মুক্তির কথা ভাবছেন। গৃহ সন্নিকটে অদূরে রমণীয় কুঞ্জমধ্যে সহচরীরা তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি সেইদিকে ভগ্নহৃদয় বিষাদ দৃষ্টিতে দেখলেন। কিন্তু সেদিকে গেলেন না। যুদ্ধবিশারদ শাম্ব, রতিবিশারদ শাম্ব, আপন বাহু তুলে নিরীক্ষণ করলেন। সত্যি, তাঁর যে-অঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলই প্রতিবিম্বিত হয়, তা এখন অধিকতর রক্তাভ দেখাচ্ছে। তিনি গৃহমধ্যে গমন করলেন।

গৃহমধ্যে বহু দাসদাসী বিচরণ করছে। শাম্ব কারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, অন্তঃপুরে গমন করলেন। সেখানে নানা সুবর্ণের আভরণ নানা সময়ে প্রাপ্ত বিবিধ মণি, কক্ষে কক্ষান্তরে, রমণীয় শয্যা ও বিবিধ গৃহসামগ্রী নানাদেশীয় মহার্ঘ বসন, কোনো কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন না। অথচ এ সকলই ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

শাম্বকে অন্তঃপুরে গমন করতে দেখে রমণীগণ পাথর স্খলিত প্রস্রবণের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হলেন। শাম্ব কপাট বন্ধ করে অতিকায় সুবর্ণদর্পণ হাতে তুলে নিলেন। নিরীক্ষণ করলেন আপন প্রতিবিম্বকে। আশ্চর্য, পিতা মিথ্যা কিছু বলেন নি। লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁর নাসা, কর্ণ, ভ্রূ ইত্যাদির স্থানে স্থানে স্ফীতিলাভ করেছে। এ কি বাসুদেবের অভিশাপমাত্রেই ঘটলো? নাকি তাঁর কথায় এখন চোখে পড়ছে! তিনি কোষ্ঠীর ভবিতব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হয়তো অভিশাপের বাস্তব ভিত্তি তাই। কিন্তু শাম্ব এই ঘটনাকে পিতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

শাম্ব সুবর্ণদর্পণ রেখে দিয়ে কপাট খুলে দিলেন। রমণীগণ মধ্যে কেবল লক্ষ্মণাকেই প্রবেশ করতে বললেন। এই সেই দুর্যোধন আত্মজা লক্ষ্মণা, যাঁকে শাম্ব হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। লক্ষ্মণা সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বালঙ্কারশোভিতা। কিন্তু শাম্ব কর্তৃক সখী ও সহচরীদের কক্ষ প্রবেশে বাধাদানে অবাক হলেন। অবাক হলো প্রণয়সঙ্গিনীরা। ম্লান মুখে তারা ফিরে গেল। লক্ষ্মণার হৃদয় অশুভ আশংকায় কেঁপে উঠলো। তিনি শংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

শাম্ব ব্যস্ত কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে লক্ষ্মণা?'

লক্ষ্মণা প্রশ্ন আশা করেন নি। শাম্বর জিজ্ঞাসায় এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তারপর বললেন, 'তোমার চোখ মুখ শুষ্ক। পীড়িত, বিষন্ন, দুঃখিত

দেখাচ্ছে তোমাকে। মহর্ষি নারদ তোমাকে কোথায় ডেকে নিয়ে গেছলেন? কিছুক্ষণ আগেও তুমি সুখী ছিলে। এখন এত করুণ আর বিমর্ষ কেন?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সব কথাই বললেন। লক্ষ্মণা অস্ফুট ক্রন্দনে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অভিশাপ! কেন? তুমি যে রমণীমোহন, এ কথা দ্বারকায় সর্বজন-বিদিত। তবে কেন অভিশাপ?'

শাম্ব বললেন, 'লক্ষ্মণা, অভিশাপ জিজ্ঞাসার অতীত। এ অমোঘ এবং অনিবার্য। এ ভাগ্যের পরিহাস না, নির্দেশ। একে অমান্য করা চলে না। আমি এখন থেকে তোমাদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো। নগর প্রাকারের বাইরে কিছুকাল অপেক্ষা করে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দেশ নেবো। তিনি যা বলবেন তাই করবো।'

লক্ষ্মণা আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলেন, বললেন, 'না না, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

শাম্ব শান্ত স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মণা, মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই একমাত্র এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তিনি যদি নির্দেশ দেন, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তবে, খুব দ্রুতই ব্যাধি আমাকে গ্রাস করবে, আমি অনুভব করছি। পূর্ণ গ্রাসের পূর্ব পর্যন্ত আমি নগরের বাইরে থাকবো। তারপরে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

লক্ষ্মণার কান্না হৃদয়বিদারক হলো। তিনি শাম্বকে আলিঙ্গন করে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'প্রিয়তম, স্বর্ণ-দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল তোমার অঙ্গে, আমি কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখি না। এ সকলই তোমার পিতার অভিশাপগ্রস্ত মনের ও চোখের বিকার। আমি এখনো তোমার বুকে আমার প্রতিবিম্বকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি এখনো বিশ্বের সকল পুরুষের ঈর্ষণীয় সেই বলিষ্ঠ রূপবান পুরুষই আছো। পিতার অভিশাপ পুত্রের প্রতি স্নেহেরই এক বিপরীত সম্ভাষণ। ব্যাধির আশংকা, গৃহত্যাগের বাসনা তুমি মন থেকে ত্যাগ করো।'

শাম্ব মনে মনে হাসলেন, করুণ আর মর্মান্তিক সেই হাসি। বললেন, 'লক্ষ্মণা, পিতার অভিশাপ না, বৃষ্ণিসিংহাবতার পুরুষের অপমানিত মর্মাহত অন্তরের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে আর এক পুরুষের প্রতি। এ ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের সম্পর্কজনিত কপট উষ্মা বা ক্রোধের বিষয় কিছু নেই। তোমাকে তো সব ঘটনাই বললাম। বাসুদেবের মতো ব্যক্তির পৌরুষে যদি আঘাত লাগে, তবে

তাঁর সংহারমূর্তি কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তুমি কল্পনা করতে পারো। অন্য পুরুষের তো কোনো কথাই নেই। তা ছাড়া, তুমি আমার মনের ও চোখের যে-বিকারের কথা ভাবছো, তা সত্যি না। পিতা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি কখনোই নিজেকে দেখতে ভুল করি নি। বিকার বা মায়া, কিছুই আমাকে গ্রাস করে নি। পিতার ষোল সহস্র রমণীর প্রমত্ত উৎকট কামতাড়িত আচরণ আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি। বৃষ্ণিসিংহের ক্রোধবহ্নির সম্যক কারণ আমি অনুভব করেছি।'

লক্ষ্মণার আসন্ন স্বামী-বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণ কোনো যুক্তি মানতে পারছে না। অশ্রুসজল চোখে, ব্যথায়, অভিমান স্ফুরিত স্বরে বললেন, 'রতিকোশাস্ত্রবিদ হে দ্বারকামোহন, সেই রমণীদের কামোচ্ছ্বসিত আচরণের অপরাধই বা কি? আমি জানি তুমি কদাচ সেই রমণীদের নিজের রূপের দ্বারা কামোদ্রেক করো নি। কিন্তু সর্বজ্ঞ বৃষ্ণিসিংহ কি জানতেন না, মাতৃগণ ব্যতীত দ্বারকার সকল রমণীকুলের তুমি অতি আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ? এই ষোল হাজার রমণীকে নির্বিচারে গ্রহণের জন্য তিনি নিজেকে অনাচারীজ্ঞানে অতি পুণ্যের স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেন নি। মুষল ও লাঙ্গলধারী দুর্দান্ত যদুবীর বলভদ্রকেও তিনি সেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে দেন নি, কারণ বলভদ্রও সর্বদাই সুরাসবপানে প্রমত্ত থাকেন। তবে তোমাকে কেন তিনি কামোচ্ছ্বসিত রমণীদের কারণে অভিশাপ দিলেন?'

শাম্ব গম্ভীর হলেন, বললেন, 'লক্ষ্মণা, সুলক্ষণে প্রিয়তমে, তোমাকে আগেই বলেছি মহাপুরুষের অভিসম্পাত প্রশ্নের অতীত। তা ছাড়া যদুকুলের কুমারগণ তাঁদের পিতার সমালোচনা শুনতে অভ্যস্ত না। পিতার অভিশাপ অলঙ্ঘনীয়। তিনি আমাকে মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন সেই পথেই আমার যাত্রা।'

লক্ষ্মণা ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'আহ্, হায় কী দুর্ভাগ্য আমার, যে-পুরুষের মুহূর্তের দর্শন ছাড়া থাকতে পারি না, যিনি আমাকে হরণ করার সময়ে পিতার বাধা দানের ফলে হস্তিনানগরী ভূমিকম্পে আকুঞ্চিত হয়েছিল, যাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ছাড়া দিনযাপন করি নি, তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে আজ আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মণা, অভিশাপমুক্ত হয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।'

রমণীর মন এই সব সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ মানে না। শাম্বর স্নেহলগ্ন হয়ে তিনি নানা রূপে নিজের ব্যথা প্রকাশ করতে লাগলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি

নগর প্রাকারের বাইরে কেন যাবে ?'

শাম্বর বিশাল বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে উঠলো। কিন্তু কাতরতা প্রকাশ না করে বললেন, 'লক্ষ্মণা, ব্যাধি আমাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আমি আমার প্রিয়জনদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে চাই।'

লক্ষ্মণা এই কথা শুনে অতি শোকাকুলা হলেন। কারণ তিনি এই বলীয়ান রূপবান পুরুষের অন্তরের বেদনা অনুভব করলেন। যিনি নগরের পথে বের হলে রমণীগণ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখতে ছুটে আসেন, তিনি কুৎসিত বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে কেমন করে সেই নগরী মধ্যে বাস করবেন ? তখন লক্ষ্মণা স্বামী সান্নিধ্যে বসনভূষণ পরিত্যাগ করে, যুগপৎ কান্না ও আবেগকম্পিত স্বরে বললেন, 'হে পরম সুন্দর মহাভুজ রমণীবিশারদ, এই দারুণ দুঃখেও আমি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তোমাকে কামনা করছি। তোমার দুই বিশাল বাহু ও বক্ষ ও তেজ দ্বারা আমাকে মর্দিত করো।'

শাম্ব শান্ত ও অবিকৃতভাবে লক্ষ্মণাকে আপন অঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হায় অভিশাপ! কুরুকুলের এই অবিস্মরণীয়া রমণীরত্নের সঙ্গে সঙ্গম প্রমোদেও কোনো সুখানুভূতির লেশ নেই। জীবনপ্রবাহ কি আশ্চর্য স্বপ্নবৎ! যে-আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এখন এই ধারণার বশবর্তী।...'

শাম্বর নগর প্রাকারের বাইরে সকলের চোখের অন্তরালে সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুবেলায়, বৎসরান্ত বাসের আগেই, পিতার অভিশাপ এবং ভবিতব্য সমগ্র দেহে অতি উৎকটরূপে প্রকটিত হলো। তিনি দিনের আলোয় সচরাচর বালুবেলায় আত্মপ্রকাশ করতেন না। উপকূলবর্তী পর্বতের গুহাকন্দরে দিনযাপন করতেন। পর্বতের বুকে, আশেপাশের বৃক্ষে ও ভগ্নপ্রস্তর মৃত্তিকায় যে সমস্ত ফলমূলাদি সংগ্রহ করতে পারতেন তা দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। পর্বতের ক্ষীণ প্রস্রবণধারায় যে মিষ্ট জল পেতেন, তা দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন।

নগররক্ষীরা যখন অশ্বচালনা করে, নগরের বাইরে টহল দিতে বেরোতো, শাম্ব কখনোই তাদের সামনে যেতেন না। সূর্যাস্তের পর তিনি যখন বালুবেলায় বেরিয়ে আসতেন তখন নগরের দ্বারপালদের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো, রৈবতক পর্বত নগরীর আলোকমালা। নাগরীদের গুঞ্জন ও হাসি, নাগর পুরুষদের দেখে, চোখের ঝিলিক হানা নানা

প্রকারের অঙ্গভঙ্গি। সুরাসবপানে সুখী ও প্রমত্ত রাজপুরুষগণের নাগরী পণ্যাঙ্গনাদের অতি রুচিশীল সঙ্গীত ও নৃত্য মুখরিত অঙ্গনে গমন। প্রবাসী ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বা পাঞ্চালের অধিবাসীরা বা অন্যান্য দেশের নাগরিকগণ, দ্বারকানগরীর নৈশ প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে, মঙ্গল শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজছে। শাম্ব শুনতে পেতেন সবই। দূরের অন্ধকার বালুবেলা থেকে দেখতে পেতেন না কিছুই। কিন্তু সবই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

শাম্বর নিজের গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরের কী অবস্থা? তিনি নির্বিকার থাকবার চেষ্টা করলেও সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতোই সে-সব বিষয় তাঁর অন্তর মধ্যে তরঙ্গায়িত হতো। তাঁর গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরে আলো জ্বলছে তো? রমণীরা প্রতি রাত্রের মতোই সুখে বিচরণ করছে তো? লক্ষ্মণা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসে নেই তো? মাতৃগণ মনোকষ্টে নেই তো? পিতা বিচলিত ও বিমর্ষ হয়ে নেই তো? ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাঁর অদর্শনে ভগ্নমনোরথ হয়ে নেই তো?

এই ভাবে বৎসর পূর্তির পূর্বেই শাম্বর দেহ কুষ্ঠরোগের গ্রাসে অতি কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ রূপ ধারণ করলো। পিতার নির্দেশ তাঁর মনে পড়লো। মহর্ষি নারদের কাছে তাঁকে যেতে হবে। তাঁর কাছে যাবার সময় হয়েছে। তিনিই ব্যাধিমুক্তির উপায় বলে দেবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায়? শাম্ব তাঁকে কোথায় পাবেন? মহর্ষি সর্বব্যাপী। ঋষিগণসহ নানা বর্ষগুলোতে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। অথচ তাঁকে না পেলে চলবে না। তাঁর প্রতি অসঙ্গত আচরণের মূলেই নিহিত রয়েছে এই অভিশাপের কারণ। সেইজন্য হয়তো পিতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তির উপায় জানতে বলেছেন।

শাম্বর সহসা মনে হলো, পিতার কাছে যাওয়া উচিত। একমাত্র তিনিই হয়তো বলতে পারেন মহর্ষি এখন কোথায় অবস্থান করছেন। রাত্রে তিনি এই কথা ভাবলেন এবং পরের দিন প্রভাতেই নগরদ্বার উন্মুক্ত হবার পরে নগরের উদ্দেশে গমন করলেন। না, এখন আর শাম্বকে দেখে কেউ যদুবংশের সেই রূপবান যুদ্ধবিশারদ পুরুষকে চিনতে পারবে না। নগর ও দ্বাররক্ষীরা সহজেই অনুমান করে নেবে, তিনিও একজন ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় ভিক্ষার্থী। ভিক্ষা শেষে যথাসময়ে নগরের বাইরে নিজের আশ্রয়ে চলে যাবেন।

শাম্ব ভুল ভাবেন নি। দ্বাররক্ষীরা তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজে-দের বিশাল গুম্ফে মোচড় দিল। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। নানা কার্যব্যপদেশে, নগরের অধিবাসীরা পথে ভিড় করে, নানা কথায় মুখরিত করে

চলেছেন। কেউ শাম্বর কুষ্ঠ কুৎসিত চেহারার দিকে ফিরেও তাকালেন না। বরং কেউ কেউ যুগপৎ ঘৃণা ও কৃপাবশে, তাঁর প্রতি দূর থেকে মুদ্রাদি নিক্ষেপ করলেন এবং শাম্বকে তা সাগ্রহে সংগ্রহ না করতে দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

শাম্ব দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে রৈবতকে কুশস্থলীতে গমন করলেন। বিভিন্ন স্থানে চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ইত্যাদি ইত্যাদি যাদবশ্রেষ্ঠগণকে দেখতে পেলেন। তাঁরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাতও করলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি অনায়াসেই বাসুদেবের সাক্ষাৎ পেলেন, এবং অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র পুত্রকে চিনতে পারলেন। তাঁর অভিশাপের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ শাম্বর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মূর্তি দেখে কৃষ্ণ মুহূর্ত মধ্যে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হলেন। সেই মুহূর্তে গান্ধারীর অভিশাপের কথা তাঁর মনে পড়লো। গান্ধারী শোকে ও মনস্তাপে অতীব বিস্মৃত হয়েছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পুত্রের আস্ফালন, যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা, কৃষ্ণের বহু অনুরোধ, যুদ্ধজনিত জ্ঞাতি ও লোকক্ষয় বিষয়ে কৃষ্ণের সাবধানবাণী, শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ে কৃষ্ণের দৌত্য সে-সবই তখন শোকাকুলা গান্ধারী বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন, কালের অমোঘ নিয়মে যা অনিবার্য গান্ধারী অভিশাপ দিতে গিয়ে সে-কথাই উচ্চারণ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তা কখনোই অভিশাপরূপে বর্ষিত হয় নি।

কিন্তু এখন কৃষ্ণ নিজ মুখে উচ্চারিত অভিশাপেরই পরিণতি, কুষ্ঠ জর্জরিত আত্মজকে দেখে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করলেন। তিনি শাম্বকে নিয়ে কুশস্থলীর এক কক্ষে দ্রুত গমন করলেন। শাম্ব পিতাকে যথাবিহিত প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ প্রদান করে বললেন, 'পিতা, আপনার মনে কোনো প্রকার দুঃখ সঞ্চার করতে বা আপনাকে বিচলিত করতে আমি আসি নি। আপনার অভিশাপে আমার সর্বাঙ্গে ব্যাধি। আপনি বলেছিলেন, আরোগ্যলাভের উপায় একমাত্র মহর্ষি নারদ আমাকে বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'শাম্ব, এ বিচিত্র যোগাযোগ! মহর্ষি আজই দ্বারকায় এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমি এখনই তোমার সংবাদ দিচ্ছি, তুমি অপেক্ষা করো।'

শাম্বও মনে মনে বিস্ময় ও স্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'এ আমার এক পরম সৌভাগ্য!'

কৃষ্ণ কক্ষত্যাগ করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং ক্ষণপরেই মহর্ষি নারদসহ সেখানে আবার উপস্থিত হলেন। মহর্ষি নারদকে দেখে শাম্ব এগিয়ে এসে কষ্টের সঙ্গে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি আশীর্বাণী ও স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে, কৃষ্ণের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি শাম্বর ব্যাধিমুক্তি বিষয়ে আলোচনা করবো।'

কৃষ্ণ মহর্ষির ইঙ্গিত উপলব্ধি করে সে-স্থান ত্যাগ করলেন। মহর্ষি শাম্বকে বললেন, 'বসো, আমি তোমাকে এক স্থানের কথা বলবো।'

মহর্ষি অগ্রে আসন গ্রহণ করলেন। শাম্ব অদূরে উপবেশন করলেন। বললেন, 'হে পরমপূজনীয় মহর্ষি, আমার বিষয়ে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। নিতান্ত চপলতাবশত আমি আপনার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারেন, যদুবংশের পুত্র হয়ে আমি কখনোই ইচ্ছাকৃত-ভাবে তা করি নি। এখন যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। পিতার দ্বারা আমি অভিশপ্ত হয়ে কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। আপনি তুষ্ট হোন, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনি সুরলোক, অসুরলোক, গন্ধর্বলোক, অন্তরীক্ষ যাবতীয় লোকে গমনাগমন করে থাকেন। আপনার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন এখন আমার কী কর্তব্য? পিতা বলেছেন, আপনি আমার আরোগ্যলাভের উপায় বলে দিতে পারেন।'

মহর্ষি শাম্বর কথা শুনলেন, তারপরে সম্বোধন করলেন, 'হে বৃষ্ণিব্যাঘ্র! তোমার প্রতি আমার পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করছি।'

মহর্ষির মুখে 'বৃষ্ণিব্যাঘ্র' সম্বোধন শুনে, শাম্বর প্রাণের মধ্যে অতি ব্যথাতুর একটি আনন্দানুভূতি হলো। মনে হলো, এখনই তাঁর পুচ্ছহীন রক্তগর্ভ চোখ জলপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি হৃদয়ের আবেগকে দমন করে মহর্ষির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

মহর্ষি আবার বললেন, 'আমি জানি, তোমাকে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে কাল যাপন করতে হবে। কিন্তু তার কিছুই বৃথা যাবে না। এবার মন দিয়ে শোন। আমি একদা একবার সূর্যলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, সূর্যদেবকে দেবতারা বেষ্টন করে আছেন। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাবৃন্দ তাঁর চার-পাশে অবস্থান করছেন। ঋষিগণ সেখানে বেদপাঠ করছেন এবং সূর্যের স্তব করছেন, পূজিত হচ্ছেন ত্রিসন্ধ্যা দ্বারা। সেখানে সূর্যকে ঘিরে রয়েছেন আদিত্যগণ, বসুগণ, মারুতগণ, অশ্বিনীগণ। তাঁর পার্শ্বেই রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তাঁর দুই পত্নী রজনী ও নিক্ষুভা। রয়েছেন পিঙ্গলা, যিনি সদাসর্বদা

মঙ্গল অমঙ্গল বিষয়ে লিখে চলেছেন। দ্বারপাল রূপে রয়েছেন দণ্ডনায়ক, রজনা, স্তোশা, কালমাস এবং পক্ষী। কণ্ঠশৃঙ্গে রয়েছেন ভিণ্ডমন এবং নম্রদিণ্ডি।'

শাম্ব স্তব্ধ বিস্ময়ে মহর্ষির মুখ থেকে এই বর্ণনা শুনলেন। মহর্ষি আবার বললেন, 'ইনি একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণেরও উর্ধ্বে। ইনিই সকল শক্তির উৎস। ইনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। তোমার একমাত্র পূজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন, সেই জন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।'

শাম্ব বিনীত নম্রস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো এই সূর্যলোকের কথা শুনি নি। আপনার অশেষ করুণা, আপনি আমাকে শোনালেন। কিন্তু কোথায় এই সূর্যলোকের অবস্থান, আমি তাও জানি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পথের সন্ধান দিন, আমি যে-কোনো প্রকার নিগ্রহ সহ্য করে তাঁর করুণাভিক্ষা করতে সেখানে যাবো।'

মহর্ষি বললেন, 'যথার্থ বলেছ। তুমি এখান থেকে উত্তর সমুদ্রতীরে গিয়ে, উত্তর পূর্বে গমন কর। তুমি যাবে মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে, সেখানে মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্র বর্তমান। সেখানে তিনি পরমাত্মা রূপে অত্যুজ্জ্বল পুরুষ রূপ নিয়ে রয়েছেন। তুমি সেইখানে গমন করো।' এই কথা বলে, মহর্ষি গাত্রোত্থান করে আবার বললেন, 'কোনো কারণে কোনো সংকটে পড়লে, তুমি আমার সন্ধান করো, আমি তোমার সংকটমোচনের উপায় বলবো।'

শাম্ব করজোড়ে নতজানু হয়ে আবার মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করলেন। মহর্ষি চলে যাবার কিছু পরেই কৃষ্ণ এলেন। মহর্ষি শাম্বকে কোনো কথা পিতাকে বলতেই নিষেধ করেন নি। অতএব তিনি মহর্ষি বর্ণিত মহানদী চন্দ্রাভাগা তীরে সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের কথা পিতাকে বললেন, এবং তখনই যাত্রা করার জন্য পিতার অনুমতি চাইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'একমাত্র মহর্ষিই এ বিষয়ে অবগত আছেন। চন্দ্রভাগা মহানদী দেবলোক থেকে অতি বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জানি। কিন্তু সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের সন্ধান আমার জানা নেই।'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যথাস্থানে পৌঁছুতে আমার কতোদিন লাগবে, তা আমি জানি না। অতএব যতো শীঘ্র সম্ভব, আমি যাত্রা করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে বিদায় দিন।' এই বলে তিনি নতজানু হয়ে পিতার পদযুগল স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালেন।

পুরুষোত্তমের অন্তর বিচলিত হলো। তিনি তাঁর ঔরসজাত সেই অত্যুজ্জ্বল রূপবান বংশধরের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন, সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ, কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অস্থি গলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণপুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে, ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম স্ফীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ অসহায়। কৃষ্ণ বললেন, 'এই দূর পথের যাত্রায় তুমি কী কী গ্রহণযোগ্য মনে করো।'

শাম্ব বললেন, 'কিছুই না। আমি অভিশপ্ত, মুক্তির সন্ধান ছাড়া কিছুই আমার গ্রহণীয় না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এত দূরবর্তী পথ তুমি অশ্বচালিত রথ অথবা অশ্বারোহণ ব্যতিরেকে কেমন করে যাবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়াও পথ চলতে আরো নানা রকমের প্রয়োজন থাকে।'

শাম্ব বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'এখন আর আমার সে-সবে কোনো প্রয়োজন নেই। কবচ কুণ্ডল অঙ্গুরীয়াদি সবই আমি খুলে রেখেছি। সর্বাঙ্গে জড়াবার বস্ত্র আমার আছে। এমন কি পাদুকাও আমি ত্যাগ করেছি, কারণ পাদুকা পায়ে চলতে পারি না। আমার এই বিকট মূর্তি নিয়ে এখন রথারোহণ, গ্রাম-জনপদে বিস্ময় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করবে। অশ্বারোহণে গেলে, লোকে আমাকে নানা প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে। এখন আমাকে ওসবে খুবই বেমানান লাগবে। সপারিষদ অথবা সৈন্যসামন্তসহ আমি যেতে পারি না। আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাধিগ্রস্ত হৃতদরিদ্র লোকেরা যেমন অন্যান্যদের সাহায্যে বা কৃপায় গ্রামজনপদে গমনাগমন করে থাকে, আমাকেও সেইভাবেই যেতে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা? ভাববেন না। গাছে ও মাটিতে ফলমূলের অভাব হবে না। তৃষ্ণার জলও নদনদী জলাশয় প্রস্রবণ থেকে সংগ্রহ করতে পারবো। আপনি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবেন না।' শাম্ব পিতার সামনে আর উচ্চারণ করবেন না: তিনি একজন অভিশপ্ত মানুষ। পূর্ব জীবনের সঙ্গে এখন তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি আর এখন যদুবংশের রূপবান কুমার নেই। গ্রামজনপদের ভিক্ষান্নে তিনি দিন যাপন করতে পারবেন।

কৃষ্ণ নিজেও যে সে-কথা বোঝেন না, এমন নয়। তবু আত্মজর কথা শুনে, কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তার পরে বললেন, 'তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

শাম্বর চোখের সামনে মাতৃমূর্তি জাম্ববতী ভেসে উঠলেন। পুত্র দর্শনে তাঁর খুশী মুখের আকস্মিক আহত আঘাতপ্রাপ্ত অভিব্যক্তি যেন শাম্ব দেখতে পেলেন। বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকেই অনুমতি নিয়ে যাত্রা করছি। মাতৃগণকে আপনিই সমস্ত বৃত্তান্ত বলবেন, আমার প্রণাম জানাবেন। আপনি আমাকে যাত্রার অনুমতি দিন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এসো। তোমার যাত্রা সফল হোক।'

শাম্ব আর একবার পিতার পদধূলি নিয়ে যাত্রা করলেন। লক্ষ্মণার কথা কি তাঁর মনে পড়ছে না? তাঁর নিজের অন্তঃপুর, বিলাস সামগ্রীতে সাজানো গৃহের সৌন্দর্য, রমণীরত্নাদি, যাদের সঙ্গে নানা ক্রীড়া কৌতুকে, ভোগে বিলাসে দিনগুলো কেটে যেতো, সে-সব কিছুই কি তাঁর মনে পড়ছে না? কোনো মানুষের পক্ষেই সে-সব ভোলা সম্ভব না। কিন্তু অভিশাপমুক্ত না হয়ে শাম্ব আর সেখানে তাদের সামনে যাবেন না। শাম্বকে দেখলে এখন তাদের দৃষ্টি আহত, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় কুঞ্চিত হবে। চিত্তবিকার ঘটবে। লক্ষ্মণারও কি একই অবস্থা হবে না?

শাম্ব কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে দ্রুত নগরীর পথে বেরিয়ে পড়লেন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নগরীর পথে পথে নগরবাসীরা চলাচল করছে। যদুবংশের বালক এবং কুমারগণ অশ্বারোহণে নানা দিকে ভ্রমণ করছে। নগররক্ষীদের এই শান্তির সময়ে তেমন ব্যস্ততা নেই। নানা শ্রেণীর শ্রমজীবী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও, পথিমধ্যে শুণ্ডিনীর ভাণ্ডারের সামনে মক্ষিকার ন্যায় জড়ো হয়েছে। সকলের দৃষ্টি যে কেবল শুণ্ডিনীর পৈষ্টী ও মাধ্বীপূর্ণ পাত্রের দিকে, এমন বলা যায় না। রসিকা যুবতী শুণ্ডিনীর প্রতিও অনেকের লক্ষ্য। তার অবিশ্যি কেউ পর না, সবাই আপন। সে সবাইকেই তার হাসির দ্বারা আপ্যায়ন করছে, সবাইকেই দৃষ্টির ঝলক হানছে, এবং সবাইকেই তার সুঠাম অঙ্গের নানা ভঙ্গি দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে, তার তৈরি সুরাপানে সকলেই কেমন উল্লাস বোধ করে থাকে।

শাম্ব নগরীর প্রাসাদসমূহের অলিন্দে ও গবাক্ষে রমণীদের কারোকে অলস-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। যদুবংশের কুমারগণকে কেউ কেউ কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করছে এবং একে অপরকে অঙ্গুলিদ্বারা বিশেষ কারোকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করছে। শাম্বকে তারা কেউ চিনতে পারছে না। একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তাকিয়ে, কেউ তার দৃষ্টিকে অকারণ বিঘ্নিত করতে চায় না।

শাম্ব অকারণ অতীতের কথা ভেবে, মনস্তাপ ভোগ করতে চান না। কারণ সে-মনস্তাপের কোনো মূল্য নেই। তিনি দ্বারকার নানা পথ দিয়ে, পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন। যদিও আগের মতো স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলতে তিনি আর সক্ষম নন। তাঁর সর্বাঙ্গের বহিরঙ্গ এখন প্রায় সম্পূর্ণ অসাড়। হাত ও পায়ের গ্রন্থিসমূহে রক্তাভ ক্ষত ও স্ফীতির জন্য পদক্ষেপ সহজ নেই। সহসা দ্রুতগতি অশ্বচালিত রথ অথবা কোনো অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ছুটে এলে, তিনি অনায়াসে পথের পাশে ছিটকে চলে যেতে পারেন না। স্বভাবতই রথারোহী ও অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণ বিরক্ত হন। এই নগরীর পথও সর্বত্র মোটেই সমতল না। সমুদ্রমধ্যে পার্বত্যদ্বীপ বিশিষ্ট এই ভূমির অধিকাংশ রাজপথই চড়াই উৎরাইয়ে বন্ধুর।

শাম্ব মনে মনে পুণ্যভূমি মিত্রবনের কল্পনা করতে করতে, ব্যাধির দুঃখ কষ্ট ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত করে তিনি নগরীর পূর্ব দ্বারে পৌঁছুলেন। এই সময়ে যদুবংশের কুল-রমণীগণ সর্বালঙ্কার শোভিতা হয়ে সহচরীদের সঙ্গে কোনো পূজা সাঙ্গ করে ফিরছিলেন। উপবাসক্লিষ্ট হলেও পূজাশেষে তাঁদের মন প্রফুল্ল ছিল। তাঁরা দরিদ্র ও প্রার্থীদের পথে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে করতে যাচ্ছিলেন। শাম্বও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি হাত না পেতে পারলেন না। পূজারিণীরা তাঁকে বিমুখ করলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতে সকলেই আকুঞ্চিত মুখে শিহরিত হচ্ছিলেন। স্পর্শের আশংকায় দূর থেকে মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করছিলেন।

শাম্ব দুঃখ ও মনস্তাপ থেকে নিজেকে নির্বিকার রাখলেন। মনে মনে কেবল উচ্চারণ করলেন, "আমি অভিশপ্ত।" তিনি পূজারিণীদের আচরণে কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। এরকম না ঘটলেই তিনি বরং অবাক হতেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা, জবাব পাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টি ও মন এই সব রমণীদের তুলনায় উদার ছিল না। অতীতে সুস্থাবস্থায় কুষ্ঠরোগীর বীভৎস চেহারা দেখে, তাঁর মনেও বিকার ঘটতো, দৃষ্টি আহত ঘৃণায় শিহরিত হতো এবং সংস্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন।

শাম্ব ফল ও মিষ্টান্ন খেয়ে, পথের ধারে জলাশয়ে সকলের কাছ থেকে দূরে জলপান করলেন। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকায় আরোহণ করে, মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুলেন। অবিশ্যি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকায়ও তাঁকে যাত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হলো। স্বভাবতই তাঁর মতো একজন ব্যাধিগ্রস্তের কাছ থেকে খেয়া-পারানি অর্থ কেউ দাবি করে নি।

মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুতে অপরাহ্ণ হয়ে গেল। যাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে যে-যার পথে চলে গেল। শাম্ব সমুদ্রের তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। কোন্ সীমানা থেকে পূর্ব-উত্তরে গমন করতে হবে, মহর্ষি নারদ স্থির করে তা বলে দেন নি। অধিক উত্তরে সিন্ধুদেশ কুবলয়াশ্ব বংশধরদের রাজত্ব। ভূমিকম্পপ্রবণ সেই দেশে ঋষি উতংকের আশ্রম ছিল। শাম্ব অনুমান করলেন, সমুদ্রতীর ধরে ততোধিক উত্তরে তাঁকে যেতে হবে না।

আকাশ ক্রমে রক্তাভ হলো, এবং অতি দ্রুত সেই রক্তাভায় কৃষ্ণছায়া ছড়িয়ে পড়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে লাগলো। বহু দূর দিগন্ত পর্যন্ত বালুকারাশি এখনো তপ্ত। শাম্বর অশক্ত পদযুগল প্রতি পদক্ষেপেই সেই তপ্ত বালুতে ডুবে যাচ্ছে। গতি হয়ে উঠছে মন্থরতর। সমুদ্র সর্বদাই গর্জমান, বহু দূর পর্যন্ত তরঙ্গরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে, আবার বেগে নেমে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে নামতেই সমুদ্রের বুক থেকে অতিবেগে বায়ু উত্থিত হলো। সমুদ্রের গর্জনের প্রচণ্ডতার সঙ্গে বালুকারাশি উড়তে লাগলো। চোখ খুলে রাখা দায় হলো। সারা গায়ে অজস্র তীক্ষ্ণমুখ সুঁচের মতো বালুকা বৃষ্টি হতে লাগলো। নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে, বালুকণা গলনালী ও মুখের মধ্যে ঢুকে গেল।

শাম্ব দেখলেন, পাহাড়ের মতো বালুকারাশি ও সমুদ্রতীরে তিনি একলা। এতক্ষণ যাত্রীবা যারা তাঁর কাছাকাছি চলছিল, তারা ভিন্ন পথে নিকটবর্তী কোনো গ্রামে চলে গিয়েছে। তিনি দেখলেন, এক শ্রেণীর অনতিদীর্ঘ সাপ অনায়াসেই বালুরাশি ঠেলে চলে যাচ্ছে। তিনি জানেন, এই সাপ অতি বিষাক্ত, কিন্তু সর্বদাই উদ্যত আক্রমণশীল না। শাম্ব এই প্রথম অনুভব করলেন, তিনি নিরস্ত্র। কোনো মানুষ বা শ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, তিনি কিছুই করতে পারবেন না। একমাত্র আশা, মানুষ তাঁকে কিছু করবে না। তাঁর কাছে এমন কিছুই নেই, যা দস্যু বা তস্করেরা লুণ্ঠন করতে পারে। কিন্তু কোনো শ্বাপদ সরীসৃপ তাঁকে শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করলে তিনি নিরুপায়।

বাতাস যেন হাজার বেগবান অশ্বচালিত হয়ে ছুটে আসছে, বিশাল বালু-বেলায় দাপাদাপি করছে। অথচ আকাশে মেঘ নেই। সূর্যাস্তের পরেই নক্ষত্র রাজি ঝিকিমিকি করে উঠেছে। এই বাতাসের বেগ দেখলে, মনে হয় পৃথিবীও যেন অতিবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। বালুকারাশির স্তূপ আশ্চর্য শব্দে ফেটে যাচ্ছে, এবং সেই ফাটলের গহ্বর দিয়ে, বাতাস সাপের মতো এঁকে-বেঁকে, সাঁ সোঁ শব্দে ছুটে চলেছে। অন্ধকারে সমুদ্রের তরঙ্গে তীক্ষ্ণ ধারালো

ঝকঝকে দাঁতের হাসি খলখলিয়ে বাজছে।

'হে অভিশপ্ত, কোনো দিকে দৃক্‌পাত করো না।' শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, এবং চলতে লাগলেন। সমুদ্র, বায়ুর তাণ্ডব, কোনো কিছুই তাঁর অধীন না। অতএব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অনিবার্য জেনে, নিজের কর্ম করাই শ্রেয়। এই সময়েই, পূর্ব দিগন্তে এক ফালি তাম্রাভ চাঁদ দেখা গেল। আর শাম্ব মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। গন্ধ পাওয়ামাত্র তিনি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সমুদ্রতীরের চারদিকে লক্ষ করলেন। এবং যা আশা করেছিলেন, তা দেখতে পেলেন। তাম্রাভ চাঁদের ম্লান আলোয়, দীর্ঘ ঋজু ঝাড়ালো কতগুলো গাছ, খানিকটা অঞ্চল জুড়ে নারকেল বীথির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্র থেকে কিছুটা পুবে, সেই গাছপালাব মধ্যে, কতিপয় কুটিবেব অবয়ব ও দু-একটি আলোর বিন্দু দেখতে পেলেন। মাছের আঁশটে গন্ধের ইঙ্গিতে তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন, কাছেপিঠেই কোথাও নিশ্চয় ধীবরপল্লী আছে। শাম্ব স্বস্তি বোধ করলেন। এই মহাসমুদ্রের ঝটিকাপ্রবাহিত বিশাল বালুবেলায় তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করছিলেন। তাঁর অন্তরে কোনো ভয় উৎপাদিত হয় নি। অভিশপ্ত মানুষ তার অভিশাপের বোঝা একাই বহন করে। শাপমোচনের প্রয়াসে একাই সংগ্রাম করে। তবু জগত সংসারে তাঁর পরিচয়, তিনি মানুষ। মানব জীবধর্মের এই নিয়ম, সংসারের বাইরে একাকী থেকেও সংসারের সীমান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

শাম্ব ধীবরপল্লীর সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় গাছপালা যেন আভূমি নত হয়ে পড়ছে। কুটিবগুলো কাঁপছে। কিন্তু ধীবর-পল্লীর কেউ ভয়ে ভীত না। শিশুরা কুটিরের ভিতরে ঘুমোচ্ছে। রমণী এবং পুরুষরা এখনো ঘরকন্না, জাল সেলাই, গোটানো এবং নানা ক্রীড়া-কৌতুক করছে। ঝড়ো বাতাসকে আড়াল করে কোনো কোনো ধীবর রমণী রান্না করছে। কিন্তু শাম্ব পল্লী মধ্যে প্রবেশ করতেই, তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটলো, শান্তি বিনষ্ট হলো। তার সেই অতি বিকট মূর্তি দেখে, অনেকেই ভয়ে ও অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো। রমণীরা কুটিরে ঘুমন্ত সন্তানদের আড়াল করার জন্য দরজায় দাঁড়ালো। গৃহপালিত কুকুরেরা শাম্বকে দূর থেকে চারদিকে ঘিরে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিল।

কুকুরের চিৎকার, ঝড়ে গাছপালার সোঁ সোঁ এবং সমুদ্রের গর্জন, সব মিলিয়ে, একটা তাণ্ডবের মাঝখানে যেন ভূতসহ নরনারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিঙ্গল আবছা জ্যোৎস্নায়, গাছপালা নরনারীদের ছায়াগুলো কিভূত দেখাচ্ছে।

শাম্ব সহজেই অনুমান করতে পারেন, তাঁকে কী রকম দেখাচ্ছে। তিনি ঝড়ের এবং কুকুরের চিৎকার ছাপিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'ভাই বন্ধুগণ, আমি সমুদ্র থেকে উত্থিত কোনো জলচর প্রাণী নই। আমি মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। ব্যাধিই আমাকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করেছে। তোমাদের নারী পুরুষ সবাইকেই বলছি, আমাকে ভয় পেও না। আমার দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।'

শাম্ব দেখলেন, তাঁর কথায় কাজ হলো। ধীবর রমণী পুরুষদের চোখ মুখের ভীতির ভাব অনেকটা অপসারিত হলো। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো এবং বারে বারে শাম্বর দিকে দেখলো। একজন পুরুষ তাদের নিজেদের লোককে সম্বোধন করে বললো, 'আসলে আমি এই প্রাণীটিকে কোনো নরখাদক রাক্ষস ভেবেছিলাম। কিন্তু এর কথা আমাদের থেকেও ভালো। যেন কোনো উচ্চবংশজাত ব্যক্তির ন্যায় শালীনতাপূর্ণ। রাজরাজড়া বা ঋষিগণ যেভাবে কথা বলেন, এর কথাবার্তা সেই রকম।'

একজন রমণী সন্দিগ্ধ ভয়ে বললো, 'কিন্তু নরখাদক রাক্ষসেরা অনেক রকম মায়া জানে। কে বলতে পারে এর এরকম কথা মায়া ছাড়া কিছুই না?'

শাম্ব নিজেই রমণীর কথার জবাব দিলেন, 'তুমি যথার্থ বলেছো, কিন্তু রাক্ষসদের আচার আচরণ বিভিন্ন রূপ হয়। তারা হুংকার ছাড়ে, আবির্ভূত হয়েই তাণ্ডব করে, বাক্যবিনিময়ের কোনো চেষ্টাই করে না। দ্বারকা এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। এ অঞ্চলে যদি কোনো রাক্ষসের বাস থাকতো, তা হলে বাসুদেব অথবা যদুবংশের কোনো বীর নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করতেন, তোমাদের জীবনকে নিরাপদ করতেন। আমি একজন নিতান্ত হতভাগ্য, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ।'

শাম্বর কথা শুনে, সকলেই যেন অনেকখানি আশ্বস্ত এবং সহজ হলো। কয়েক জন কুকুরগুলোকে হাত তুলে প্রহারের ভঙ্গিতে তাড়া করে দূরে সরিয়ে দিল। একজন বর্ষীয়ান রৌদ্রদগ্ধ তাম্রবর্ণ দীর্ঘদেহী পুরুষ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি এখন দ্বারকা থেকে আসছি। পূর্বোত্তরের চন্দ্রভাগা নদীর ধারে মিত্রবনে আমি যাবো।'

শাম্ব ভাবলেন, তাঁর পরিচয় দেওয়া বৃথা। তা অবিশ্বাস্য শোনাবে, তেমনি এদের কাছে তাঁর অভিশাপের বিষয় বলাও নিরর্থক। তিনি আবার বললেন, 'আমি আজ সারা দিনই চলছি। সহসা বাতাস ওঠায়, বালুর ঝড়ে, আমি

অত্যন্ত ক্লান্ত আর পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছি। যেখানে আমাকে যেতে হবে, সেই পথ আমার জানা নেই। দিক ঠিক না করে; রাত্রের অন্ধকারে আমি চলতে পারছি না। শুকনো মাছের গন্ধে টের পেলাম, এখানে নিশ্চয়ই কোনো বসতি আছে।'

শাম্বর কথাবার্তার উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে সকলেই সহজ হয়ে গেল। তাদের অবিশ্বাস ভয় সন্দেহ দূর হলো। সেই ধীবর পুরুষটি বললে, 'কিন্তু চন্দ্রভাগা নদীই বা কোথায়, মিত্রবনই বা কোথায়?'

শাম্ব বললেন, 'শুনেছি, সিন্ধুনদের থেকে উৎপন্ন একটি বেগবতী শাখার নাম চন্দ্রভাগা। তারই তীরে কোথাও মিত্রবন আছে। সবই আমাকে খুঁজে নিতে হবে।' এই পর্যন্ত বলে শাম্ব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'আমি আজ তোমাদের পল্লীর উপান্তে কোথাও রাত্রিটা শুয়ে কাটিয়ে দেবো। এখন এই সমুদ্রকূলের অন্ধকারে কোথাও মিষ্ট জলের সন্ধান করা আমার পক্ষে দুরূহ। আমি তোমাদের কাছে কয়েক গণ্ডুষ পানীয় জল আর কয়েক গ্রাস খাদ্যের প্রত্যাশী।'

ইতোমধ্যে ধীবর রমণী পুরুষরা শাম্বকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, তিনি যেরকম কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ দেখতে, তাঁর কথাবার্তা মোটেই সেরকম না। তাঁর কথা শুনলে, ধীমান ও শ্রীমান মনে হয়।

বর্ষীয়ান ধীবরটি বললো, 'তুমি খাদ্য পানীয় সবই পাবে। তুমি এখন বস। আমরা প্রথমে ভয় পেলেও, এখন আর তা নেই।'

শাম্ব নিশ্চিন্ত হয়ে একটি নারিকেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন।

শাম্ব ক্রমাগত এইভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগলেন। উত্তর সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরে গমন করছেন। একটা নদী অতিক্রম করতে গিয়ে, এক ঋষিতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শাম্ব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, চন্দ্রভাগা নদীতীরে মিত্রবন কোথায়, তাঁর জানা আছে কী না।

সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বস্তুতপক্ষে একজন তপস্বীই ছিলেন। তিনি শাম্বকে বলেছিলেন, 'এই নদী অতিক্রম করা তোমার ঠিক হয়নি। আমি শুনেছি, মিত্রবন নামে এক সূর্যক্ষেত্র পঞ্চনদীর দেশে আছে। আরো শুনেছি, অন্তরীক্ষের পাদদেশে কোথাও সেই স্থান বর্তমান। তোমার ন্যায় চর্মরোগীরা সেখানে যায়

আরোগ্যলাভের জন্য। বস্তুতপক্ষে সেখানে কী আছে, কেমনভাবেই বা চর্ম-রোগীরা আরোগ্যলাভ করে, আমার কিছুই জানা নেই। তবে আমার মনে হয়, তোমাকে সেই পঞ্চনদীর দেশেই যেতে হবে। তুমি নদী পার না হয়ে, ফিরে যাও।'

তপস্বীর মুখে চর্মরোগের কথা শুনে, শাম্বর মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না, তাঁর গন্তব্য মিত্রবনের কথাই তিনি বলেছেন। শাম্ব অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তপস্বীকে প্রণাম করেছিলেন। তপস্বী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

শাম্ব বহু নদনদী অতিক্রম করে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পূর্বোত্তর বরাবর চলেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তিনি সহনীয় করে তুলে-ছিলেন। ক্রমেই অশক্ত হয়ে পড়া শরীরকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অরণ্যমধ্যে শ্বাপদকে ভয় করেন নি। কিন্তু গ্রাম ও জনপদের সর্বত্র প্রায়ই তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। বয়স্ক নরনারীরা যতোখানি ঘৃণা প্রদর্শন করে ততোখানি বিতাড়নের দ্বারা নিগ্রহ করে না। কিন্তু গ্রাম জনপদের বালকগণ, সারমেয়কুল সর্বত্র একই রকম। বালকেরা তাঁর গতিভঙ্গির বিকৃতিকেই কেবল অনুকরণ করে নি, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে তাড়া করেছে। তাদের সঙ্গে সারমেয়কুলও এক মুহূর্ত স্থির হতে দেয় নি।

শাম্ব অতি দুঃখের সময়ে কেবল মনে মনে উচ্চারণ করেছেন, 'তুমি অভিশপ্ত। শাপমোচনেই তোমার জীবনের মোক্ষলাভ। ভাগ্য অমোঘ। তাকে মেনে নিয়েই, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের সন্ধান করতে হয়। আমার কেন এমন দুর্ভাগ্য হলো, অপরের কেন হলো না, এইরূপ প্রশ্ন বাতুলতামাত্র। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অপরের তুলনা করে, আত্মাকে ক্ষুব্ধ করা এবং কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। নিজের কষ্টের জন্য কারোকে দোষারোপ করাও অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু না। কেন জরা আছে, ব্যাধি আছে, মৃত্যু ঘটে, এই সব নিয়ে মানুষ বিলাপ করে, শোকাকুল হয়। অথচ এসবের আক্রমণ থেকে কারোরই রেহাই নেই। বলবীর্যের দ্বারা শত্রু নিধন মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিস্থাপন যেমন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তেমনি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য, তাকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।'

শাম্ব গ্রামে জনপদে যখনই নিগৃহীত লাঞ্ছিত হয়েছেন, তখনই সহ্য করবার শক্তি সংগ্রহ করেছেন। কখনো কখনো তাঁর চোখ ফেটে জল এসেছে, কিন্তু কদাপি ক্রুদ্ধ হন নি। প্রতি-আক্রমণ কিংবা উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেন নি।

সুখ এবং দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে, সর্বদাই নির্বিকার থেকেছেন। অতীতের কথা বা বর্তমানের কথা ভাবেন নি। শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছেন। গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে চলেছেন, এবং মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষের মূর্তিই কেবল কল্পনা করেছেন।

এইভাবে সাতটি ঋতু অতিক্রমের পরে, তিনি এক আসন্ন সন্ধ্যায় চন্দ্রভাগা তীরে পৌঁছুলেন। নৌকায় যারা নদী পারাপার করছিল, তারা কেউ কেউ নদীটিকে মহানদী বলেও উল্লেখ করছিল। শাম্ব দেখলেন, অতি বেগে পূর্ব-দক্ষিণগামিনী নদীটির বুকে রক্তাভ শার্ঙ্গাস্ত্রের মতো বঙ্কিম স্রোত ঝকঝক করছে এবং শৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এক-একটি তীক্ষ্ণ রেখা ছুটে চলে যাচ্ছে। নদীর তীর বালুকারাশি পূর্ণ না, বরং সবুজ ঘাসে শক্ত মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ঋজু বিশাল মহীরুহসমূহ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। যেন নদীকূলে এসে ক্লান্ত পথিকদের আশ্রয়দানের জন্য, আকাশবিদ্ধ বনস্পতিরাজিসমূহ দাঁড়িয়ে আছে। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তাভা যেমন নদীর বুকে, তেমনি বনস্পতির শীর্ষে। কাছেপিঠে ঘন বসতি চোখে পড়ে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কুটির। নদী থেকে তীরভূমি বেশ উচ্চে। তথাপি, সম্ভবত বর্ষায় এ নদীতে বন্যা হয়, সেই জন্যই তীরে কোনো লোকালয় নেই। অথচ কর্ষিত ক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয়েছে।

শাম্ব এই নদী দর্শন মাত্র, তাঁর অন্তরে গভীর আনন্দের সঞ্চার হলো। নদীর এপারে ওপারে গমনাগমনকারী প্রতিটি পুরুষকেই তিনি, মনের সামান্যতম সন্দেহও মোচনের জন্য বারে বারে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'সিন্ধু-নদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?'

অনেকের কাছ থেকেই তিনি জবাব পেলেন না। অধিকাংশ লোকই তাঁকে এড়িয়ে গেল, যেন তাঁর প্রশ্নের অর্থ বুঝতেই পারে নি। আসলে তাদের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা গোপন থাকছিল না। কেউ কেউ জবাব দিল, 'কোথা থেকে উৎপন্ন, সেসব জানি না। এই নদীর নাম চন্দ্রভাগা।'

চন্দ্রভাগা! শাম্ব যেন বারে বারেই নামটি শুনতে চাইছিলেন। কিন্তু মিত্রবন কোথায়? নদীর এপারে না ওপারে? এইটিই পঞ্চনদীর দেশ তো? সন্ধ্যার ছায়া যতো ঘন হতে লাগলো, খেয়া যাত্রীদের সংখ্যাও দ্রুত স্বল্প হয়ে উঠলো। শাম্ব শেষ পর্যন্ত মাঝির শরণাপন্ন হলেন। স্থানীয় অধিবাসী পুরুষ ও স্বল্পসংখ্যক রমণীদের সকলেরই দেহের গঠন দীর্ঘ। আপাতদৃষ্টিতে তাদের চোখে মুখে রুক্ষতা থাকলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় সকলেই বেশ

রসিক ও আমুদে। অপরূপ নদীতীরে সুবিমল বাতাসে, তাদের সুখী দেখাচ্ছিল এবং প্রায়ই প্রাণের স্ফূর্তিতে গান গেয়ে উঠছিল। তাদের গানের ভাষা অনেকটা পৈষ্টীপাত্রের গায়ে লেগে থাকা মক্ষিকার মতো, অশ্লীল ও ইতরতাপূর্ণ, কিন্তু নির্দোষ মনে হচ্ছিল। কারণ তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে কিছু বলছিল না, নিজেদের কামোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করছিল, এবং গান শুনে সকলেই হৈ হৈ করে হেসে উঠছিল।

শাম্বকে দেখেই মাঝির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠায়, দাড়ি কুঁকড়ে উঠলো। বললো, 'ওহে, তোমাকে আমি শেষ খেয়ায় পার করবো, এখন নিতে পারবো না।'

শাম্ব বললেন, 'ভাই, সেটা তোমার করুণা। আগে বা শেষে, যখনই তুমি আমাকে পার করো, পার হতে পারলেই আমি সার্থক জ্ঞান করবো।'

শাম্বর বিনীত বাক্যে মাঝি যেন একটু অবাক হলো। আসলে শাম্বর ভাষায় বিন্দুমাত্র অর্বাচীনতার স্পর্শ নেই। ধীমান ও জ্ঞানীর মতো তাঁর কথা শুনে, আরো কয়েকজন যাত্রী তাঁর দিকে তাকালো। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সকলের মুখে বিমুখতা ফুটে ওঠে। শাম্ব আবার বললেন, 'এ দেশে আমি কখনো আসি নি। এই নদীর তীরে মিত্রবন নামক স্থানে আমি যেতে চাই। আমি শুনেছি, সে-স্থানকে সূর্যক্ষেত্র বলা হয়। সে-স্থান কি নদীর পরপারে?'

মাঝি চমৎকৃত হয়ে বললো, 'পরপারে বটে, কিন্তু এ ঘাটে পার হয়ে তোমাকে নদীর উত্তরদিকে সারা দিনের পথ যেতে হবে। তার চেয়ে রাত্রিটা তুমি এপারেই অতিবাহিত করে, নদীর উজানে তীর ধরে চারটি অতিকায় বাঁক পাবে। ভোরে রওনা হলে সন্ধ্যাকালের মধ্যে তুমি সেখানে পৌঁছুতে পারবে, আর সেখানেই খেয়া পার হবে।'

শাম্ব কৃতার্থ হয়ে বললেন, 'ভাই, পঞ্চনদীর দেশের মাঝি, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

মাঝি শাম্বর কথায় খুবই প্রসন্ন হলো, এবং তার চোখে মুখে করুণার অভিব্যক্তিও ফুটলো। সে বললো, 'এ পারে কোনো গ্রাম নেই ওপারে গেলে ঘাটের অদূরেই তুমি একটি গ্রাম পাবে। আমার মনে হয়, এপারে রাত্রে থাকা তোমার ঠিক হবে না। গভীর রাত্রে এপারে যক্ষগণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, নানা রকম গান বাজনা করে। সে এক রকমের ইন্দ্রজালের মায়া। সেই মায়ায় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, হিংস্র জন্তু তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তারা মানুষের রোগ ব্যাধি মানে না। তুমি অপেক্ষা কর, শেষ খেয়ায় আমি তোমাকে ওপারে

নিয়ে যাবো।'

শাম্ব কৃতজ্ঞতায় কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। মাঝির কথায় তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো। নৌকা ছেড়ে যাবার পরে, শাম্ব সাবধানে নদীর জলে অবতরণ করলেন। অবগাহন স্নানে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নদীতীরের এক স্থানে এসে তিনি উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ছোট ছোট টিলার গায়ে একটি কিংবা দুটি মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে পারে, এমনি ধরনের মানুষের তৈরি কতকগুলো গুহা। তার আশেপাশে, ঝোপঝাড়ের মুণ্ডসকল লতাগুল্মের দ্বারা শক্ত করে বেঁধে, একটি প্রবেশমুখ রেখে, এক ধরনের কুটির তৈরি করা হয়েছে, যার ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই, এবং ভিতরে নিশ্চয়ই মাথা সোজা করে বসাও যায় না। আশেপাশে কয়েক জায়গায় কাঠের আগুন জ্বলছে। তারই লেলিহান শিখার আলোয়, শাম্ব সেই সব গুহা ও কুটিরের সামনে কিছু মানুষকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখলেন। পুরুষ এবং রমণীর কণ্ঠস্বরও তাঁর কানে এলো।

শাম্ব মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন, এরা কারা? কোনো যাযাবর জাতির গোষ্ঠীভুক্ত, অথবা অরণ্যবাসী কিরাতগণ? ভাবতে ভাবতে তিনি সেই সব গুহা ও কুটিরের সামনে এগিয়ে গেলেন। কাঠের আগুনের আলোয় তাঁর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কয়েকজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। শাম্বর বুকে যেন বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। দেখলেন, তাঁর সামনে যে-কজন এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সকলেই তাঁর মতো কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। শাম্ব এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, কয়েকজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রমণীও সামনে এসে দাঁড়ালো। যাদের দু-একজনের কোলে শিশু! আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগ-গ্রস্ত না।

শাম্ব মুহূর্তেই অনুমান করতে পারলেন, এ অঞ্চলই মিত্রবন। যে-কথা তিনি মহর্ষি নারদের কাছে শুনেছিলেন, এরাও নিশ্চয় সেরকম ভাবেই কারো কাছ থেকে শুনে, এখানে আরোগ্যলাভের জন্য এসেছে। তিনি সন্দেহ মোচনের জন্য প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'এই স্থানের নাম কি মিত্রবন?'

একজন পুরুষ জবাব দিল, 'তাই তো শুনেছি।'

শাম্বর মনে পড়লো, মহর্ষি নারদের সূর্যক্ষেত্রের সেই বিস্ময়কর বর্ণনা,

যেখানে গ্রহরাজ সূর্যকে ঘিরে অষ্টাদশ দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ অপ্সরাগণ, দণ্ডনায়ক ও দিণ্ডি দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই সূর্যক্ষেত্র কোথায়, যেখানে গ্রহরাজ পরমাত্মন্ অবস্থান করছেন?'

শাম্বর কথা শুনে, সবাই হেসে উঠলো। কেউ বললো, 'এর কথাবার্তা বেশ রাজপুরুষদের মতন চৌকস।'

কেউ বললো, 'ঋষির মতনও বলা যায়।'

শাম্ব অবাক হয়ে শুনলেন, এদের কথাবার্তা রীতিমতো অর্বাচীন, ইতর শব্দে ভরা। এদের কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই এমনভাবে গ্রহরাজের কথা শুনে হাস্যপরিহাস করছে, যেন তারা ব্যাধিগ্রস্ত নয়। একজন এগিয়ে এসে বললো, 'তোমার মতন আমরাও অনেক কথা শুনে এখানে এসেছি। কিন্তু ওই যে সব গ্রহরাজ-টাজ কী সব বলছো, ওসব আমরা কিছুই দেখি নি। তবে মান্ধাতা আমলের একটা মন্দির আছে। ওটাকেই সবাই সূর্যক্ষেত্র বলে।'

শাম্বর অন্তর এক রকমের অশান্তি ও অস্বস্তিতে ভরে উঠলো, জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মন্দিরে কোন্ দেবতার বিগ্রহ আছে?'

সবাই আবার পরিহাস করে হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'সেটা মন্দিরই কী না, আমরা জানি না। মাথার ওপরে ছাতা, আর রাজার মতন জুতো জামা পরা একটা মূর্তি আছে। ও-ই নাকি সূর্যমূর্তি। আমরা রোজ তাকে একবার করে গড় করি।'

অনেকে প্রতিধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ, আমরা চন্দ্রভাগার জলে রোজ চান করে, সেই মূর্তিকে একবার গড করি। তার আশেপাশে আরো অনেক মূর্তি আছে, ওরাও নাকি সবাই দেবতা। এদেরও গড করি।'

একজন পুরুষ বললো, 'অপ্সরা মূর্তি বেশ সুন্দর, আমি রোজ তার গায়ে গা ঘষি।'

আর একজন বললো, 'আমরা রোজ সকালে চন্দ্রভাগায় নেয়ে, মন্দিরে গড় করে ভিক্ষে করতে বেরোই। আর এ সময়ে এসে ভিক্ষার অন্ন ফুটিয়ে খাই।'

অন্য একজন বললো, 'আমরা সংসারও করি। এই সব মেয়েছেলেরা প্রতি বছরই পোয়াতি হয়, আর বাচ্চা বিয়োয়।'

ভগ্নকেশ, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ, পুচ্ছহীন রক্তচক্ষু রমণীরা সবাই হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'আমাদের বাচ্চাগুলো প্রথমে খুব ফুটফুটে হয়ে জন্মায়। চার পাঁচ বছর বয়স হলেই ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মতন হয়ে যায়।'

একটি রমণী তার বুকের ফুটফুটে শিশুটিকে দেখিয়ে বললো, 'এই ছাখো,

এখন কেমন সুন্দর দেখতে। ও আমার পেটেই জন্মেছে। ওর বাবারও কুষ্ঠ ছিল, কুদিন হলো মরে গেছে। আমার ছেলে যখন একটু বড় হবে, তখন ওরও কুষ্ঠ হবে। কিন্তু সে সব নিয়ে আমি ভাবি না। রাত হলেই পুরুষের সঙ্গে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তুমি নতুন এসেছো, এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন করলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন থেকে তুমিই ওর সঙ্গে থাকবে। মেয়েদের মধ্যে ও এখন সব থেকে বয়সে ছোট। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আগে বেশ সুপুরুষ ছিলে।'

পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে, শিশু কোলে রমণীটি শাম্বর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো।

একজন চিৎকার করে বললো, 'এখানে সবাই রোগ সারাতে আসে, কিন্তু এমন কোনো দিব্য ব্যাপার নেই যে, রোগ সারে। চামড়া ভেদ করে আমাদের হাড়ে ঢুকো গজিয়ে যায়, আর আমরা মরে যাই।' আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকে, তার আগের জন্মিত ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে যায়, আর তোমার মতন নতুন নতুন লোক এখানে রোগ সারাতে আসে।'

শাম্বর মনে হলো, কোনো মায়ার দ্বারা তিনি অবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান নেই। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কোন নরকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ স্থান কখনোই মিত্রবন হতে পারে না। এদের সকলের পরিহাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি অসহায় অবিশ্বাসই ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, নানা স্থান থেকে এরা এখানে এসেছে, সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করেছে। এদের কারো সঙ্গেই কারোর কোনো সম্পর্ক নেই। বংশ-পরম্পরা বলেও কিছু নেই। সমাজ ও সংসার থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যাধিগ্রস্ত বাহিনী, যারা আরোগ্যের আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আরোগ্যলাভ দূরের কথা, ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুকেই এরা অবধারিত জেনে কিছুদিনের জন্য যদৃচ্ছা জীবন ধারণ করে যাচ্ছে। এদের কোনো আশা নেই, অতএব, কোনো বিশ্বাসও নেই। অথচ এরা অবিশ্বাসী ছিল না। তা হলে এখানে আসতো না।

শাম্ব সহসা দেখলেন, তাঁর চার পাশে ছায়ার মতো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। একজন চিৎকার করে বললো, 'ওহে, তুমি যে একেবারে মুনি-ঋষিদের মতন দেবতায় পাওয়া লোক হয়ে গেলে! জিজ্ঞেস করছি, কোথা থেকে আসছো?'

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে, সকলের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেই শিশু-বুকে যুবতী কুষ্ঠ রোগিণীটি তাঁর গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি জবাব

দিলেন, 'কোথা থেকে এসেছি, সে কথায় আর কী কাজ? অতীতকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় নয় কী?'

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'ঠিক ঠিক! কিন্তু তোমার কথাবার্তার ধরন-ধারণাগুলো বড্ড জ্ঞানীগুণীদের মতন লাগছে। বলি, তোমার কি ক্ষুধা তেষ্টা বলে কিছু আছে? থাকলে আমরা দিতে পারি।'

শাম্ব প্রকৃতই ক্ষুধার্ত ছিলেন। সেই ভোরে, নদীতীরের নরম মৃত্তিকার জঙ্গল থেকে, কয়েকটি মূল তুলে জলে ধুয়ে চিবিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত। তোমাদের সকলের সংকুলান হলে, আমাকেও কিছু খেতে দাও।'

শাম্ব এই কথা বলা মাত্র, তাঁর পার্শ্ববর্তিনী সেই রমণী তার শিশুটিকে তাঁর বুকের ওপর প্রায় নিক্ষেপ করে বললো, 'তা হলে তুমি আমার ছেলেকে ধরো, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।'

সকলেই সমর্থন করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নীলাক্ষিই আমাদের নতুন সঙ্গীকে খেতে দিক।'

শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'নীলাক্ষি!' নাম শুনে বোঝাই যায় না, এই রমণীও একদা নীলাক্ষি ছিল। অবিশ্যি, কাকেই বা বোঝা যায়? এ চিন্তা বাতুলতা। কিন্তু শিশুটিকে নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে পড়লেন। নতুন মানুষের কোলে সে কিছুতেই থাকতে চাইছে না, চিৎকার কান্না জুড়ে হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি অসহায় চোখে, উদ্ধারের প্রত্যাশায় আশেপাশের সকলের দিকে তাকালেন। কিন্তু বৃথা। তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত পুরুষ বা রমণীগণের মধ্যে কেউ এগিয়ে এল না, হাত বাড়িয়ে দিল না। বরং তাঁকে শিশুটি নিয়ে বিব্রত ও উদ্‌ব্যস্ত হতে দেখে, সকলেই যেন বিশেষ কৌতুক বোধ করে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, 'নীলাক্ষির ছেলে নতুন বাপকে এখনো চিনতে পারছে না। ওহে ছেলের বাপ, ছেলেকে একটু আদর করছো না কেন?'

কেউ বললো, 'তোমার ঘরে কি বউ ছিল না? তোমার কি ছেলেমেয়ে ছিল না? তুমি কি গৃহস্থ ছিলে না? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন মোটেই ঘরকন্না করা জানো না। কেন হে, তুমি কি রাজ-রাজড়ার ছেলে নাকি?'

শাম্ব মনে মনে বললেন, 'আমার একটাই মাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত।' তিনি শিশুটির অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করলেন, তাঁর মনে করুণা ও স্নেহের

উদ্রেক হলো। শিশুটিকে নানা ক্রীড়া কৌতুকের ভঙ্গি করে, শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। বুকে চেপে, শূন্যে দুলিয়ে তাকে খুশি করবার বিবিধ কৌশল অবলম্বন করলেন। শিশুটি এখনো আশ্চর্য উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান এবং নিষ্পাপ। সে শাম্বর আচরণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। কান্না থামলো। জন্মাবধি সে কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের দেখে অভ্যস্ত, অতএব শাম্বর মুখের প্রতি কৌতূহল বশে তাকিয়ে সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো না। রোগাক্রান্ত কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে স্নেহ ও সোহাগ সন্ধান করে নিতে পারে। শিশুটির চোখের বর্ণ নীল। নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রভাগার রৌদ্রচকিত জলের ন্যায় উজ্জ্বল। নীলাক্ষির চোখ দুটিও কি একদা এই রকম ছিল?

শাম্ব দেখলেন, তাঁর চারপাশে পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে কিছু বালক-বালিকা রয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এরা সকলেই সুস্থ দেহে জন্মগ্রহণ করেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাধি এদের আক্রমণ করেছে। এরাও কি অভিশপ্ত? অন্যথায়, কী অপরাধ এইসব বালক-বালিকাদের, যাদের অসহায় চোখে মুখে হতাশা ও অবিশ্বাস? এদের যদি কোনো অপরাধ থেকে থাকে, তার একমাত্র কারণ, তারা এই সব পুরুষ ও রমণীদের ঔরস ও গর্ভজাত সন্তান। এ কি কোনো পূর্ব জন্মের পাপের ফল? অমোঘ ভবিতব্য?

শাম্ব নিজেও ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত। অমোঘ তার পরিণতি। তাঁর অন্তর কাতর হলো, ব্যথায় দ্রবীভূত হলো, এই সব রমণী-পুরুষ বালক-বালিকা আর শিশুদের দেখে। এদের মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? তাঁর নিজের মুক্তিরই বা কী উপায়? মহর্ষি নারদোক্ত বৃত্তান্ত তো কখনো মিথ্যা হবার না। তিনি কি প্রকৃতই মহর্ষি কথিত সেই সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনেই এসেছেন? অথচ এই স্থান, এই সব হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধি-গ্রস্তদের দেখে তা মনে হয় না।

শিশুটি আবার হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি শুরু করলো। সৌভাগ্য, নীলাক্ষি নাম্নী রমণীটি খাদ্য নিয়ে এল। শাম্বর সামনে খাদ্যের মৃত্তিকাপাত্র রেখে, ছেলেটিকে নিজের কোলে নিয়ে বললো, 'বসো, খাও।'

শিশুটি মায়ের কোল পেয়ে যেন ইন্দ্রজালের দ্বারা বশীভূত ও শান্ত হলো। শাম্ব পার্শ্ববর্তী একজন পুরুষকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হাত ধোয়া আর কুল-কুচার জন্য জল পাওয়া যাবে?'

লোকটি হৈ হৈ করে উঠলো, 'দ্যাখ দ্যাখ, এ নিজেই বলছিল, অতীতের কথায় কাজ কী? কিন্তু এ নিজেই এখনো আগের জীবনের কথা ভুলতে পারে

নি। খাবার আগে হাত ধুতে চায়, মুখ ধুতে চায়।'

আর একজন বললো, 'আমরা তো এখন হাতে কোনো সাড়ই পাই না। জল দিয়ে ধুলেও টের পাই না, আগুনে পোড়ালেও টের পাই না। ভিক্ষের অন্ন ফুটিয়ে খাবো, তার আবার হাত ধোয়াধুয়ি কিসের?'

অন্য আর একজন বললো, 'এর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সবই যেন আমাদের থেকে আলাদা।'

এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ গলিত দন্ত, রক্তাভ হাঁ-মুখে হাস্য করে বললো, 'কিছুদিন যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে ও আমাদের মতোই হয়ে গেছে।'

এই সময়ে সদ্য রোগাক্রান্ত একটি বালিকা, জলপূর্ণ একটি মৃত্তিকার পাত্র শাম্বর খাদ্যের পাত্রের সামনে এনে রাখলো। শাম্ব কৃতজ্ঞ চোখে বালিকাটিকে দেখে, মৃদু হাসলেন। জলের পাত্র নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাদ্যের পাত্রের সামনে বসলেন। সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি একলাই খাবো? তোমরা?'

নীলাক্ষি বললো, 'আমরা ভিক্ষা শেষে ফিরে এসেই, ফুটিয়ে নিয়ে খেয়েছি। ওই দেখছো না, এখনো রান্নার আগুন জ্বলছে।'

একজন পুরুষ বললো, 'আমরা সারাদিন দূরদূরান্তরে ভিক্ষে করি, ফিরে এসেই আগে পেটের জ্বালা মেটাই। যা তণ্ডুল থাকে, কিছু খাই, বাকিটা কাল সকালের জন্য রেখে দিই। সকালে খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়ি।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে ফিরে বললেন, 'এই খাদ্য তুমি আগামী সকালের জন্য রেখে দিয়েছিলে? রাত পোহালে তুমি কি খাবে?'

নীলাক্ষি তার রক্তিম ক্ষতযুক্ত স্ফীত অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করে হেসে বললো, 'ওহে প্রাণ, তোমাকে যা দিয়েছি, তা খাও। আমার এখনো কিছু রাখা আছে, সকালে তাই খাবো। তোমার খিদে না মিটলে যেটুকু রেখে দিয়েছি, তাও তোমাকে দিয়ে দেবো।'

একজন রমণী বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি খাও। নীলাক্ষি তোমাকে পেয়ে খুশী, তোমাকে খাইয়ে ও আরো খুশী। তুমি তোমার দানটা রাত্রে ভালো করে দিও, নীলাক্ষিকে সুখী করো।'

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। আগুনের শিখার আলোয়, তাদের সবাইকেই অতি ভয়ংকর প্রেতমূর্তির ন্যায় দেখালো। নীলাক্ষি খিলখিল করে হেসে, শাম্বর হাঁটুতে একটা চাপড় মারলো, এবং তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে অভিসারিণীর উল্লাসে ইশারা করলো। শাম্ব যেন অন্তরে শিহরিত হলেন।

এই শিহরণে কোনো সুখ বা কামোচ্ছ্বাস নেই। এই শিহরণ তাঁর কাছে পূর্ব জীবনের স্মৃতিযুক্ত, অথচ ভয়জাত। তিনি অভিশপ্ত, কারণ তিনি রমণীমোহন ছিলেন। সেই অভিশাপের ফল তিনি বহন করছেন। গৃহ থেকে বিদায়ের পূর্বে, লক্ষ্মণার অতি কাতর প্রার্থনায়, পত্নীর ধর্মরক্ষার্থে, তিনি জীবনের শেষবারের জন্য রমণ করেছেন, অথচ তা কামোদ্দৃপ্ত ভোগের উচ্ছ্বাসে তৃপ্ত হবার জন্য না। এখানে নীলাক্ষির আশাও তিনি পূরণ করতে পারবেন না।

শাম্বর মনে স্বতঃই একটি বিরোধ সৃষ্টি হলো। যার সারাদিনের আহরিত অন্ন তিনি গ্রহণ করবেন, সে একটি বিশেষ প্রত্যাশায় তা পরিবেশন করছে। অথচ তার প্রত্যাশা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। অতএব খাদ্যপাত্র স্পর্শ না করে তিনি নীলাক্ষিকে বললেন, 'আমি তোমার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবো না, তোমার সঙ্গে সহবাস আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত, আমি কি তবু এই অন্ন খেতে পারি?'

নীলাক্ষি হেসে উঠলো, এবং শাম্বর কথা যারা শুনতে পেলো, সবাই হৈ হৈ করে হেসে উঠলো।

একজন বললো, 'ওহে নয়া মানুষ, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের নীলাক্ষি ও বিষয়ে অনেক তুকতাক জানে। যা করবার সে-ই করে নেবে।'

সবাই উল্লাসে হেসে উঠলো। নীলাক্ষিও তাদের মতো হেসে শাম্বকে বললো, 'আমি বলছি তোমাকে, এখন পেটের খিদে তো মেটাও। অন্য খিদের কী হয়, তা পরে দেখা যাবে।'

নীলাক্ষির কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সকলেই বুঝতে পারলো, এবং সবাই একসঙ্গে নীলাক্ষিকে সমর্থন করলো। শাম্ব দেখলেন, বালক-বালিকারাও বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায়, বয়স্কদের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাদের ক্রীড়া কৌশলের কোনো কিছুই তাদের অজ্ঞাত না। যখন মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যায় তখন তার জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। থাকে কেবল শিশ্নোদরপরায়ণতা। এদের দেখে, শাম্ব তাঁর জীবনে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। কিন্তু মুক্তির কী উপায়? ব্যাধি থেকে আরোগ্যই মুক্তি। মুক্তিই দেয় নতুন জীবনের সন্ধান।

শাম্ব এই সব হতমান অবিশ্বাসীদের সামনে বসেও, অন্তরের অটুট বিশ্বাসকে অনুভব করলেন। তিনি যদি ভুল স্থানে এসে থাকেন, তবে আবার মহর্ষি

নারদের সন্ধানে যাবেন। এই কল্প গ্রহণ করে তিনি নীলাক্ষির দেওয়া খাদ্য খেলেন। বিভিন্ন প্রকারের তণ্ডুলের সহযোগে, নানা শাক ও মূল সিদ্ধ করা খাদ্য। শাম্ব অতি উপাদেয় জ্ঞানে এই খাদ্য খেলেন। জলপান করে তৃপ্ত হলেন। তারপরে, তাঁর চারপাশে যারা উপবিষ্ট ছিল, তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বললে এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। আমরা রোজ তাকে গড় করি।'

শাম্ব হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললেন, 'মন্দিরে বিগ্রহ থাকলেই তাঁর নিত্য পূজাদি হয়। এই মন্দিরের বিগ্রহের পূজার কী ব্যবস্থা আছে?'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, যার ফলে শাম্ব কোনো কথাই উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি সবাইকে নিরস্ত করে একজন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি বলো, তোমার কাছ থেকে শুনি।'

বৃদ্ধের অঙ্গ এখন গলিত-প্রায়। নাসিকার হাড় সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত, দুইটি ছিদ্র ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে সানুনাসিক স্বরে বললো, 'আমি ওই মন্দিরে কখনো পূজা হতে দেখি নি। তবে মন্দিরের পুব দিকে একজন মুনি-পুরুষের আশ্রম আছে। সে কখনো মন্দিরের বিগ্রহের পূজা করে না।'

'কিন্তু আমাদের বেহ্মচয্যি পালন করতে বলে।' একজন ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলো।

আর একজন বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মুনি ব্যাটা আমাদের উপোস করতে বলে। বেহ্মচারি হতে বলে। রোজ ভোরবেলা চান করে, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে থাকতে বলে।'

'সে আরো অনেক কিছু বলে।' আর একজন বলে উঠলো। 'তার কথার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝি না। আমরা জানতাম এখানে এসে চন্দ্রভাগায় নাইলেই আমরা ভালো হয়ে যাবো। কিন্তু সবই ফক্কিকারি। আমরা যদি তপস্যাই করবো, তবে ভিক্ষে করবো কখন? আমাদের খেতে দেবে কে? মুনিটা বলে, তোমরা এই নদীর ধারে চাষ আবাদ করো। আমরা কি এখানে ঘর-সংসার করতে এসেছি? আমরা সবাই একদিন পচে-গলে মরে যাবো। রোজই একটু একটু করে আমাদের হাত-পা খসে যাচ্ছে।'

লোকটির কথা শুনে কেউ কেউ আর্তনাদ করে উঠলো। আহত পশুর ন্যায় সেই আর্তনাদে, নদীকূলের বিস্তৃত অন্ধকার ভূমি, ঝোপঝাড়, গাছপালা,

এখনো অবশিষ্ট কয়েকটি আগুনের শিখায় যেন এক ভয়ংকর নরক সদৃশ হয়ে উঠলো। অচিরাৎ মৃত্যুভয়েই যেন কেউ কেউ নিজেদের আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করতে লাগলো। অন্যদিকে অন্ধকারে চলে গেল কেউ। শাম্ব গম্ভীর আর চিন্তিত হয়ে পূর্বদিকে তাকালেন। কে মুনি ঋষি এখানে আশ্রম করে আছেন? অথচ তিনি মন্দিরের বিগ্রহের কোনো পূজা করেন না। কিন্তু এদের নানা প্রকার উপদেশ দান করেন? এদের কথাবার্তা থেকে সম্যক কিছুই বোঝার উপায় নেই। শাম্বর কাছে এ স্থান অপরিচিত। এই রাত্রের অন্ধকারে এখন মন্দির প্রাঙ্গণে বা মুনির আশ্রমে যাওয়া উচিত হবে না। যদিও সেই স্থানে যাবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা বোধ করছেন, কাল এবং স্থান চিন্তা করে, চিত্তকে দমন করলেন।

শাম্ব দেখলেন, প্রায় সকলেই যে যার মৃত্তিকা গহ্বরে বা পাতা ঝোপের কুটিরে গমন করেছে। দু-একজন রমণী পুরুষ বালক-বালিকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসে আছে। প্রায় নিভন্ত দু-একটি ক্ষীণ আগুনের শিখা এখনো জ্বলছে। নীলাক্ষি এখনো ঘুমন্ত শিশু কোলে নিয়ে তাঁর পাশে বসে রয়েছে। শাম্ব স্মরণ করতে পারেন না, কতোক্ষণ পূর্বে শৃগাল প্রহর ঘোষণা করেছে। কিন্তু করেছে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। এখন মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে কালো পাখা বিস্তার করে রাত্রিচর পাখীরা উড়ে যাচ্ছে। নদীর কলকল শব্দের মধ্যেও পাখীদের পক্ষ সঞ্চালনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। সন্ধ্যাতারা পূর্ব দিগন্ত থেকে অনেকখানি উঠে এসেছে। সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও বিভিন্ন নক্ষত্ররাশি, কৃষ্ণ আকাশে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে তাকালেন। নীলাক্ষি তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে শাম্বর দিকেই তাকিয়েছিল। সহবাস কামনায় অতি ব্যাকুলতা তার চোখে নেই, কিন্তু গভীর প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে আছে। শাম্ব কোমল স্বরে বললেন, 'সকলেই যে যার আশ্রয়ে চলে গেছে। তুমিও তোমার ছেলেটিকে নিয়ে ঘুমোতে যাও।'

নীলাক্ষি আশাহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তুমি? তুমি কী করবে, কোথায় থাকবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি যেখানে আছি, সেখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবো।'

নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠলো। চার পাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'কী করে তুমি সারা রাত বাইরে থাকবে? এখনই নেকড়েরা ছুটে আসবে। তারা কুষ্ঠ রোগীদের রেহাই দেয় না। আমাদের

আদ্রির গর্তের ঝাঁপে আর পাতার ঘরেও তারা হামলা করে, নখ দিয়ে আঁচড়ায়। তুমি বাইরে থাকলে, ওরা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।'

শাম্ব মুহূর্তেই ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি এখনই অগ্নিকুণ্ডের আগুন উসকে তুলবো, আগুনের পাশে বসে থাকবো। নেকড়ের দল এলে আমি আগুন নিয়ে তাদের তাড়া করবো।'

নীলাক্ষি শাম্বর কথায় বুঝতে পারলো, তিনি যা বলছেন, তা করবেন। সে বললো, 'কিন্তু আমি তোমার আশায় বসে আছি। আমি একলা থাকতে পারি না। একজন পুরুষ না থাকলে আমার সবই ফাঁকা লাগে।'

শাম্বর কাছে এই সরল স্বীকারোক্তি মর্মন্তুদ বোধ হলো। তিনি কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে পুরুষ দুদিন আগেও তোমার সঙ্গে থাকতো, তার জন্য তোমার শোক-দুঃখ কিছু নেই? তাকে কি তুমি ভুলে গিয়েছ?'

নীলাক্ষি মাথা নেড়ে বললো, 'কেন ভুলে যাবো? তাকে আমার ভালোই মনে আছে। আমি তার জন্য অনেক কেঁদেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে ওসব শোক-দুঃখের কী দাম আছে? তুমি শুনলে না, আমরা রোজই একটু একটু করে পচে-গলে মরে যাচ্ছি? তোমার মতন নতুন যারা আসে তারা সবাই কয়েকদিন এই রকমই ভাবে। আলাদা আলাদা দূরে সরে থাকতে চায়। তারপরে যখন বুঝতে পারে, ওতে কোনো লাভ নেই, তখন সকলের সঙ্গে মিশে যায়। তুমিও যাবে। তবে মিছে কেন দেরি করছো? আমাদের ঘর সমাজ বলে এখন কিছুই নেই। মরতে মরতেও আমরা আমাদের নিয়েই থাকবো। আমাদের এখন কোনো পাপও নেই পুণ্যও নেই। পুড়ে-যাওয়া-পাখা মৌমাছি যেমন ফুলের গায়ে লেগে থেকে মরে যায়, আমরা সেইভাবেই মরতে চাই। যেটুকু সুখ মেটে তাই মিটিয়ে নিই। তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমি সুখী করবো।'

শাম্ব অনুভব করলেন, নীলাক্ষির প্রতিটি কথাই অতি নিষ্ঠুর বাস্তব। ব্যাধি ও নিশ্চিত বীভৎস মৃত্যু আশাহীন জীবনের কথা। কিন্তু তিনি বিচলিত নন, এখনো মুক্তির অভিলাষী। তিনি কোনো যুক্তি দেখালেন না, বললেন, 'নীলাক্ষি, আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি আমাকে মার্জনা করো, আমাকে ত্যাগ করে তুমি তোমার শিশুটিকে নিয়ে আশ্রয়ে যাও।'

নীলাক্ষি তথাপি বললো, 'আমার যদি রোগ না হতো, আমি যদি সমাজ সংসারে থাকতাম, তুমিও যদি সুস্থ থাকতে, তবে কখনোই আমাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে পারতে না। তোমার কথা থেকেই বোঝা যায়, তুমি রাজরাজড়া

ঋষিদের মতো সবই জানো। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারো না, আমার এই যে শরীরটা, এর বাইরে কোনো সাড়াই এখন আর নেই। তুমি যদি আমার বুকেও হাত দাও, আমি টের পাবো না। এখন শুধু শরীরের ভেতরেই সাড় আছে। যেমন জিভ দিয়ে এখনো খাবারের স্বাদ পাই। হয়তো মরার আগে পর্যন্ত এই সাড়ই থাকবে। এই সুখটুকু তুমি কেন আমাকে দেবে না?'

শাম্ব বুঝলেন, নীলাক্ষির এই সব উক্তি অধিকতর বাস্তব ও মর্মন্তুদ। সে কোনো কথাই প্রচ্ছন্ন রাখে নি। কিন্তু কী করে বলবেন, তিনি পিতার দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত। শাপমোচনের জন্যই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনে সে-ই ধ্রুব ও মোক্ষ। তিনি করজোড়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে সামান্য সুখী করতে পারলেও আমি সুখী হতাম। আমাকে অক্ষম জ্ঞানে তুমি ক্ষমা করো।'

নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ হতাশায় ও ক্ষোভে জ্বলে উঠলো। তার ভগ্ন নাসা, ক্ষয়-ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত পাংশু মুখ শক্ত হলো। শিশু কোলে সে উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি অক্ষমই থাকো। তোমাকে ধিক্! আমি যখন সুস্থ ছিলাম, তখন ঋষি পুরুষরাও আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতো। এখানে এখন যতো পুরুষ আছে, আমি যাকে ডাকবো, সে-ই আমার কাছে ছুটে আসবে। এর পরে তুমি আমাকে চাইলেও আর পাবে না।' এই বলে সে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

শাম্ব নতমুখে বসে রইলেন। তিনি জানেন, নীলাক্ষির অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না, কারণ তিনি অভিশপ্ত হয়ে এখন এক কল্প গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীলাক্ষির জন্য তাঁর অন্তর দুঃখে দ্রবীভূত হলো। কিছুক্ষণ এইভাবে অধোবদনে বসে থাকবার পরেই তিনি ঘ্রাণে হিংস্র পশুর উপস্থিতি টের পেয়ে চকিত হলেন। দেখলেন, এখন আর কেউ বাইরে নেই। তিনি একলা। দূরে অন্ধকারে তাকিয়ে শ্বাপদের প্রজ্বলিত চক্ষু দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে, অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে, খুঁচিয়ে আগুনের শিখা উসকিয়ে তুললেন। জ্বলন্ত একটি কাঠের টুকরো নিয়ে তিনি চারপাশে তাকালেন। অগ্নিশিখার প্রভায় জ্বলন্ত শ্বাপদ চক্ষুগুলো দূরান্তরে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু তারা প্রত্যাশায় আশেপাশেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। শাম্ব আশপাশ থেকে কাঠের টুকরো নিয়ে, অগ্নিকুণ্ড বিস্তৃত করলেন। জ্বলন্ত কাঠ ছড়িয়ে, নিজের চারপাশে ব্যূহের সৃষ্টি করলেন, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে উপবেশন করলেন। এখন শুধু নক্ষত্ররাজি অতি ধীরে আকাশের কক্ষপথে গমন করছে। নদীস্রোতে

নক্ষত্রেরই রেখা মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে, আর কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে
শাম্ব নদীর দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার বিদায় নেবার আগে, যখন গাছে পাখীর প্রথম স্খলিত জিজ্ঞাসু ডাক শোনা গেল, শাম্ব তখন চন্দ্রভাগার বেগবতী শীতল স্রোতে অবগাহন করলেন। জলের ধারা যেন তাঁর দেহের গভীরে প্রবেশ করে, অন্তরস্থল পর্যন্ত ধৌত করে দিল। তাঁর মন ও প্রাণ যেন গভীর এক আনন্দানুভূতিতে ভরে উঠলো। স্নানের শেষে তাঁর একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ডখানি দেহে জড়িয়ে, ভেজা বস্ত্র নিংড়ে, গা মাথা মুছলেন।

আকাশের পুব দিগন্ত ক্রমে রক্তিম হয়ে উঠছে। শাম্ব দেখলেন, পাতার কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরের কেউ এখনো জাগে নি। তিনি এদের সঙ্গে এখন আর দেখা করতে চাইলেন না। বরং তারা জেগে ওঠে, এই আশংকায় তিনি দ্রুত পূর্বদিকে গমন করলেন।

অনতিঘন অরণ্যানী ও বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে একটি মন্দিরের আকৃতি দেখা গেলেও, তার দূরত্ব যে কিছু কম, তা মনে হলো না। সেই মন্দিরের কিঞ্চিৎ দর্শনে, শাম্ব তাঁর হৃদয়ে এক রকমের ব্যাকুলতা বোধ করলেন, এবং যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হলেন। ক্রমেই পাখীদের স্খলিত স্বর স্পষ্ট ও সবব হয়ে উঠতে লাগলো। দেখলেন, যে অঞ্চলকে নিতান্ত অরণ্যানী মনে করেছিলেন, তা নানা ফুলে ফলে সুশোভিত এক সুবিশাল রমণীয় কানন। তাঁর মনে হলো, জীবনের বাকি দিনগুলো এমন রমণীয় কাননে কাটিয়ে যেতে পারলেও, তাঁর অভিশপ্ত প্রাণ অনেক শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে।

শাম্ব যতোই মন্দিরের নিকটবর্তী হলেন ততোই যেন কাননের শোভা অধিকতর রমণীয় হয়ে উঠতে লাগলো। মন্দিরের আকৃতি ও বিবিধ দেবতা যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরাদের মূর্তি, প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পূর্বের আকাশ ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর সিন্দুরের মতো লাল হয়ে উঠলো। তাঁর ডান দিকে বেগবতী চন্দ্রাভাগার বুকে যেন রুধিরের তরল স্রোত বয়ে চলছে। নদীর কলকল, বাতাসের মৃদু শনশন, পাখীর সুমিষ্ট ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শাম্বর মনে হলো, মানুষের সমাজ সংসার ছাড়িয়ে, তিনি যেন এক অপার্থিব মায়াময় স্থানে পৌঁছেছেন। এখানে কি প্রকৃতই সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষ পরমাত্মা অবস্থান করেন?

শাম্বর মনে এই চিন্তার উদয়মাত্রই তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হলো। কারণ মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জল মূর্তির এক কল্পনা তাঁর অন্তরে গ্রথিত হয়ে আছে। তিনি নদীর তীরবর্তী মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। যথার্থ দক্ষিণে বলা যায় না, দক্ষিণ পূর্ব কোণে এবং একটি বৃহৎ রথের ন্যায় মন্দিরের গঠন। দ্বার আছে, কিন্তু কোনো প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত নয়। রথের ন্যায় মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার, পিঙ্গলা-দণ্ডনায়ক, রাজ্ঞা ও স্তোশ্রা, কালমাস-পক্ষীন, ভিণ্ডমান, ও নগ্নদিণ্ডি, দ্বারপালগণ রয়েছেন। অপ্সরাগণ রথের বিভিন্ন অংশে নৃত্যে সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রাদি বাদনের অপরূপ ভঙ্গিতে রয়েছেন। তাছাড়া দেবতাগণ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীগণ, মারুতগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থান করছেন। মাথার ওপরে ছত্র, সেই আশ্চর্য পুরুষমূর্তি অবস্থান করছেন। শিরস্ত্রাণ তাঁর মস্তকে, কোমরবন্ধরূপে রয়েছে অভিয়ঙ্গ, পদতলের কনুইয়ের উর্ধ্ব পর্যন্ত পাদুকা শোভা পাচ্ছে।

শাম্বর অন্তরে গ্রহরাজের নানা বিস্ময়কর ও বিচিত্র কাহিনী উদিত হলো। তিনি আভূমি নত হয়ে, সেই পুরুষমূর্তিকে প্রণাম করলেন, ভাবলেন, এই কি নারোদোক্ত সেই সূর্যক্ষেত্র? তবে কেমন করে এই সর্বদেবমান্য পরমাত্মাকে আমি আরাধনা করবো? তাঁর তুষ্টিবিধান করে, শাপমুক্ত হবো? তিনি কি মূর্তিমানরূপে আমার সামনে কখনো দেখা দেবেন? কেমন করে তাঁর আশীর্বাদ পাবো? তিনি কি আমাকে সেই ব্রহ্মরূপ শব্দের দ্বারা, শাপমোচনের নির্দেশ দেবেন? এই চিন্তা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরে যেন এক গভীর কল্পবোধ দৃঢ়তর হলো। তিনি সেই পরমাত্মার দুই পাশে তাঁর দুই পত্নী, রাজ্ঞি ও নিক্ষুভাকে দেখলেন। সকলেই যেন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। শাম্বর অন্তর বারে বারে শিহরিত হতে লাগলো।

এইরূপ চিন্তার মধ্যে, শাম্ব চারটি দ্বার প্রদক্ষিণ করে আবার নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। এই সময়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। দেখলেন, পূর্বাকাশব্যাপী রক্তাভার মধ্যে এক বিশাল সিন্দুর গোলকের ন্যায় সূর্য উদিত হচ্ছেন। একজন উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ, তাঁর সারা গায়ে জল, শুভ্র কেশ ও গুম্ফ ও শ্মশ্রু বিন্দু বিন্দু জলে চিকচিক করছে। সামান্য একখণ্ড সিক্ত ধুতি তাঁর পরিধানে। সদ্যোত্থিত সূর্যের আভায় সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ যেন রক্তিম দেখাচ্ছে। তিনি নদীতীরে দাঁড়িয়ে, চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। তাঁর করজোড় দুই হাত সূর্যের প্রতি প্রসারিত। তিনি কি কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করছেন? কিন্তু তাঁর ঠোঁট নড়ছে না। কী করে তিনি রক্তবর্ণ

তেজোদৃপ্ত সূর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিপাত করে আছেন? শাম্বর ধারণা, এইরূপে মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই সদ্যোস্নাত উজ্জ্বল পুরুষের চোখে কোনোরকমে বিকার দেখা যাচ্ছে না।

শাম্ব সহসা তাঁর সামনে গেলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাবলেন ইনিই কি সেই ব্যক্তি, যাঁর কথা গত রাত্রে হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল? কে ইনি? প্রকৃতই কি একজন ঋষি, যিনি সর্বদা রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সূর্যকে বেদোক্ত ভাষায় বন্দনা করেন? মহর্ষি নারদ বলেছিলেন, ঋষিগণ সে স্থানে বেদোক্ত প্রার্থনাদি আবৃত্তি করেন।

শাম্বর এই ভাবনার মধ্যেই সেই পুরুষ দুই হাত দিয়ে তাঁর দুই চোখ ধীরে মার্জনা করলেন। তারপর তীরের উচ্চভূমিতে উঠে, মন্দিরের দিকে না এসে, উত্তরদিকে গমন করলেন। শাম্ব যেন চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণে সেই পুরুষের পশ্চাতে অনুসরণ করলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে নানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পাখীরা যেন সদ্যোত্থিত সূর্যকে বন্দনা করে গান করছে। কিছুদূর যাবার পরে রমণীয় কানন মধ্যে একটি কুটির ও তপোবন দেখা গেল। শাম্ব সেই পুরুষকে আর অনুসরণ করতে যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই তিনি পিছন ফিরে শাম্বর দিকে তাকালেন। শাম্বর মনে হলো, রৌদ্রালোক তাঁকে অত্যুজ্জ্বল করেছে। আর অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই, নতজানু হয়ে, সেই পুরুষকে আভূমি প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'হে মহাভাগে অত্যুজ্জ্বল পুণ্যদেহ! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আপনাকে আমি নদীতীরে সূর্য নমস্কার করতে দেখেছি। অন্তরে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, আমাকে যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি আপনার প্রতি আকর্ষণ করলো। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে থাকতে পারলাম না। হে মহাতপাঃ, আপনি আমাকে মার্জনা করুন।'

সেই পুরুষ প্রস্তরমূর্তির মতো অপলক চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছুই বললেন না। তাঁর অপলক চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। শাম্বর মনে হলো, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই পুরুষ যেন তাঁর সমুদয় বিষয় অবগত হলেন। তথাপি শাম্ব এই তপোধনের অসন্তুষ্টির আশংকায় হাত জোড় করে আবার বললেন, 'মহাত্মন, আপনাকে অশেষতেজঃ-প্রভাযুক্ত দেখছি। আমি মহাব্যাধি আক্রান্ত অভিশপ্ত। এই মহাক্ষণে আপনার দৃষ্টিকে আমি হয়তো আহত করেছি। আপনার পবিত্র অন্তরের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছি। আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি যেন এক অলৌকিক আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনাকে অনুসরণ করেছি।

আপনি আমাকে অজ্ঞ জ্ঞানে ক্ষমা করুন।'

শাম্ব কথা শেষ হতেই অদূরে বহুকণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল। পুরুষ-মূর্তি বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

শাম্ব যেন নিজের শ্রবণকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সদ্যোস্নাত উপাসক যে তাঁকে এক কথায় আহ্বান করবেন, এ কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। মহা-প্রভঃ ঋষি আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছিলেন। শাম্ব তাঁর অন্তরে গভীর আস্থা অনুভব করে দ্রুত পায়ে ঋষিকে অনুসরণ করলেন। দূরে দক্ষিণের কোলাহল শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সমব্যাধিগ্রস্ত সেই সব পুরুষ রমণী বালক-বালিকারা বোধহয় নদীর জলে স্নান করছে। তারপরে মন্দিরে নমস্কার করে সদলে সবাই ভিক্ষে করতে বেরোবে।

ঋষি পুরুষ কুটির প্রবেশে উদ্যত হয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালেন, পিছনে ফিরে তাকালেন। শাম্ব আগেই অনেকখানি দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রভা-যুক্ত পুরুষ বললেন, 'তুমি তপোবন মধ্যে মুক্ত রৌদ্রে কোথাও বসো। তুমি স্নান করে এসেছো, দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে ব.সা। অল্পক্ষণেই আমার পূজা সাঙ্গ হবে। তারপরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো।' এই বলে তিনি কুটির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শাম্ব প্রতিটি নির্দেশই যথাবিহিত পালন করলেন। তিনি ফুল ফল সুশো-ভিত তরুবীথির ছায়া পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্বে মুখ করে মুক্ত রৌদ্রে উপবেশন করলেন। এ স্থানমাহাত্ম্য কিনা তিনি বুঝতে পারলেন না, যুগপৎ তাঁর অন্তরে এক অনুশোচনা ও অনির্বচনীয় আনন্দবোধ তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। অনু-শোচনা এই কারণে, তিনি এমন আশ্চর্য রমণীয় তপোবনে কখনো একান্ত একলা বসেন নি। এর মধ্যে যে এক মহত্তর আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ বিরাজ করছে, আগে কখনো অনুভব করেন নি। ভোগ, বীরত্ব, শত্রুনিধন, ক্ষত্রিয় ধর্মপালন এসবই তিনি জানতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনন্ত। কেন তিনি আগেই এই অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন নি! এই অনুশোচনা তাঁর মনে জাগছে, এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রতি মুহূর্তে তা ধৌত করে দিচ্ছে।

নারদোক্ত বৃষ্ণিব্যাঘ্র যে-ভাবে বসেছিলেন, সূর্য তাঁর মুখোমুখি ছিলেন না, অথচ সর্বাঙ্গে রৌদ্র স্পর্শ করছিল। তিনি নদী, পরবর্তী তীর এবং দূরের আকাশে তাকিয়ে রইলেন, এবং ক্রমে এক ভাবাবেশে তিনি চোখ মুদ্রিত করলেন। তাঁর চোখের সামনে কুসুমের বর্ণ দুলতে লাগলো। কতোক্ষণ তিনি এভাবে ছিলেন, অনুমান করতে পারেন না। হঠাৎ শুনলেন, 'এই নাও,

এই ফলমূলাদি খাও। যৎসামান্য মিষ্টি খেয়ে জলপান করো।'

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত গাত্রোত্থানে উদ্যত হলেন। সেই প্রভাযুক্ত ঋষি তাঁর সামনে জলপদ্মের পাতায় ফলমূল মিষ্ট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শাম্বকে গাত্রোত্থানে উদ্যত দেখে, নিরস্ত করে বললেন, 'তোমাকে উঠতে হবে না। যেখানে বসে আছো, সেখানেই বসো। এই নাও, এই যৎসামান্য ফলমূলাদি খাও। তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। তার আগে একবার গ্রহরাজকে প্রণাম করো।'

শাম্ব সূর্যকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপরে ঋষির প্রতি হাত প্রসারিত করলেন। ভেবেছিলেন, প্রভাযুক্ত ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই জলপদ্মের পাতা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা আদৌ করলেন না। যেমন-ভাবে একজনকে পাতায় খাদ্য পরিবেশন করতে হয়, তেমনি ভাবেই শাম্বর সামনে তা ভূমিতে রাখলেন। তাঁর বাঁ হাতে ছিল একটি মৃত্তিকার জলপূর্ণ পাত্র। সেটিও পাতার পাশে রাখলেন, বললেন, 'খাও। আমি বসছি। তোমার খাওয়া হলে, বৃত্তান্ত শুনবো।'

শাম্বর হৃদয় অতি আকুঞ্চিত হয়ে, নিশ্বাস অতি গভীরে আবর্তিত হলো, এবং মনে হলো, তাঁর চোখ ফেটে জল আসবে। হতভাগ্যের মতো অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করবার পরে এইরকম প্রভাযুক্ত একজন উজ্জ্বল ঋষি পুরুষ তাঁকে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করলেন, সুবাক্য বললেন, এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণার কুঞ্চন দেখা গেলা না। তিনি যেন একজন বিকলাঙ্গ কুৎসিত কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সামনে নেই, এমনই স্বাভাবিক, বরং তার অধিক, শান্ত সৌম্য তাঁর মুখভাব, আচরণ আশ্চর্য অনায়াস ও ভব্যযুক্ত।

শাম্ব অতি কষ্টে তাঁর হৃদয়াবেগ দমন করলেন ও অশ্রুসংবরণ করলেন। দেখলেন তাঁর কপালে চন্দ্রভাগা তীরের মৃত্তিকারই একটি গোলাকার ফোঁটা চিহ্ন। মাথায় সুদীর্ঘ চুলে এক খণ্ড বস্ত্র জড়িয়ে চূড়ার মতো বাঁধা। তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু যেন উজ্জ্বল রৌপ্যের ন্যায়, মুখমণ্ডলে সুবর্ণ দীপ্তিতে কোথাও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি। ইনিই প্রকৃত মহর্ষি নারদোক্ত অত্যুজ্জ্বল পরমাত্মা গ্রহরাজ নন তো? কায়াকল্প ধারণ করে শাম্বকে আচ্ছন্ন করছেন না তো?

প্রভাযুক্ত পুণ্যদেহধারী আবার বললেন, 'খাও। খাওয়া হলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

শাম্ব আবার করযোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে, ফল মুখে দিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় মধ্যে সেই আবর্ত বারে বারে আকুঞ্চিত হতে লাগলো এবং চোখ জলে ভরে উঠতে চাইলো। তিনি নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করলেন এবং

অমৃতবৎ ফলমূলাদি খেতে লাগলেন। প্রভাযুক্ত ঋষি নিকটেই একটি আমলকী বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন এবং নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাম্ব দুগ্ধজাত মিষ্টি খেয়ে, জলপান করলেন। ঋষি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে আমি গতকাল এখানে দেখিনি।'

শাম্ব বললেন, 'আমি গত সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি।'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'তোমাকে দেখে, আমি সেইরকমই অনুমান করেছি। কিন্তু এখানে তোমার মতো যারা আসে, তারা সকলেই জীবনের প্রতি বিশ্বাস-হীন বীতশ্রদ্ধ অসংযমী হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা আর পূর্বের সুস্থ জীবনের মতো থাকে না। আচরণও বদলে যায়। তোমাকে আমি তার ব্যতিক্রম দেখলাম।'

শাম্ব বললেন, 'আমি সাত ঋতু অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি শত শত গ্রাম জনপদ ও নগরীর মধ্যে দিয়ে এসেছি। অধিবাসীদের আমাকে দেখে ভয় ও ঘৃণার জন্য, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয় নি। আমি নিজেকে দিয়েই তাদের মনোভাব বিচার করেছি। তথাপি তারা আমাকে খেতে দিয়েছে। দুরন্ত বর্ষায়, তীব্র শীতে, খামারে গোয়ালের ধারে বহির্বাটির মাথাঢাকা দাওয়ায় থাকতে কোনো বাধা দেয়নি। সারমেয়কুল সর্বত্রই একরকম এবং অবোধ বালক-বালিকাগণও। তারা আমাকে নানাভাবে তাড়না করেছে, পীড়ন করেছে। কিন্তু আমি রাগ করি নি। পরমাত্মার কাছে তাদের সুমতির প্রার্থনা করেছি। তবে হে মহাত্মন, গৃহত্যাগ করার পরে, আপনার মতো দয়াময় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি এই প্রথম পেলাম; তাতে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে, হয়তো আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।'

'সিদ্ধিলাভ? কিসের সিদ্ধিলাভ?'

'শাপমোচন।' কথাটি উচ্চারণ করেই, শাম্ব যেন সহসা বিব্রত বোধ করে আবার বললেন, 'আরোগ্যলাভই আমার সিদ্ধি।'

প্রভাযুক্ত ঋষি কয়েক মুহূর্ত শাম্বর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই স্থানের কথা তোমাকে কে বলেছে, কী বলেছে?'

শাম্ব এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'যিনি সকল বর্ষসমূহ ও অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করেছেন, সেই মহর্ষি নারদ।'

'নারদ!' প্রভাযুক্ত পুরুষ বিস্মিত স্বরে উচ্চারণ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় তোমার সঙ্গে মহর্ষির সাক্ষাৎ হয়েছিল? তোমার পরিচয়ই বা কী?'

শাম্ব মৌনাবলম্বন করে মাথা নত করলেন। প্রভাযুক্ত পুরুষ তীক্ষ্ণ চোখে

শাম্বকে দেখলেন, কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং কোমল স্বরে বললেন, 'পরিচয় দিতে যদি কুণ্ঠা থাকে, তবে থাক। হয়তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ।'

শাম্ব প্রকৃতই কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। তিনি যে বাসুদেবতনয়, এই পরিচয় দেওয়ার অর্থ এক সুদূরপ্রসারী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করা। একমাত্র বংশপরিচয়ের দ্বারা অপরের উৎসাহকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান না। কিন্তু এই মহাত্মা এ কথা কেন বললেন, 'হয়তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ?' শাম্ব বললেন, 'আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, অসন্তুষ্ট হবেন না। এখন আমার একমাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত। শাপমোচনের দ্বারা মোক্ষ লাভই আমার লক্ষ্য।'

প্রভাযুক্ত ঋষি বললেন, 'বুঝেছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে মহর্ষি নারদ তোমাকে কী বলেছিলেন, কী নির্দেশ দিয়েছেন তা আমি শুনতে চাই।'

শাম্ব নির্দ্বিধায় নারদোক্ত সূর্যক্ষেত্র ও তার বর্ণনাদি এবং এখানে আগমন করে চন্দ্রভাগায় স্নান ইত্যাদি সব কথাই বললেন। তাঁর গতকাল অতিসায়াহ্নে আগমন, হতমান অবিশ্বাসী রোগগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাত্রিবাসের বর্ণনা দিলেন এবং তারা এই প্রভাযুক্ত ঋষির বিষয়ে কী বলেছে, তাও বললেন। বর্ণনা দিলেন, আজ অতি প্রত্যূষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে, সূর্যক্ষেত্র দর্শনের পর, মহাত্মার দর্শন, এই রমণীয় কানন ও তপোবন তাঁর মনে কী গভীর শান্তি ও অনির্বচনীয়তা এনে দিয়েছে। তিনি বারে বারে মহাত্মার প্রশস্তি করে বললেন, 'আপনি যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হন, তা হলে এক বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রভাযুক্ত ঋষি প্রসন্ন মুখে বললেন, 'একটা কেন, তোমার যা জিজ্ঞাস্য আছে, করো। আমি সাধ্যমত জবাব দেবো।'

শাম্ব বললেন, 'আমি দেখলাম, আপনি সূর্যদেবকে নমস্কার করে, কুটিরে গমন করলেন। মন্দিরের বিগ্রহকে তো আপনি পূজা করলেন না?'

ঋষি হেসে বললেন, 'তুমি গতকালই রাত্রে, আস্তানার কুষ্ঠরোগীদের কাছে শুনেছো, মন্দিরের বিগ্রহের পূজা হয় না। আমার ওই পরমাত্মা বিগ্রহকে পূজা করার কোনো অধিকার নেই। বেদ বলেছেন, গ্রহরাজ সূর্য সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বপ্রতিমান্য। বেদে আমার অধিকার থাকলেও বিগ্রহপূজা সকল শ্রেণীর দ্বারা সম্ভব না। বিশেষত আমি দেবলক ব্রাহ্মণ, আমার বিগ্রহ পূজা নিষেধ। কিন্তু আমি এই মিত্রবনে বাস করি, অতি প্রাচীনকাল থেকে এ স্থান

সূর্যলোক নামে খ্যাত, আমি প্রতিদিন গ্রহরাজেরই পূজা করি। প্রাচীনতম কালে যখন এই গ্রহরাজের কোনো মূর্তি কল্পনা করা হয় নি, তখন একটি রক্ত মণ্ডলাকার অঙ্কনদ্বারা সর্বত্র তাঁর উপাসনার প্রচলন ছিল। আমি প্রতিদিন একটি মণ্ডলাকার অঙ্কন করে সবিত্রের উপাসনা করি।'

শাম্ব নতুন বৃত্তান্ত শুনে অবাক হলেন, তাঁর কৌতূহল বর্ধিত হলো। তিনি বললেন, 'মহাত্মন্, মহর্ষির কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে আমি গ্রহরাজকে কায়ারূপে দর্শন করবো। এখন বুঝতে পারছি, আমি মহর্ষির কথা অর্বাচীনের ন্যায় ভেবেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন এই গ্রহরাজের মূর্তি কী ভাবে, কবে থেকে মন্দিরে বিগ্রহের ন্যায় কল্পিত হয়েছিল?'

ঋষি প্রীত হয়ে বললেন, 'যে সব মহাপুরুষগণ এই পৃথিবী নামক গ্রহকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হতে দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন, এই গ্রহরাজ আদি ও অনন্ত। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং নিয়ন্তা। তিনি ভয়ংকর কিন্তু শান্ত। তিনি প্রচণ্ড অগ্নিময়, কিন্তু জীবের জীবনধারণের কারণ। আমরা বিভিন্ন রূপে তাঁকে পূজা করেছি, বিভিন্ন নামে তাঁকে অভিহিত করেছি। আমাদের স্বভাব এইরকম যে যাকে আমরা ঈশ্বর রূপে ধ্যান করি, তাঁকে নিজেদের মনোমতো একটি রূপ দিতে চাই। সেই রূপ হওয়া চাই অতি তেজোদৃপ্ত, মহাবলশালী, অতি ক্ষমতাসম্পন্ন। গ্রহরাজের এক নাম আমরা দিয়েছি, 'বিবস্বান'। কে এই বিবস্বান, তুমি কি জানো?'

শাম্ব অতিশয় চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'আমি সূত মুখে এক অতি পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন এই ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থল পর্বতের অন্তরীক্ষবাসী। তাঁর সন্তানগণের নাম বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্ণি মনু আর অশ্বিদ্বয়। আমি আরো শুনেছি, এই মহাবল গন্ধর্বরাজ চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকু এই বিবস্বানেরই বংশধর ছিলেন। পরবর্তীকালে এই ইক্ষ্বাকু রাজের বংশধরেরা সূর্যবংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন।'

ঋষিপুরুষ অতি প্রসন্ন ও বিস্মিত মুগ্ধ চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পরিচয় না দিলেও, আমি ঠিকই অনুমান করেছি, তুমি কোনো খ্যাতনামা সদ্বংশজাত; নিতান্ত অর্বাচীন নও। তুমি যা শুনেছো, আর মনে রেখেছো, তা অতীব সত্য। সেই গন্ধর্বরাজ বিবস্বান এমনই পরাক্রান্ত মহাবলশালী তেজোদৃপ্ত ছিলেন যে, সেই কালের লোকেরা তাঁকে গ্রহরাজ সূর্যের

সঙ্গে তুলনা করতেন। কালে এমনই হলো, বিবস্বান বললে সূর্যকে বোঝায়, আবার রাজাকেও বোঝায়। সেই কারণেই ইক্ষ্বাকুবংশকে সূর্যবংশ বলা হয়। কিন্তু আমরা গ্রহরাজকে বিবস্বান নামে অভিহিত করলাম। তাঁর বহু নামের মধ্যে এইটি একটি। গ্রহরাজের বর্তমান যে-মূর্তি কল্পিত হয়েছে, তা গন্ধর্ব-রাজ বিবস্বানের ন্যায় হওয়া বিচিত্র নয়। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ অতি-শয় পরিশ্রমী ও গুণী। তাঁরাই এই কল্পনাকে মূর্তির রূপদান করেছেন। তাঁরা বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার জানেন। তাঁদের চাক্ষুষ সৃষ্টি মানুষের মনে মায়ার সঞ্চার করতে সক্ষম।'

শাম্ব বিস্মিত ও উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আমি আপনার কথার সমুদয় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এখন আমি জানতে ইচ্ছা করি, এখানে কে এই সূর্যক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন, মন্দিরই বা কার সৃষ্টি? এই পরম রমণীয় কাননই বা কে সৃষ্টি করেছেন?'

ঋষি বললেন, 'আমি যাবৎকাল এখানে এসে বাস করছি, তখন থেকেই এসব দেখছি। আমাদের বংশে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি আমার পূর্বপুরুষগণের কাছে শুনেছি, এই স্থানকে গ্রহরাজের মূলস্থান বলা হয়। আরো শুনেছি, গ্রহরাজের এটি অস্তাচলমানস্থান। তিনি যখন এই ভূমণ্ডলের চক্রে অন্য পৃষ্ঠে আলোক দান করেন, তখন এখানে তার শেষ কিরণের একটি গুণ কার্যকরী হয়।'

শাম্ব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'দয়া করে আমাকে বলুন, শেষ কিরণের সেই গুণ কী? অস্তাচলমানস্থানই কী? কাকেই বা মূলস্থান বলে?'

ঋষি বললেন, 'এই ক্ষেত্রকে মূলস্থান কল্পনা করা হয়েছে। অস্তাচলমান-স্থান বলা হয়, কারণ, গ্রহরাজ যখন ত্রিগুণ সীমাতিক্রান্ত হোন তখন তিনি 'পুরুষ' রূপে অভিহিত হন। তাঁর সেই অস্তাচলাভাব বিবিধ চর্মরোগ, দেহের বিকৃতি বিনাশ করে। আমি অস্তাচলগামী গ্রহরাজের পূজা প্রতিদিন স্নানাদি শেষে করে থাকি।'

শাম্বর অন্তর আশার আলোয় উদ্ভাসিত হলো। তিনি অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রহরাজের কিরণের কি এরূপ আরো স্থান ও কাল বিভাগ আছে?'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'আছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তোমাকে বলছি। এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে লবণদধি তীরে উদয়াচলে তিনি প্রথম আবির্ভূত হন। সেখানে তিনি পূর্বোত্তর কোণে উদিত হন, সেজন্য তাঁকে

সেখানে কোণাদিত্য বলা হয়। এই স্থানে তিনি পশ্চিম দক্ষিণে অস্তাচলে যান। যমুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মধ্যাহ্নে অবস্থান করেন। তখন তিনি কালপ্রিয় নামে অভিহিত হন। মহাব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য, এই তিন স্থানে, তিন কালে তাঁর প্রভা অঙ্গে ধারণ করা বিধেয়।'

শাম্ব মনে মনে সংকট অনুভব করে, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক উদয় থেকে অস্তকালের মধ্যে, এই সুদূরবর্তী তিন স্থানে তিন কালে কী করে মানুষের পক্ষে গমনাগমন সম্ভব?'

ঋষি শাম্বকে আশ্বস্ত করে হেসে বললেন, 'সম্ভব না। সম্বৎসরে এই তিনকালকে ভাগ করে তিন স্থানে তোমাকে অবস্থান করতে হবে। আমিও করেছি।'

শাম্ব প্রভাযুক্ত ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনাকে দর্শনমাত্রেই আমি অনুভব করেছিলাম, আপনি অশেষগুণসম্পন্ন উজ্জ্বল পুরুষ। আপনি জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ। আপনার সান্নিধ্য অতি আনন্দদায়ক। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি এই ত্রিক্ষেত্রে গমন করতে পারি।'

ঋষি স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করে বললেন, 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে। তার আগে, তোমার আরো একটি বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হবে।'

'মহাত্মন, আমি শ্রমবিমুখ নই। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, প্রাণপণে আমি তা পালন করবো।'

'আজ্ঞার বিষয় কিছু না, তোমারই কল্পকর্মের কথা আমি বলছি। যে-দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই নাম সকল বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম এবং দ্বাদশ রূপে তিনি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীতে, অতি ক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দিন সেই সব নদ নদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।'

শাম্ব ব্যগ্র কৌতূহলে জানতে চাইলেন, 'সেই দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীর নাম আপনি দয়া করে বলুন।'

ঋষি বললেন, 'এই চন্দ্রভাগা তার মধ্যে একটি। এ ছাড়া, তোমাকে যেতে হবে পুষ্কর, নৈমিষ্য, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, পয়স্বিনী, যমুনা, তাম্রা, ক্ষিপ্রা এবং বেত্রবতী। এই সমস্ত অঞ্চলই উত্তর অংশে, বিন্ধ্যপদে, দক্ষিণের উত্তরাঞ্চল সীমানায়। তুমি প্রত্যেক স্থানে একদিন অবস্থান

করলেও, আমার মনে হয় ছয় ঋতু অতিক্রম করবে। সাত ঋতুতে তুমি এখানে পৌঁচেছো। আরো ছয় ঋতু এইভাবে পরিভ্রমণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কী না তোমারই বিচার্য।'

শাম্ব অতি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'মহাভাগে, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি নিশ্চয়ই পারবো। আপনি আমাকে আর কিছু নির্দেশ দেবেন?'

ঋষি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি, প্রতি মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে গ্রহরাজের প্রভা উজ্জ্বলতর হয়। এই দিনটি উপবাস করা বিধেয়।'

শাম্ব দ্বিধা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাত্মন্, আপনি বলছেন, 'আমি শুনেছি', আপনি হৃষ্ট মনে আমাকে জবাব দিন, কোথায় কার কাছে শুনেছেন? আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট?'

ঋষি হাস্য করে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না। তুমি দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ করে আসার পরে, আমি তোমাকে নতুন বৃত্তান্ত বলবো।'

শাম্ব করযোড়ে বললেন, 'আমাব মহাভাগ্য। আমি আপনাকে আর একটি কথা বলবো। আমি গতকাল অতি সায়াহ্নে যখন এখানে এলাম, টিলার মৃত্তিকা গহ্বরে ও পাতার কুটিরে ব্যাধিগ্রস্ত হতাশ অবিশ্বাসীদের দেখে, আমার অন্তর বিষাদে পূর্ণ হয়েছে। আপনার উপদেশ ওরা গ্রহণ করে নি। আমি এক হতভাগ্য, ওরা যেন আরো অধিক হতভাগ্য। আমি ওদের জন্য এতই বিচলিত বোধ করছি, কেবলই মনে হচ্ছে, ওরাও কি দ্বাদশ স্থানে যেতে পারে না? আরোগ্য লাভ করতে পারে না? আমি কি ওদের সঙ্গে আহ্বান করতে পারি না?'

প্রভাযুক্ত ঋষি সহসা কোনো কথা বললেন না, অপলক নিবিড় চোখে শাম্বর মুখের দিকে তাকালেন। শাম্বর চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শাম্বর ব্যাধিগ্রস্ত বিশাল শরীরের প্রতি লক্ষ করলেন। শাম্ব অন্যায় আশংকায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্যত হলে, তিনি হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'আমি তোমার কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে-ই হও, আমার বিশ্বাস, তোমার শাপমোচন ঘটলে, তার সঙ্গে কোনো মহৎ কর্মেরও সাধন হবে। অন্যথায় এ চিন্তা তোমার মনে উদিত হতো না। ওই সব কুটিরের অধিবাসীদের প্রতি আমি বিমুখ নই। তোমাকে আমি যা যা বলেছি, ওদেরও তা বলেছি। হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা মানে নি। তুমি যদি ওদের তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো, এক বিশাল জনসংখ্যা আস্তে আস্তে রোগমুক্ত হতে পারে। তুমি যদি ওদের সম্মত করাতে পারো, তা হলেই সার্থক।' এই বলে ঋষি বৃক্ষমূল থেকে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তুমি

ক্যাছেপিঠে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াও। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে তণ্ডুল ফলমূলাদি দেয়। এক গোপরমণী দুধ ও দুগ্ধজাত ক্ষীর মিষ্টান্ন দেয়। আমি দিনান্তে একবার স্ব-পাকে রান্না করি। অস্তগামী আদিত্যের পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ করে, অন্নগ্রহণ করি। তুমিও আমার অন্নের ভাগ গ্রহণ করবে।'

শাম্ব আবার আভূমি নত হয়ে ঋষিকে প্রণাম করলেন। ঋষি তাঁর কুটিরে গমন করলেন। শাম্বও গাত্রোত্থান করলেন, কিন্তু বেশি দূরে কোথাও গেলেন না। চন্দ্রভাগা তীরে গিয়ে জলের সামনে বসে, ঋষির কথিত কর্তব্যকর্ম বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। আর মনে মনে বললেন, 'হে বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, তুমি আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও।'

শাম্ব সূর্যাস্তের পরে, ঋষির পূজা শেষে, তাঁর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করে, রাত্রের মতো বিদায় চাইলেন। ঋষি তাঁকে বললেন, 'তুমি এখন ওই টিলার গায়ে যাবে। সাবধানে থেকো। এই মিত্রবনের কোথাও তুমি একটি কুটির নির্মাণ করে থাকো এই আমার ইচ্ছা। তবে তার আগে তুমি দ্বাদশস্থানে ঘুরে এসো, এবং সেই অবিশ্বাসীদের যদি সম্মত করাতে পারো, তার চেষ্টা পাও।'

শাম্ব ঋষিকে প্রণামপূর্বক বিদায় নিয়ে, নদীতীরের সেই বিস্তৃত টিলা অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। অন্ধকার নেমে এসেছে। অগ্নিকুণ্ডগুলো জ্বলছে, এবং সেই আলোয় দেখা গেল, পুরুষ-রমণীগণ বালক-বালিকাগণ ইতস্তত গুচ্ছ গুচ্ছ বসে আছে। দেখেই বোঝা যায়, তাদের রান্না খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। তখনো কেউ কেউ খাচ্ছিল। শাম্বকে দেখে সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে কলরব করে উঠলো। একজন চিৎকার করে বললো, 'নীলাক্ষি, গতকালের সেই লোকটা ভোর রাত্রেই কোথায় চম্পট দিয়েছিল, আবার এখন ফিরে এসেছে। নিশ্চয়ই ও আজ তোমার খাবারে আবার ভাগ বসাতে এসেছে।'

'আজ হয়তো ও, সারাদিন না খেয়ে বুঝেছে, নীলাক্ষির সঙ্গে থাকাই ভালো।' আর একজন বিদ্রূপ করে বললো।

একজন কাছে এসে বললো, 'তোমার সঙ্গে কি ওই ঋষি লোকটার দেখা হয়েছিল? নিশ্চয়ই অনেক জ্ঞান দিয়েছে?'

শাম্ব বললেন, 'উনি একজন প্রকৃত জ্ঞানী। তবে উনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন।'

শাম্বর আশেপাশে যারা ছিল, আর তাঁর কথা শুনতে পেলো, সবাই হই হই

করে উঠলো, 'হতেই হবে, হতেই হবে। ঋষ্যাটা যাকে পায়, তাকেই গুচ্ছের উপদেশ দেয়। তোমরা শোনো, একেও সেই ঋষি লোকটা অনেক উপদেশ দিয়েছে।'

শাম্ব গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'থামো। তিনি একজন প্রকৃতই জ্ঞানী। তাঁর সম্পর্কে তোমরা সংযত বাক্য উচ্চারণ কর।'

শাম্বর গম্ভীর অথচ দৃঢ় স্বরে এমনই একটি প্রত্যয় ছিল, সকলেই কেমন সচকিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণ পরে একজন বলে উঠলো, 'এ লোকটা রাজরাজড়া ঋষিদের মতো কথা বলে। এও নিশ্চয়ই আমাদের কোনো জ্ঞান দেবে।'

'না, আমি তোমাদের কোনো জ্ঞান দেব না।' শাম্বর স্বর যেন গম্ভীর শঙ্খের নিনাদে ধ্বনিত হলো, 'আমি তোমাদের একটি মাত্র অনুরোধ করবো।'

সকলেই কিছুটা হতবাক বিস্ময়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। এই সময়ে নীলাক্ষি তার শিশুটিকে বুকে নিয়ে শাম্বর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ক্ষয়-ক্ষত স্ফীত ঠোঁটে বিস্ফারিত হাসি। শাম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলাক্ষি, তোমার আজ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়েছে তো?'

নীলাক্ষি ঠোঁট কুঞ্চিত করে বললো, 'ওসব পূর্ণটূর্ণ জানি না। ঝুলি কোনোদিনই ভরে না, লোকে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করে আসে। কিন্তু তুমি কী যেন বলছিলে?'

'ও আমাদের কী একটা অনুরোধ করবে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'ওর ভাবগতিক মোটেই সুবিধের না। ও নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান দেবার তালে আছে।'

শাম্ব দৃঢ় এবং কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'না, আমি তোমাদের কোনো জ্ঞান দেবো না। তোমরা ভুলে যাচ্ছো, আমিও তোমাদের মতোই মহাব্যাধি-গ্রস্ত দুর্ভাগা অভিশপ্ত। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু একটাই—।'

'যে তুমি ঋষি রাজরাজড়াদের মতন কথা বলো।' কয়েকজন বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

শাম্ব সেই কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না। প্রভেদ এই, তোমরা বিশ্বাস হারিয়েছো, আমি এখনো বিশ্বাস হারাই নি।'

'কিসের বিশ্বাস? আমাদের আবার কিসের বিশ্বাস থাকতে পারে?' সমস্বরে রমণী পুরুষ বলে উঠলো।

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত প্রায় সকলের মুখের দিকে যেন আলাদা আলাদা করে তাকালেন, বললেন, 'আরোগ্যলাভের বিশ্বাস।'

'তখনই বলেছিলাম লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা জ্ঞান দেবে!' কয়েক-জন লাফালাফি করে বলে উঠলো, 'ও আমাদের বিশ্বাস করতে বলছে, আমরা ভালো হয়ে যাবো।'

সবাই নানা ইতর ভাষা উচ্চারণ করে, বিকৃত উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো, আর ধিক্কারের ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, 'মিথ্যা স্তোক, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।' ...

শাম্ব শান্ত ভাবে অপেক্ষা করলেন। যখন ওরা কিঞ্চিৎ শান্ত হলো, তখন তনি বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরে শোন, আমরা সমগোত্রীয়, সকলেই সমান। সংসারের সব মানুষ আমাদের কারোকে আলাদা চোখে দেখে না। আমার জীবনে যা সত্য, তোমাদের জীবনেও তা সত্য। তবে কেন তোমাদের আমি মিথ্যা কথা বলবো। তোমরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও যদি সম্পদশালী হতে, তা হলে আমি তস্করের ন্যায় মিথ্যা কথা বলতে পারতাম, ছলনা করতে পারতাম। এক্ষেত্রে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই।'

সকলের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা দিল। একজন বৃদ্ধা কাছ থেকে বললো, 'এটা ঠিক, আমাদের ঠকাবার কিছুই নেই। আর ও আমাদের মতনই একজন কুষ্ঠরোগী।'

'কিন্তু ও যে কী সব বিশ্বাস-ফিশ্বাসেব কথা বলছে। ওসব তো মিথ্যা। ছলনা।' একজন বলে উঠলো।

শাম্ব বললেন, 'কখনোই না। যার বিশ্বাস হারায়, তার সবই হারিয়ে যায়।'

'আমাদেরও সবই হারিয়ে গেছে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের আর কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই।'

শাম্ব বললেন, 'আমার সঙ্গে তোমাদের এই প্রভেদের কথাই বলছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমার পাপই আমাকে বিনাস করতে উদ্যত হয়েছে, আর একমাত্র মুক্তির উপায়, দুষ্কর প্রায়শ্চিত্ত। এই আমার বিশ্বাস।'

'কী সেই প্রায়শ্চিত্ত?' নীলাক্ষি জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'আরোগ্যলাভের চেষ্টা। এসো, আমরা সবাই আরোগ্য-লাভের চেষ্টা করি।'

সকলে সমস্বরে হই হই করে উঠতেই, নীলাক্ষি তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'চুপ করো। ও আমাদের মতোই কুষ্ঠরোগী। ওর কথা আমাদের শোনা উচিত। ও কী বলে, আমরা শুনবো।'

শাম্ব চমৎকৃত বিস্ময়ে দেখলেন, নীলাক্ষির প্রতিবাদে এক অবিশ্বাস্য আশাতীত প্রতিক্রিয়া ঘটলো। নীলাক্ষির প্রতিবাদও যেন উপস্থিত সকলের কাছে আশাতীত বোধ হওয়ায়, তারা স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'এসো, তুমি বসো, আমরাও বসি। তুমি কী বলো, আমরা শুনি। তোমার কথা যদি আমাদের মনে লাগে, ভালো। নইলে তোমাকে আর তোমার কথা আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

শাম্বর মনে হলো, এ যেন সেই গত রাত্রের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রমণী না, যে অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাঁকে উত্তম যুক্তির দ্বারা রমণে প্ররোচিত করেছিল। উত্তম যুক্তি ছিল তার কথায়, কারণ এই ব্যাধি এবং দেহের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরের অনুভূতি আর মানসিকতা বিষয়ে ওর বক্তব্যে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই রমণী যে এমন অঘটনপটীয়সী হতে পারে, তিনি অনুমানও করতে পারেন নি। তার কথার মধ্যে এখনো তেজ ও যুক্তি লক্ষণীয়। শাম্ব এদের সম্পর্কে যতোটা হতাশ হয়েছিলেন, ততোটাই আশান্বিত হলেন। তিনি নীলাক্ষির সঙ্গেই একটি অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসলেন। দেখা গেল, অনেকেই সামনে এসে বসলো। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বন্যহস্তীযূথ এখনো পুরোপুরি নতি স্বীকার করতে পারছে না, অথচ বিদ্রোহও করতে পারছে না, এইরকম তাদের অবস্থা। তার মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন, কেউ কেউ বলাবলি করছে, 'নীলাক্ষি যখন বলছে, তখন শোনাই যাক, কী বলো হে! লোকটা আমাদের কেউ না হতে পারে, নীলাক্ষি তো আমাদের।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি এবং সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন, 'আমার যা বলবার, তা তোমাদের বলেছি। তবু আমি আবার তোমাদের বলছি, আমাদের সামনে জীবনের আর কী অবশিষ্ট আছে?'

'মরা মরা। পচে গলে মরা।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্ব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'না। সুস্থ হয়ে বাঁচা। লয় ক্ষয় ও মৃত্যু অনিবার্য। স্বর্গলোকেও এই জীবনমৃত্যুর লীলা চলছে। যাঁরা মহৎ কর্মের দ্বারা দিবি আরোহণ করেছেন, তাঁরা নক্ষত্রলোকে বিরাজ করছেন। আমরা তাঁদের স্মৃতিচারণ করি, পূজা করি। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা সুস্থ সবল ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের সামনে জীবনের এইটাই একমাত্র অবশিষ্ট আছে।' বলে তিনি নীলাক্ষির কোল থেকে তার শিশুটিকে নিয়ে তুলে ধরে দেখিয়ে বললেন, 'এই সুন্দর শিশুটি কী অপরাধ করেছে যে, সে তার

পিতামাতার ব্যাধি নিয়ে অকালে মরে যাবে? ওর অপরাধ কি এই, এই পৃথিবীতে ও জন্মেছে? নিজেদের আর ওকে, ওর মতো আমাদের এখানে আরো শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো দায়িত্ব কি আমাদের নেই?'

সহসা কেউ কোনো জবাব দিল না, কিন্তু প্রতিবাদে চিৎকার করেও উঠলো না। শিশুটিও যেন বিশেষ কৌতুক ও আকর্ষণে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলো, কেঁদে উঠলো না। শাম্ব আবার বললেন, 'ব্যাধি হলে, আরোগ্যলাভের নানা উপায় আছে। আমাদের সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে। এখনো আমাদের আশা আছে। মনে বিশ্বাস থাকলে আমরা আরোগ্যলাভ করতে পারবো। এই সব শিশু বালক বালিকারাও সুস্থ হবে। বড হয়ে ওরা তোমাদের জয়গান করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'ভালো হওয়ার কী উপায়?'

শাম্ব বললেন, 'হতাশ হয়ে, এক স্থানে পঙ্গুর মতে বসে থাকা না।' বলে তিনি ঋষি কথিত দ্বাদশ স্থান ও নদনদীর কথা বললেন।

কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, 'এ সেই ঋষি লোকটার কথাই বলছে।'

'কিন্তু ও নিজে আমাদের মতই একজন কুষ্ঠরোগী।' নীলাক্ষি উচ্চস্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও সুস্থ লোকের মতন আমাদের কেবল উপদেশ দিতে আসে নি। ও আমাদের সঙ্গে যাবে, ও আমাদের মতন একজন। আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

তৎক্ষণাৎ কয়েকজন নীলাক্ষির কথার প্রতিধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ, আমিও যাবো, আমিও যাবো। ও আমাদের মতনই একজন।'

একজন রুদ্ধ স্বরে শাম্বকে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'ওকে আমার ছদ্মবেশী যক্ষ বলে মনে হচ্ছে। কুষ্ঠরোগী সেজে এসেছে, আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে।'

আর একজন মাটিতে লুটিয়ে কেঁদে বললো, 'হা ঈশ্বর, আমি কি আবার সত্যি ভালো হয়ে যাবো? একি আশ্চর্য কথা শুনছি?'

শাম্ব নীলাক্ষির কোলে তার শিশুটিকে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দনমান লোকটিকে জড়িয়ে ধরে তুলে বললো, 'আশা রাখো, বিশ্বাস রাখো। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, সংসার প্রকৃতই বিস্ময়কর, ঘটনাবলী সকলই আশ্চর্যজনক।'

'তা নইলে কেন আমাদের এই মহারোগ হবে?' নীলাক্ষি বললো, এবং শাম্বর দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমার মনে আশা জাগছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' আমাদের মনেও আশা জাগছে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি।' অনেকে সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্বর চারপাশে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা এসে দাঁড়ালো। শাম্ব সকলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রমণীরা তাদের শিশুদের শাম্বর দিকে এগিয়ে দিল। শাম্ব শিশুদের কপালে মাথায় তাঁর অসাড় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ফিরে তাকালেন নীলাক্ষির দিকে। নীলাক্ষি এগিয়ে এলো। শাম্ব তার শিশুটিকে স্পর্শ করলেন। তাদের এই আচরণ যেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত। কিন্তু নীলাক্ষির বিষয়ে তাঁর মনে তখনো একটি দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। তিনি আশংকা করছিলেন, নীলাক্ষি হয়তো গত রাত্রের মতোই, অভ্যস্ত বাসনায় রমণেচ্ছা প্রকাশ করবে।

নীলাক্ষি সেই মুহূর্তেই বলে উঠলো, 'কাল রাত্রে আমি তোমার ওপর অন্যায় রাগ করেছিলাম। তোমাকে এই কারণেই আমি আরো বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের মতন হয়েও আমাদের থেকে তোমার মনের জোর বেশি। তুমি যেন কাল রাত্রের কথা মনে রেখে আমার ওপর রাগ করো না।'

শাম্বর অন্তর মুহূর্তের জন্য দুর্বল হলো। বহুদিন তিনি কোনো রমণীকে স্নেহ ও সোহাগ করেন নি। এখন মনে হলো, নীলাক্ষিকে তিনি সোহাগ ও আদর করবেন, তার বাসনা পূর্ণ করবেন। আবার ক্ষণ পরেই তিনি মনের দুর্বলতা দমন করলেন, বললেন, 'আমি কখনোই তোমার ওপর রাগ করি নি। বরং আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দেখছি, তোমার মধ্যেও শক্তি আছে।'

নীলাক্ষির ভগ্ন নাসা, পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ, ক্ষয়ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত মুখে সলজ্জ হাসি ফুটলো। বললো, 'না না, আমার কোনো শক্তি নেই। আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি পেয়েছি। এবার বলো আমরা কবে কখন যাত্রা করবো।'

শাম্ব বললেন, 'শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। আমরা সকলেই কল্প গ্রহণ করে, আগামীকাল প্রত্যূষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে যাত্রা করবো।'

কেউ কেউ তাদের সংগৃহীত অতি সামান্য বস্তুর জন্য আর্তস্বরে বলে উঠলো, সে-সব কেমন করে তারা ফেলে যাবে? শাম্ব বললেন, 'এখানে সব যেমন আছে তেমনই থাকবে। আমরা কেবল আমাদের এই দেহগুলো নিয়ে যাত্রা করবো। আর নিতান্ত ব্যবহার্য বস্তু সকল বহন করবো।'

'আজো আমার কিছু বাড়তি খাবার আছে।' নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'তোমাকে এনে দিই, খাও।'

শাম্বর হৃদয় এক অনাস্বাদিত ব্যথায় ও আনন্দে ভরে উঠলো। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার হৃদয় অতুলনীয়। এখানে আসার আগে, তপোবনের ঋষিই আমাকে তাঁর স্বপাক অন্ন খেতে দিয়েছিলেন। তোমার বাড়তি খাবার তুমি কাল স্নানের পরে খেও।'

'কিন্তু তুমি আজও কি চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে বসে থাকবে?' নীলাক্ষি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'না। আমি এখন তপোবনে যাবো। কাল প্রত্যুষে এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলবো।'

এক বৃদ্ধা বললো, 'হ্যাঁ, তাই যাও। আমি শুনেছি ওই তপোবনে কোনো জন্তু জানোয়াররা হামলা করে না।'

শাম্ব রাত্রের জন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর তপোবনে যাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, আগামীকাল প্রত্যুষেই সকলকে নিয়ে তাঁর যাত্রার কথা ঋষিকে জানানো। অবিশ্যি তিনি কুটির বন্ধ করে নিদ্রিত থাকলে তাঁকে জাগাবার কোনো প্রশ্নই নেই। তা হলে শাম্ব আজ রাত্রিটা মন্দির সংলগ্ন কাননে কোথাও কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি এখনো বিস্ময় বোধ করছিলেন। তিনি একজন ক্ষত্রিয়। কোনো কার্য সমাধা করতে হলে অস্ত্র ও বাহুবলেই তিনি অধিকতর বিশ্বাসী। অথচ সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল এক মানবিক আবেদনে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন, নীলাক্ষিই তাঁর অস্ত্র স্বরূপ কাজ করলো।

শাম্ব মন্দিরের নিকটবর্তী হতেই, অন্ধকারে ঋষির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'তুমি বোধহয় আমার সন্ধানে যাচ্ছো?'

শাম্ব থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই রমণীয় কানন অন্ধকার হলেও সবই যেন আবছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। ঋষির পিছনেই নদী ও নক্ষত্রখচিত আকাশ। শাম্ব তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। করজোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে শাম্ব বললেন, 'মহাত্মন্, আপনিই যথার্থই অনুমান করেছেন।'

'অনুমান না বৎস, আমি দূরের অন্তরাল থেকে সবই দেখেছি ও শুনেছি।' ঋষি শাম্বর কথা শেষের আগেই বলে উঠলেন. 'তোমার অভিপ্রায় শুনে, আমার অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মেছিল। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তুমি যে-ই হও, অশেষ তোমার ক্ষমতা। আমি আবার তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও, তোমার অনুগামীরা সকলে আরোগ্যলাভ করুক। এখন আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। এই কানন মধ্যে এক আশ্চর্য

শাখাপ্রশাখাবিস্তৃত বৃক্ষ আছে। একজন মানুষ অনায়াসে নিশ্চিন্তে সেখানে শয়ন করতে পারে। কোনো হিংস্র শ্বাপদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এসো, তোমাকে আমি সেই বৃক্ষ দেখিয়ে দিই। কাল প্রত্যুষে যাত্রাকালে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

শাম্ব বুঝলেন, ঋষিপুরুষও শুভ কাজের মধ্যে আর কোনো আলাপাদি বা বিলম্ব করতে চান না। তিনি ঋষিকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকারে পাখীর প্রথম ডাকেই শাম্বর নিদ্রাভঙ্গ হলো। এ ডাক রাত্রিচর পাখীর, প্রভাতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল স্খলিত জিজ্ঞাসু পাখীর স্বর। শাম্ব দেখলেন, পূর্বাকাশে ঈষৎ রক্তাভা জেগে উঠেছে। তিনি সেই খট্টিকার ন্যায় প্রশস্ত ও বিস্তৃত শাখাযুক্ত বৃক্ষ থেকে অবতরণ করে আগেই গেলেন সেই টিলা অঞ্চলে। তখনো সকলেই নিদ্রিত। শাম্ব যদি জানতেন নীলাক্ষি কোন্ কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করে, তা হলে প্রথমে তাকেই ডাকতেন। তা জানা না থাকায় তিনি প্রতিটি কুটিরের সামনে, মৃত্তিকা গহ্বরের কাছে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুললেন।

মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত অঞ্চলটি কোলাহলে পূর্ণ হলো। সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে চন্দ্রভাগার জলে স্নান করে নিল। শাম্বও তাদের সঙ্গে স্নান করলেন। পুবের আকাশে ক্রমেই অতি উজ্জ্বল রক্তাভা ছড়িয়ে যেতে লাগলো। শাম্বর নির্দেশে সকলেই দ্রুত প্রস্তুত হলো। ব্যবহার্য বস্ত্রাদি, খাবারের ও রন্ধনের পাত্রাদি ঝোলায় বেঁধে নিল। শাম্বর মনে পড়ে গেল, শাম্ব এবং অন্যান্য বীরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আজও যেন তিনি যুদ্ধযাত্রা করছেন। এ যুদ্ধের রূপ আলাদা। তিনি আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরে গমন করবেন এবং সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমে উপস্থিত হবেন। সিন্ধুর উৎপত্তিস্থল হিমালয়। চন্দ্রভাগা যে স্থানে শাখা নদী রূপে অবতরণ করেছে, সে-স্থানও হিমালয়ের ওপরে।

নদীর তীর ধরে যাবার সময়ে, সেই প্রভাযুক্ত ঋষি, গতকাল যেখানে ভোরে দাঁড়িয়েছিলেন, এখনো সেখানেই প্রতীক্ষা করছিলেন। এখনো গ্রহরাজ উদিত হন নি। শাম্ব তাঁর সামনে গিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর সঙ্গের দল কখনোই ঋষিকে কোনোরকম শ্রদ্ধা দেখায় নি। আজ তারা কপালে

করজোড় স্পর্শ করে, নানা জনে নানারকম মন্তব্য করলো। কেউ বললো, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো হে ব্রাহ্মণ।'

কেউ বললো, 'আমরা ভালো হয়ে আবার এখানে আসবো।'

ঋষি দু হাত প্রসারিত করে সকলের শুভযাত্রা ও মঙ্গলকামনা করলেন।

শাম্ব যাত্রার আগেই গণনা করেছিলেন, শিশু থেকে বৃদ্ধ, নানা বয়সের নরনারী সর্বসাকুল্যে সত্তরজন ছিল। দ্বাদশ স্থানে ও নদনদীতে স্নান করে, দ্বাদশ মাস পরে তিনি যখন আবার চন্দ্রভাগাকূলে অস্তাচলমান স্থানে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজন মাত্র জীবিত। বাকি কিছু সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে, সকলেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ কেউ ব্যাধির অতি প্রাবল্যে মারা গিয়েছে। সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বিশেষতঃ অসুস্থ বালক-বালিকাগণ। কিছু সংখ্যক লোক নানা স্থানে থেকে গিয়েছে। কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয় নি। নীলাক্ষির শিশুটিও মারা গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মায়েরা তাদের শিশুকে হারিয়ে যেমন শাম্বকে অভিসম্পাত দিয়েছিল, নীলাক্ষি তা দেয় নি।

শাম্ব যে-চৌদ্দজনকে নিয়ে ফিরে এলেন, তাদের মধ্যে তিনজন রমণী, দুইটি বালক-বালিকা, বাকি সকলেই পুরুষ। তাদের সকলের বিকৃত দেহে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শাম্ব যেমন অনুভব করেছেন, ক্ষীণতর হলেও তাঁর সম্পূর্ণ অসাড় দেহে, এই এক বৎসরের মধ্যে অনুভূতিবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে, বাকি চৌদ্দজনের অভিজ্ঞতাও তাঁর মতোই। ভ্রূ বা মস্তকের কেশের ভঙ্গুরতা ও পতন বন্ধ হয়েছে। তাঁর মতো, পুরুষদের সকলের গুম্ফ ও শ্মশ্রুও এখন অভগ্ন ও ঘন। দেহের ক্ষয় ও ক্ষতের বৃদ্ধিলাভ ঘটে নি। যদিও অনেক সঙ্গীকে হারাতে হয়েছে এবং সকলেই শোকার্ত, তথাপি সকলের মধ্যেই নবজীবন লাভের একটি উদ্দীপনা জেগেছে। অথচ সেই উদ্দীপনার মধ্যে কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নেই। আছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, সকলের আচরণে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। শাম্বও অন্তরে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। এই নবজন্মের সূচনায়, যেন একটি নতুন সংঘের স্থাপনা ঘটেছে।

রমণীদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যেই নীলাক্ষিকে নেত্রীস্থানীয়া মনে হয়। সে হয়ে উঠেছে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়ী, মন্দিরের অপ্সরাদের ন্যায় তার সর্বাঙ্গে যেন

রূপ ও লাবণ্যের সঞ্চার হয়েছে, অথচ গ্রহরাজের প্রতি তদ্‌গত ভক্তিতে এক ধ্যানমগ্না পূজারিণী। তাকে দেখলে এখন আর বিশ্বাস করা যায় না, সে ছিল বিশ্বাসহীনা, প্রত্যহ যে-কোনো পুরুষের সহবাসে অভ্যস্ত কামতাড়িতা। সকলের মধ্যেই এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

সর্বোপরি এক বিশিষ্ট ঘটনা এই, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা সঙ্গমের জলে, শাম্ব পেয়েছেন একটি দারুমূর্তি যাঁর সঙ্গে এই মিত্রবনের গ্রহরাজের মূর্তির আশ্চর্য সাযুজ্য বর্তমান। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কপালের ওপর এসে পড়েছে যেন এক খণ্ড বস্ত্রের আবরণ, বিশাল চক্ষুদ্বয়, শিরস্ত্রাণের বাইরে বিন্যস্ত কেশপাশের অংশ, মনোহর গুম্ফ, কুঞ্চিত শশ্রু, রাজকীয় পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গ বন্ধন এবং চরণদ্বয় পাদুকাবৃত। দারুমূর্তিটি মোটেই খুব ছোটখাটো না, একজন দীর্ঘদেহ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং নিতান্ত হালকাও না। বর্ষসমূহে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ন্যায়, শাম্বর মনও সেই মূর্তি প্রাপ্তিতে, যেন এক গভীর সংকেতময় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। জীবনের কিছুই নিরর্থক না। সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ নির্দেশ বর্তমান।

শাম্ব মূর্তি প্রাপ্ত হয়ে, ব্যাকুলিত চিত্তে বক্ষে ধারণ করেছিলেন, আর কখনোই ত্যাগ করেন নি। এই সমস্ত ঋতুগুলো এবং সমস্ত পথপরিক্রমায় দারুমূর্তিটি তিনি স্কন্ধে বহন করেছেন। এক সঙ্গে স্নান করেছেন, এই মিত্রবনের ঋষি-উক্ত তিনটি বিশেষণের দ্বারা প্রত্যহ পূজা করেছেন. সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য।

মিত্রবনের ঋষি শাম্বর সঙ্গীগণসহ প্রত্যাবর্তনে যেন পরিবার ও স্বজনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে শিশুর ন্যায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। প্রণামের জবাবে তিনি সকলকেই আলিঙ্গন করলেন, রমণীদের মস্তকে ও কপালে হাতের স্পর্শ দিয়ে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন। শাম্বর মূর্তিপ্রাপ্তিতেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি চমৎকৃত, বিস্ময়ে উদ্বেলিত ও চঞ্চল হলেন। শাম্বকে বললেন, 'এই মিত্রবনেই, রমণীয় কানন মধ্যে তুমি এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করো। আমি দেখেই বুঝতে পারছি, এ মূর্তি কল্পবৃক্ষের দ্বারা তৈরি। এ নিশ্চয়ই কোনো নিপুণ বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। কিন্তু তোমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।'

শাম্ব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দায়িত্ব!'

ঋষি তাঁকে এই প্রথম নিজের কুটিরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা আছে। তোমাকে এবার প্রস্তুত হতে হবে আর এক বিরাট পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য।'

শাম্ব মৃত্তিকায় জোড়াসনে বসে বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

ঋষি বললেন, 'আজ্ঞা নয়, তোমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। হয় তো মহর্ষি নারদ উপস্থিত থাকলে তিনিই তোমাকে বলতে পারতেন।'

শাম্ব বললেন, 'আপনাকে মহর্ষির তুল্য অভিজ্ঞ মনে হয়। আপনিই আমার কর্তব্যের কথা বলুন।'

ঋষি মহর্ষির উদ্দেশ্যে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আমার অভিজ্ঞতা জীবনের তাগিদে। মহর্ষি বিশ্বভ্রমণ করে জ্ঞানলাভ করেছেন। যাই হোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, তুমি যখন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, কেন গ্রহরাজ বিগ্রহের কোনো পূজা হয় না, তোমাকে বলেছিলাম, আমার সে-অধিকার নেই। এখন তোমাকে বলি, সে-অধিকার আছে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তোমাকে যেতে হবে সেই শাকদ্বীপে, সেখানকার ব্রাহ্মণদের তোমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে হবে!'

শাম্ব অজ্ঞতাবশতঃ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো শাকদ্বীপের নাম শুনি নি। সে-স্থান কোথায়, গমনযোগ্য কী না, আপনিই বা সে স্থানের কথা কেমন করে জানলেন আমাকে সবই ব্যক্ত করুন।'

ঋষি বললেন, 'সবই তোমাকে বলবো। তোমরা এই যে দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ করলে, স্নান করলে, উপবাসাদি করলে এ সবই প্রাকৃতিক চিকিৎসা রূপে গণ্য হবে। শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা কেবল সূর্যোপাসক নন, এই ব্যাধিকে দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল, তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানেন, গ্রহরাজই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন। তাঁরা উপাসনা ও বিবিধ কর্মের দ্বারা এই গুণ আয়ত্ত করেছেন। আমার মনে হয় কখনো কখনো তাঁরা কোনো পরাক্রান্ত রাজার দ্বারা ভারতবর্ষে আনীত হয়েছিলেন, কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায়, আবার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মিত্রবনের এই মন্দির দেখেই তা বোঝা যায়। কারণ একমাত্র শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণরাই গ্রহরাজবিগ্রহের পূজার অধিকারী।'

শাম্ব অতি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললেন, 'মহাত্মন, এ সকল সংবাদই আমার কাছে নতুন। আমি সেই ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণদের দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হচ্ছি, কারণ তাঁরাই একমাত্র এই ব্যাধি দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি জানেন। এখন বলুন, এঁদের কথা আপনি কেমন করে জানলেন, কোথায় এবং কোন পথেই বা শাকদ্বীপে গমন করা যায়। আমি তাঁদের আনয়নের যথাসাধ্য

চেষ্টা করবো।'

ঋষি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, তোমার দ্বারাই তা সম্ভব। শোন, আমি পূর্বপুরুষদের কাছে এই শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কথা শুনেছিলাম। সেখানে মগ ও ভোজক দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, উভয় শ্রেণীই সূর্যোপাসক। শুনেছি ভোজক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, রক্তের সম্পর্ক মানামানি নেই। এই রীতি আমাদের দেশে সম্মানের চোখে দেখা হয় না, পরন্তু বিরাগ ও বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করতে পারে। তুমি সেখানে গেলেই সব চাক্ষুষ করতে পারবে। পথ নিঃসন্দেহে খুবই দুর্গম। এখান থেকে তোমাকে অন্তরীক্ষে গমন করতে হবে। অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের নিকটবর্তী কোনো স্থানের নাম শাকদ্বীপ। সেখানে গমন করলে, অধিবাসীরা তোমাকে সম্যক শাকদ্বীপ চিনিয়ে দেবে। শাকদ্বীপ গমনের পূর্বে, তুমি গ্রহরাজ মূর্তিকে কানন মধ্যে স্থাপন করো। তথাপি একটি সমস্যা থেকে যাচ্ছে।'

'কী, বলুন। চেষ্টা করবো, যাতে সমস্যা দূর করা যায়।'

'বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়কে এখানে আনয়ন করে তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তির জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সেই মহান শিল্পীরা বাস করেন। তাঁরা এখানে এসে কাজে হাত দিলে, তাঁদের ভরণপোষণের কী উপায়।'

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'মহাত্মন, অর্থানুকূল্য ব্যতীত এইরূপ এক বিশাল কাজ সম্ভব না। আমি একজন ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্মানুযায়ী আমি শত্রুকে নিধন ও পরাজিত করে, তাদের ধনসম্পত্তি সকল লাভ করেছি। এই কাজে কি আমি সেই সকল ধনসম্পদ ব্যয় করতে পারি না?'

ঋষি বিস্মিত ও অত্যুৎসাহী হয়ে বললেন, 'তুমি এবং তোমার নিজের যা কিছু সংগ্রহ, সকলই তুমি এ বিশাল যজ্ঞকাণ্ডে ব্যয় করতে পারো।'

শাম্ব এখন ঋষির নিকটে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পিতার অভিশাপের বিষয়ের বর্ণনা করলেন। বললেন, 'মহাত্মন্, জন্মসূত্রে আমি বাসুদেবপুত্র যদুবংশের বৃষ্ণিশাখার বংশধর। ক্ষাত্রবীর্যের স্পর্ধা, প্রণয়শীলা রমণীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুখী ও বিলাসের জীবন এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতিমাত্র। তা আমাকে আকর্ষণ করে না, বিচলিত করে না। যে কল্পারম্ভের দ্বারা আমি কর্ম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছি আমার গৌরব তা ছাড়া আর কিছু নেই।'

ঋষি শাম্বকে আলিঙ্গন করে, চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'সাধু সাধু!'

শাম্ব ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আমি এখন অশ্বচালনায় সমর্থ। এ

অঞ্চল থেকে অশ্ব সংগ্রহ করে, আমি অবিলম্বে দ্বারকায় যাবো। ধনসম্পদ নিয়ে পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্বকর্মাগণকে আমার অভিপ্রায় নিবেদন করবো। এখানে ফিরে এসে, আমি কালমাত্র অপেক্ষা না করে, শাকদ্বীপে যাবো। নীলাক্ষি এবং অন্যান্য সকলে এখানে থাকবে, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য সকল কাজের প্রতি লক্ষ ও যত্ন করবে।'

ঋষি বললেন, 'মাত্র কয়েকদিন পরেই শুক্লা সপ্তমী তিথি। তুমি সেইদিন তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তি কানন মধ্যে কোনো উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করে দ্বারকায় গমন করো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

শাম্বর সঙ্গে ঋষির কথার পরে, এক নতুন কর্মযজ্ঞের সূচনা হলো। শাম্ব তাঁর সঙ্গীদের সবাইকেই তাঁর পরিচয় দিলেন, ইচ্ছার কথা জানালেন। সকলের যা কিছু কাজ সবই বুঝিয়ে দিলেন। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করে, চন্দ্রভাগা-কূলের কানন মধ্যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। পরদিবসেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বেগবান অশ্বে আরোহণ করলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে, নীলাক্ষির মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় হলো। শাম্ব গম্ভীর হলেন, নীলাক্ষির সামনে গমন করলেন। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার চোখে এই মুগ্ধতা কিসের?'

নীলাক্ষি বললো, 'মানুষের। তাকিয়ে দেখ, সকলেই তোমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি মিথ্যা বলে নি। তথাপি নীলাক্ষির চোখে মুখে যেন প্রকৃতি লক্ষণ অতি গাঢ়তব মনে হলো। একি নিতান্ত তাঁরই ভ্রম? নীলাক্ষি আবার বললো, 'আমি তোমার শুভযাত্রা কামনা করছি। কাজ শেষ করে তুমি দ্রুত ফিরে এসো।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে আবার তাকালেন। নীলাক্ষি হেসে বললো, 'আমাকে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই।'

শাম্বও হাসলেন, বললেন, 'আমরা সকলেই মানুষ, ভুল আমারও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কল্প কর্ম শেষ হতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে।'

নীলাক্ষি বললো, 'অনর্থক চিন্তা করো না। তোমার শুভযাত্রা ত্বরান্বিত কর।'

শাম্ব আশ্বস্ত হয়ে অশ্বচালনা করলেন। এক পক্ষকাল মধ্যে তিনি দ্বারকায়

পৌঁছলেন। বাসুদেব পুত্র দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জাম্ববতী শাম্বকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন এবং মাতৃগণ সকলেই তাঁকে অশেষ সাধুবাদের দ্বারা স্নেহ ও সোহাগ জানালেন। শাম্বর নিজ গৃহে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু শাম্ব একদিন মাত্র দ্বারকায় অবস্থান করবেন জেনে তাঁর অন্তঃপুরে যেন শোকের ছায়া নেমে এলো। সংবাদ পেয়ে বাসুদেবও বিস্মিত উদ্বেগে দেখা করতে এলেন।

শাম্ব পিতা, মাতৃগণ, লক্ষ্মণা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকা রমণীগণের সামনেই তাঁর আগমনের কারণ ও আসন্ন কর্মের কথা সব ব্যক্ত করলেন। তিনি সকলের সম্মতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করলেন। বাসুদেব ম্রিয়মাণ হলেন, কিন্তু শাম্বর কল্পের কথা শুনে, তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না, বরং সম্মান করলেন। জাম্ববতীর অন্তর বিদীর্ণ হলো, তথাপি তিনি স্বামীর কথানুযায়ী সম্মতি দিলেন।

লক্ষ্মণা অতি কাতর হয়ে দুই হাতে শাম্বকে আকর্ষণ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'স্বামী, আমি কী নিয়ে এই দ্বারকায় থাকবো? কেন থাকবো? কতোকাল থাকবো?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'কুরুকন্যা, শোন, আমার ব্রত এখনো শেষ হয়নি। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছো, আমার এখনো মুক্তি ঘটেনি। নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনেই আমি এখানে এসে-ছিলাম। আমার অতীত জীবন আর কখনোই ফিরে আসবে না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে-কোনো সময় পঞ্চনদীর দেশে, চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে এসো। সেখানেই তোমার যদি বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাস করো। আরও শোন লক্ষ্মণা, জীবন কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চরমান, পরিবর্তনশীল। তুমি তপোবনে গেলে, রৈবতকের এই হর্ম্যতলের বিলাসকক্ষের জীবন পাবে না। তোমার স্বামীকেও পূর্বের ন্যায় পাবে না। তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।'

শাম্ব দ্বারকায় এক রাত্রি বাস করলেন। যদুবংশের বিশিষ্ট পুরুষ জ্যেষ্ঠ ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পরের দিন তিনি রথারোহণে তাঁর বিবিধ স্বর্ণ, মণিমুক্তা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিত্রবনের পথে যাত্রা করে তিনি বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর যাবতীয় রত্নাদি ও রথ তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে দান করে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানালেন। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায় প্রীতির সঙ্গে মিত্রবনে গিয়ে মন্দির তৈরি করতে স্বীকৃত

হলেন।

শাম্ব আর এক পক্ষকালের মধ্যে অশ্বারোহণে মিত্রবনে পৌঁছে, একটি সপ্তমীতিথি পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অষ্টমী তিথিতে সকলের সম্মতি নিয়ে পদব্রজে শাকদ্বীপ যাত্রা করলেন। পঞ্চনদীর দেশের সমতলভূমি অতিক্রম করে, হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছতে তাঁর মাসাধিকাল কেটে গেল। শুরু হলো অন্তরীক্ষের পথ। অতি দুর্গম গিরিশিখর ও বনভূমি মধ্য দিয়ে গমনের সময় শাম্ব তাঁর জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। অন্তরীক্ষের পার্বত্যপথ অতি দুর্গম, কিন্তু শান্ত ও গম্ভীর। দৃশ্যাবলী অতি মনোমুগ্ধকর। ফলমূল এবং পার্বত্য ঝরনার জলই তাঁর খাদ্য ও পানীয়। তবে যতোই অন্তরীক্ষ নিকটবর্তী হতে লাগলো, সেখানকার অধিবাসী গন্ধর্বদের সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন। গন্ধর্ব রমণী ও পুরুষরা সকলেই অতি মনোহর রূপ। ধবল গিরিশৃঙ্গে প্রথম আদিত্য কিরণপাতে যে বর্ণ ধারণ করে এদের গাত্রবর্ণ সেইরকম। কেশ এবং চক্ষু নিবিড় কৃষ্ণ। অশ্বযুক্ত রথ, অশ্ব ছাড়াও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ পার্বত্য ছাগ পৃষ্ঠে অনেকে গমনাগমন করে। প্রকৃত অন্তরীক্ষ পর্বত মধ্যস্থিত এক বিশাল উপত্যকাভূমি। সুদীর্ঘ হ্রদ ও একটি বেগবতী নদীতে গন্ধর্বরা নৌকারোহণেও চলাচল করে।

শাম্ব স্বভাবতই এই অপরিচিত জাতি সম্পর্কে শঙ্কিত ও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। অন্তরীক্ষের অধিবাসীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণ করেছে। তাঁর শারীরিক বিকৃতির জন্য কেউ ঘৃণা করে নি। খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে। পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবং সাবধান করে দিয়েছে, ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে অসুরদের প্রায়ই যুদ্ধ চলছে। শাম্ব যেন সাবধানে গমন করেন।

শাম্ব এই বিচিত্র পার্বত্যদেশসমূহ ও তার অধিবাসীদের দেখে দুর্গম পথের ক্লান্তি অনেকখানি ভুলে থাকতে পেরেছেন। উত্তর পশ্চিমের নির্দিষ্ট পথে যেতে গিয়ে তিনি অসুর সৈন্যদের অনেকগুলো অবরোধ সৃষ্টিকারী স্কন্দাবার দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে সর্বত্রই নিজের পরিচয়, গন্তব্য ও গন্তব্যস্থলে গমনের কারণ-সমূহের বিবরণ দিতে হয়েছে। অসুরদের সীমানা অতিক্রমের পরে শাকদ্বীপে গমনের আগে সুরসেনাদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। স্বর্গের প্রতিটি মানুষেরই তিনি পদধূলি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহার খুব ভালো ছিল না।

দশ ঋতু অতিক্রান্ত করে, শাম্ব শাকদ্বীপে পৌঁছুলেন। দেখলেন, সে

স্থানের অধিবাসীদেরও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি। চোখের রক্ত মিশ্রিত, কৃষ্ণ নীল এবং গোমেধ বর্ণ। অন্তরীক্ষের অধিবাসীদের তুলনায় স্বর্গলোকের দেবতাদিগের সঙ্গেই শাকদ্বীপের মানুষদের সাদৃশ্য বেশি। শাম্বকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করলো শাকদ্বীপ মগ ব্রাহ্মণদের বেশবাস। পুরুষদের কাঁধ থেকে পায়ের কনুই পর্যন্ত পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গের বন্ধন। পায়ে পাদুকা। মাথার ওপরে কপাল পর্যন্ত একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আবৃত। সকলেরই জটা ও শ্মশ্রু রয়েছে এবং প্রতিদান পুবঙ্ক ও বর্ম ধারণ করে থাকেন।

শাম্ব মগ সম্প্রদায়শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে তাঁকে পরিচয় এবং আগমনের কারণ সকল ব্যক্ত করলেন। এবং করুণ ও বিনীতভাবে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। তাঁর আচরণে মগশ্রেষ্ঠ প্রীত হলেন। বিভিন্ন পরিবারকে আহ্বান করে আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, সুদূর ভারতবর্ষে তাঁদের যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে কী না? এবং কতোজনকে শাম্ব নিয়ে যেতে চান?

শাম্ব বললেন, 'আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনাদের কেউ কখনো ভারতবর্ষে গমন করে থাকবেন। হয় তো আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের অব্যবস্থায় আপনারা বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি এক কল্প করে আপনাদের আহ্বান করতে এসেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের কোনোরকম ত্রুটি হবে না। আমি আপনাদের গৃহ, গার্হস্থ্যজীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থাদি করবো। কর্ষণযোগ্য ভূমি ও গাভী দান করবো। আপনারা আঠারোজন ব্রাহ্মণ, আপনাদের পরিবারবর্গ নিয়ে চলুন। আমাদের বিশাল দেশে এই মহাব্যাধির অতি প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনারাই একমাত্র এই মহাব্যাধির আমূল ধ্বংস করতে পারেন। আমার ব্যাকুল প্রার্থনা আপনারা রক্ষা করুন।'

মগ ব্রাহ্মণগণ শাম্বর কথা বিবেচনা করলেন। শাম্ব বহু দূরদেশ থেকে অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করে তাঁদের নিতে এসেছেন। শাম্বর ব্যবহার আচরণ কথাবার্তায় তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদিত হলো। পরিবারস্থ মহিলাগণ শাম্বর প্রতি প্রীত হলেন। মগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ পরিবারকে শাম্বর সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন. এবং তাঁদের গমনের প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই শাম্বর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললেন।

শাম্বর শাকদ্বীপে যেতে যতো বিলম্ব হয়েছিল. ফিরে এলেন তার থেকে দ্রুত। কারণ আঠারোটি পরিবার তাঁদের অশ্ব পার্বত্য গর্দভ ও বিরাটাকৃতি ছাগ, অশ্বচালিত রথে ভারতবর্ষে এলেন। অস্তাচলমানস্থানের মিত্রবনে ফিরে

শাম্ব দেখলেন, এক বিশাল রথের ন্যায় মন্দির অনেকখানি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন তাঁর জন্য বাকি ছিল। তিনি ফিরে আসায় সে-কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলো।

মিত্রবনের ঋষি ও সকলেরই শাম্বর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাঁর রূপের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বলবর্ণে চারিপার্শ্বের প্রকৃতি, নদী, নরনারী সকলই যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই রূপই শাম্বর সেই প্রকৃত রূপ। তাঁর রূপ-দর্শনে সকলে মোহিত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হলো।

নীলাক্ষি শাম্বর পদধূলি নিয়ে বললো, 'প্রণাম হে বিবস্বান।'

শাম্ব চমকিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, ওই নামে আমাকে কখনো সম্বোধন করো না। এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ও গ্রহরাজ ছাড়া ওই নাম আর কারোর হতে পারে না।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সেই রূপের কথাই মনে হচ্ছে।' নীলাক্ষি বললো।

শাম্ব বললেন, 'তুমি আমাকে শাম্ব নামে সম্বোধন করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'না, তোমাকে আমি এখন থেকে বৃষ্ণিরত্ন বলে ডাকবো।'

শাম্ব বললেন, 'সেই ভালো।'

কিন্তু শাম্বর কার্য সমাধার অবকাশ কম ছিল। মিত্রবনের ঋষির সঙ্গে আলোচনান্তে তিনি মগদের ছয়টি পরিবারকে মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাকি বারোটি পরিবার ও বিশ্বকর্মা বংশধরদের নিয়ে প্রথমে যাত্রা করলেন মথুরার সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণ তীরে। সেখানে একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশ্বকর্মা বংশধরদের, যাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন, তাঁদের একাংশের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'এই কালপ্রিয় স্থানে একটি মন্দির আপনারা তৈরি করুন।'

এক মহাযজ্ঞ যখন শুরু হয় তখন সকলের হৃদয়ে ও মনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। বিরোধ এবং আলস্য সেখানে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বিশ্বকর্মাগণ স্বীকৃত হলেন। অতঃপর শাম্ব, বাকি ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়ে উদয়াচলের ওড্রদেশে লবণদধির তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রাচী নদীর একটি শাখা চন্দ্রভাগা নামে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এখানে তিনি অবশিষ্ট ছয়টি মগ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শেষ বিশ্বকর্মা বংশধরগণ যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও সেখানে একটি মন্দির তৈরি করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সম্মত হলেন। শাম্ব এখানেও একটি অগ্নিহোত্র গৃহের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

এক বছর পরে তিনি যখন মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, সেখানে একটি ছোটখাটো নগরী সৃষ্টি হয়েছে, সকলেই তার নাম দিয়েছে শাম্বপুর। শাম্ব বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর এরকম কোনো অভিপ্রায় ছিল না। বরং তিনি দেখে সুখী ও চমৎকৃত হলেন, মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছে। সকলেই যেন দিব্যমূর্তি ধারণ করেছে। এবং কল্পবৃক্ষ মূর্তির নিত্য পূজাদি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে।

মিত্রবনের ঋষির নির্দেশ মতো শাম্ব প্রতি চার মাসে তিনস্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয়-কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লভ ক্ষেত্র। এই সময় তাঁর সঙ্গে আদি চৌদ্দজন তিন স্থানেই গমনাগমন করলো।

দ্বাদশ বৎসর শেষে তিনটি মন্দির পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। নীলাক্ষি উদয়াচলের মন্দিরে আজীবন বাস করার প্রার্থনা জানালো। শাম্ব বললেন, 'তুমি যেখানে থেকে গ্রহরাজকে সেবা করে সুখী থাকবে, সেখানেই থাকো।'

নীলাক্ষি বললো, 'আমি এই সমুদ্র ও চন্দ্রভাগা তীরের মধ্যবর্তী স্থলেই থাকতে চাই। বৃষ্ণিরত্ন, আমি আজীবন কোণাদিত্যের পূজা করবো, কিন্তু আমি নিতান্ত প্রস্তরের অপ্সরামূর্তি নই। আমি মানুষ, তুমি আমার মহামৈত্র। তোমার দর্শনের আশায় আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হবে। বৎসরান্তে একবার দেখা দেবে তো?'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষির ঘনকৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত নীলচক্ষুদ্বয় অশ্রুকণায় চিকচিক করছে। শাম্ব হৃদয়ে অনুভব করলেন, এক অনাসক্ত অথচ কাতর আবেগ। বললেন, 'নীলাক্ষি, মিত্রবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলি নি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।'

নীলাক্ষি শাম্বর পদযুগল স্পর্শ করে বললো, 'শক্তির কথা বলো না, তুমিই আমার শক্তি। তবে আজ থেকে এই কোণাদিত্যক্ষেত্রের নাম হোক মৈত্রেয়বন।'

শাম্ব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, অপরূপ তোমার কল্পনা, এর অধিক ভালো নাম আর এ স্থানের হয় না।'

নীলাক্ষি বললো, 'হে মৈত্রেয়, যে কারণে এ স্থানের নাম আজ থেকে মৈত্রেয়বন, সেই কারণ রক্ষা করো।'

শাম্ব নীলাক্ষির কপালে ডান হাত স্পর্শ করে বললেন, 'মৈত্রেয় কখনো মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধাসূচক কথা বলে না।'

নীলাক্ষি অশ্রুপূর্ণ চোখে হাসলো। মৈত্রেয়বনে বাতাস শনশন নিস্বনে প্রবাহিত হচ্ছে। কোণাদিত্য যেন তাকেই স্নেহপূর্ণ লোচনে অবলোকন করছিলেন।

মহর্ষি নারদ এলেন মিত্রবনে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে শাম্বপুর নগরী এখন ক্রমবর্ধমান। শাম্ব নারদকে অভ্যর্থনা করলেন, পূজা করে পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করলেন। মহর্ষি বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুমি কি আর কখনো দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে চাও না? সেখানে রাজকীয় সুখভোগ করতে চাও না?'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি, আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখভোগের কোনো বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয়ক্ষেত্রে ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি। মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং তিন স্থানের তিনকালের আলোকে স্নান করছে। অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।'

মহর্ষি মুগ্ধবিস্ময়াপন্ন চোখে শাম্বর মুখের দিকে দেখলেন, বললেন, 'চলো, আমি তোমার প্রতিষ্ঠিত গ্রহরাজকে পূজা করবো।'

'চলুন।' শাম্ব ব্যস্ত হয়ে পূজাদির নানা উপকরণ নিয়ে মহর্ষিকে অনুসরণ করলেন।

মহর্ষি চন্দ্রভাগার জল ও ফুলপত্রাদি সহ কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে সেই কল্পবৃক্ষ মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি গ্রহরাজকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করলেন, 'হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।'

শাম্বর সারা শরীর শিহরিত হলো। শাম্বাদিত্য! এ কী নামে মহর্ষি গ্রহরাজকে সম্বোধন করলেন?

মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক

নাম, শাম্বাদিত্য। এই নামেই তিনি এখানে পূজিত হবেন।'

শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেন নি। আজ এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অশ্রুপাত রোধ করা কঠিন বোধ হলো। তিনি দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ, মুখে অনির্বচনীয় হাসি। তিনি ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বাইরে চলে গেলেন।

প্রেম নামে বন

'প্রেম সাধিলে প্রেম মিলে।'...এ হলো প্রেম সাধকের কথা। এক্ষেত্রে 'সাধিলে'-এর অর্থ 'সাধন করলে'। প্রেমে পড়তে জানি, প্রেম সাধন করতে শিখি নি। প্রেম পীরিতি করা কাকে বলে, সঠিক অর্থে, তাও জানি, তেমন কথা বলতে পারি না।

প্রেম কি করা যায়? সম্ভবত না। করার কথা বললেই, আগে সাধকের কথা মনে আসে। প্রেম করা যায় না, তার সাধন করা যায়। কিন্তু সে তো হলো সাধকের কথা। আমার আপনার গতি কী, সেই কথাটি বলো।

সে কথাটা বোধ হয় এই আমরা প্রেমে পড়তে জানি। কেমন করে পড়া? তারও কি কোনো ব্যাখ্যা জানি? আমি তো জানি না। যদি জানবোই, তা হলে যেথা সেথায় প্রেমে পড়বোই বা কেন? কেন না, আমার অবস্থা তো দেখছি সেই গানটির মতো, 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রেমের ফাঁদ।'...ফাঁদও যে আবার অলংকার হয়, তা আবার গলায় লট্‌কে, বুকে ঝোলানো যায়, তাও কি জানতাম? কেবল বুকেই বা বলি কেন? প্রাণের ভাঁজে ভাঁজে সেই অলংকার পরে বেড়াচ্ছি, নাম যার ফাঁদ। যদি জানবোই, কেন প্রেমের ফাঁদ পরি। বা সোজা কথায় বলা ভালো, যদি জানবোই, কেন অমন ফাঁদে পড়ি। তা হলে কি আর সাধ করে প্রেম ফাঁদের গহনা পরি?

একজন তো বলে খালাস হয়েছেন, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।'...কী মজার কথা বলো দেখি? এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াল ব্যাপার। বাঙলাদেশের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই, (এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কথাটা বিতর্কিত হতে পারে, আমি সেই তর্কে যেতে চাই না) একবার সেই দেশে গিয়েছিলাম। কথাটা অবিশ্যি সেই দিনের। আমার তৎকালীন আবেগ ধরা প্রাণে, সেই জায়গাটি দেখার ইচ্ছা ছিল, যেখানে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানী দালালরা হত্যা করেছিল।

জায়গার নাম মীরপুর, তখনো বাঙালী বিদ্বেষী, পাকিস্তানী গুপ্ত খুনী বাহিনী ইতস্তত চোরাগোপ্তা হানছে। তবু আমি যাবো শুনে, প্রশাসকরা একটু চিন্তিত হলেন। পুলিসের এক বড় কর্তা, আমার বন্ধু, তাঁকে আমি মিহির ভাই বলে ডাকি। ওটা তাঁর ডাকনাম। তিনি দুজন সাদা পোশাকের

অফিসারদের আমার সঙ্গে পাঠালেন, আগে মীরপুর থানায়। মীরপুর থানায় পৌঁছেই শুনলাম, সেইমাত্র মীরপুরের কোনো এক আস্তানা থেকে দুটি লাইট মেশিনগান পুলিস উদ্ধার করে এনেছে। আমাকে দেখানো হলো সেই ভারী বড় বন্দুক দুটি, যাদের খাপে তখনও গুলি ভরা।

মীরপুরের সেই ভয়াবহ বর্ণনায় এখন আমি যেতে চাই না। শুধু এইটুকু জানলেই হবে, এই মীরপুরেই কয়েকদিন আগে, জহীর রায়হানকে টেলিফোনে ডেকে হত্যা করা হয়েছে। টেলিফোনে জহীর রায়হানকে নাকি জানানো হয়েছিল, তাঁর দাদাকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে, তিনি এলে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারেন।

আমি জহীর রায়হানের বধ্যভূমিতেই যেতে চাই শুনে, মীরপুর থানার ও. সি.-র মুখটা একটু বিমর্ষ আর উদ্বিগ্ন হলো। তবু তিনি একটি খোলা জীপ এবং চারজন সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে দিলেন। তা ছাড়া, সেই দু'জন সাদা পোশাকের অফিসার তো ছিলেনই, তাঁরাও গুপ্তভাবে সশস্ত্র ছিলেন।

বিশেষ করে, জহীরের বধ্যভূমির নিকটেই বারো আর তেরো নম্বর ব্লকে, তখ না কিছু বিহারী মুসলীম ছিল, যাদের ইংরেজিতে বলা যায়, হোস্টাইল। হঠাৎ আক্রমণ, কিছুমাত্র বিচিত্র না। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটে নি, আমাদের তারা দূর থেকেই লক্ষ্য করে দেখেছে। অন্তরাল থেকে কোনো বুলেট ছিটকে আসে নি। জীপ থেকে নেমে যখন আশেপাশে ঘুরে দেখছিলাম, তখন বন্দুকধারী এক পুলিস, সাদা দাড়িওয়ালা চাচা বলে উঠেছিল, 'সায়েব, যেইখানে হেইখানে পারা দিয়েন না, হালারা পুরা মীরপুরটারে মাইনের ক্ষাত্ কইরা রাইখ্যা গেছে।'

কী সাংঘাতিক ভয়ের কথা বলো তো? আমার ঢাকাই চাচার কথার মানে হলো, 'সায়েব যেখানে সেখানে পদক্ষেপ (বা মাড়াবেন না) করবেন না, শালারা পুরো মীরপুরটাকে মাইনের ক্ষেত করে রেখে গিয়েছে।'·· ঘাট পাতার মধ্যে কোথায় পাতা আছে, কে জানে। একবার ঠেকলেই সোনা। একটি বিস্ফোরণ মাত্র। তারপরেই সব শেষ। কোথায় মুণ্ডু, আর কোথায় হাত পা, খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একেই বলে, আড় আনতে কুড়। ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া। প্রেমের ফাঁদ থেকে একেবারে মীরপুরের বধ্যভূমি, চাচার ভাষায়, মাইনের ক্ষেত্র। অবিশ্যি একেবারে, ধান ভানতে শিবের গীত বলবো না। প্রেমের ফাঁদের কথাটা বলতে গিয়েই, মাইনের ক্ষেত্র বিষয় মনে পড়ে গেল। ভুবন জুড়ে যদি

প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকে, তা হলে, কখন যে শরবিদ্ধ হতে হবে, কে জানে। হলেই বা তা পঞ্চশর, তবু শর তো। আর যদি প্রেম ফাঁদকে অলংকারই মনে করি, তা হলে, সেও যে তখন, 'খুলতে গেলে বাজে'। তখন তো আর কেঁদে মরলেও হবে না, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'। একবার পরলেই জ্বালা। তারপরেও শুনতে হবে, তুমি কি সব স্থানকেই গোকুল ভেবেছ, আর সবই কালাচাঁদ? তা হলে এখন, 'ওরে তুই একলা বসে কাঁদ'।…

কাঁদতে হবে, সে তো জানি। কেন এ ফাঁদ অলংকার পরতে হয়, তার ব্যাখ্যা তো হলো না। এ কি বিশ্বসংসারের মায়া? হৃদয় যার ব্যাখ্যা জানে না, জানে কেবল মুগ্ধ হতে? এ মহামায়াকে কোনো দিন চেনা গেল না, জানা গেল না, সে তার আপন সাজে, আপনাকে ছড়িয়ে, কোন্ অলক্ষ্যে থেকে নিরন্তর আকর্ষণ, চুম্বকের মতো। অদ্যাবধি সেই নেপথ্য রহস্য জানা হলো না। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয় না?

সাধকের কথা বুঝি, তাঁদের প্রেম সাধন এক অতি কঠিন আর গোপন বিষয়। তাঁরা কথায় কথায় বলেন, 'আপন সাধন কথা, না কহিবে যথা তথা'। …তাঁদের সবই হলো দেহভাণ্ড নিয়ে কার্যকারণ, যেহেতু, 'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তা দেহভাণ্ডেও আছে, অতএব প্রেম সাধনার যা কিছু সবই তত্ত্ব আর তত্ত্বানুযায়ী কর্ম।

যদি বলো, সেই কর্মের ফল কী? কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে 'মহাসুখবাদ'। অন্যমতে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যথার্থরূপে জাগ্রত করে 'সহস্রারে গমন'। আবার আর এক ভিন্ন মতে 'বজ্রোলী সাধন'। সেই সাধনে সাধক সাধিকা দুহুঁ মিলে জাগিয়ে তোলেন, সেই 'ডোম্বিনী'কে। সকলেরই চলাফেরা 'বায়ুর ঘরে'। কেউ বলে, 'নাড়ির ঘরে'। কেউ বা 'দমের ঘরে'। কেউ বলেন, জলে ডুবে চান করবেন, তথাপি তাঁর যেমন বেণী তেমন রবে। ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে, মৎস্য ধরবেন, গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগবে না। একে বলে মীন সন্ধান। কেউ বলেন, 'ঊর্ধ্বরেতঃ'।

সবই বড় কঠিন কাজ। কেউ স্রোতে নেই, সবাই উজানগামী। এ সব হলো প্রেম সাধকের সাধনা। আমি সাধক নই। প্রেম সাধতে শিখি নি। স্বয়ং চণ্ডীদাস মহাকবিও বলেন কী না, প্রেম সাধন হলো কেমন? না, 'ভেকের মুখেতে সাপেরে নাচায়'। কী ভয়ংকর কথা! খাদ্য খাদক, দুহুঁ দোঁহায় মিলন করে নাচে।

এমন প্রেম সাধন, আমার জন্য না। কিন্তু সাধতে শিখলাম না, প্রেম করা

কাকে বলে, সঠিক অর্থে তাও জানলাম না, কারণ প্রেম করা যায়, আদৌ কথাটা সত্যি কী না বিশ্বাসের বাধাটা সেইখানেই। চিরদিন দেখে এলাম, কখন কোন্ সময়ে, মনোহরণ হয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে প্রাণহরণও বটে। আমি প্রেমের বাহুডোরে বাঁধা।

এত কথা বলতে হলো যে কারণে, এবার তার ব্যাখ্যান করি। যার প্রেমের বাহুডোরে আমি বাঁধা পড়েছি, অরণ্য তার নাম। সে আমাকে ডাক দিয়ে এনেছিল অনেক আগেই, ঘরছাড়া করে। তখন ভাবি নি, কী রূপের মোহ যে তার সারা অঙ্গে ধারণ করে আছে। আমার বিচরণ এখন তার অঙ্গে অঙ্গে, তার অঙ্গের অভ্যন্তরে। শুকনো মৃত্তিকার গভীরে, যেমন করে জলের ধারা চুইয়ে প্রবেশ করে, বনের রস তেমন করে আমার গভীরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্রবণ। আমি এখন মাতাল হয়েছি। তার ফুল ফল লতাগুল্মের মদির গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে, অবশ করেছে। 'চোখ গেল চোখ গেল' পাখিটার মতো, আমারো চিৎকার করে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করছে। এখন তার বর্ণাঢ্য রূপ, চেয়ে দেখতে পারি না, অথচ চোখ ফেরাতে পারি না। এক কথায় বলি, এই বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন আমি তার কোমল বাহুডোরের নিবিড়ে ধরা পড়েছি, খেয়াল করি নি।

এখন আমি তার চরণে প্রণাম করছি, সে আমাকে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছে। প্রেমের এমনি খেলা। আমি যদি তাকে মা বলে ডাকতে যাই, সে অপরূপা প্রকৃতির সাজে, আমাকে প্রেমশরে বিদ্ধ করে।

আমি কালকূট, বিষে অঙ্গ জরজর। মরুর উত্তাপের জ্বালায়, আমি যখন তার নিবিড় ছায়ায় সুখ সন্ধান করি, সে আমার চোখের দু'কূল ভাসিয়ে দেয়। জ্বালায় পড়ে, যখনই প্রলাপ বকতে যাই, কী এক অনির্বচনীয় সুধায়, সে আমার প্রাণ ভরিয়ে দেয়।

এ প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যাও আমি জানি না। এখন বন আমার প্রেম। সে আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার আপন ঘরে, যার কোনো সীমা নেই। সেই অসীমের মধ্যে, সসীম খেলা কতোখানি আমার চোখে পড়বে, জানি না। আমার আপন হৃদয় কি আমার আছে? আমার নিজের দৃষ্টি? দেখি!

গাড়ি ড্রাইভ করছেন সিংজী। আমি তাঁর পাশে। ঝকঝকে নতুন জীপ, আর তেমনি ঝকঝকে স্বয়ং সিংজী। অজিত সিং। ঝকঝকে ঝলক তাঁর রক্তিম চোখে গালে, সারা মুখেই। এমন না যে, চলেছি গোটা একখানি, রক্তকুসুমের বনের ভিতর দিয়ে, যার ঝলক লেগেছে অজিত সিংজীর চোখে মুখে। এই ঝলকের একটা গন্ধও আছে, তার নাম সুরা। পাহাড়ী অরণ্যের রাস্তা, পদে পদে বাঁক, চড়াই উৎরাই। হাতের যন্ত্র কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হলে, এই সারেণ্ডা বনের কোন্ অতলে তলিয়ে যেতে হবে, কে জানে।

যে-যন্ত্রের নাম স্টিয়ারিং, তা ধরা আছে, সিংজীর বাঘের মতো থাবায়। পথঘাট তাঁর বহুকাল ধরে, বহুবারে যাতায়াতে জানা। তিনিও একজন ব্যাঘ্রসদৃশ ব্যক্তি এই অরণ্যের, তবু বাঘকেও বিপদে পড়তে হয়। জীপের যেরকম গতি দেখছি, হঠাৎ কোনো ঘন বনের বাঁকে হস্তীযূথ দাঁড়িয়ে থাকলে রক্ষা নেই। নিশ্চিত সংঘাত। আর সেই সংঘাতের পরিণাম, চিন্তার অতীত। গাড়ির চাকার তলায় যেমন খেলনা চটকে যায়, তেমনি হস্তী শুঁড়ের আলিঙ্গনে, একটি জীপ গাড়ি দলামোচড়া হওয়া, এমন কোনো ব্যাপার না। তারপরে সেটাকে পাহাড়ের খাদে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হলো। চুকে যাবে ঝামেলা।

কিন্তু এমনভাবে চুকে গেলেই তো হলো না। বনের পাকে পাকে, অনেক বিপাকের পথ ছাড়াও, বন তার আপন দুয়ার খুলে রেখেছে, অন্য পথে। সেই প্রেম বনের পথ চলতে গেলে, প্রেমেই চলতে হয়। সিংজীর এই যন্ত্র গর্জিত শকটের দ্রুত গমন, মোটেই সে রকম না। অন্তত আমার প্রাণটি তো দুরুদুরু করছেই।

আমাদের দুজনের মাঝখানে, একটা ইটালিয়ান সাইড হ্যামার। বুলেটও ভরতি করা আছে। যেন যে-কোনো মুহূর্তে দরকার হলেই, সিংজী তা ঝটিতি তুলে নিয়ে, কাজে লাগাতে পারেন। অবিশ্যিই, সংরক্ষিত এই বনের পশুরাও সংরক্ষিত। কারোকে হত্যা করা নিষেধ। কিন্তু সংসারে এমন লোকও আছে, যারা নিষেধের গণ্ডীতে কখনো বাস করতে শেখে নি, চলতে শেখে নি, আচরণ করতেও শেখে নি। সিংজী সেইরকম একজন ব্যক্তি।

স্বভাবতই, আইন শৃঙ্খলার কথাটা মনে আসে। কিন্তু কে না জানে, ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে বড় তিক্ত, কারণ রক্ষকই ভক্ষক। আইন ভঙ্গ করা তাদেরই সাজে, আইন যারা তৈরি করে। এটা হলো, একটা অতি সাধারণ, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। সিংজী অনেক ওপরতলার মানুষ, আইন ভাঙতে তাঁর দেরি হয় না। জানি না, অন্তরের দিক থেকে তিনি কতোটা

নিষ্ঠুর ! এখনো সে পরিচয় পাবার অবকাশ আমার হয় নি। আজ নিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমার দু'দিনের দেখা। প্রথম দিন, জরাইকেলায়, তাঁর বাসভবনে। যদিও, তাঁর বাসভবন কেবলমাত্র জরাইকেলাতেই নেই, তা ছড়িয়ে আছে, টাটানগর থেকে রাউরকেলা পর্যন্ত। এমন কি জঙ্গলের অভ্যন্তরে, ছোট নাগরাতেও তাঁর নিজস্ব বাড়ি এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী আছে। এই জঙ্গলের ভেতরে প্রথম এসে, তাঁর ছোট নাগরার বাড়িতেই। তারপরে, দ্বিতীয়বারের দেখা এদেলবা, যেখান থেকে আমরা এখন চলেছি, থলকোবাদের দিকে। এখন আমি পুরোপুরি সিংজীর অতিথি।

কিন্তু এই দু'দিনের মধ্যে অজিত সিং-এর মতো ব্যক্তিকে চিনে ওঠা কঠিন। এদেলবা থেকে, জীপে ওঠবার সময় তাঁকে বন্দুকটা টোটা ভরে সঙ্গে নিতে দেখে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এটার কোনো দরকার আছে নাকি?'

সিংজী কিছু আগে থেকেই সুরাপান করেছিলেন। দেখে শুনে মনে হয়েছে, ওটা তাঁর সেকেণ্ড নেচার। সুরাপানের কোনো সময় অসময় নেই। তখন তাঁর চোখ মুখ, রক্তাভায় ঝলকাচ্ছিল। ঝকঝকে সাদা দাঁতে হেসে উঠে আমাকে জবাব দিয়েছিলেন, 'কিসের দরকার নেই বলুন। আপনি হলেন একজন রাইটার মানুষ, সব দেখে দেখে, মনে মনে, বুলেট জমা করে রাখছেন। তারপরে সময় পেলেই, কাগজ নিয়ে বসে যাবেন, আর কলমের ডগা দিয়ে, বুলেট ছুঁড়তে থাকবেন। আমার তো তা না, শিকার পেলেই, আমি গুলি করবো। তা সে জানোয়ারই হোক, আর মানুষই হোক।'

আমি চমকে উঠে বলেছিলাম, 'মানুষও?'

সিংজী হেসে বলেছিলেন, 'কেন নয়? আপনি কি মনে করেন, পৃথিবীর সব মানুষই অবধ্য? এমন কিছু মানুষ তো থাকতে পারে, যাদের বধ করা ছাড়া, কোনো উপায় থাকে না।'

কথাটার কী জবাব দেব, ভেবে পাই নি। কারণ, পৃথিবীতে সকল মানুষ অবধ্য কী না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছিলাম না।

সিংজী হঠাৎ তাঁর লখনৌয়ের কাজকরা পাঞ্জাবির কাঁধ থেকে, জামা খানিকটা নামিয়ে, ডান দিকের উচ্চবাহুর একটা অংশ দেখালেন, 'দেখেছেন?'

দেখেছিলাম, বড় একটি ক্ষতের দাগ। তাঁর ফরসা গায়ে, ক্ষতের দাগটা অতিমাত্রায় রক্তিম। তিনি আবার জামাটা তুলে, হীরের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেছিলেন, 'মামটা নালার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই? জরাইকেলার কাছেই।'

বলেছিলাম, 'ঘুরেও এসেছি।'

সিংজী বলেছিলেন, 'একদিন সকালে, সামটা নালার ধার দিয়ে হেঁটে কোয়েল নদীর দিকে যাচ্ছিলাম। আজ থেকে বছর চারেক আগের কথা। হঠাৎ একটা বন্দুকের গুলির শব্দ পেলাম, কিন্তু তার আগেই আমার হাতের এই জায়গায় মাংস ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম। মাথার ওপর দিয়ে পর পর আরো দুটো গুলি চলে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে বেশী সময় লাগে নি। গুলি যে ছুঁড়ছে, সে হাতী বাঘ মারার জন্য ছোঁড়ে নি, অজিত সিং-ই তার লক্ষ্য। হামা দিয়ে জঙ্গলের অন্যদিকে সরে গিয়ে, প্রাণপণ দৌড়ে পালিয়েছিলাম। আশপাশ দিয়ে আরো কয়েকটা গুলি চলে গেছলো। তার মানে, আমাকে যে মারতে চেয়েছিল, সে আমাকে পেছন পেছন তাড়া করেছিল। কিন্তু পেছন ফিরে, তাকে দেখে নেবার কোনো উপায় ছিল না, তাহলে নির্ঘাত মরতে হতো। কারণ, আমাকে সাপের মতোই এঁকেবেঁকে ছুটতে হয়েছিল। নিজের কাছে কোনো অস্ত্রই ছিল না। অনেকগুলো গুলির আওয়াজ শুনে, স্বভাবই আশেপাশের জঙ্গলে যারা কাজ করছিল, বা গৃহপালিত পশুরা চরে বেড়াচ্ছিল, সকলেই ছোটাছুটি হাঁকাহাঁকি লাগিয়ে দিয়েছিল। সে আর বেশিদূর আসতে পারে নি।'

বলে, বন্দুকটা গাড়ির সামনের আসনের মাঝখানে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, 'এবার বুঝতে পারলেন তো, কেবল জানোয়ার না, মানুষের জন্যও দরকার হতে পারে?'

তারপরে আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না। গোপন আততায়ী যাঁকে হত্যার জন্য পিছনে পিছনে ফেরে, তাঁর সাবধানতা অবলম্বন স্বাভাবিক। কিন্তু মূলে তো ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। আততায়ী সকলের পিছনে ঘুরে বেড়ায় না। সিংজীর পিছনে গুপ্তঘাতক ঘুরে বেড়ায় কেন? সে-জবাবটা নিশ্চয়ই আছে, সিংজীর জীবনের ক্ষেত্রেই, যার কোনো পরিচয় এখনো আমি জানি না। এখন আমি শুধু তাঁর, এই বন পাহাড়ে, গাড়ি চালানো দেখছি।

এদেলবা ত্যাগ করেছি আমরা বেলা প্রায় দুটো নাগাদ। হয়তো তার কিছু বেশিও হতে পারে। এখনো অপরাহ্ণ বলতে যা বোঝায়, তা হয় নি। যেখানে বন নিবিড় না, একটু খোলা জায়গায় এলে, গাছপালার মাথায় রোদ এবং তাদের কিছু দীর্ঘ ছায়া দেখলে, বলা যায়, এখন পড়ন্ত বেলা। কিন্তু কয়েকদিন বনে ঘুরে ঘুরে, এটা বুঝেছি, বনের বিকাল হঠাৎ কখন নেমে আসে বোঝা যায় না। কিংবা সন্ধের নিবিড় ছায়া কখন ঘিরে আসে, তাও ঠিক

খেয়াল করা যায় না। কারণটা আর কিছু না। এক সময়ে, রৌদ্র ঝলকিত প্রান্তর থেকে, কখন বনের গভীরে ঢুকে পড়লাম, যেখানে সূর্যের আলো কদাচিৎ প্রবেশ করে। সেই নিবিড় বন অতিক্রম করে যখন কিছুটা মুক্তাঞ্চলে এলাম, তখন হয় তো দেখা গেল, সূর্য তখন অস্তগামী। তার রক্তাভা ছড়িয়ে আছে বনে বনান্তরে। অথচ, নিবিড় বনে প্রবেশের আগে, ঝলকিত রৌদ্রের দৃশ্যটাই তখনো জেগে থাকে মনের কোণে। প্রকৃত দৃশ্য যে কখন বদলিয়ে গেছে, সে কথা মনে থাকে না।

এখন সিংজীর জীপ চলেছে, প্রায় দু'হাজার ফুট ওপরের পাহাড় দিয়ে। রাস্তার এক পাশে বনবেষ্টিত পাহাড়, অপর দিকে, গভীর খাদ। প্রত্যেকটি বাঁকের মুখই, চোখের বাইরে, এবং বাঁকের মুখগুলো প্রত্যেকটিই ঘন ঘন। প্রত্যেকটি বাঁকের মুখেই, একটি করে সাইনবোর্ড দাঁড় করানো, যার গায়ে কঙ্কালের মুণ্ড, তার নিচে দুটি হাড়ের ক্রস্ চিহ্ন। অর্থাৎ, এই সব চিহ্নের অর্থ, মৃত্যু, অতএব সাবধান। এ ছাড়াও, নানা ধরনের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তির বোর্ড তো আছেই। যেমন, কোথায় কী ধরনের বাঁক বা, কোথায় কালভার্ট অথবা সেতু।

এদেলবা ছেড়ে আসার পরে, কিছুক্ষণ সিংজী আমাকে একটু ইঙ্গিতমূলক ঠাট্টা করছিলেন। সুরসতিয়া নামে একটি মেয়ের কথাই তিনি আমাকে বারে বারে বলছিলেন, যার নামে, তিনি সবসময়ই একটি বিশেষণ প্রয়োগ করছিলেন, 'সুসুনকুড়ি'। সুসুনকুড়ি শব্দের অর্থ, 'নাচের মেয়ে'। কথাটা ঠিক মুণ্ডা না ওরাওঁ, আমি জানি না, কিন্তু কথাটা জানতাম। সিংজীর কথাবার্তা রীতিমতো একটি বিশেষ ইঙ্গিতে ভরা ছিল। একবার তিনি এ কথাও বলেছিলেন, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু এদেলবায় ফেলে এলেন। আপনাকে মনে হচ্ছে, মণিহারা অজগর, অন্ধকারে যে পথ দেখতে পাচ্ছে না।'

আমি সিংজীর কথা শুনে, একটু চমকেই উঠেছিলাম। নিজের মুখ, নিজের দেখবার কোনো উপায় ছিল না। গাড়ির রিয়ার ভিউ ফাইণ্ডারের আয়নাটা ফেরানো ছিল তাঁর দিকেই। সম্ভবত নিজের মুখ দেখেও, নিজের হৃদয় বা মনোগত, সম্যক পরিচয়টা পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে হয়েছিল, একটি অতি বেদনাদায়ক সত্যিকে তিনি অনায়াসে বলে দিয়েছিলেন। আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি, কেমন একটা আড়ষ্টতা এবং লজ্জাবোধ করছিলাম, অথচ আমার ভিতরে একটা আবেগও টলটল করছিল।

সুরসতিয়া আমার জীবনের মণি কী না, তা এই মুহূর্তেই বলতে পারছি না। তবে সুরসতিয়া নামে একটি মুণ্ডা মেয়ে যে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকালের নক্ষত্র, তা কখনোই ভোলা সম্ভব না। প্রকৃতপক্ষে, আমার প্রেম এখন বন, এই বোধ আর অনুভূতি, সুরসতিয়ার দান। সুরসতিয়া বনমালা। বনের যে প্রকৃতি সৌন্দর্য, তার যে গভীরতা, আনন্দ সুখ এবং তীব্র একটি বেদনাও বটে, সুরসতিয়ার মধ্যেই আমি তা দেখতে পেয়েছি। অনুভব করেছি, আমার সকল রক্তকণা দিয়ে।

আমার জবাব না পেয়ে, সিংজী বলেছিলেন, 'কথাটা আমি মিথ্যে বলি নি। বুঝলেন রাইটার সাহেব, জীবনের গোলমালটাই সেখানে—বিলকুল বিপরীত। আপনি নিশ্চয় কথাটা জানেন বা বোঝেন, তা না হলে, এমন একটা ব্যাপার জীবনে ঘটে গেল কেমন করে? আপনি এসেছেন কলকাতা থেকে, সারেণ্ডার জঙ্গল দেখতে, ঘুরতে, কিন্তু এই জঙ্গলের একটি মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে গেল, যা কলকাতায় বসে ভাবাই অসম্ভব ছিল।'

এখন আর এ কথায় আমি আশ্চর্য হই না। বাস্তব ব্যাপারটা যে কোনো ছকের না, সেটা জানাও একটা অভিজ্ঞতার বিষয়। সেই অভিজ্ঞতা আমার একভাবে ঘটেছে, আর তা আনন্দ এবং বেদনায় ভরা। সভ্যতার ঊষাকাল থেকে, মানুষ যে সতীত্বের কথা বলে এসেছে, তার সঙ্গে, মানুষের একটি বিশেষ স্বার্থ জড়িয়েছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সেটা শুরুর কাল, অতএব নারীও হবে পুরুষের একান্ত সম্পত্তি, যেখানে আর কারোর হস্তক্ষেপ চলবে না। কিন্তু এই দাবির সঙ্গে, পুরুষ তার শুদ্ধতার কথাটা শাস্ত্রের বাক্যে যতো প্রয়োগ করেছে, জীবনে কখনোই না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই, অন্তঃপুরের সৃষ্টি হয়েছিল। নারীর ভূমিকা, সেই সমাজে, অন্তঃপুরিকা।

এই কারণেই এঙেলস্ সাহেবের কথাটা আর একবার ভাবতে ইচ্ছা করছে। প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের ছায়ায় যারা আজও বাস করে, বিশ্বাস করে, এবং সেই বিশ্বাসে জীবনধারণ আর আচরণ করে, তাদের নারী-পুরুষের মিলনের জগৎটা দেখতে গেলে, সভ্য সমাজের মানুষ যে চশমা দিয়ে তা দর্শন করে, তার নাম, স্পেকটিকল্ অব প্রসটিটিউশন। বেশ্যাবৃত্তির চশমা দিয়ে দেখা যাকে বলে। কারণ, আদিম অধিবাসীদের ধ্যানধারণা আলাদা। সভ্য সমাজের সঙ্গে তার মিল নেই। যদিও, সভ্যতা নামক রাক্ষসটি অতি দ্রুত, এইসব পাহাড় অরণ্য কন্দরের জীবনকে অতি দ্রুত গ্রাস করছে, তবু এখনো যতোটুকু অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

তারই পরম সুধা আর বিশাল বিস্ময় নিয়ে আমি ফিরে চলেছি।

সিংজী আবার বলেছিলেন, 'তবে, আপনাকে আমি রেসপেক্ট করছি এই কারণে, আপনি কেবল সাহসী না, আপনিও নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। নারী পুরুষের মিলনের চুক্তিটা সব সমাজেই আছে, এদেরও আছে। চেহারা একটু অন্যরকম। এদের সমাজে, মেয়েকেই পণ দিয়ে, ঘরে নিয়ে আসতে হয়। যে ছেলে, যতো বেশি পণ দিতে পারে, সব থেকে সুন্দরীটিকে সে-ই বিয়ে করতে পারে। কারণ, আদিতে এদের সমাজের মেয়েরা ছিল বীর্যশুল্কা। যে তাকে, তার গোষ্ঠীর সঙ্গে, যুদ্ধ করে হরণ করে নিয়ে যেতে পারতো, বরমাল্য পড়তো তারই গলায়। এখন আর সে দিনকাল নেই। তবু, উৎসর্গটাই আসল কথা। আপনার যদি ইচ্ছা না থাকতো, আলাদা কথা। কিন্তু একজনের উৎসর্গের কাছে, আপনিও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আপনার সঙ্গে, আমাদের অনেকের সেখানেই তফাত। কারণ, উৎসর্গের থেকে, আমরা সভ্যতার ইতরামিটাকেই বেশী পছন্দ করি।'...

সিংজী গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছিলেন। একটু বেশীই বলছিলেন। স্বাভাবিক, কারণ, বেশী বলবার জন্য যে দ্রব্যের দরকার, তা তাঁর গর্ভে অনেকখানি সঞ্চিত ছিল, সঞ্চারিত হচ্ছিল মস্তিষ্কের সীমায়। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছিলাম, সিংজীর কথাগুলো শুনে। তিনি যে এমনভাবে এসব কথা বলতে পারেন, আমি ধারণা করতে পারি নি। তাঁকে আমি যতোটুকু জেনে-ছিলাম, তাতে তাঁকে একজন ধনী, দুর্ধর্ষ সাহসী, অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান এবং বেপরোয়া ব্যক্তি ছাড়া, অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পাই নি। তাঁর কথাগুলো শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর অন্য দিকের চিন্তা ভাবনা অভিজ্ঞতার জীবনটাও খুব ছোট না। তা না হলে বনের সমাজ ও মন সম্পর্কে, সে কথাগুলো বলতে পারতেন না। কিন্তু তার সঙ্গে, আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয় ছিল। কথাগুলো বলতে বলতে, তিনি যেন ক্রমেই কেমন গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। প্রথমে কেমন ঠাট্টা করে কথা বলছিলেন, শেষের দিকে তাঁর কথাবার্তা আর তেমন হালকা শোনাচ্ছিল না।

তারপরে তিনি হঠাৎ বলেছিলেন, 'ওহে রাইটার সাহেব, এই অধমের একটা কথা মনে রাখবেন। আপনাকে আমি ঋষিপুরুষ হতে বলছি না, তবে সুরসতিয়ার ব্যাপারটা আপনি ঋষিপুরুষের মতোই ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'জীবনের এরকম একটি ঘটনা, কেমন করে ভোলা যায় সিংজী?'

সিংজী বলেছিলেন, 'ভোলা বলতে, আমি এ কথা বলছি না, আপনার মনে কোনো দাগ থাকবে না। ও দাগটা কখনোই উঠবে না, তবে এখন দাগটা যতো জলজ্বলে, পরে হয় তো অনেকটা ফিকে হয়ে যাবে। তবে একেবারে মুছে কখনোই যাবে না। আমি ভোলা বলতে এই বলছি, এর জন্যে মনে মনে হা হুতাশ করে, জ্বলে পুড়ে মরবেন না।'

আমি বলেছিলাম, 'হা হুতাশ আমি এখনো করছি না, হয় তো এখনো আমি আমার মনের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারছি না বলে। তবে, আপনাকে এইটুকু বলতে পারি, আমার মনে কোনো পাপবোধ নেই।'

সিংজী বলেছিলেন, 'সেটাও আপনাকে দিয়েছে, ওই সুমুনকুড়ি মুণ্ডা মেয়েটি।'

আমি অস্বীকার করতে পারি নি, বলেছিলাম, 'ঠিক বলেছেন।'

সিংজী বলেছিলেন, 'মনের মধ্যে দাগটা সুরসতিয়ারও থাকবে, কিন্তু নিজের চোখেই দেখে এলেন, ও কী রকম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ? ঘুম থেকে উঠে যখন আপনাকে আর দেখতে পাবে না, যখন শুনবে, আপনি চলে গেছেন, তখন হয় তো আবার ঘুমোবে। ও দাপাদাপি কান্নাকাটি করবে না, কারোর কাছে কোনো অভিযোগ করবে না, হয় তো একটু বেশী ভিয়েং, মানে ওদের হাঁড়িয়া পান করবে, কাজ বিশেষ করতে পারবে না। তারপরে, আবার এক সময়ে সতেজ হয়ে উঠবে, নাচবে, গান করবে, কাজ করবে, কোনো জোয়ান ছেলের সঙ্গে প্রেম করবে, ছেলেমেয়ে হবে। তবু—।'

সিংজী কথাটা শেষ না করে, চুপ করে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ পরে, সিংজী হঠাৎ একটু হেসে বলেছিলেন, 'রাইটার সাহেব, আপনি লেখেন, আপনাকে আর আমি কী বলবো, কী বোঝাবো ? আমি বলতে চাইছিলাম, তবু হয় তো, কখনো একলা অন্যমনস্কে, আপনার কথা ওর মনে পড়ে যাবে, নিজের মনে দু'কলি গান গাইবে। আপনি হয় তো জানেন, ওরা নিজেদের মনের কথা সুর দিয়ে, বেশ গান গাইতে পারে।'

বলেছিলাম, 'শুনেছি। সুরসতিয়াকে গাইতেও শুনেছি।'

সিংজী আবার বলেছিলেন, 'তাই বলছিলাম, যা ঘটে গেছে, তার জন্য আপনি বা সুরসতিয়া, কেউ আগে থেকে প্রস্তুত ছিলেন না, আপনারা মতলব করে, কিছু করেন নি। এ ঘটনার নীট্ ফল হলো, আপনাদের দুজনের একটি আনন্দের স্মরণযোগ্য ঘটনা।'

আমি বলেছিলাম, 'কিংবা আরো কিছু অধিক, জীবনকে নতুন করে জানা, নিষ্পাপ কামনার মাধুর্যের ঐশ্বর্যকে পাওয়া।'

সিংজী বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান ছাড়া, এমন পাওয়া আর কেউ পায় না।'

তারপর থেকে সিংজী আর প্রায় কোনো কথাই বলেন নি। জীপ ঢুকেছিল আরো উঁচুতে। এখনো আমরা উঁচু পাহাড়ের গভীর বনের ভিতর দিয়েই চলেছি। সিংজীর নীরবতাকে প্রায় মৌন স্তব্ধতা বলা যায়। স্টিয়ারিং-এর ওপর তাঁর ভরসা, কিছুটা রক্তিম থাবা। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলেছেন। গর্জিত গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। গাড়ির গর্জন না থাকলে হয় তো, ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতো।

একসময়ে গাড়ি যেন একটু নামতে শুরু করলো। পড়ন্তবেলার রোদ থেকে, ক্রমে আমরা ঢুকে গেলাম, অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারে। একটু যেন শীতই করে উঠলো। অথচ শীত করার কথা নয়। গন্ধ বদলিয়ে গেল। যেন এক অতি প্রাচীন নিবিড় গন্ধ, যার নাম দিতে পারি, সে-অভিজ্ঞতা নেই। সিংজী গাড়ির হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। হেডলাইট জ্বালিয়ে দেবার মতো অন্ধকার হয় নি, তবু গাছের গায়ে পড়লে, আলোয় অনেকটা বেশী পরিষ্কার দেখায়। মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে, সিংজীর ঝকঝকে চপ্পলের ওপর, যা দিয়ে তিনি ব্রেকের ওপর চাপ দিয়ে রেখেছেন। পাঞ্জাবির সঙ্গে চোস্ত তাঁর পরনে। একটু অবাক লাগছে, তাঁর মেদবর্জিত ঋজু শরীর দেখে। যাঁর সুরাপানের কোনো সময় অসময় নেই, তাঁর এমন মেদবর্জিত শক্ত-পোক্ত শরীর থাকে কেমন করে। তাঁর বয়সের সঠিক হিসাব না জানলেও, অনুমান করা যায়, চল্লিশোর্ধ্বে। ঊর্ধ্বে না হলেও, তার কাছাকাছি তাঁর মাথার পাতলা চুলে, অল্প পাক ধরেছে। সূচ্যগ্র এবং সুদীর্ঘ গোঁফ জোড়াতেও, কয়েকটি রুপোলি ঝলক আছে। তাঁর জামার বোতামই যে শুধু হীরার, তা না। অনামিকা এবং মধ্যমার একটিতে নিশ্চয় হীরা বসানো। দ্যুতি দেখে তাই মনে হয়। অন্য পাথরটি আমার অচেনা।

গাড়ি হঠাৎ যেন একটা সমতলে নেমে এলো। দেখলাম রোদের রঙে রক্তাভা দেখা দিয়েছে, অপরাহ্ণের ম্লানিমা থেকেও বেশী, যেন প্রায় সন্ধ্যা আসন্ন। গাড়ির গতি একটু কমলো। সিংজী বাঁ হাতের কব্জি তুলে, ঘড়ি দেখলেন। বললেন, 'আর আধ ঘন্টার মধ্যেই, আমরা থলকোবাদ বাংলোয় পৌঁছে যাবো। আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না। কষ্ট আপনারই, এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে

যেতে হচ্ছে।'

সিংজী হেসে উঠে বললেন, 'গাড়ি চালাতে কষ্ট? আর এত পথই বা আপনি দেখলেন কোথায়? এ তো সামান্য রাস্তা।'

আমি বললাম, 'সেটা আপনি খুব স্পীডে গাড়ি চালিয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে একটুখানি পথ।'

সিংজী বললেন, 'খুব জোরে চালাচ্ছিলাম কী?'

আমি বর্তমানের গতি দেখে, একটু স্বস্তি বোধ করছি। আমি বললাম, 'জানি না, আপনি স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে দেখেছিলেন কী না। আমিও দেখি নি, কারণ বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ ভয়ে ভয়েই বসেছিলাম।'

সিংজী হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'তাই নাকি? আমি আবার গাড়ি চালাবার সময়, স্পীডোমিটারের দিকে একটুও তাকাই না। তা ছাড়া আস্তে গাড়ি চালাতে একেবারে পারি না।'

বদরিকাপ্রসাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল, ছোট নাগরা থেকে যাঁর জীপে এদেলবায় গিয়েছিলাম। তিনি একজন ফরেস্ট রেঞ্জার। তাঁর অতি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, তিনি আগে যখন দ্রুত গাড়ি চালাতেন, তখন, বনের একটি গ্রামে, দুটি মুণ্ডা বাচ্চাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। অবিশ্যি তখন তিনি কিঞ্চিৎ মদিরাচ্ছন্ন ছিলেন। পাঁচ বছরের যে মেয়ে দুটি তাঁর গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল, তখন ওঁর একমাত্র মেয়ের বয়সও তাই। সেই থেকে ঘটনাটা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি, নিজের মেয়েকে আদর করতে গেলেই, সেই মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ে যেতো। দ্রুত গতির কথা তিনি কিছু বলেন নি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মদ্যপান করে আর কোনোদিন গাড়ি চালাবেন না।

কিন্তু সিংজীরও সুরা বস্তুটি যথেষ্টই গ্রহণ করা ছিল, তথাপি, তিনি গাড়ি আস্তে চালাতে পারেন না।

সিংজী আবার বললেন, 'তা ছাড়া, আমরা একটা অঞ্চল বেশ জোরেই বেরিয়ে এসেছি, সেই অঞ্চলটায় হাতীরা উপদ্রব করে প্রায়ই।'

কথাটা আমারো মনে এসেছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু হাতী উপদ্রুত অঞ্চলে তো একটু সাবধানে চালানোই উচিত, তাই নয় কী?'

সিংজী বললেন, 'নিশ্চয়ই। সাবধানে, কিন্তু আস্তে না। আপনি যদি স্লো স্পীডে গাড়ি চালান, তা হলে সাবধান হয়েও লাভ নেই। সাবধানতা আসলে কী? আপনার নজর ঠিক রাখা। এমন সাবধান থাকা উচিত, সামনে, দূরে,

ডাইনে, বাঁয়ে কোনো কিছুই যেন আপনার চোখ এড়িয়ে না যায়। আপনার দৃষ্টি যদি সজাগ থাকে, কোথায় কী আছে না আছে, তা হলে আপনি গাড়ির স্পীড ঠিক করতে পারেন, কারণ ওটা তো আপনার হাতে। কিন্তু গাড়ির স্পীড কমিয়ে চলার কোনো মানেই হয় না। ওসব অঞ্চল থেকে যতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা যায়, সেটাই করা উচিত।'

এ বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে সিংজীর কথা শুনে মনে হলো, তিনি তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে যা বললেন, তা সম্ভবত সঠিক। তিনি সাবধানতা আর গতি, দুটোর ওপরেই সমান জোর দিয়ে কথাটা বললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু না মনে করলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

সিংজী বললেন, 'তার মানে রাইটার সাহেব, আপনি আমাকে এখনো আপনার একজন বন্ধু মনে করতে পারছেন না।'

আমি সংকুচিত লজ্জায় বললাম, 'না, না, তা বলছি না।'

সিংজী বললেন, 'তবে আপনি এত ফরমালিটি করে, আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন? আপনার যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন, কোনো কথাই গোপন করবো না।'

আমি বললাম, 'গোপনীয় বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করছি না, বরং একটু ডেলিকেট। যাই হোক, আপনার গাড়িতে কেউ কখনো চাপা পড়েছে?'

সিংজী বললেন, 'না, আপনাদের দয়ায় এখনো সেরকম কিছু ঘটেনি, তবে—।' বলে তিনি চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললেন, 'আমি জীবনে খুব জব্বর চাপা পড়েছি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি!'

সিংজী হা-হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি। বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, আপনাকে তখন যেমন বুলেটের দাগ দেখিয়েছিলাম, সেইরকম দেখিয়ে দেবো। তখন আপনি বলবেন, আমি জিন্দা না মুর্দা।'

আমি তথাপি তাঁর দিকে, তাঁর আপাদমস্তক দেখলাম। সিংজী আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন। গাড়ি তখন বনবাসীদের একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। জায়গাটা যে গ্রামের প্রান্তঃসীমা, বোঝা যাচ্ছে, রাস্তার এক ধারে, গাছপালার ছায়ায়, কয়েকটা দাঁড় করানো পাথর দেখে, যেগুলোর উচ্চতা পাঁচ ছ' ফুটের মতো। অনেকটা বাটনাবাটার শিলের মতো, কিন্তু প্রকৃত কোনো আকার ধারণ করে নি, কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো। একটু ছায়া অন্ধকারে

হঠাৎ দেখলে, ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। কতকগুলো মানুষের মূর্তি, পাশাপাশি মুখোমুখি, যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি, এটা সমাধিস্থান। অরণ্যের আরো কয়েক জায়গায় এরকম দেখেছি। সেইদিকে দেখে, আমি আবার সিংজীর দিকে তাকালাম।

সিংজী বললেন, 'তা বলে, আপনি আমাকে সত্যি একটা মুর্দা ভাববেন না, আমি এখনো জিন্দাই আছি, আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারেন। আমার ছায়াও পড়ে।'

সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে বলতে হয়, সিংজীর কথা, এবং সেই মুহূর্তেই বনবাসীদের নিরালা সমাধিস্থান দেখে, কয়েক নিমেষের জন্ম, আমার চিন্তা ভাবনা একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আমি আপনাকে কখনোই মুর্দা ভাবি নি।'

সিংজীর মুখ যেন এই মুহূর্তে আরো রক্তাভ দেখালো। সেটা অস্তগামী বেলার রক্তিম রোদের জন্ম কী না, বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন, 'তবে এক অর্থে, আমাকে আপনি মুর্দাই বলতে পারেন।'

সিংজী হাসলেন। কিন্তু এ হাসিতে, তাঁর স্বাভাবিক ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য নেই, বেলা শেষের এই রক্তিম আলোর মতোই ম্লান। তাঁর এই মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ আমার মনে হলো, তাঁর কথাগুলো সবই আলো অন্ধকারের ছায়ায় ঝাপ্‌সা। শুনতে এক রকম শোনায়, আসলে বলেন অন্ত কথা। সেই চর্যাপদের দোহার ভাষার মতো, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই যার নাম দিয়েছেন, সন্ধ্যা ভাষা। আমি বলি গূঢ় ভাষা।

গাড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকছে। আশেপাশে কয়েকটা চালা ঘর দেখা যাচ্ছে, যেগুলোর দেওয়াল টকটকে লাল মাটির। পথের ধুলোও লাল। জীপের গতি শ্লথ হলেও, লাল ধুলো উড়ছে এবং বেলা শেষের রক্তিম রোদের সঙ্গে মিশে, দোল খেলার আবীর ছোঁড়াছুঁড়ির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তথাপি, খানিকটা অভ্যাসবশতঃই নাকে রুমাল চাপা দিলাম ধুলোর ভয়ে।

গ্রামবাসীদের অনেকেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, সিংজীর জীপের দিকে তাকালো। লেংটি পরা পুরুষদের কেউ কেউ গাড়ির দিকে তাকিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানালো। সিংজী তাকিয়ে দেখলেন না, অতএব সেলামের জবাবটা কপালে হাত ঠেকিয়ে আমিই জানালাম। মেয়েরা কেউ কেউ মুখে হাত চাপা দিচ্ছে। মনে হয়, হাসিটা দেখাতে চায় না। কেউ কেউ অরিষ্টি, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে, গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

লেংটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে জীপ গাড়ি দেখছে। গৃহপালিত মোরগ-মুরগী কক্-কক্ করে ছোটাছুটি লাগিয়েছে।

আমি এসব দেখছি, কিন্তু আমার মনে বিচরণ করছে অন্য কথা। সিংজীর যে কথায় আমার চমক লেগেছে, তা হলো তাঁর গাড়িতে চাপা পড়ার কথা। তাঁর ভাষায় 'জব্বর চাপা', পড়েছিলেন, এবং বুলেটের দাগ যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি গাড়ি চাপা পড়ার দাগও আমাকে দেখাবেন। তাঁর এই ঋজু শক্ত শরীর দেখে, একটুও মনে হয় না, কোনো দৈব দুর্ঘটনা তাঁকে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করেছে।

জীপটা বরাহ আর্তনাদের মতো শব্দ করে, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। এক রাশ লাল ধুলো উড়ে গেল। দেখলাম, রাস্তার ধারেই, দুটি তরুণী বনবালা দাঁড়িয়ে পড়েছে। জীপটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, ওদের দুজনের আর সরবার জায়গা নেই। সরতে হলে, প্রায় বারো চৌদ্দ ফুট নিচে কোয়েনার জলে পড়তে হয়। পাহাড়ী নদী কোয়েনা, সারেণ্ডা বনের অনেক পাহাড় পর্বত ঘুরে, প্রায় সর্বত্র তার শাখা-প্রশাখায় জাল ছড়িয়ে রেখেছে। যে-পথেই যাওয়া যাক, কোয়েনা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

কিন্তু নিচের জলে পড়লে, তরুণী দুটির আঘাত লাগবে। কোয়েনার কল-কল স্রোতের তলায়, পাথরের ছড়াছড়ি। বনবালা দুটি ভীরু অবাক চোখে, সিংজী আর আমাকে দেখছে। ওদের ভীরু অবাক্ মুখে, হাসবে কি হাসবে না, এরকম একটি দ্বিধার ভাব। কী করতে চান সিংজী এদের নিয়ে? আমি জিজ্ঞাসু চোখে, তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বনবালাদের দিকে তাকিয়ে, আমার পক্ষে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন।

বনবালারা ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে, নিজেদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। তারপরে মুখে আঁচল চেপে খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসির সঙ্গে, ওদের শরীরের স্বল্পবাস তারুণ্যও যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আমি একটু স্বস্তিবোধ করলাম, যাই হোক, কোনো গুরুগম্ভীর ব্যাপার না।

সিংজী আবার কিছু বলে উঠলেন, ওদের ভাষায়। ওরা আবার আগের মতো হেসে উঠলো, এবং সিংজীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখালো। একটি তরুণী মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে, নিজের ভাষায় কী কথা বললো। তার জবাবে, সিংজীও কিছু বললেন। বনবালা দুটি আবার হেসে উঠলো, এবং হাসতে হাসতেই একজন কিছু বললো। সিংজী খুশী হওয়ার ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকিয়ে, পকেট থেকে তাঁর বিড়ির একটা বাণ্ডিল ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

ওরা প্রথমে একটু দ্বিধা করলো, তারপরে সিংজী কী কথা বলতে, একজন হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা নিল। সিংজী তাঁর গাড়ির এঞ্জিন চালু করলেন, হাত তুলে, ওদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলে, গাড়ি চালিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, 'আপনি হয় তো কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারেন নি?

বললাম, 'কিছুই না।'

সিংজী বললেন, 'এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। কিছুদিন এদের সঙ্গে মেশামেশি করলেই, মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। সুরপতিয়া আপনাকে কিছু শেখায় নি?'

বললাম, 'মনে করে রাখার মতো বিশেষ কিছু শেখায় নি। দু চারটি কথা মনে রাখতে পেরেছি।'

সিংজী হেসে বললেন, 'আমি গাড়িটা ওদের পাশে থামিয়ে দিয়েই বললাম, এটা কী করলে? তোমাদের দেখেই আমার গাড়িটা বিগড়ে গেল কেন? তোমরা নিশ্চয়ই কোনো তুক করেছ। ওরা প্রথমে ভেবেছিল, আমি বুঝি ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করছি। তারপরেই ওরা বুঝেছে, আমি আসলে ঠাট্টা করেছি, তাই হেসে উঠলো। বললো, তোমাকে আমরা চিনি। তোমার গাড়ি এ জঙ্গলে কেউ তুক করে খারাপ করতে পারবে না। তোমার মতলব কি? আমি বললাম, আমার মতলব হলো, তোমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাই। তাতে ওরা আবার হেসে উঠলো, কারণ জানে আমি সত্যি কথা বলছি না। ওরা আমাকে ভালোই চেনে। জিজ্ঞেস করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমি জায়গার নাম করে বললাম, ওখানে তোমাদের মতো দুজন থাকলে, আমার এই বন্ধুর একটু সেবা করা যায়।'

আমি একটু কুপিত বিস্ময়ে বললাম, 'সে কি, আপনি এ কথা বলতে গেলেন কেন?'

সিংজী বললেন, 'ভয় নেই, আপনার সম্মান আমি ক্ষুণ্ণ করি নি, ওরা সেভাবে কথা নেয় নি। ওরা বললো, হাটের ওপরে টিলার বাংলোয় যে চৌকিদার আছে, তার বউ তোমার বন্ধুর সেবা করতে পারবে। তোমরা থাকলে, আমরা কাল সকালে যাবো।... এইটুকুই কথা হয়েছে। ওরা আমার নাম আর চরিত্রের বিষয় সবই জানে। ওরা খারাপ ভাবে কিছু নেয় নি। তবে কাল সকালে ঠিক আসবে। আর, আমি এটা পথ চলতি, নিতান্তই একটু মজা করলাম। আপনি কি দুঃখিত হলেন?'

সিংজীর প্রশ্নে আমি চমকিত বিস্ময়ে বললাম, 'না না, দুঃখিত হবো কেন?'

এখানকার জীবন আর সমাজ সম্পর্কে আপনি আমার থেকে অভিজ্ঞ। কোথায় কাদের সঙ্গে কী বলা উচিত, তা আপনি ভালোই জানেন।'

সিংজী বললেন, 'তবু আপনি যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।'

কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। বনবালা দুটিকে দেখে সুরসতিয়ার কথাই আমার আগে মনে পড়ে গেল। কতটুকু সময়ই বা কেটেছে। আজ দুপুরে আমি ওর সঙ্গে, সেই গভীর জলাশয়ে স্নান করেছি। আমাদের ভূমিকা ছিল, পৃথিবীর আদি নারী পুরুষের। এখনো তার কোনো রেশ থেকেই আমি মুক্ত নই। সিংজীকে আমি চিনি না, বুঝিও না। প্রথমে অবিশ্যি ভুল ভেবেছিলাম, তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি নি। তাঁর মেজাজের মধ্যে কোথাও একটা উগ্রতা আছে, তা আমি অনুমানের অধিক অনুভব করেছি। অনুভূতি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের কি না, আমি জানি না। সহসা মনে হয়েছিল, তরুণী বনবালা দুটির প্রতি তিনি কোনো অন্যায় আচরণ করতে যাচ্ছেন। চোখের সামনে সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হতো না, অথচ তাঁর মতো প্রভাপান্বিত ব্যক্তির বিরোধিতা করাও অসম্ভব। অবিশ্যি, আমার মনে রাখা উচিত ছিল, সিংজী এই জঙ্গলে, এমন কি জঙ্গলের বাইরে, আধুনিক সভ্য জগতেও বিশেষ পরিচিত। তবু, অন্যমনস্ক হয়ে ওঠার কারণ, তরুণী দুটিকে বাংলোয় আহ্বান করা। আমি আর কোনো বনবালা, তরুণীর সঙ্গে মেলামেশা করতে চাই না।

গাড়ি গ্রামের সমতল ছেড়ে, আবার পাহাড়ের ওপর উঠছে। সিংজী বললেন, 'রাইটার সাহেব, আপনার অন্যমনস্কতার কারণ আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করবেন, আপনাকে দুঃখ দেবার কিছু করি নি। জগৎটা খুব অদ্ভুত, সেটা আপনি ভালোই জানেন। হয় তো আগামী কাল ওরা এলে, আপনার ভালোই লাগবে।'

আমি সিংজীর মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর সুচ্যগ্র দীর্ঘ গোঁফের ফাঁকে হাসিটি চতুর না, বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন।

গাড়ি পাহাড়ের একটা বাঁক নিয়ে আবো খানিকটা উঁচুতে উঠলো। সামনের উইণ্ডস্ক্রীনে, রক্তিম রোদের একটি ম্লান রেখা পড়লো। সিংজী বললেন, 'আমরা বাংলোয় পৌঁছে গেলাম।'

বলতে বলতেই, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, গাড়ি আর একটু উঁচুতে উঠেই, মোরাম পাথর বিছানো একটি চত্বরে ঢুকলো। একটি মোরগ আচমকা গাড়ি দেখেই পাখা ঝাপটা দিয়ে, কক্-কক্ করে পালিয়ে গেল। আমি আমার বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটি বৃহৎ বাংলো বাড়ির শান বাঁধানো বারান্দায়,

রঙ করা কয়েকটি বড় বড় বেতের চেয়ার। চেয়ার না বলে সোফা বলাই ভালো।
একটি কালো কুচকুচে যুবক, খাকী হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা যুবক ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে, সেলাম ঠুকলো।

সিংজী বললেন, 'আসুন, নামা যাক্। মালপত্র যা আছে, ওরা সব নামাবে।'

সিংজী বাঁ দিক দিয়ে নামলেন। বাঁ দিকেই স্টিয়ারিং। আমি ডান দিক দিয়ে নেমে, চারদিকে তাকিয়ে, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এটা এদেলবার মোহন-বাবুর সাময়িক পাতার ঘরের আস্তানা না। এ জায়গার সবকিছুই রাজকীয়। আমাকে মুগ্ধ করলো, স্থানটির মহিমা। একটি নাতিউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় আমি দাঁড়িয়ে। যেখানে দাঁড়ালে সারেণ্ডা বনের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। আমার চোখের সামনে, পশ্চিম দিগন্তের আকাশ লাল করে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। যে দিকেই দৃষ্টি যায়, নাম না জানা গাছে, নানা রঙের ফুলের বাহার। হলুদ, বেগুনি, সাদা, নানা রঙের ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা। কিন্তু এখন সকলেই গায়ে মেখেছে, অস্তগামী সূর্যের লাল ছটা।

আমি শুনতে পাচ্ছি, সিংজী কাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন। একাধিক লোক কথা বলছে, এবং একটা ব্যস্ত ত্রস্ত ছোটাছুটি লেগে গিয়েছে। আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সবুজ রঙের কাঠের রেলিং দিয়ে, অর্ধবৃত্ত চত্বর ঘেরা। রেলিং-এর নিচে থেকেই নেমে গিয়েছে খাদ, জঙ্গলে আবৃত।

চত্বর না বলে, জায়গাটিকে বাংলোর উঠোন বলাই সংগত। রেলিং-এর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, বেশ কিছু ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ রঙের কাঠের বেঞ্চি। আরাম করে বসবার জন্যে হেলান দেবার ব্যবস্থাও আছে। আর বেঞ্চিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, মোরাম সরিয়ে সযত্নে তৈরি ছোট ছোট ছকের ফুলের বাগান, নানা রঙের ফুল ফুটেছে।

দেখতে দেখতে একটু বাঁ দিকে চোখ পড়তেই, মনে হলো একটি সাঁকোর মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে মনে হলো মাথার ওপরে কেয়ারি করা লতাগুচ্ছের নিচে দিয়ে যেন একটি কুঞ্জবীথির দিকে যাবার সেতু। তার ভিতর এগিয়ে খানিকটা যেতেই দেখলাম, চওড়া কাঠের প্ল্যাটফরমের মতো, অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, তারপরেই রেলিং দিয়ে ঘেরা। সামনে গিয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বাংলোর নিচেই, পাহাড়ের খাদ বেয়ে যে মাঠ জলাশয়ের দিকে চলে গিয়েছে, আমি যেন সেই ঘাসজঙ্গলের মাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। আরো মনে হলো, আমি যেন

বাংলোর বাইরে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখান থেকে দাঁড়িয়ে, দূরের দৃশ্য যেন মুহূর্তে তার পট বদল করলো। আমি যেন অনেকটা, উঁচু শূন্য থেকে, পাখির মতো পাখা মেলে দিয়ে, দিগন্তের বনানীকে দেখতে পাচ্ছি।

পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। সিংজী এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন, 'আমিও ভাবছিলাম, রাইটার সাহেব নিশ্চয়ই এদিকে এসেছেন। মনে হচ্ছে, আপনি বনের সঙ্গে মিশে গেছেন?'

আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে আসছিল, 'আমি প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছি। এ বনের নাম দেবো প্রেম বন।' কিন্তু সিংজীকে তা বলা সম্ভব না। সঙ্কোচ আর লজ্জাই শুধু না, উনি আবার কী ভাবে কথাটা নেবেন, কে জানে। বললাম, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ সিংজী, এরকম একটি জায়গায় নিয়ে আসার জন্য। অপূর্ব!'

সিংজী বললেন, 'ধন্যবাদটা আমাকে দেবেন না। যা দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন, ধন্যবাদ দিন তাকেই।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি হঠাৎ যেন গোপন কথা বলার মতো, আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমি এই বনপ্রকৃতির কথা বলছি।' বলেই তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন, এবং আবার বললেন, 'কী, ঠিক বলি নি?'

আমি বললাম, 'ঠিকই। বনপ্রকৃতির কাছে তো আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু এখানে নিয়ে আসার জন্য, আমি আপনার কাছেও কৃতজ্ঞ।'

সিংজী আমার কাঁধে তাঁর চওড়া থাবা রেখে বললেন, 'ঠিক আছে ভাই রাইটার সাহেব, এটা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়, আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার একটু হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক ছেড়ে, গা ছেড়ে একটু বসা যাক্। আমি ওদের চা করতে বলে দিয়েছি, আর চাল ভেজে তেল লংকা পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে দিতে বলেছি।'

আমি বলে উঠলাম, 'চমৎকার!'

সিংজী বললেন, 'কয়েকটা ডিম ভাজতেও বলেছি।'

আমি বললাম, 'ওটাই হবে অতিরিক্ত।'

সিংজী বললেন, 'কিছুই না, আপনাকে আমি সব বিলকুল হজম করিয়ে দেবো।'

বলে, একটি চোখের পাতা বুজে ইশারা করলেন। কিন্তু বড় ভয়ের ব্যাপার। ইশারাটা নিতান্তই দুর্বোধ্য। কীভাবে তিনি বিলকুল হজম

করাবেন? পদ্ধতিটা কী?

সিংজী আবার হা-হা করে হেসে, আমার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে বললেন, 'চলুন। ভয় নেই।' আমি তাঁর সঙ্গে ফিরতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, সিংজী, এটা কী, এই প্ল্যাটফরমটা?'

সিংজী বললেন, 'প্ল্যাটফরমই বলতে পারেন। ওকে শুটিং প্ল্যাটফরম না বলে, ভিউফাইণ্ডিং প্ল্যাটফরম বলতে পারেন। এটা শিকারের জন্য তৈরি হয় নি, চারিদিকের দৃশ্য দেখবার জন্যই। তবে ধরুন, আমি যদি এখন দেখি, নিচের ওই মাঠ দিয়ে, একটা দাঁতালো শুয়োর চলে যাচ্ছে, তা হলে কি আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? আমি ছুটে গিয়ে, আমার সাইড হ্যামারটা নিয়ে এসে কাজে লাগাবো।'

এই কথার মধ্য দিয়েই যেন সিংজীর ভিতরটাকে কিছুটা দেখা যায়। তাঁর জীবনের চিন্তা-ভাবনা অন্যরকম। তিনি আমার বনপ্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা বোঝেন, অথচ নিজে শিকারের কথা ভাবেন।

সিংজী চলতে চলতে বললেন, 'কথাটা বোধহয় আপনার ভালো লাগলো না, না?'

আমি হেসে বললাম, 'সৌভাগ্যবশতঃ আমি বন্দুক চালাতে শিখি নি।'

সিংজী হেসে বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, যারা বন্দুক চালাতে শিখেছে, তারা দুর্ভাগা?'

তাঁর পালটা প্রশ্নে আমি চমকে উঠে বললাম, 'না না, আমি মোটেই তা বলতে চাই নি।'

সিংজী বললেন, 'তার জন্য আপনি এত সংকুচিত হচ্ছেন কেন? আপনি 'না না' বললেও আমি জানি, ওটা আপনার সাবকন্সাস্ মাইণ্ডে আছে। কিন্তু আমি তাতে কিছুই মনে করছি না এই কারণে, আমাদের সকলের মধ্যেই বিভিন্নতা আছে, তথাপি আমরা এক সঙ্গে মেলামেশা করি, কারণ, এই কনট্রাস্টই আসলে সৌন্দর্য। শিকার করাটা আমার কাছে একটা অত্যন্ত উত্তেজক আর আনন্দের খেলার বিষয়। কিন্তু যারা বন্যপ্রাণীদের জন্য মমতাবোধ করেন, তাঁদের কাছে, আমি হয় তো একটা মূর্তিমান কালান্তক যম।'

বলে তিনি আবার হেসে উঠলেন। আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো বন্যপ্রাণীদের খুব ভয় পাই। তবে, আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে, তার রাজ্যে, তার শান্তিভঙ্গ করতে চাই না।'

সিংজী বললেন, 'সম্ভবত আমিও না। আসলে বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমার

একটু প্রীতিই আছে। তবে, সকলের ওপরে না। আমি আমার একুশ বছর বয়সে, চক্রধরপুরে একটি হাতী মেরেছিলাম। আর কখনো মারি নি। কিন্তু তার আগে, সেই হাতীটা, অন্তত আট-ন' জনকে হত্যা করেছে। তার মধ্যে, এক বছরের শিশুও বাদ যায় নি। তা ছাড়া, কম করে, এক ডজন গরীবের চালা ঘর মাটিতে ধসিয়ে দিয়েছে। সে একটা ভয়ংকর ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। সে যাই হোক, আমার শিকারের গল্প আপনাকে আমি পরে শোনাবো। শুধু এইটুকু আপনাকে বলে রাখি, যে কোনো নিরামিষাশী বন্য পশুকেই আমি ভালোবাসি. একমাত্র দাঁতালো শুয়োর ছাড়া।'

আমি একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

তিনি বললেন, 'দাঁতালো শুয়োর, আপনাদের বাঙলা মুলুকের কেউটে সাপ, এরা কারোকে ক্ষমা করে না, সামনে পড়লেই তাকে আক্রমণ করে, এবং সে আক্রমণ একেবারে নির্ঘাত প্রাণঘাতী। কারণটা কী জানেন্ ?'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'ওরা যতো হিংস্র, আসলে ততটাই ভীরু। ভীরু আর সন্দিগ্ধ বলেই, ওরা আগেই সবাইকে শত্রু ভেবে আক্রমণ করে।'

সিংজীব কথা শুনে, আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি, কেউটে সাপ নাকি তার নিজের ছায়াকেও ছোবল মারে। সেটা কি এই কারণেই ?

তিনি আবার বললেন, 'আপনার সামনে হঠাৎ যদি একটা বাঘ পড়ে, সে হয় তো আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে, যদি সে নিতান্ত ভয় না পেয়ে যায়, তাহলে সে আপনাকে এড়িয়ে, গা ঢাকা দিয়ে, আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করবে। কিন্তু আপনি যদি একটা দাঁতালো বুনো শুয়োরের সামনে পড়ে যান, আপনার রক্ষে নেই। সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে, আপনাকে ফালা ফালা করে দেবে।'

কথা বলতে বলতে আমরা বাংলোর বারান্দায় উঠে এলাম। আমি প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বললাম, 'তার মানে তো মৃত্যু।'

সিংজী বললেন, 'হ্যাঁ, এমন মৃত্যুর সংখ্যা, এ জঙ্গলে খুব কম নেই। কেউ কেউ, বুনো শুয়োরের আক্রমণে বেঁচে গেলেও, চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেছে। দাঁতালো বুনো শুয়োর আমি বড় একটা ছেড়ে দিই না। তা ছাড়া—।'

কথা শেষ না করে একটু হাসলেন, এবং আবার বললেন, 'বনের মানুষদের ভোজটা ভালোই হয়। বরাহ মাংস ওদের খুবই প্রিয়। বরাহ বা বনমোরগ মারার জন্য, ওদের কোনো নিষেধ নেই, কেননা ওগুলো বনের মানুষদের খাদ্য।

কিন্তু হরিণ বা ময়ূর মারা নিষেধ। তবে ময়ূর পেলে ওরা ছেড়ে দেয় না।'

কথাবার্তার মধ্যেই লোহার নেটের জালে ঘেরা দরজা বন্ধ পাল্লা দিয়ে দেখতে পেলাম, ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলো জ্বালানো হচ্ছে। আকাশের রক্তাভা বিলীনপ্রায়, সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় হয়ে আসছে। সিংজী বললেন, 'চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।'

আমি তাঁকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। মাঝখানে একটি বড় গোল টেবিল, তার ওপরে হ্যারিকেন জ্বলছে। ধুতির ওপরে, হাফ শার্ট পরা একটি মাঝবয়সী লোক, আমার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম দিল। আমিও তার জবাব দিলাম। সে সিংজীর দিকে তাকিয়ে এখানকার বনপাহাড়ী হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, 'হাজাক বাত্তি জ্বালা দেগা সাব?'

সিংজী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাইটার সাহেব কী বলেন, হ্যাজাক জ্বালাবার দরকার আছে?'

আমার মনে হলো না, উজ্জ্বল আলোর কোনো প্রয়োজন আছে। গভীর এই বনের, পাহাড়ী টিলার ওপরে, হ্যারিকেনের রক্তিম আলোই ভালো। হ্যাজাকের আলো বনের রাত্রির নিবিড়তাকেই চাবুকের কষায় চমকিয়ে দেবে। বললাম, 'থাক্ না। আমার তো খারাপ লাগছে না। দরকারই বা কী?'

সিংজী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মারাংহোরো হুজ্জোতি করতা আভি? ইধার আতা হ্যায়?'

লোকটি বললো, 'নেই, উত্না হুজ্জোতি নাই করতা। দু তিন হপ্তা আগে, তিনঠো মারাংহোরো বাংলা মে আয়া রহা। কুছ্ কিয়া নেই, আপনেই ভাগ গয়া।'

তার মানে দু তিন সপ্তাহ আগে, বাংলোতে তিনটি হাতী এসেছিল! মারাংহোরো যে হাতী, তা আমি আগেই জেনেছি। 'ওত্না হুজ্জোতি নাই করতা' তার মানেই বা কী? হুজ্জোতি করে, তবে তত্তোটা না? আমি সিংজীর দিকে তাকালাম। তাঁর মুখে চিন্তা বা উদ্বেগের কোনো ছায়া নেই। বললেন, 'উস্‌মে কুছ্ নাই হোগা। তুম্ সব ঘর মে বাত্তি দে দে। টাংকি মে পানি ভরতি হো গয়া?'

লোকটি বললো, 'হাঁ সাব।'

সিংজী বললেন, 'বহুত আচ্ছা। কাল কুছ্ মেহমান বাংলোমে আয়েগা।'

লোকটি বললো, 'জানতা হ্যায় সাব।'

সিংজী বললেন, 'কাল রাতমে হাজাক জালনে পড়েগা, ঠিক রাখনা।'

লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'জী সাব।'

গোল টেবিলের ওপরে, আরো চারটি হ্যারিকেন ছিল। সেগুলো এখনো জ্বালানো হয় নি। লোকটি সেগুলো নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি সিংজীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কি হাতী হুজ্জোত করে নাকি?'

তিনি বললেন, 'এ বাংলোতে আর হুজ্জোত কী করবে। নিচে, গ্রামের চাষবাসের কিছু ক্ষতি করে। আগুন জ্বালিয়ে, কেনেস্তারা পেটালেই পালিয়ে যায়। দুষ্টু হচ্ছে ময়ূরগুলো। ওরা রাত্রে বিশেষ আসে না বটে, কিন্তু দিনের বেলা, যখন তখন কচি কচি শস্য, ছড়ানো বীজ খেয়ে ফেলে। আর তাতেই, এদের তীরধনুকে ময়ূর মারা পড়ে।'

আমার জিজ্ঞাসাটা একটু ভিন্নতর, বললাম, 'হাতীরা বাংলোয় এসেছিল?'

সিংজী বললেন, 'শুনলাম তো তা-ই। তবে সেটা বিপজ্জনক কিছু না, নিতান্তই জানোয়ারের কৌতূহল। আপনার তাতে ভয় পাবার কী আছে। এদেলবার জঙ্গলে, পাতার ঘরে বাস করে এলেন, তারপরে আর ভয় থাকার কোনো কারণ নেই।'

নেই, তা হয় তো ঠিক, কিন্তু মন যে মানতে চায় না, সেটা অস্বীকার করি কেমন করে। সিংজী আবার বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

আমি এতক্ষণে ঘরটার চারদিকে তাকাবার অবকাশ পেলাম। এ গভীর বনের মধ্যে, ব্যবস্থা রাজকীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গোল টেবিলের বাঁ পাশে রয়েছে বড় ডিম্বাকৃতি আয়না সহকারে ড্রেসিং টেবিল, ডান দিকে ডাবল বেডের খাট। বিছানা দেখে, স্পর্শ না করেও অনুমান করা যায়, অতি আরামদায়ক নরম গদির বিছানা। তেমনি ধবধবে পরিচ্ছন্ন বালিশ। ড্রেসিং টেবিলের বাঁ দিকে একটি ওয়ারড্রব, তার পাশেই পাশের ঘরে যাবার দরজা। সে-ঘরেও এইমাত্র হ্যারিকেন জ্বলে উঠলো। আমার মুখোমুখি, বিপরীত দিকে দুটি দরজা। একটি দরজা লোহার জাল দেওয়া পাল্লা, সেটি বন্ধ, বাইরে সদ্য নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকার অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অন্যটি বন্ধ।

সিংজী আমার লক্ষ্য করা দেখে, জিজ্ঞেস্ করলেন, 'কীরকম বুঝছেন, খুব অসুবিধে হবে না তো?'

অসুবিধে? সিংজীর বিনয় বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, বিদ্রূপ না হলেই হলো। বললাম, 'এই গভীর বনের মধ্যে, আমি তো এরকম ব্যবস্থার

কথা ভাবতেই পারি না।'

তিনি বললেন, 'এ জঙ্গলে, এরকম বাংলো কমই আছে। ইংরেজদের তৈরি। কাজ আর আরাম, দুটো বিষয়ে ওরা আমাদের থেকে একটু আলাদা বুঝতো। চলুন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই। বলে তিনি, গোল টেবিলের ওপর থেকে, হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে, এ ঘরের খাটের ডান দিকে একটি ছোট বন্ধ দরজা ঠেলে খুললেন। এ দরজাটা আমি খেয়ালই করি নি। দেখলাম, ডান পাশেও একটি ঘর। এ ঘরে একটি এক শয্যাবিশিষ্ট খাট। সংলগ্ন বাথরুম। সিংজী বললেন, 'এটি একটি ঘর, একজনের থাকবার। একটু ছোট, কিন্তু আরামদায়ক। এর পাশেই যে-ঘরটা প্রথম দেখলেন, আমি ভাবছি, আগামীকাল যে অতিথিরা আসছেন, তাঁদের জন্য, এই দুটি ঘর ছেড়ে দেব।'

বলে, তিনি আগের ঘর ডিঙিয়ে ওয়ারড্রবের পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকলেন। এ-ঘরে দুটি খাট, দুটি বিছানা, একটি ড্রেসিং টেবিল এবং একটি ওয়ারড্রব। সিংজী বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দেখলাম, বালতি, টিনের বড বাথ টাব, কল আর বেসিন রয়েছে। সিংজী ভিতরে ঢুকে, বেসিনের ট্যাংকের কল ঘোরাতেই কলকল করে জল পড়লো। আমি রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এই জঙ্গলে, কল ঘোরাতেই জল? সিংজী বললেন, 'সবই ঠিক আছে, নেই কেবল বিজলী।'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিজলী নেই তো জল আসছে কেমন করে?'

সিংজী একটু হেসে বললেন, 'ম্যান পাওয়ারের দ্বারা। এখানে পাহাড়ের ওপর কুয়ো খনন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বাংলোতে তা আছে। বড় জলের ট্যাংকও আছে। লোকজন, কুয়োর জল দিয়ে, ট্যাংক ভরেছে।'

আমি বললাম, 'যথেষ্ট, এর পরে আর বিজলীর দরকারই বা কী?'

সিংজী বললেন, 'একটু আছে। প্রত্যেক খাটেই মশারি টাঙাতে হয়। মশা তেমন নেই, কিন্তু মশা ছাড়াও জঙ্গলে নানান রকম পোকামাকড় আছে, সেগুলো অত্যন্ত বিষাক্ত, কামড়ালে বিপদ ঘটতে পারে, সেজন্যও মশারি দরকার। কিন্তু গরম থাকলে, কষ্ট হয়, বাতাসের অভাব। হাতপাখা কতক্ষণ টানা যায়। অবিশ্যি টানা পাখা আছে, কিন্তু সারারাত্রি টানবার লোকের অভাব।'

তাঁর কথা শুনে মাথা তুলে দেখলাম, টানা পাখা ঝুলছে। এতক্ষণ খেয়াল করি নি। আসলে হ্যারিকেনের আলোয়, নজরটা ওদিকে যায় নি।

সিংজী আবার বললেন, 'তবে গরমকালেও, রাত্রের দিকে, এখানে ঠাণ্ডা

লাগে, সেটাই যাঁ রক্ষে।'

এ ঘরে খাট ছাড়া, ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটি চেয়ার। মাঝের ঘরটির গোল টেবিল ঘিরে, বেশ কয়েকটি সোফা রয়েছে। অনুমান করা যায়, রাত্রে, মাঝের ঘরটা ড্রয়িং রুমের কাজও দেয়।

সিংজী বললেন, 'রাইটার সাহেব, আপনি আর আমি এ ঘরে থাকবো, ও ঘর দুটো অতিথিদের দেওয়া হবে, আপত্তি নেই তো?'

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'না না, আপত্তি আবার কিসের, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।'

সিংজী চোখের একটু ভঙ্গী করে বললেন, 'আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে কী না, সেটা আপনিই জানেন।'

বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে আবার বললেন, 'ওয়ারড্রবের কাছে আপনার স্যুটকেশ আছে। স্নান করে পোশাক বদলে নিন। আমি মাঝের ঘরের বাথরুমে যাচ্ছি, এক সঙ্গেই দুজনের হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু হ্যারিকেন বাথরুমের ভেতরে নিয়ে যাবেন, আলো ছাড়া যাবেন না।'

একটু ভয় পেয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

তিনি বললেন, 'অন্ধকারে চান করতে অসুবিধা হবে। তা ছাড়া, বিছে টিছে থাকতে পারে। চাই কি, কোনো এক কোণে হয় তো দেখলেন, একটা অজগর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রয়েছে।'

বলেই তাড়াতাড়ি আবার দু পা এগিয়ে এসে বললেন, 'এমনি বললাম। ভয় পাবেন না। এ জঙ্গলের পাইথনও খুব নাম করা। এ সব বাংলোতে তো সব সময়ে লোকজন আসে না, বা থাকে না, খালিই পড়ে থাকে। আর এই যে সব বাবাজীদের দেখছেন, চৌকিদার আর তার লোকজন, কাজকর্ম না থাকলে, বাবুদের মহুলাসিদ্ধ রস খেয়েই সময় কেটে যায়। ওরা বস্তুটাকে বলে, 'সড়গা'।'

মদেরই কত প্রকার নাম শুনলাম। মদ্‌গম, সড়গা, ডিয়েং। হয় তো এখনো আরো কিছু শোনা বাকী আছে। কিন্তু সিংজীর কথা শুনে, একটু যেন ভয়ই পেলাম। তিনি চলে যাবার পরে, আমি হ্যারিকেন নিয়ে ঘরের কোণগুলো দৃষ্টি ফেলে দেখলাম। বলাই বা যায় কী। হয় তো খাটের নিচেই একটা মস্ত বড় অজগর গুটিসুটি কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। সময়মতো পেঁচিয়ে ধরে, গ্রাসে পুরলেই হলো। গাটা শিউরে উঠলো!

আসলে, এটাও এক ধরনের অবসেশন। বেশী ভাবলেই, চেপে ধরবে। অতএব মাভৈঃ! নিজের মতো চলাফেরা করা যাক।

স্নান করে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরে, মাঝের ঘরে এসে দেখলাম সিংজী নেই। তিনি তখনো বাথরুমে আছেন কী না, এ কথা ভাববার মুহূর্তেই বাইরে থেকে ওঁর গলা শুনতে পেলাম, 'রাইটার সাহেব, বাইরে আসুন, এখানে বসে চা পান আর চালভাজা চিবোনো যাক।'

আমি জালের দরজা খুলে বাইরে গেলাম। বেতের চেয়ারের সামনে, বেতেরই টেবিলের ওপর, হ্যারিকেন জ্বলছে। সিংজী পাঞ্জাবির সঙ্গে, লুঙ্গি পরেছেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, সামনের অন্ধকার থেকে একজন হ্যারিকেনের আলোর সীমানায় এগিয়ে এলো। দেখলাম, ওর হাতে ট্রে। সে বারান্দায় উঠে এসে, টেবিলের ওপর ট্রে রাখলো। চা এবং দুটি পাত্রে চালভাজা। দুটি প্লেটে ডিমের ওমলেট।

লোকটি টি-পট থেকে কাপে চা ঢালবার উদ্যোগ করতেই, সিংজী বললেন, 'ছোড় দো, হম বনা লেগা। তুম অন্দর মে যাকর, মশারি লাগা দো।'

এ সেই প্রথম দেখা, খাকী হাফ প্যাণ্ট হাফ শার্ট পরা যুবক। বললো, 'জী।'

বলে চলে গেল। সিংজী বললেন, 'নিন, চালভাজা চিবোন।'

তিনি তাঁর নিজের পাত্রটি তুলে নিয়ে বললেন, 'রাইটার সাহেব, আপনাকে একবারও জিজ্ঞেস করা হয় নি, আমার ছোট নাগরার বাড়িতে আপনার কোনো অসুবিধে হয় নি তো?'

আমি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একটুও না। বরং আপনি এভাবে বললে, আমি সংকোচ বোধ করি। আমি ছোট নাগরায়, আপনার বাড়িতে খুবই ভালো ছিলাম।'

সিংজী বললেন, 'অবিশ্যি, ছোট নাগরার বাঙালী নার্স মেয়েটিও শুনলাম, আপনাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে একদিন।'

আমি সিংজীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ওঁকে একটু ভয়ই পাই। কী ভেবে বলছেন, কে জানে। কিন্তু মুখ দেখে, সেরকম কিছু মনে হলো না। বললাম, 'হ্যাঁ। ছাড়লো না কিছুতেই।'

সিংজী বললেন, 'আমি জানি, মেয়েটি খুব ভালো। তৃপ্তি এই জঙ্গলের

মানুষদের ভালোবাসে। ভালো না বাসলে, এভাবে একটি বাঙালী মেয়ে একলা এই জঙ্গলে থাকতে পারতো না। আপনার সঙ্গে কি আগেই ওর জানাশোনা ছিল?'

বললাম, 'না, একেবারে আচমকা, এখানেই পরিচয়। বোধহয় পরিচয়টা পেলো বলেই, নিমন্ত্রণটা আমার কপালে জুটে গেল।'

সিংজী বললেন, 'তা কেন? আপনি রাইটার লোক, যেখানে যাবেন, সবাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করবে। ও আমাকে বলছিল, আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়। আমি বলেছি, সময় পেলে যেন, এই থলকোবাদ বাংলোয় চলে আসে। আপনাকে চিঠিতে আসবে বলেই লিখেছে তো?'

আমি বললাম, 'পরিষ্কার করে সেরকম কিছু লেখে নি, তবে আসবার ইচ্ছা জানিয়েছে।'

সিংজী সাহেব আর কিছু বললেন না। আমার চোখের সামনে, তৃপ্তির মুখটি ভেসে উঠলো। তৃপ্তি ভৌমিক। দমদমে বাড়ি, বাড়িতে বিধবা মা আর ছোট ভাইবোনেরা আছে। এই জঙ্গলের, ছোট নাগরা ব্লকের হেলথ্ সেণ্টারে নার্সের চাকরি করে, যেখানে ওষুধ-বিষুধ কিছুই প্রায় নেই, ডাক্তার মর্জি মতো, মাঝে মাঝে দয়া করে আসেন। তৃপ্তি মাসে মাসে, বড় জামদায় গিয়ে, ওর মাসের মাইনে আর খাবার-দাবার কিনে নিয়ে আসে। টাকা পাঠায় দমদমে। একটি তরুণী বাঙালী মেয়ে, এই গভীর জঙ্গলে চাকরি করে টাকা পাঠায় মাকে, রক্ষা করে ভাইবোনকে, আর জঙ্গলের অধিবাসীদের সেবা করে। দেখে যে কেবল শ্রদ্ধা করেছি, তা বলবো না, ওর সান্নিধ্যে গিয়ে খানিকটা আবেগ-প্রবণও হয়ে পড়েছিলাম। বেড়াতে গিয়ে, ওর মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতে গিয়ে, স্বভাবতই একটা কথা বিশেষভাবে মনে হয়েছিল। ওর বয়সের মেয়েদের, সীমন্তে সিঁদুর নিয়ে, ইতিমধ্যেই গৃহবধূরূপে কোথাও বিরাজ করার কথা। অথচ জীবন ওকে আজ কোথায় টেনে এনেছে। বলতে গেলে, একরকমের বনবাস। তৃপ্তির ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে এদেলবায় যাবে। এদেলবা যাবার সময় ওর জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলাম, ও এসে জানিয়েছিল, একটি মেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে, ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে পড়েছিল, আর আমার ভিতরটা গিয়েছিল ভিজে। বলেছিল, আবার আমাদের দেখা হবে। জানি না, তৃপ্তির সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কী না।

সিংজী বলে উঠলেন, 'চা খান রাইটার সাহেব, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

আমি একটু চমকে উঠলাম, লজ্জিতও হলাম। সিংজী কাপে চা ঢেলেছেন।

তাঁর চালভাজা আর ডিম দুই-ই খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি চালভাজা চিবোতে চিবোতে, চায়ের কাপ তুলে নিলাম।

সিংজী বললেন, 'তৃপ্তির কথা ভাবছিলেন বুঝি ?'

অস্বীকার করার উপায় ছিল না, বললাম, 'হ্যাঁ, মেয়েটি বড় দুঃখী।'

সিংজী বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমাদের দুঃখটা কেউ দেখতে চায় না।'

আমি অবাক্ চোখে সিংজীর দিকে তাকালাম। সিংজী হেসে বলে উঠলেন, 'এমনি ঠাট্টা করে বললাম। আমার আবার দুঃখটা কী। আমার টাটায় বড ব্যবসা আছে। রাউরকেলা স্টিল প্ল্যাণ্টের সঙ্গেও আমার কারবার বেশ ভালো। তা ছাড়া, জঙ্গলের ইজারাদারি তো আছেই। কোনো কিছুরই অভাব নেই। তা সে ওয়াইন অ্যাণ্ড ওম্যান যাই বলুন, সব চাইলেই পেতে পারি।'

সিংজী চুপ করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই পাওয়াটাই কি সব পাওয়া ? টাকা সম্পত্তি ক্ষমতা আর প্রমোদ ? কিন্তু সিংজী নিজেই বলেছেন, সব মানুষ এক-রকম হয় না। অবিশ্যি জরাইকেলায় শুনেছিলাম, তাঁর একমাত্র ছেলে টাটায় চিকিৎসিত হচ্ছে, পোলিওতে ভুগছে। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে সেখানেই আছেন।

সিংজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন বাইটার সাহেব ?'

বললাম, 'আপনার কথাগুলোই।'

'কী ভাবছেন ?'

'মনে হচ্ছে, ঠিক সুখী মানুষের কথা আপনি বলেন নি।'

'সেটা আপনি বাইটার বলে ভাবছেন। পৃথিবীব বেশির ভাগ মানুষ কী চায় ?'

হঠাৎ আমার একটা হাস্যকর কথা মনে পডে গেল। আমার এক অবিবাহিত শিক্ষক বন্ধু একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মানুষ চায় মেয়েমানুষ।' আমি সিংজীকে বললাম, 'বেশির ভাগ মানুষ, আমার ধারণা, খেয়ে পরে সুস্থভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায়।'

সিংজী বললেন, 'রাইটাব সাহেব, আপনাকে তো আমি ফরমায়েশি কথা বলতে বলি নি। এ যা আপনি বললেন, অনেকটা ফরমায়েশি লেখার মতো, বক্তৃতার মতো শোনালো। তা হলে, আপনাকে তো আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম, বনের পশুরা কী চায় ? আপনি কি বলতেন, তারা না খেয়ে, অসুস্থ অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায় ? খাবার কথাটা কেবল বাদ রাখলাম।'

আমি সিংজীর কথায় একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। ঠিক এরকমভাবে আমি ভাবি নি, বা পালটা প্রশ্নটা যে ঠিক এ ভাবে আসতে পারে, তাও চিন্তা করি নি। এটা তো ঠিকই, মানুষ বা পশু, কে-ই বা ক্ষুধা অসুস্থতা অস্বাভাবিকতা চায়। বললাম, 'মাফ করবেন সিংজী, ঠিক এরকম ভেবে আমি কিছু বলি নি। কমন ভাবেই বলেছিলাম। আমার বলা উচিত ছিল, মানুষ, মানুষের মতোই বাঁচতে চায়।'

সিংজী বললেন, 'বেশ তো, কিন্তু মানুষ তো আপনার কলের মানুষ না। সবাই কি একরকমভাবে বাঁচতে চায়? আপনি কি আমার মতো জীবন নিয়ে বাঁচতে চান?'

বললাম, 'না।'

সিংজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? আমি আপনার থেকে বড়লোক, আপনার থেকে জীবন আমার বেশী ভোগের, অসুবিধাটা কী?'

আমি সিংজী সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, 'মানুষের বাঁচার নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো বাদ দিলে, তার বাঁচতে চাওয়ার ব্যাপারটা আপেক্ষিক। আমরা কে কী ভাবে বাঁচতে চাই বা কী না চাই, সেটা নির্ভর করে, আমার পরিবেশগত ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে।'

'কিন্তু আপনি একটা সহজ কথা কেন বলছেন না রাইটার সাহেব, মানুষ একটু শান্তিতে বাঁচতে চায়। পারে কি না পারে, সেটা আলাদা কথা।'

বলতে বলতে সিংজী হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে হ্যাঁ, কথাটা শুনতে যতো সহজ শোনায়, ততো সোজা কখনোই নয়। শান্তি পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। পেতে চাইলেই, তো জোটে না। রাইটার সাহেব, আপনি জীবনে কীরকম শান্তি পেয়েছেন?'

এরকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সিংজীর কথা শুনছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, শান্তি পাওয়ার ইচ্ছার গভীর উপলব্ধি, না থাকলে, এভাবে কেউ ভাবতেও পারে না, বলতেও পারে না। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসায়, আমি যেন একটু থতিয়ে গেলাম। সেই বিখ্যাত জাপানী ছোট্ট কবিতাটি মনে পড়ে যায়, 'কী করি কোথা যাই/কোথা গেলে শান্তি পাই/ভাবিলাম বনে গিয়া/জুড়াইব তাপিত হিয়া।/শুনি সেথা অর্ধরাত্রে/কাঁদে মৃগী কম্প্র গাত্রে।'...

সিংজী সাহেবের গলায় একটু হাসির শব্দ হলো, বললেন, 'বলতে পারছেন না, না?'

আমি কোনো দ্বিধা না করেই বললাম, 'সিংজী, শান্তি কথাটা গভীর অর্থ-ব্যঞ্জক বলে আমার মনে হয়। ওটাও আপেক্ষিক, আমার ধারণা শান্তি ব্যাপারটা অনুভূতির বিষয়। সকলের শান্তি পাওয়ার অনুভূতিটা এক না।'

সিংজী বললেন, 'আপনি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম!'

বললাম, 'সেটাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। শান্তি বস্তুটা নিজেকে মন দিয়ে সৃষ্টি করে নিতে হয় বলে আমি মনে করি, কিন্তু আমি তা পারি নি।'

সিংজী বললেন, 'পথে আসুন। বলতে পারতেন, নিজের মনে শান্তি সৃষ্টি করার জন্যই, আপনার এই বনে জঙ্গলে ছুটে আসা।'

বলে তিনি হা-হা করে হাসলেন। তাঁর কথা একেবারে মিথ্যা, তা বলবো না। শান্তি সৃষ্টির জন্যই এসেছি কী না জানি না, এ আমার ভালোবাসার টান। আমি সিংজীর দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার জীবনে শান্তির অবস্থান কীরকম?'

সিংজী পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে, নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, 'রাহুর মতো।'

বলে, তাঁর বিশেষভাবে তৈরি, লম্বা বিড়িটি ধরালেন। আমি ভ্রূকুটি বিস্ময়ে তাঁর দিকে দেখলাম। তিনি ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কথাটা বুঝতে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে রাইটার সাহেব? তা হলে আরো পরিষ্কার করে বলি, ও বস্তুটি আমার ভাগ্যে কখনো জোটে নি। আপনি অবিশ্যি ভিন্ন জগতেব মানুষ, শান্তিকে আপনি সৃষ্টি করতে চান মনের মধ্যে। আমি আপনার মতো করে ভাবতে পারি না। কিন্তু শান্তি? সে আমার কাছেও নেই, কোনোদিন ছিলও না। যদি মত্ততার অচেতনতাকে শান্তি বলা যায়, তা হলে আমি মাঝে মাঝে শান্তি পাই। খোয়ারি ভাঙতে বেশী সময় লাগে না, আর ভাঙলেই, সেই ক্ষণকালের শান্তি, আরো বেশী যন্ত্রণাদায়ক রাহুর গ্রাসের মতো, আমাকে গ্রাস করে।'

সিংজী কথা থামিয়ে তাঁর দীর্ঘ বিড়িতে টান দিলেন, ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললেন, 'শুতে বসতে খেতে, কোনো কিছুতেই তা নেই। আমার কাজের মধ্যে, শান্তির লেশও নেই। আর আমার সংসার? আমার বাবা মা অনেকদিন মারা গেছেন। আমার নিজের কোনো ভাইবোন নেই। আমি যাকে বিয়ে করেছি, সে পাটনার এক বড়লোকের মেয়ে, প্রভা তার নাম। সব মেয়েরাই ছেলেবেলা থেকে, তার স্বামী কেমন হবে, তার একটা ছবি এঁকে

নোর। খোঁটাখুটি হয় তো, সকলেরই মনের ছবিটাই এক। কিন্তু বিয়ের পরে, প্রভা কী দেখলো? ওর কল্পনা বা বাস্তব, কোনো দিক দিয়েই, আমাকে মেলাতে পারলো না। ও সুখী হতে পারে নি। আমি কি ওকে সুখী করবার চেষ্টা করেছি? না, তাও করি নি, কারণ আমি জানতাম, আমার সেই চেষ্টা হতো মেকী, আর সংঘর্ষ লাগতো অনিবার্য। তার ফল হয়েছে, আমরা সংঘর্ষ বাঁচাতে গিয়ে, দুজনে এক ঘরে, অচেনা জীবন যাপন করেছি। যেন ভদ্র আর অমায়িক, দুই আবাসিক। প্রভা যদি নিতান্ত অশিক্ষিতা হতো, তা হলে এটা সম্ভব হতো না। একদিকে ওর আত্মসম্মান বোধ প্রবল, আর একদিকে খুবই অসহায়, আমাকে ছেড়েও যেতে পারেনি। তবু আমাদের একটি ছেলে হয়েছে, সে এখন টাটার হাসপাতালে। দুরারোগ্য পোলিওতে সে ভুগছে, জানি না, বাঁচবে কী না। গতকালও আমি সেখানে ছিলাম। প্রভার সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, আমিও আর দশজন সাধারণ বাবার মতোই, আমি আমার ছেলেকে ভালোবাসি। ওর রুগ্‌ণ চেহারা, আর করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে—।'

সিংজী হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বিড়িতে কয়েকটি টান দিলেন। দেখা গেল, তা নিভে গিয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। কিন্তু বিড়িটা টানবার জন্যই কি তিনি কথা থামালেন? হ্যারিকেনের রক্তিম আলো ওঁর মুখে পড়েছে। সেই জন্যই যে তাঁর মুখ অত্যধিক লাল হয়ে উঠেছে, আমার তা মনে হলো না। অথচ, এখন তিনি সুরাও পান করেন নি, তথাপি তাঁর মুখে এতো রক্তের ছটা লাগলো কেমন করে? তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, নিশ্বাস তাঁর বুকের কাছে আটকে রয়েছে। তিনি তাঁর ভিতরের কোনো তীব্র অনুভূতির উদ্যত প্রকাশকে যেন দমন করছেন। সম্ভবত অসহায় পিতার, এই হলো যাতনার রূপ, সন্তানের জন্য, প্রতি মুহূর্তে যাঁর বুক ফাটছে। তাঁর চোখের সামনে, এখন হয় তো, সেই রুগ্‌ণ একমাত্র সন্তানেরই সেই করুণ চোখ দুটি ভাসছে।

সিংজী একটা দমকা নিশ্বাস ত্যাগ করে, একটু যেন, হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'রাইটার সাহেব, থাক, শান্তির প্রসঙ্গ থাক।'

সিংজীর দিকে তাকিয়ে, মনে হলো, শান্তি দূর অস্ত্‌। কিন্তু একটু স্বস্তিও তিনি যদি পেতেন। এ জীবনটা তো যেন, বাতাসহীন পৃথিবীর মতো, কোথাও যার একটুও মুক্তির অবকাশ নেই। অথচ, এই বস্তুজগতে, তাঁর কোনো কিছুই অভাব নেই। আমার মনে পড়লো, বাঙলায় একটা প্রচলিত কথা, বললাম, "সিংজী, শান্তি পাওয়া কঠিন, সুখ কাকে বলে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের

একটা প্রচলিত কথা আছে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। আমার মনে হয়, এই স্বস্তিটা না থাকলে, কোনোক্রমেই চলে না।'

সিংজী সাহেব যেন চমকে উঠে, সচকিত বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এই! এই তো এতক্ষণে আসল কথাটা বলেছেন, সুখ! আশ্চর্য, এ কথাটাই তো আমার আগে মনে পড়া উচিত ছিল। আসলে আমি আমার অল্প বয়স থেকে চেয়ে এসেছি সুখ। স্বস্তি বলুন, আর শান্তি বলুন, ও সবের কথা আমি কখনো ভাবি নি। এই সুখের অন্বেষণই ছিল আমার জীবনের মূল কথা, আর সেই সুখ—'

হঠাৎ কথা থামিয়ে, তিনি ডান দিকের অন্ধকারে ঝটি'ত ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলেন, 'কৌন? কৌন হ্যায় উধার?'

আমি চমকে উঠে, সেদিকে তাকালাম। ডান দিকের, বেশ দূর থেকেই মেয়ে-স্বর ভেসে এলো, 'হম্ বিসোয়ারি সাব্, বর্তন লেনে আয়া।'

সিংজী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'বর্তন লেনে আয়া তো উধার আন্ধার মে খাড়া কাহে, লে যাও।'

আমি তো, প্রথম দৃষ্টিপাতে, অন্ধকারে কিছু দেখতেই পেলাম না। সিংজী সাহেব কেমন করে দেখলেন, জানি না। আস্তে আস্তে একটি যুবতী বনবালা হ্যারিকেনের আলোয় জেগে উঠলো। ভীরু সংকুচিত তার চোখের দৃষ্টি আর পদক্ষেপ। সে বারান্দায় উঠে এলো নতমুখে। মাথায় ঘোমটার কোনো প্রশ্নই নেই। পরিধানে তার কিচরি, যা এই বনপাহাড়ের নিজস্ব পোশাক, বনবাসীরা নিজেদের তাঁতে নিজেরাই বোনে। দু খণ্ড মোটা সাদা কাপড়, লাল পাড় ঠিক বলা যায় না, অনেকটা বর্ডারের মতো। এক খণ্ড কোমরে জড়ানো, আর এক খণ্ড জড়ানো উর্ধ্ব দেহে। এ বস্ত্রের কথা আমি শুনেছিলাম জরাইকেলাতেই।

সিংজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়া নাম বোলা?'

যুবতী চকিতে একবার সিংজী আর আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'বিসোয়ারি।'

সিংজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুম্ ক্যায়া, চৌকিদারকে বহু?'

বিসোয়ারি নত হয়ে কাপ ডিশ সব ট্রে-র ওপরে জড়ো করছিল। হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল, আবার তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, 'নহি, হম চৌকিদারকো বেটাকো বহু।'

সিংজী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বহুত আচ্ছা। বিসোয়ারি, তুম এ বর্তন লে যাও, ইস্‌কে বাদ দুটো গিলাস, ঔর এক জাগ্ পানী লে আও।'

বিসোয়ারি ট্রে হাতে নিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'জী !'

এখন আর তার চোখে মুখে, ভীরু সংকোচের ছাপটা তেমন নেই। সে বারান্দা থেকে নামতে উদ্যত হলো। সিংজী বললেন, 'অওর দেখো বিসোয়ারি, আন্ধার মে এ্যায়সা চুপচাপ খাড়া মত্ রহো। মেরা সাথ বন্দুক হ্যায়, গোলি মার দে সকতা। সামঝি ?'

বিসোয়ারি বললো, 'হাঁ সাব্, সামঝি।'

কথাটা বলতে বলতে, তার কালো চোখ দুটি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বারান্দা থেকে নেমে, অন্ধকারে অনায়াসে চলে গেল।

আমি সিংজীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ওকে দেখতে পেয়েছিলেন ?'

সিংজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাধারণভাবে পাবার কথা না। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, ওটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ও আসলে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। আমাকে অবিশ্যি অনেকবারই দেখেছে, নতুন মেহ্মান আপনি, আপনাকেই বোধহয় দেখছিল। বসুন, আসছি।'

বলে তিনি সরে গিয়ে, দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে গেলেন। আমি সামনে তাকালাম। হ্যারিকেনের আলোটাকে বাধা মনে হলো। ওটাকে নিচে, টেবিলের আড়ালে রাখলাম। আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন, অনেক নিচে নেমে এসেছে। আকাশ আর বনের কোনো সীমারেখা, সহসা চোখে পড়ে না। অথচ মনে হচ্ছে, একটা অস্পষ্ট আলোর কুহক যেন সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এরকম আলোক, অনেকটা কুহকের মতো মনে হয়, যেন থেকেও নেই। দেখেও, কিছু বোঝা যায় না, নানারকমের বিভ্রম জাগায়। একি নিতান্ত নক্ষত্রেরই আলো, নাকি আকাশের কোথাও ক্ষীণ চাঁদের রেখা জেগে আছে ?

বুঝতে পারি না, কিন্তু বনকে এবং সমস্ত চরাচরকে মায়াবিনীর রহস্যে ঘেরা মনে হচ্ছে। বাতাস তেমন নেই, গরমও নেই। কী একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, অনতিতীব্র, অথচ ঘ্রাণের মধ্যে তা সতত সঞ্চারিত। আমার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে আছে, সিংজীর কথাগুলো। সুখের অন্বেষণই ছিল তাঁর জীবনের মূল কথা। আসলে হয় তো বলতে চেয়েছিলেন, মূল লক্ষ্য। কথাটা শুনলেই মনে হয় আগুন নিয়ে খেলার মতো।

সিংজী সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাছে এসে বললেন, 'বাহ্, এই বেশ ভালো করেছেন। বাতিটা নামিয়ে দিয়ে, পরিবেশটা অনেক ভালো হয়েছে।'

তিনি তাঁর চেয়ারে বসে, যে-বস্তুটি টেবিলের ওপরে রাখলেন, অস্পষ্ট

আলোয়, সেটা চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই, সুরার বোতল। সেই বিলাতি সুরারই বোতল, জন্মস্থান যার স্কটল্যাণ্ডে। বললেন, 'বুঝলেন রাইটার সাহেব, সুখের কথা বলতে হলে, একটু সুরার দরকার। গলা না ভিজলে, ওসব কথা ঠিক বলা যায় না।'

তাঁর কথার অর্থ সম্ভবত এই দাহ্য বস্তুর দাহ না থাকলে, অনায়াসে সব কথা বলা যায় না, কোথাও একটা বাধা থেকে যায়। সুরা মানুষকে প্রগল্‌ভ করে তোলে। যে কথা উচ্চারণের অযোগ্য, যে-আচরণকে অন্য সময় অসম্ভব বলে মনে হয়, সুরা-ই একমাত্র তার সব বাঁধনকে ছিন্ন করে দিতে পারে।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, ঠুং ঠাং শব্দ শোনা গেল। ভেবেছিলাম, বিসোয়ারি আসবে বারান্দার সামনের দিক দিয়ে। কিন্তু শব্দটা পেয়ে আমাকে তাকাতে হলো ঘরের দরজার দিকে। টেবিলের আড়ালে রাখা আবছা আলোতে দেখলাম বিসোয়ারির এক হাতে বুকের কাছে চেপে ধরা একটি বড় কাঁচের জাগ, জলপূর্ণ। বাঁ হাতে দুটি কাঁচের গেলাস। ও এগিয়ে এসে, আগে গেলাস দুটো রাখলো, তারপরে দুহাতে জাগটা রাখলো বোতলেব পাশে। রেখে, একটু সরে দাঁড়ালো।

সিংজী বললেন, 'ঠিক হ্যায় বিসোয়ারি, জরুরত হোগা তো বাদ মে বোলায়েগা।'

বিসোয়ারি 'জী আচ্ছা' বলে, আবার ঘরের ভিতর দিয়েই চলে গেল।

সিংজী বোতলের ছিপি খুলে, দুটো গেলাসেই পানীয় ঢাললেন। বাধা দিতে যাওয়া বৃথা, কারণ শুনবেন না। সুরার সঙ্গে জল মিশিয়ে, একটি গেলাস আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করুন কালকূট মহাশয়, আজ আপনাকে আমি আমার সুখের সন্ধানের কথা শোনাবো।'

আমি গেলাস হাতে তুলে নিলাম। কেন তিনি আমাকে এখন কালকূট মহাশয় বলে সম্বোধন করলেন? তাঁর মতে যা অমৃত তা আমার হাতে তুলে দিলেন বলে?

সিংজী গেলাস হাতে নিয়ে, একটু উঁচুতে তুলে বললেন, 'পৃথিবীতে সকলের সুখের জন্য!' বলে গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিলেন। গেলাস রেখে বললেন, 'সুখের সংজ্ঞা কী? আমি মনে করতাম, যখন যা পেতে ইচ্ছা করে, তা পাওয়ার নামই সুখ। যা চেয়েছি, তা আমি পেয়েছি। এমন কি সীমাকেও পেয়েছিলাম। আর সেই সীমার কাছ থেকে জানতে পারলাম, সুখের আসল সংজ্ঞাটা কী। তার আগে আপনাকে সীমার পরিচয়টা দিয়ে নিই।'

সিংজী একটি বিড়ি ধরালেন।

সারেণ্ডা বনের, সম্ভবত সব থেকে শ্রেষ্ঠ, থলকোবাদের বাংলোয় বসে রাত্রের অন্ধকারে, একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতোই একটি মানুষের মনের কথা শুনে গেলাম। এ দেশে, এই বনের ঝিঁঝির ডাককে বলা হয়, 'রায়তানা'। অর্থাৎ ঝিঁঝির কান্না। বনের আদিম অধিবাসীদের এইরকম ধারণা, ঝিঁঝি কাঁদে। সিংজী কাঁদলেন কী না, আমি জানি না, শুনতে শুনতে মনে হলো, এই বন-প্রকৃতির সঙ্গে ওঁর স্বর যেন একাকার হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'রাইটার সাহেব, আমাব একটা বিশ্বাস, মানুষের রিপুর ক্ষেত্রে যখন যা চাওয়া যায়, তা' যদি পাওয়া যায়, তা হলে রুচিটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তার আর বাছবিচার থাকে না। আপনি কি কথাটা মানেন?'

আমি বললাম, 'এখন আর জিজ্ঞাসা না, আপনি বলুন, আমি শুনি।'

সিংজী তাঁব পানীয় পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বেশ তাই। চাইলেই পাওয়া যায়, এতে রুচি নষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা একটা সময় ক্লান্তিও আসে। এ ক্লান্তিটা বিবেকের জ্বালা বলে আমি মনে করি না, এটা একটা যন্ত্রণা। যতোই ভোগ করি না কেন, কোথায় একটা শূন্যতা থেকে যায়, কোনো কিছু দিয়েই যেন তা ভরাট করা যায় না। আমি কিন্তু মোটেই সাধুপুরুষের মতো কথা বলছি না, বরং তাব উল্টো। এই শূন্যস্থান পূবণের ব্যবস্থাটা, মোটেই বানপ্রস্থ না, কারণ, মহাপ্রাণের হাহাকারটা যদি থেমেই যাবে, তাহলে আর ভাবনা ছিল কী? হাহাকার থাকে, অথচ আকণ্ঠ পান করেও মনে হয়, তবু ভরিল না চিত্ত।'

সিংজী একটু হাসলেন, গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে, আবার বললেন, 'ইংরেজীতে যাকে হ্যাঙোভার বলে, বাংলায় বোধহয় তাকেই খোয়ারি বলা হয়। আর খোয়ারি কাটাবার জন্য, মাতালরা একটা প্রতিষেধক জানে, আবার খানিকটা মদ্যপান করে। বিষ দিয়ে, বিষক্ষয়ের মতো, মদ দিয়ে, মদের খোয়ারি কাটানো। তাতে চিত্ত ভরে কী না জানি না, সাময়িক খোয়ারিটা কাটে। কথাটা কেন বললাম, এর জবাবটা আপনি পরে পাবেন। সীমা দাসের পরিচয়টা দেবার আগে, আর একটু বলে নিই। ভোগের একটা ক্লান্তির মুহূর্তেই, প্রভাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার বাবা নেই, নিজের চাচাজী বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনি প্রভাকে দেখেন নি।

আপনি যখন জরাইকেলায় ছিলেন, তখন ও ছেলেকে নিয়ে টাটায় ছিল। থাকলে ওকে দেখতে পেতেন, কারণ, পর্দানসীন বলতে যা বোঝায়, ও ঠিক তা না। প্রভা বলতে যা বোঝায়, রূপের দিক থেকে সে তাই, সুবর্ণপ্রভা বলা যায়। আপনাকে আগেই বলেছি ও পাটনা শহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে, ওর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে, একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যে কারণে, ও আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে নি। আমিও জোর করি নি, আত্মসমর্পণও করি নি। কিন্তু মনের মধ্যে একটা বড় রকমের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।'

সিংজীর গেলাস শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আমারই হয় তো উচিত ছিল, বোতল থেকে গেলাসে ঢেলে দেওয়া। খেয়াল ছিল না, অভ্যস্তও নই। সিংজী নিজেই বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে ঢাললেন, অনেকটা বেশীই ঢাললেন। টেবিলের নিচে, আড়ালে হ্যারিকেনটা থাকলেও অস্পষ্ট আলোয় সেটুকু দেখা যায়। যা অস্পষ্ট, তা হলো সিংজীর মুখ। গেলাসে অল্প জল মিশিয়ে, চুমুক দিয়ে, পাঞ্জাবির আস্তিনে ঠোঁট মুছে বললেন, 'প্রতিক্রিয়াটা কী রকম জানেন? সব মিলিয়ে, একটা অনুশোচনা, একটা ব্যর্থতা। ইংরেজিতে যাকে মেলাংকলি বলে, খানিকটা তাও বলতে পারেন। যদিও কোনো হীনমন্যতা আমাকে গ্রাস করে নি। লেখক বা ইনটেলেকচুয়াল হলে বলতে পারতাম, একটা ইনারশিয়া ফীল করছিলাম। আসলে, কাজে কর্মে মন বসছিল না, অথচ হাতে তখন অগাধ কাজ। আমার কর্মচারীরা সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। সে সময় আমি টাটায়, এখন থেকে ধরুন, প্রায় চার বছর আগে। আমি দু চারটে সই সাবুদ করেই, সারা দিনের কাজ শেষ করে দিতাম। অথচ এমন না যে, আমি সকাল থেকে বসে কেবল মদ্যপান করছি। বরং ও-বস্তুতে তখন কেমন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করছিলাম।

সেই সময়ে, কটকে আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছিল। উড়িষ্যা সরকারই মামলাটা করেছিলেন। আমার যাবার কোনো দরকার হতো না, আমার উকীলই আমার জন্য দাঁড়াতেন, যা বলবার বলতেন। অন্য প্রয়োজনে, কখনো সখনো কটকে গেলেও মামলার দিনগুলোতে আমি উপস্থিত থাকতাম না। আমার উকীল ছিলেন একজন বাঙালী, নির্মল চ্যাটার্জি। উনি একটা চিঠি দিয়ে জানালেন, একটা তারিখে, আমাকে কোর্টে, জজের সামনে উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, যাবো না। যা হয় হোক। তবু ভাবলাম, যাই, কিছুদিন একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি। কটকে আমার ছোটখাটো একটা বাড়িও আছে। আপনি কটকে গেছেন কখনো?'

বললাম, 'না।'

সিংজী বললেন, 'তা হলে আপনি চিনতে পারবেন না। ওখানে একটি চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে, কটক্ চণ্ডীদেবী। মন্দিরের কাছেই আমার বাড়ি। আমি কথনোই হোটেল-টোটেলে ওঠা পছন্দ করি না। নিজের লোকজন আর একটা আস্তানা না থাকলে, আমি থাকতে পারি না। কটকের বাড়িতে আমার একটি লোক ছিল। ঠিক দিনে উপস্থিত হয়ে, যথাসময়ে কোর্টে গেলাম। কাজকর্ম মিটতেও দেরি হলো না। মামলাটা শেষ দিকে এসে পড়েছিল, সেজন্যই আমার একবার উপস্থিতির দরকার ছিল। আমার উকীলবাবু চ্যাটার্জি সাহেব, আমি কটকে গেলেই, সন্ধেটা আমার সঙ্গে কাটান। একটু পানভোজন হয়। ধরে নিন, আনুষঙ্গিক আরো কিছু ঘটে।'

সিংজী একটু হাসলেন, এবং নিজের মনেই কথাটা একবার উচ্চারণ করলেন, 'আনুষঙ্গিক!' তারপরে গেলাসে চুমুক দিয়ে, আবার বললেন, 'কোর্ট থেকে বেরোবার সময়ে, চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, রাত্রে একটা নাটক দেখতে যাবেন। নাটক দেখে, ফিরে গিয়ে আমার বাড়িতে বসবেন। চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে নাটক দেখতে গিয়ে, প্রথম সীমাকে আমি দেখলাম। একটা ওড়িয়া সামাজিক নাটক হচ্ছিল, সীমা ছিল তার নায়িকা। ওর নাচ গানও নাটকের মধ্যে ছিল। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, সীমা অসাধারণ সুন্দরী বা রূপসী না। শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায়, তাই। অবিশ্যি, আগামীকালই সম্ভবত ও এখানে আসছে, আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। তবু তখন আমি যে চোখে দেখেছিলাম, সেটাই বলি। প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, সেটা ওর স্বাস্থ্যের দীপ্তি। কথাটা বোধহয় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে অনেক থাকে—আমি সে-স্বাস্থ্যের কথা বলছি না। আমি কবি সাহিত্যিক না যে, ভাষার বর্ণনায় বুঝিয়ে দেবো। বরং আমার অনুভূতির অভিজ্ঞতা থেকে বলি, কোনো কোনো মেয়ের শরীরের গঠন এমন হয়, আর এমন একটি দীপ্তি থাকে, যা সোজাসুজি পুরুষের রক্তে গিয়ে বেঁধে। আর রক্তের মধ্যে একটা উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। সীমার চেহারার মধ্যে, সেটা আছে একশো ভাগের বেশী। অবিশ্যিই, আমি শুধু শরীরের কথাই বলছি, তার সঙ্গে চোখ মুখও ধরতে হবে। আমরা কথায় কথায় বলি বটে, চোখে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ। কিন্তু প্রকৃত বিদ্যুৎকটাক্ষ, কটি মেয়ের চোখে থাকে? সীমার তা আছে, এমন আছে যে, তা নির্ঘাত আপনাকে তড়িতাহত করবে। অবিশ্যিই, সেটাও একধরনের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরারই সামিল, সম্ভবত একে বলে, সুখের মৃত্যু।'

সিংজী বলতে বলতে, এবার একটু জোরে হেসে উঠলেন। এখন তাঁর হাসিতে কিঞ্চিৎ মত্ততার আভাস। যেটুকু পান করেছেন, হিসাব করলে, এখনই তাঁর মত্ততার কোনো কারণ নেই। একমাত্র, সীমার স্মৃতি যদি তাঁকে মত্ত করে থাকে, সেটা আলাদা। গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার মরবার সাধ জাগলো। আমার বেশ কিছুদিনের ঘুমন্ত স্তব্ধতাকে, সীমা যেন কশাঘাতে জাগিয়ে তুলল। নাটক দেখতে দেখতে, আমি, সীমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখছিলাম না। মঞ্চে সীমা না এলে, নাটক আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। দ্বিতীয় ইণ্টারভেলের সময়, চ্যাটার্জি সাহেবকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, সীমা কোথায় থাকে, সে বিবাহিতা কী না, বা কী তার জীবন। তখন চ্যাটার্জি আমাকে বললেন, সীমার বাবা বাঙালী, মা ওড়িয়া। ওর বাবার নাম নিকুঞ্জবিহারী দাস। কটকে তাদের কয়েক পুরুষের বাস, কিন্তু এদেশের সঙ্গে, বিয়ের সম্পর্ক সীমার বাবাই প্রথম স্থাপন করে। সীমার বাবা নিকুঞ্জ দাসের অবস্থা খারাপ না। চাকরি আর ব্যবসা, সবই তাদের পরিবারের লোকেরা করে। তবে একান্নবর্তী পরিবার আর নেই, ভাগাভাগি হয়ে গেছে। সেই হিসাবে, নিকুঞ্জ দাসকে তেমন অবস্থাপন্ন বলা যায় না। নিকুঞ্জ দাসের বংশের লোকেরা এখন নামেই বাঙালী, বাঙলা কথা নিজেদের মধ্যেও কম বলাবলি করে। নিজেদের ভাবা অনেকখানি ওড়িয়া ভাবতেই শিখেছে। বন্ধুবান্ধব, সমাজ সামাজিকতা ওড়িয়াদের সঙ্গে অনেকখানি। নিকুঞ্জবিহারী প্রথম একটি ওড়িয়া পরিবারে বিয়ে করে, কিন্তু তেমন একটা শিক্ষিত বা অভিজাত পরিবার না। সীমার মামা, দাদামশাই, কটকের আদি অধিবাসী না, তারা কটকে এসেছিল গঞ্জাম জেলা থেকে।'

সিংজী হঠাৎ থামলেন। টেবিলে রাখা বিড়ির বাণ্ডিল থেকে, একটি বিড়ি নিয়ে ধরিয়ে বললেন, 'এতোটা বংশ পরিচয়ের হয় তো কোনো দরকার ছিল না। দরকার হ'লো এই জন্যে, সীমার মামা বাড়িতে অন্ধ্রের ইনফ্লুয়েন্স কিছুটা ছিল। সীমার মা নিজে গানবাজনা ভালো জানেন, শুনেছি, তিনি নাচতেও জানেন। এর সঠিক ব্যাকগ্রাউণ্ড কী, আমি তা জানি না—অর্থাৎ, সীমার মা নাচ গান কোথা থেকে, কী ভাবে শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কেউ কখনো পাবলিকলি নাচতে গাইতে দেখে নি। সীমা ছেলেবেলা থেকেই, নানান অনুষ্ঠানে নাচ গান করেছে। কটকে ওকে সকলেই চেনে। লেখাপড়াও কিছু-দূর করেছিল, তবে বেশীদূর টানা সম্ভব হয় নি, কারণ, নাচ গানের নানান দলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ। কখনো কলকাতা, কখনো পাটনা, দিল্লী, বম্বে,

মাদ্রাজ, অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। নামও মোটামুটি খারাপ করে নি। ওর বাবা মায়ের পূর্ণ সমর্থন গোড়া থেকেই ছিল, তা না হলে, দলের সঙ্গে নানান জায়গায় যেতে পারতো না। চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন, সীমার প্রতিভা ছিল, কিন্তু প্রতিভাকে, অধ্যবসায়ের দ্বারা, বিকশিত করে তোলার জন্য যে কর্মঠতা থাকা দরকার, বা একজন শক্তিশালী গুরুর দরকার, তা ওর ভাগ্যে জোটে নি। যা জুটেছে, তা উঞ্ছবৃত্তি, কারণ, কিছু উঞ্ছ বাজে লোকেরাই ওকে সব সময় ঘিরে থেকেছে চাটুকারিতা করেছে, ওর একটু সঙ্গ লাভের জন্য নানাভাবে তোষামোদ করেছে। টাকা পয়সার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। আর এই টাকা পয়সাই, সর্বনাশের মূল। নিকুঞ্জ দাস দেখলো, মেয়ে দু' হাতে টাকা রোজগার করছে, মেয়েকে সে কোনো বাধাই দিল না। নিকুঞ্জ দাসের স্ত্রী—মানে, সীমার মা ব্যাপারটাকে কী ভাবে নিয়েছিল, জানা যায় না। আস্তে আস্তে দেখা গেল, মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই, সীমা দাস হয়ে উঠলো ফেমাস ভোলাপচুয়াস গার্ল।'

সিংজীর বিড়িটা সম্ভবত নিভে গিয়েছিল, তিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আবার বিড়িটা ধরাতে গেলেন। দেখলাম, তাঁর মুখ লাল, হাত যেন কাঁপছে। আমি মনে মনে তাঁর ইংরাজি কথার বাঙলা তর্জমা করছিলাম, 'বিখ্যাত স্বেচ্ছাচারিণী মেয়ে।' স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েরা বিখ্যাত হয় কিংবা কুখ্যাত হয়, সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, সীমা দাস সম্পর্কে, আমার কৌতূহল বাড়ছে। বিশেষ করে, সিংজী-সীমা দাস পর্বের জন্য।

সিংজী বললেন, 'আমার সঙ্গে যখন ওর পরিচয়, তখন ওর বয়স কুড়ি। এখন চব্বিশ চলছে। সেই নাটকের রাত্রের কথাই বলি। চ্যাটার্জির কাছে অল্প বিস্তর যেটুকু শুনলাম, তাতেই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, সীমার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। চ্যাটার্জিকে সে কথা বললাম। তিনি রাজী হলেন। সেই রাত্রেই, নাটকের শেষে, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, নিকুঞ্জ দাসের বাড়িতে। দেখা গেল, সেখানে অনেকের ভিড়, নিকুঞ্জ দাসও আছে। সীমা মধ্যমণি হয়ে বসে আছে, সকলের চাটুকারিতা আর তোষামোদ শুনছে।

চ্যাটার্জিকে দেখে, নিকুঞ্জ দাস তাড়াতাড়ি উঠে, তাঁকে নমস্কার করলেন, আপ্যায়ন করলেন। দেখলাম, সীমা উঠে এসে, চ্যাটার্জিকে প্রণাম করে বললো, বসুন কাকাবাবু। কথাটা এই রকম নিছক বাঙলাতেই বলেছিল। আর সকলেই, উকীলবাবুকে খাতির করে বসালো। কিন্তু তাদের জমাটি আড্ডা যে নষ্ট হবার আশঙ্কা, তা অনেকেই বুঝে একটু নিরাশ হয়ে পড়েছিল

চ্যাটার্জি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, নাম ধামের সঙ্গে, তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই, আমার বংশগত আভিজাত্য, ব্যবসা বাণিজ্য আর্থিক অবস্থার কথাও বলেছিলেন, আর আমি যে নাটক দেখে, সীমার গুণ এবং প্রতিভায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি, তাও বলেছিলেন। সীমার সঙ্গে ঘরে ঢুকেই আমার চোখাচোখি হয়েছিল। আপনি নিশ্চয় বোঝেন, মানুষের পরিচয়, তার চোখ অনেকখানি। অন্তত তাৎক্ষণিক মনোভাবের প্রতিবিম্ব, চোখের মতো আর হয় না, যার মধ্যে সবই ফুটে ওঠে। আমি সীমার দিক থেকে একবারও চোখ সরাতে পারছিলাম না। সীমা যতোবারই আমার দিকে তাকাচ্ছিল, ততোবারই চোখাচোখি হচ্ছিল। আমার দৃষ্টির মধ্যে, আবেগ, মুগ্ধতা, কোনো কিছুই গোপন করার চেষ্টা করি নি। আপনাকে আগেই বলেছি, ওর রূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা সোজাসুজি রক্তে গিয়ে বিদ্ধ করে। আমাকেও করেছিল, আমি আমার রক্তে একটা উন্মাদনা বোধ করছিলাম। কিন্তু, আমি মানুষটা যে একেবারেই কম্‌প্লেকসিটি বর্জিত, তা মনে করবেন না। আমার আবেগ বা মুগ্ধতা, বা রক্তের উন্মাদনা, কোনোটাই পতঙ্গের মতো না। নিতান্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, পুড়ে মরবার মতো মানুষ আমি না। মনে মনে মরতে পারি, কিন্তু সে-মরাটা আলাদা। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে কাজে লাগাতে না পারলে, কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। তাই আমি কোনো চাটুকারিতা করি নি। আমার মুগ্ধতাকেও গোপন করি নি। তবে ওই সব প্রসাদলোভী চাটুকারদের ভিড়ে, আমার বসে থাকতে একটুও ইচ্ছা করছিল না। তার একটা কারণ ঈর্ষা হতে পারে, তবে আমি আবেগপ্রবণও বটে। তাই আমি চ্যাটার্জিকে বলেছিলাম, রাত্রে আর ওখানে বসে থেকে কী হবে, অন্য দিন, অন্য সময় আসা যাবে।

নিকুঞ্জ দাস খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তিনি কিছুতেই আমাদের ছাড়তে চান নি। সীমাকেও দেখলাম, ও নিজেই সবাইকে বিদায় দিতে আরম্ভ করলো। ওই সব চাটুকার ভক্তদের মধ্যে, অভিনেতা, পরিচালক এবং আরও দু চারজন রসিক বাবু ছিলেন। সীমার মতো মেয়েদের জীবনে, এটাও বোধহয় প্রচলিত নিয়ম, বা দরকার, চাটুকারিতা ছাড়া এদের ভালো লাগে না। সীমা নিশ্চয়ই ভালো নাচতে পারে, সাপিনীর থেকেও বেশী। নাচের সময়, মনে হয় না, ওর শরীরে হাড়গোড় বলে কিছু আছে, কিন্তু ওর আসল দীপ্তিটা শরীরে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আর প্রত্যেকটি ভঙ্গিতে।'...

সিংজী হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাইটার সাহেব, আপনাকে কি আমি

বিরক্তি করছি—মানে, আপনাকে কি আমি বোর করছি?'

আমি বললাম, 'না, তবে আপনার কথা থেকে, আমি এখনই অনুমান করতে পারছি, আপনি যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছিলেন, সীমা আপনার কাছে ধরা দিয়েছিল।'

সিংজী বন্ধুর মতো আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, 'ঠিক বলেছেন রাইটার সাহেব, আমি নিজেকে তখন একটা ঝানু সাপুড়ে ভেবেছিলাম। আমি সেবার তিন দিন কটকে ছিলাম। তিন দিনের মধ্যে আমি সীমার কটকের জীবন চুকিয়ে দিয়েছিলাম। টাকা পয়সার কথা আমি চিন্তা করি নি, সীমা যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তখনই ও স্টেজকে নোটিস্ দিয়েছিল। সেরকম কোনো চুক্তিপত্র ছিল না যে, ও স্টেজ যখন খুশী তখন ছাড়তে পারবে না। তবু ঝামেলা করবার চেষ্টা হয়েছিল। নিকুঞ্জ দাস হয় তো চান নি, সীমা আমার সঙ্গে মিশুক বা চলে যাক। কিন্তু সীমা ওর বাবার ইচ্ছায় চলে না। আসল ব্যাপার যেটা, সেটা টাকা। টাকার কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি সীমাকে নিয়ে প্রথম গেছলাম রাউরকেলায়। রাউরকেলার স্টিল প্ল্যাণ্টের জার্মান ক্লাব থেকে শুরু করে, সমস্ত অফিসার আর কণ্ট্রাক্টরের দল মেতে উঠেছিল। দু' দিন সীমার নাচের পারফরমেন্সও দিয়েছিলাম। তা নিয়ে দারুণ হৈ হৈ কাণ্ড। কয়েকদিন মাতামাতির পরে সীমাকে নিয়ে কোথায় চলে গেলাম জানেন?'

সিংজী কথা থামিয়ে, তাঁর গেলাসের পানীয় সবটুকু শূন্য করে দিলেন, এবং বোতল থেকে আবার ঢাললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

সিংজী গেলাসে জল ঢেলে বললেন, 'গেলাম বলা যায় না, এলাম বলা উচিত। এলাম, এই বাংলোয়, যেখানে আমরা বসে আছি। জীবনে অনেক চেয়েছি পেয়েছি, ঠিকই, কিন্তু ঠিক মধুচন্দ্রিমা বলতে যা বোঝায়, তা আমার জীবনে প্রকৃতরূপে আগে ঘটে নি। সীমাকে নিয়ে, তা আমার ঘটেছিল এই থলকোবাদ বাংলোয়। রাইটার সাহেব, আপনাকে আমি যে সুখের কথা বলছিলাম, তার সন্ধান যেন আমি জীবনে সেই প্রথম পেয়েছিলাম। সীমা আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়েছিল, কিংবা তার অধিক, ও নিজেকে আমার কাছে উৎসর্গ করেছিল। আত্মসমর্পণ যে আমার কাছে আগে কেউ করে নি, তা না, কিন্তু তাদের কারোর জন্য, আমি কখনো, সে উন্মাদনা বোধ করি নি। আপনি কেবল রাইটার না, পুরুষমানুষ, আপনি খানিকটা নিশ্চয় বুঝবেন, মাতালের যেমন মদ, শিশুর যেমন মাতৃস্তনের নেশা,

কিছুতেই তৃষ্ণা মিটতে চায় না, সীমা আমার কাছে তাই। মদ্য পান করলে যেমন নেশা হয়, খোয়ারি হয়, আবার খোয়ারি কাটাতে গেলেও মদ্য পান করতে হয়, সীমাকে নিয়ে আমার সেই অবস্থায় কেটেছিল।'

সিংজী হঠাৎ থেমে, গেলাসটা তুলে, এক চুমুকে শেষ করে, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন, 'আমি জানি না, আপনি আমাকে পশু ভাববেন কী না, কিন্তু আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করছি, আমি সীমার কথা ভাবলেই, আমার রক্তে দোলা লেগে যেতো, আমি এক মুহূর্তও তখন স্থির থাকতে পারতাম না। সীমারও অবস্থা সেই রকমই ছিল। আমরা দুজনে, এই বাংলোর কাজের লোকদের সামনে, নির্লজ্জ ব্যবহার করতাম। খাবার কথা আমাদের মনে থাকতো না। দরজা বন্ধ করতে পর্যন্ত ভুলে যেতাম। কখনো ক্লান্তি বোধ করতাম না। সুখের অনুভূতি যে কতো তীব্র হতে পারে—একেবারে নিছক যৌবনের সুখের কথাই বলছি, সীমার সঙ্গে এই বাংলোতে কাটাবার আগে, তা জানা ছিল না।'

সিংজী এমনভাবে থেমে গেলেন, যেন হঠাৎ তাঁর গলার কাছে কিছু ঠেকে গেল, বা বুকের কাছে খচ্ করে কিছু বিঁধে গেল। অত্যন্ত দ্রুত বোতল থেকে গেলাসে হুইস্কি ঢেলে, সামান্য জল মিশিয়েই, এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেললেন। এমন ভাবে পান করলেন, যেন, অন্যথায় তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। টেবিলের নিচে রাখা, হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয়, তাঁর মুখ যেন আমার কাছে লাল অঙ্গার সদৃশ লাগলো। পাঞ্জাবির আস্তিনে, গোটা মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, 'প্রায় একভাবেই, দু' বছরের ওপর আমাদের কেটেছিল। সীমাকে নিয়ে আমি জরাইকেলায় কমই গেছি, বেশির ভাগ সময় রাউরকেলা নয় তো টাটায় কেটেছে। বাইরেও নানান্ জায়গায়, ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, ভারতবর্ষের কোথাও প্রায় বাদ রাখি নি। কখনো রেল গাড়িতে কখনো উড়ো জাহাজে, কখনো নিজের গাড়িতে। কিন্তু সীমার জন্যে একটা স্থায়ী বাড়ির দরকার ছিল। সে-বাড়ি ওর নামে করে দিয়েছি রাউরকেলাতে। বাড়ি, গাড়ি, লোকজন, টাকা পয়সা, কোনো কিছুর অভাব রাখিনি। এটা বুক বাজিয়ে বলার কথা না, ওটা আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য ছিল। আইনত তখন আর ওকে বিয়ে করার কোনো উপায় ছিল না, হিন্দু কোড বিল পাস হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রভাকে আমি এ আঘাতটা দিতে চাই নি, কেন না, সে আমার স্ত্রী হলেও, সীমা ছিল আমার স্ত্রীর অধিক। একটাই শুধু অবাক লাগে, যার শরীরের ওই রকম দীপ্তি

নির্দুষ্ট, সেই সীমা একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিল, আর তা অকালে। আমি জানি না, সেটা সীমার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল কী না, সেরকম কথা আমার কানে এসেছে, আমি মন দিই নি। আমি নিজেও সীমার কাছে কোনো সন্তান প্রার্থনা করি নি। কিন্তু রাইটার সাহেব, কথা অনেক বললাম, আসলে, আমার বলবার কথা একটিই। গল্প না করে, সে-কথাটাই বলি। আপনি মানবেন কী না জানি না, অতি তীব্র সুখের মধ্যে, একটা বিষক্রিয়া ঘটে, তা কি আপনি জানেন?'

সহসা প্রশ্ন শুনে, আমি অবাক চোখে, সিংজীর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর গোঁফের নিচে, নিঃশব্দ তীক্ষ্ণ হাসিতে, ঠোঁট ধনুকের মতো বঙ্কিম, চোখ দুটো জলজল করছে।

বললাম, 'আপনিই বলুন, আপনার অভিজ্ঞতা আছে।'

সিংজী যেন বিদ্রূপ করে উচ্চারণ করলেন, 'অভিজ্ঞতা!' তারপরে হাসির শব্দ করে বললেন, 'হ্যাঁ, অভিজ্ঞতাই বটে। সেই বিষক্রিয়ার নাম বোধহয়, মহব্বত। কিন্তু বিষের ক্রিয়া কবে শুরু হয়েছিল, বুঝতে পারি নি, তলে তলে নিশ্চয় তা কাজ করছিল। টের পেলাম, যখন ফিলিপের সঙ্গে, ওকে রাউরকেলায় মিশতে দেখলাম। সীমাকে আমি চিনি বলেই, ওর প্রতিটি চাহনি হাসি ভঙ্গী, আমি বুঝতে পারলাম, সীমা আর আমার নেই, ও জার্মান সাহেব ফিলিপের প্রেমিকা। বোঝামাত্রই, সেটা সাপের ছোবলের মতো লাগলো। ফিলিপের সঙ্গে, আমিই সীমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সে জানতো, আমার সঙ্গে সীমার কী সম্পর্ক। কিন্তু তাকে আমি দোষ দিই না। দোষ কি সীমাও করেছে? যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, করে নি। তবু, রাইটার সাহেব, মন মানে না। এখন আপনি যে অজিত সিং-এর সঙ্গে বসে আছেন, সে একটা সাপের ছোবল-খাওয়া প্রাণী। আপনি ভাই মিথ্যাক, আপনার নাম কেন কালকূট হবে? কালকূট হলাম আমি।'

বলেই তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন, 'আমারই সারা শরীর বিষে ভরা।'

আবার হেসে উঠলেন। হা-হা করে, এবং হাসতে হাসতেই, তাঁর যেন কাশি এসে গেল। হাসি আর কাশি মিলিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে, উঠে দাঁড়ালেন। নিরালা নিঝুম বনকে এই হাসি যেন চকিত করে তুললো। মনে হলো, এক মুহূর্তের জন্য, আশেপাশে, নিরন্তর ঝিঁঝির ডাকও যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সিংজী কেন উঠে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলাম না। কিছু না বলেই ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমি সামনের দিকে

তাকালাম। অস্পষ্ট একটা কুহকী আবছা আলো যেন, বন আর আকাশের গায়ে ছড়ানো। আর কোনো সন্দেহ রইলো না, তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদ নিশ্চয় আকাশের পূর্ব প্রান্তের কোথাও আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। এদেলবাড়েও, গতরাত্রে দেখতে পাই নি। গতরাত্রে এ সময়ে আমি সুরসতিয়ার সঙ্গে ছিলাম। ও আমাকে বনের অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে, অনেকবারই ময়ূরের কেকা শুনতে পেয়েছিলাম। একবার কোত্‌রা হরিণের ডাক হাউ-হাউ করে বেজে উঠেছিল, ইংরেজি:তে যাকে বলে, বার্কিং ডিয়ার।

এখানে এখনো, রাত্রের অন্ধকারে কোনো পশু বা পাখির ডাক শুনতে পেলাম না। সেটা কি নিতান্ত পাহাড়া টিলার শীর্ষে আছি বলে? অথচ, কিছুদিন আগেই, কয়েকটি হাতীর আবির্ভাব ঘটেছিল। মোটরে পাহাড়ী টিলায় ওঠবার রাস্তাটা বোধহয়, এখন যেখানে বসে আছি, তার পিছন দিকে। সেই হিসাবে, থলকোবাদ গ্রামও নিশ্চয় পিছন দিকেই। দৃশ্য দেখবার মাচার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো গ্রামের চিহ্ন দেখি নি। টিলার খাদ বেয়ে, গভীর জঙ্গল নেমে গিয়েছে, তারপরে অনেকটা বুনো ঘাস জঙ্গল ভরা মাঠ। মাঠের কোল দিয়ে, কোয়েনার একটা সরু শাখা, সর্পিলভাবে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে গিয়েছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে, এসব কথাই ঠিক আমার মনে হচ্ছিল না। সিংজী আর সীমা দাসের কথাই আমার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। আমি জানি না, কতোকাল বাদে, সিংজী আবার থলকোবাদ বাংলোতে এসেছেন। ঘটনা যা শুনলাম, সীমার স্মৃতি যে তাঁকে ব্যাকুল ও ব্যথা ভারাক্রান্ত করে তুলবে, তা স্বাভাবিক। আমি বলে না, যে-কোনো নতুন মানুষকে কাছে পেলেও হয় তো, সীমা-কাহিনী না বলে তিনি থাকতে পারতেন না। অকপটে, যে প্রগাঢ় প্রেমলীলা তিনি ব্যক্ত করেছেন, এবং সেই প্রেমিকাকেই হারিয়েছেন, তারপরে আবার সেই স্থানে এসে রাত্রিবাস করার মতো, প্রাণের শক্তি হয় তো তাঁরই আছে। কিন্তু যে হাসি হাসতে হাসতে তিনি ঘরে চ:লে গেলেন, সেটা কি হাসি? নাকি, বিষক্রিয়ারই আর এক অভিব্যক্তি?

হঠাৎ মনে হলো, সিংজী যেন একটি পত্রপল্লবে ছাওয়া বিশাল মহীরুহ, কিন্তু তার ভিতরে, ক্ষয়ের আক্রমণে, শূন্যতা প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ক্ষয় ধরেছে। আপাতদৃষ্টিতে, যে লোকটাকে দাম্ভিক, মদমত্ত, ক্ষমতাবান, ধনী বলে মনে হয়, তাঁর নিজের

ভাষায় বলতে হয়, তিনি যেন মাতৃস্তন বিচ্যুত শিশু। সীমার প্রতি তাঁর আকর্ষণের তুলনা দিতে গিয়ে, ঐ কথাই বলেছিলেন, শিশুর যেমন মাতৃস্তনের নেশা…

সহসা চমকে উঠে, আমি বারান্দার নিচের দিকে তাকালাম। হ্যারিকেনের আলোয় কিছু নড়ে উঠতে দেখলাম। তারপরেই লক্ষ্য পড়লো, একটি কালো কুচকুচে মুখ, খাকী জামা আর খাকী হাফ প্যাণ্ট। তবু আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে?'

প্রথমে দেখলাম, এক পাটি সাদা দাঁতের হাসি, তারপরে জবাব, 'হম বুধন হ্যায় সাব।'

তাকে আমি আগেই দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কৌন হ্যায়? ইধার ক্যায়া করতা?'

সে বললো, 'হম চৌকিদারকা লেড়কা হ্যায় সাব, জঙ্গলকা ফায়ার গার্ডকা কাম করতা।'

জঙ্গলের যে ফায়ার গার্ড আছে, তা জানতাম না, কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, অগ্নি প্রতিরোধ করা, বনের একটা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। বুধনের পোশাকেই মালুম দিচ্ছে, সে বন-বিভাগের কর্মী। হয় তো ওর বাবা চৌকিদারেরও পোশাক আছে। বনবিভাগের বড় কর্তাব্যক্তি কেউ এলে, তখন পরিধান করে। এখন এটাও বুঝলাম, বিসোয়ারি বুধনেরই স্ত্রী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুম ক্যায়া, কুছ মাংতা?'

বুধন জবাব দিল, 'নাই মাংতা সাব, আপ হমকো বোলায়া?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'নহি তো?'

আমার কথা শুনে, বুধন বাঁদিকে ফিরে তাকালো। অন্ধকারে, অল্প দূরেই আমি মেয়ে গলায় অস্ফুট হাসি শুনতে পেলাম। কিন্তু কারোকে দেখতে না পেয়ে, আবার বুধনের দিকে তাকালাম। বুধন কী একটা বলে উঠলো। অন্ধকার থেকে, মেয়ের স্বরে, আমার পক্ষে দুর্বোধ্য কয়েকটি কথা ভেসে এলো। বুধন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এমন সময়, বাঁ দিকের পিছনে, দরজার পাল্লায় শব্দ হলো। সিংজী বেরিয়ে এলেন, তাঁর বাঁ হাতে একটি বন্দুক। কিন্তু এটি সেই ইটালিয়ান সাইড হ্যামার না, পয়েণ্ট টু বোর, হালকা ধরনের, ঝকঝকে নতুন একটি রাইফেল। হালকা বটে, বাঘ শিকার করা যায় অনায়াসে। তাঁকে দেখেই

বুধন দৌড় দিতে যাচ্ছিল। সিংজী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই বেত্তমেজ, ঠার যা, ইধার আ।'

বুধন থমকে দাঁড়ালো, তার চোখে ভয়ের ছাপ, দৃষ্টি সিংজীর বাঁ হাতে ধরা বন্দুকের দিকে।

সিংজী ডাকলেন, 'আ যা, মেরা পাস্ আ যা।' বলে তিনি পকেটে হাত দিলেন।

এবার তাঁর ডাকে কিঞ্চিৎ কোমলতা ফুটলো। বুধন ভরসা করে, পায়ে পায়ে বারান্দায় তাঁর সামনে উঠে এলো। সিংজী জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যায়া পিয়েগা রে? সড়গা না মদ্গেম?'

বুধন ভয়ের মধ্যেও লজ্জায় মাথা নত করলো। সিংজী পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে, জিজ্ঞেস করলেন, 'আভি গাঁওমে দারু মিলেগা?'

বুধন মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'মিলেগা সাব।'

সিংজী টাকা দুটো ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'যা, কিন্‌কে লে আয়, লেকিন বহু কো সাথ পিনা, হাঁ?'

বুধন বললো, 'জী।'

বলেই বারান্দা থেকে নেমে, মুক্ত মুরগীর মতো ছুটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সিংজীর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি হেসে বললেন, 'আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু ঘরের মধ্যে, রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে, আমি সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আসলে, আপনি ডেকেছেন, এই অছিলা করে, ওর বউ বিসোয়ারি ওকে পাঠিয়েছে, উদ্দেশ্য, এই হুইস্কির বোতল থেকে আপনার কাছে হুইস্কি চাইবে। ওদের পুরুষগুলোর তুলনায়, মেয়েগুলো সেয়ানা হয়। ঠিক লক্ষ্য রেখেছে, যেই আমি উঠে গেছি অমনি আপনার কাছে পাঠিয়েছে। বিসোয়ারি দূর থেকে হেসে উঠতেই বুধন ওকে ডেকে বললো, তুই এসে সাহেবকে বল্। বিসোয়ারি দূর থেকে বললো, তুমি সাহেবকে বলো না, খালি গেলাসে একটু ঢেলে দেবে।'

সিংজী নীচু হয়ে, তাঁর নিজের গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বললেন, 'দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ওরা হুইস্কি পান করে মজা পায় না। আমাদের দেখে, ওদেরও ইচ্ছে হয়েছিল। এখন ওরা গ্রাম থেকে নিয়ে এসে, কিছু একটা পান করবে।'

বনবাসীরা যে হুইস্কি ইত্যাদি পছন্দ করে না, গতকাল রাত্রে এন্দেলবায় তার প্রমাণ পেয়েছি। তার চেয়ে ডিয়েং অর্থাৎ হাঁড়িয়া ওদের অনেক

উপভোগ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন গ্রামে গিয়ে পাবে ?'

সিংজী হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর তুলে, হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'পাবে। রাত্রি তো বেশী হয় নি, আটটা বেজেছে।'

মাত্র আটটা! আমি আমার কবজির ঘড়ি দেখলাম, আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। সিংজী হেসে বললেন, 'একে বলে বনের রাত্রি। সহজে কাটতে চায় না। আপনার হয় তো মনে হচ্ছিল, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি। খুব বেশী হলে, দেড় ঘন্টা আমরা কথা বলেছি। এরকম গভীর বনে সময় কাটাতে হলে, এমন কিছু চাই, যাতে প্রতিটি রাত্রিকে মনে হবে, ক্ষণিকের সময়, দিনকে মনে হবে, নিমেষ মাত্র।'

বলেই তিনি হেসে উঠে, তাঁর গেলাসে চুমুক দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, সময়ের কথা বলে তিনি দিনের ইঙ্গিত করলেন। যে বিষক্রিয়ায় তিনি জ্বলছেন, তার কথাই বলছেন। সীমাকে নিয়ে তাঁর দিন আর রাত্রিগুলো, এই জঙ্গলে কেটেছিল, ক্ষণিকে আর নিমেষে। কিন্তু তিনি এখন বন্দুকটা নিয়ে বেরোলেন কেন ? শিকারে যাবেন নাকি ? জিজ্ঞেস করলাম, 'বন্দুক দিয়ে কী করবেন ?'

বললেন, 'কিছুই না, কোথাও যাবো না। চলুন, একটু ভিউ প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াই। হয় তো খালি হাতেই গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, একটা অস্ত্র হাতে রাখতে পছন্দ করি।'

জরাইকেলার কাছে, সামটা নালার কথা আমার মনে পড়ে গেল, যেখানে গোপন আততায়ী তাঁকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করে, হত্যা করতে চেয়েছিল। এখানেও কি সে-ভয় আছে ? জানি না, সিংজী-ই তা ভালো বুঝবেন। তবে ভিউ প্ল্যাটফরমে যাবার প্রস্তাবটা ভালোই লাগলো। আমি ভাবতেই পারি নি, এখন রাত্রির প্রহর মাত্র আট ঘটিকা।

সিংজী গেলাসটা শূন্য করে রেখে, বারান্দা থেকে নামলেন। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে, মোরাম পাথর বিছানো চত্বরে নেমে এলাম। তখনই, পূর্ব দিকের আকাশে, ক্ষীণ একটি চাঁদের রেখা চোখে পড়লো। দ্বিতীয়ায় বেশী তার বৃদ্ধি হয় নি, অথচ আবছা আলো দেখে চতুর্থী পঞ্চমী অনুমান করেছিলাম। সম্ভবত বনের ধুলা ধোঁয়াহীন স্বচ্ছ আকাশ বলেই, দ্বিতীয়াকেও পঞ্চমী অনুমান হয়।

সিংজী হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইয়েস, টিজ্‌ দ্য প্লেগ্‌ অব্‌ গ্রেট ওয়ানস্/প্রেরোগেটিভস্‌ আর দে লেস্‌ দ্যান্‌ দ্য বেস্/টিজ ডেস্টিনি আন্‌শানেবল্‌,

লাইক ডেথ,/এভন্ যেন দিস ফরকড্ প্লেগ ইজ ফেটেড টু আস/হোয়েন উই ডুলট কুইকেন। লুক হোয়্যার শী কাম্‌স্!'...

বলেই তিনি, বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। আমিও যেন চমকে উঠে অবাক চোখে, তার লক্ষ্যে, বাঁ দিকে তাকালাম। ক্ষীণ, কুহকী জ্যোৎস্নায়, নিবিড় গাছপালা ছাড়া, কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি যেন রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশায় তাকালাম, ডেসডেমোনিয়ার আবির্ভাবকে দেখতে পাবো। ইয়াগোর সেই সর্বনাশা অপবাদের পরেই, ওথেলো এই কথাগুলো বলে উঠেছিল। আমি সিংজীর দিকে তাকালাম। সিল্কের লুঙ্গির ওপরে, পাঞ্জাবি গায়ে পয়েন্ট টু বোর রাইফেল তাঁর ডান হাতে। তাঁর এই ওথেলোর কথা যেন, খলকোবাদ বাংলোর সমস্ত পরিবেশকে বদলিয়ে দিল।

কিন্তু তিনিই আবার আমাকে স্বাভাবিক স্বরে ডাকলেন, 'আসুন রাইটার সাহেব। কিছু ভুলভাল বললাম নাকি?'

আমি বিস্মিত প্রশংসায় বলে উঠলাম, 'ভুল কী বলছেন? আপনি তো দেখছি, অপূর্ব অভিনয় করতে পারেন। চমৎকার আপনার বলার ভঙ্গী, আর সুন্দর উচ্চারণ!'

সিংজী যেন আপনমনে বললেন, 'অভিনয়!' তারপরে হেসে বলে উঠলেন, 'না না রাইটার সাহেব, এতোটা বলবেন না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। চুরি জোচ্চোরির নানান রকম কায়দাকানুন জানি, দরকার হয় বন্দুক চালাতে পারি, কিন্তু অভিনয় একেবারেই জানি না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই বললাম। আসুন।'

আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, ভিউ প্ল্যাটফরমে গেলাম। তাঁর ওথেলোর কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে। ভিউ প্ল্যাটফরমে ক্যাচ্ ক্যাচ্ মচ্ মচ্ শব্দ হলো একটু। বনের নৈঃশব্দে এই সামান্য শব্দই যেন রহস্যময় শোনালো। রেলিং ঘেরা প্ল্যাটফরমের একেবারে অগ্রভাগে গিয়ে, গাটা কেমন শিরশির করে উঠলো। প্রায় আটশো হাজার ফুট উঁচু। মাচা ভেঙে পড়ে গেলে, হয় তো কোনো গাছের ডালে বিদ্ধ হয়েই ঝুলতে হবে। কিন্তু এ কল্পনা, নিতান্তই বাতুলতা। সিংজী তা হলে পা দিতেন না।

নিচের দিকে তাকালাম। কোয়েনার শাখা দেখা যায় না। পাহাড়ের ছায়া, মাঠের অধিকাংশকে গ্রাস করে রেখেছে। সিংজী বললেন, 'একটা সার্চ-লাইট থাকলে, কয়েকটা খরগোশ নির্ঘাত মারা যেতো।'

আমি বললাম, 'বড় শান্ত আর নিরীহ জীব।'

সিংজী বললেন, 'দেখতেও সুন্দর, আর ভারী কোমল। খরগোশের মাংস খেয়েছেন কখনো?'

বললাম, 'না।'

'যদি ইচ্ছা করেন, কাল খাওয়াতে পারি।'

হেসে বললাম, 'ইচ্ছে নেই।'

তিনি বললেন, 'আপনার প্রাণে দেখছি, খুবই মমতা। কিন্তু বাঙালীবাবুরা তো রোজ প্রাণী হত্যা করেই খান?'

'কী রকম?'

'মাছ তো আপনাদের সব থেকে প্রিয় খাদ্য।' বলে হেসে উঠলেন।

তাঁর কথা শুনে একটু লজ্জা পেলাম। কথাটা একেবারে মিথ্যা বলেন নি। সেই অর্থে, আমরা আমিষভোজী বাঙালীরা রোজই প্রায় প্রাণী হত্যা করি। বললাম, 'তবু, খরগোশের কথা শুনলে, মনটা কেমন বেঁকে বসে।'

সিংজী বললেন, 'ওটা বোধহয় সংস্কার। ঠিক আছে, দেখি কাল আপনাকে বনমোরগ খাওয়ানো যায় কী না। তাতে আপত্তি নেই তো?'

আমি বললাম, 'না।'

সিংজী হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। সিংজীর হাসির মধ্যেই, মাচার বাঁ দিকের ঝোপে হঠাৎ বেশ জোরেই খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ ছুটে গেল। সিংজী ঝটিতি সেদিকে ফিরে, রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। শব্দটা আবার থেমে গেল। সিংজী স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ডান হাতে বন্দুক, ব্যারেলটা রেলিং-এর গায়ে। নীচু স্বরে বললেন, 'খরগোশের মতো ছোটখাটো কিছু না, তার চেয়ে কিছু ভারী আর বড় কোনো জানোয়ার হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হতে পারে?'

সিংজী বললেন, 'শেয়াল, শুয়োর, বনবেড়াল, কিংবা ময়ূরও হতে পারে।'

'ময়ূর কি এখানেও আছে নাকি?'

'এ জঙ্গলের প্রায় সবখানেই ময়ূর আছে। তবে এটা বোধহয় ময়ূর না। ময়ূর হঠাৎ এরকম শব্দ করেই থেমে যায় না, সে তার নিজের মনেই চলে। তা ছাড়া রাত্রে ওরা চরে বেড়ায় না, নিজেদের আস্তানা থেকে, মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে। এটা যে কী হতে পারে, বুঝতে পারছি না। বাতাসটা অন্য দিকে, গন্ধও ঠিক পাচ্ছি না।'

একেই বোধহয় শিকারী বলে, গন্ধেও শিকার খোঁজেন। প্রকৃতির নিয়মেও

তাই পশুরা গন্ধ শুঁকেই শিকার এবং শত্রুর সন্ধান পায়। সিংজী কোণের দিক থেকে, চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'চিতা-টিতা হতে পারে।'

আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'বলেন কী?'

সিংজী হেসে বললেন, 'ভয় পাবেন না, চিতা তো বাঘ ছাড়া আর কিছু না। মানুষ না হলেই হলো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মানুষ কি চিতার থেকেও হিংস্র?'

সিংজী যেন অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি একজন রাইটার হয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন? আমি তো দেখছি, আপনার মধ্যে কণ্ট্রাডিকশনে ভরা। পশুর প্রতি মমতা রাখবেন, আবার মানুষের থেকে তাকে হিংস্র বলবেন?'

কথাটা যথার্থ, কোনো সন্দেহ নেই। আমি বললাম, 'ওই সব জানোয়ারের নাম শুনলেই ভয় পাই কী না, তাই!'

সিংজী বললেন, 'তা বুঝেছি। জানোয়ার জানোয়ারই, তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। সে ভয় পেয়ে বা রেগে, হঠাৎ কী করতে পারে না পারে, কোনো ঠিক নেই। কিন্তু মানুষ তা না।'

সিংজীর মানুষের প্রতি এই অবিশ্বাসকে মনে প্রাণে কখনোই সমর্থন করা যায় না। তাঁর দিক থেকে, অবিশ্বাসের হয় তো কারণ আছে, তথাপি, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, প্রাণীসংকুলের মধ্যে, মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব।

সিংজী মুখের কাছে হাত তুলে, চিৎকার করে উঠলেন, 'গুরুয়া! এ গুরুয়া!'

তাঁর চিৎকারে মনে হলো, এই টিলা আর বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো। বেশ দূর থেকেই তাঁর ডাকের জবাব এলো, 'হো-ও হোও।'

সিংজী আবার চিৎকার করলেন, 'তারামাচা। তারামাচা।'...

একটু পরেই, আমাদের পিছনে, মোরাম পাথরের ওপর, ছুটে আসা পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটি মূর্তি, মাচার সামনে এসে দাঁড়ালো। সিংজী বললেন, 'তিন নম্বর ঘরকে অন্দর, টেবিল পর দেখো একঠো টর্চ লাইট হ্যায়। জল্‌দি লে আও! আর শুনো, বাহারকে টেবিল 'পর দারুকা বোতল হ্যায়! বোতল গিলাস পানীকা জার্গ্, ইধার লে আও।'

গুরুয়া হলো চৌকিদার, বুধনের বাবা। একটি খাটো ধুতি পরা, খালি গা। বললো, 'জী সাব্।'

সিংজী আবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই শুনো, ইধার শেরউর কুছ দেখ্‌নে মিলা?'

গুরুয়া বললো, 'নাহি সাব্, শের তো নহি আয়া, গাই ছাগল কুছ নাই

খায়া।'

সিংজী বললেন, 'ঠিক হ্যায়, তুম্ টর্চ লাইট লে আও।'

গুরুয়া চলে গেল। সিংজী বললেন, 'পাহাড়ের এই ঢালু জঙ্গলে কী থাকতে পারে? শেয়াল-টেয়ালই হবে। অথবা বনবিড়াল।'

তিনি বন্দুকটা হাতে নিয়ে, মাচায় বাঁট ঠেকিয়ে রাখলেন। চারদিকে একবার তাকালেন। হঠাৎ আবার বেশ জোরে, বাঁ দিকের ঝোপে, হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো, আর শব্দটা ক্রমেই যেন নিচের দিকে নামতে লাগলো, এবং চকিতের জন্য একটি শব্দ শোনা গেল, অনেকটা গোঙানির মতো। সিংজী বলে উঠলেন, 'হুম্! আর দেখতে হবে না, বুনো শুয়োর। ব্যাটা ভয় পেয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'ওই সামান্য একটু ডাক শুনেই। ওটা ওদের ভয়েরই ডাক।'

গুরুয়া এসে টর্চ বাড়িয়ে ধরে বললো, 'সিঙ্গীয়ে সাব্।'

সিংজী টর্চ লাইটটা নিয়েই, শব্দের লক্ষ্যে, আলো ফেললেন। বেশ বড়, পাঁচ ব্যাটারির উজ্জ্বল আলো, রীতিমতো তীব্র দেখালো। শব্দ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সিংজী সহজে নিরস্ত হলেন না, আলোটা এক জায়গায় ফেলে রাখলেন। তারপর বাঁ হাতে লাইট নিয়ে, ডান হাতে বন্দুকটা তুলে, আলোর বৃত্তে নল তাগ্ করে, ট্রিগারে আঙুল রাখলেন। আলোটা দু'একবারে ইচ্ছা করেই কাঁপালেন, একটু আশেপাশে, কয়েক ফুটের মধ্যে, ফেললেন।

আমি ঠিক এরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নি। হত্যা দেখতে না চাইলেও, এই মুহূর্তে একটা উত্তেজনা বোধ করছি। চোখের সামনে বন্দুক নিয়ে পশু শিকার, আগে আর কখনো দেখি নি। সিংজী বলে উঠলেন, 'ঝোপের মধ্যে, টর্চের আলোয়, দেখতে পাওয়া কঠিন।'

প্রায় দশ মিনিট কেটে যাবার পরেও, ঝিঁঝির ডাক ছাড়া, কিছুই শোনা গেল না। সিংজী টর্চলাইট নিভিয়ে দিলেন। গুরুয়া আবার ফিরে এলো, হুইস্কির বোতল, দুটো গেলাস আর জলের জাগ নিয়ে। সিংজী আমার দিকে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু ধরুন, গেলাস ভরতি করি।'

বলে, টর্চ লাইটটা কোমরে, লুঙ্গির কষিতে গুঁজলেন। হুইস্কি ঢাললেন, দুটো গেলাসেই। আমাকে দিয়ে, নিজে নিলেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু আপত্তি যে টিকবে না, তা জানি। তিনি টর্চ লাইট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি এটা ধরুন, আমি বন্দুকটা নিই। দরকার হলে, যেখানে আলো ফেলতে বলবো, সেখানে ফেলবেন।'

ইতিমধ্যে আমার উত্তেজনা অনেকখানি জুড়িয়ে এসেছে। বললাম, 'ছেড়ে দিন না। বেচারি তো জানতে পারে নি, সিংজী সাহেব আজ বাংলোয় এসেছেন। জানলে কখনোই আসতো না।'

সিংজী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'কী সুন্দর কমপ্লিমেণ্ট। ভালো বলেছেন।'

বলে আবার হেসে উঠতে যেতেই, ঝোপের সেই শব্দ শোনা গেল। আমি টর্চ লাইট জ্বালতে গেলাম।

সিংজী বললেন, 'থাক্, ছেড়ে দিন। আমার আসার কথা বেচারি যখন জানেই না, তখন আর চেষ্টা করবো না। মারবো যখন, তখন আগে জানিয়েই মারবো, আমি এসেছি। আমার হাতেই তোমাকে—'

কথাটা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেলেন, গেলাসে চুমুক দিলেন। তারপরে মাচার ওপরে বন্দুকটা শুইয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'দাঁড় করিয়ে রাখলে, নিচে পড়ে যেতে পারে। এখানে কি বসবেন মাচায়, না কুরসি আনতে বলবো?'

আমি বললাম, 'মাচাতেই বসতে পারি, কুরশির কোনো দরকার নেই।'

দু'জনেই বসলাম। সামনে ফাঁকা না থাকলে, বিশেষ কিছুই দেখা যেতো না। সিংজী বললেন, 'এখানে যতোবার এসেছি, কিছু না কিছু শিকার করেছি।'

আমি বললাম, 'বোধহয় একবারই করেন নি।'

সিংজী যেন একটু অবাক আর বিভ্রান্ত হলেন, তারপরেই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি সেটা ঠিক খেয়াল রেখেছেন দেখছি। না, সেবার আমি কোনো কিছুই শিকার করি নি। কোনো পশুর দ্বারা আক্রান্ত হলে, কী করতাম জানি না। কিন্তু সেবার আমি শুধু একজনকে নিয়েই ছিলাম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপরে কি আর কখনো এসেছেন? না, এবারই এলেন?'

সিংজী বললেন, 'তারপরে তো বার দুয়েক সীমাকে নিয়েই এসেছি। সীমা আমাকে ছেড়ে যাবার পরেও এসেছি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'শুনেছি, হত্যাকারীরা, হত্যার পরে, সেখানে একবার ফিরে আসে। আমি সেই কারণে আসি না। কোনো সুখ বা আনন্দের জন্যও আসি না। যন্ত্রণার মধ্যে বোধহয় একটা আরাম পাওয়া যায়, কিংবা তা বেড়ে ওঠে। যাই হোক, ঘুরে ফিরে আমার বারে বারে

এখানে আসতে ইচ্ছা করে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সীমা আপনাকে ছেড়ে গেছে বলছেন কেন? সে কি সত্যি আপনাকে ছেড়ে গেছে?'

'না, আপনি যে ভাবে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলছেন, সেভাবে ও আমাকে ছেড়ে যায় নি। রাউরকেলায় আমি ওকে যে-বাড়ি করে দিয়েছিলাম, ফিলিপের কোয়ার্টার ছেড়ে মাঝে মাঝে সেখানে এসেও থাকে। আমি রাউরকেলায় গেলে, ওর ওখানে আমাকে ডেকে পাঠায়, সে-হিসাবে ও আমাকে বঞ্চিত করতে চায় না।'

সিংজী বলতে বলতে হেসে উঠলেন, গেলাস নিয়ে চুমুক দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফিলিপের স্ত্রী এখানে নেই?'

সিংজী বললেন, 'ফিলিপ অবিবাহিত। ওর বয়সও এমন কিছু বেশী না, পঁয়ত্রিশ হতে পারে। ছেলেটা ভালো। কোনোরকম সাহেবি ঠাঠ্‌বাট নেই। ওকে অনেকে রাউরকেলার রাস্তায়, সাইকেল রিক্‌শাও চালাতে দেখেছে। সবটাই অবিশ্যি মজা। হিন্দী কথাটা মোটামুটি ওর আয়ত্তে আছে, ইদানীং ওড়িয়া ভাষাও সামান্য শিখেছে। বোধহয় সীমাই শিখিয়েছে।'

সিংজী সাহেব হাসলেন। একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ক্লাবে ভারতীয় অফিসারদের স্ত্রীদের কাছেও ফিলিপ বেশ প্রিয়। আবার ফিলিপকে আমি দেখেছি, রাউরকেলার রাস্তায়, মুণ্ডা মেয়ের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে চলেছে। আমি রাউরকেলায় গেলে, ফিলিপের সঙ্গে দেখা হবেই। ফিলিপকে নিয়ে আমি সীমার বাড়ি যেতাম। আমি যখন রাউরকেলায় থাকতাম না, তখনো ফিলিপ সীমার কাছে যাতায়াত করতো। সেটা গোপন করার কোনো ব্যাপার ছিল না। আমার একটা বন্ধুগোষ্ঠী সেখানে আছে। আমার অনুপস্থিতিতে তারা অনেকেই সীমার কাছে যেতো, তার খোঁজখবর করতো। ফিলিপও আমার বন্ধু, সেও যেতো। তারপরে—।'

সিংজী একটু থামলেন, গেলাসে চুমুক দিলেন, তারপরে গলায় পানীয় আটকে গেলে যেমন হয়, সেইভাবে রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'অতি পুরনো গল্প বলার কিছু নেই। আমার অন্যান্য বন্ধুরা, আমাকে আড়ালে ডেকে অভিযোগ করতো, সীমা আর ফিলিপের বিষয়ে। শুনতাম, কান দিতে চাইতাম না, কিন্তু তা আমার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে থাকতো। তবু আমি সীমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করা সম্ভব ছিল না। ডিগনিটির কথা বলবো না, ডিগনিটির কোনো প্রশ্নও এখানে নেই। সীমা আমার বিবাহিতা স্ত্রী না।

আমি নিজে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকেই বা কতোটুকু সুখী বা সম্মানিত করতে পেরেছি। পারি নি। সেখানে বরং প্রভা ওর ডিগনিটি বজায় রেখেছে, ও আমার সঙ্গে, কখনো আপোস করতে চায় নি। আমি মনে মনে জানি, প্রভারই জয় হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে?'

সিংজী গেলাস তুলে নিয়ে সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিলেন। নিভে যাওয়া বিড়িটা অন্ধকার জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন রাইটার সাহেব, আমি হয় তো একটু বেশী কথা বলে ফেলছি।'

আমি বললাম, 'বেশী আপনি কিছুই বলেন নি। যা বলেছেন, এই বাংলোয় এসে, আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার তুলনায়, যা বলেছেন, তা খুবই সামান্য।'

সিংজী হেসে উঠে বললেন, 'সত্যি?'

আমাকে বিদ্রূপ করলেন কী না, বুঝতে পারলাম না। বোতল থেকে গেলাসে হুইস্কি ঢেলে, জল মিশিয়ে চুমুক দিলেন। ক্রমেই তাঁর গলার স্বর যেন, একেবারে খাদে নেমে যাওয়া তানপুরার তারের মোটা ঝংকারের মতো শোনালো। বললেন, 'আমার চোখের সামনেই, সীমার আর ফিলিপের অন্তরঙ্গতা বেড়ে চললো। আমার মনে পড়তো, সীমা আমার সঙ্গে, এক সময়ে, কটক থেকে কী ভাবে চলে এসেছিল। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, সীমা পুরুষের রক্তে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু কখনো বড় শিল্পী হতে পারবে না। আপনার কী মনে হয় রাইটার সাহেব?'

আমি একটু অপ্রস্তুত আর বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, 'এ বিষয়ে, আপনার অভিজ্ঞ মন্তব্যকেই আমি সত্যি বলে মনে করি।'

তিনি বললেন, 'বেশ, কাল সকালের দিকে সীমা ফিলিপের সঙ্গে এখানে আসছে। আপনার আর আমাদের সাধারণ মানুষের চোখ আলাদা। সীমাকে দেখে, আপনার কী মনে হয়, আমাকে বলবেন।'

সেটা আরো কঠিন ব্যাপার, এই বলাটা। ব্যক্তিগত জীবনে সিংজী নিশ্চয়ই সীমাকে অনেক বেশী বোঝেন। লেখক হিসাবে, আমার নিজের একটা ধারণা, যা হয় তো অপরকে মুখ ফুটে বলা যায় না, ইংরেজিতে যাকে বলে একস্‌পার্ট, জীবন সম্পর্কে লেখকের তা হতে পারা উচিত। সীমা এই থলকোবাদ বাংলোয় আসছে, সঠিক ভাবে না জানলেও, মোটামুটি শোনা ছিল। বললাম, 'আমার ধারণার কথা আপনাকে নিশ্চয়ই বলবো। কিন্তু তা যথার্থ ধারণা নাও হতে পারে।'

সিংজী বললেন, 'আপনি লেখক হতে পারেন, কিন্তু আপনি একজন

পুরুষ।' এটা আমি ধরে নিতে পারি, আপনি জীবনে যা কিছু দেখেন, তা প্রথম থেকেই, লেখক হিসাবে দেখবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন না?'

আমি বললাম, 'কখনোই না। আমি বিশ্বাস করি, আমি প্রথমে মানুষ, তারপরে লেখক।'

সিংজী বললেন, 'চমৎকার! সীমাকে আপনার প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা-টাই আমাকে ব্যক্ত করবেন। যাই হোক, এদের দুজনের অন্তরঙ্গতায় বাধা দিই নি। আজ পর্যন্ত, ওদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে, কোনো কথাই বলি নি। ফিলিপের দিক থেকে কোনো প্রশ্নই নেই, সীমাও আমাকে কখনো কিছু বলে নি। কিন্তু সীমা বোকা না, ইংরেজিতে যাকে বলে, মীয়র এ সেক্স্ ডল্, এ বিউটিফুল বীস্ট, তাও না, ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। ও জানতো, ও কী করছে। তার জন্য ওর মনে কোনো অনুশোচনা নেই, বরং আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পেরেছি। তা হলো এই, "আমার জীবন বা আচরণের ক্ষেত্রে, কারোর হস্তক্ষেপ আমি মানবো না! যার সঙ্গে ইচ্ছা, তার সঙ্গেই আমি মিশবো। আমি কারোর কাছেই দাসখত্ লিখে দিই নি।" এসব কথা ওর মুখ ফুটে বলবার দরকার ছিল না। আমি সবই বুঝতে পারতাম, এখনো পারি। ও আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, কোনো আবদার করে না, কিন্তু শরীরটাকে আমার হাতে তুলে দিতে, কখনো কার্পণ্য করে নি। নিতে পারি নি আমি নিজেই। আর এই না নিতে পারার মধ্যেই, আমার আসল পরিচয়টা—অর্থাৎ আমার মনের বা প্রাণের আসল চেহারাটা ঢাকা পড়ে আছে।'

আমি সচরাচর যা করি না, তা-ই করে ফেললাম, বলে উঠলাম, 'জানি।'

'জানেন?' সিংজী আমার দিকে তাকালেন।

দ্বিতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ আলোয়, দু' পাশের জঙ্গলে ঢাকা, মাচায় বসে সিংজীর মুখ দেখতে পাওয়ার কথা না। সম্ভবত পানীয়র জন্যই, তাঁর ফর্সা মুখ আর চোখ যেন অঙ্গারসদৃশ জলজ্বল্ করছে। আমি তৎক্ষণাৎ বিব্রত হয়ে পড়লাম। কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, জানি বলতে, আমি আপনার কথারই পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিলাম। আপনি নিজেই কিছু আগে আমাকে বলেছেন, দেহের সুখের মধ্যেই, সীমা আপনার প্রাণের গভীরে প্রবেশ করেছিল। আপনি নিজেও তা টের পান নি।'

সিংজী তাঁর প্রকাণ্ড ভারী আর গরম থাবা দিয়ে, আমার একটি হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'ঠিক রাইটার সাহেব, ঠিক বলেছেন। আমি যে

সীমাকে ভালবেসেছি—।'

সিংজীর গলাটা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল, কথা আটকিয়ে গেল। আর সেই কারণেই, গলাটা ভিজিয়ে নেবার প্রয়োজনেই যেন গেলাস তুলে চুমুক দিলেন, আর তানপুরার শিথিল তারের মোটা ঝংকারের মতো, গাঁও গাঁও করে বেজে উঠলেন, 'আমার প্রাণের এ কথাটা আমি কারোকে কখনো বলতে চাই নি। আমি—আমার মতো মানুষও যে ভালবেসে মরেছে, এ কথাটা আমি সীমাকে তো কোনোদিন বলিই নি, কারোর মুখ থেকে এই সাংঘাতিক সত্যি কথাটা শুনতেও চাই নি। সেরকম দুঃসাহস করে, আমার কাছে কেউ সে কথা বলতে এলে, বুনো শুয়োরকে মারার মতোই, তাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলতাম।'

আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠলো। আমি না জেনে, আমার নিজেরই একটা সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম! তাঁর ডান পাশে, মাচার ওপরেই প্রাণ হন্তারক যন্ত্রটি রয়েছে।

সিংজী বললেন, 'অনেক সত্যি শোনা যায়, আবার এমন অনেক মর্মান্তিক সত্যি কথা আছে যা কখনোই শোনা যায় না। আপনি জানেন শুনে, তাই আমি নিজেই টাল খেয়ে গেছলাম। আসলে, ভাই রাইটার সাহেব, নিজের কাছে ছাড়া, এ কথাটা মুখ ফুটে, প্রথম আপনার কাছেই কবুল করলাম। মদ আমি অনেক পান করি, কিন্তু সহজে, মনের ভারসাম্য হারাই না। আজ আমার মনের ভারসাম্য তেমন থাকছে না, নিজেই যেন তা বজায় রাখতে পারছি না। কেন জানি না।'

তিনি গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, সম্ভবত আগামীকাল সীমা এখানে আসছে, তাঁর অবচেতনে, সেই প্রতিক্রিয়া চলছে। মনের ভারসাম্য সেই জন্যই হয় তো বজায় রাখতে পারছেন না। কিন্তু সে-কথা তাঁকে আমি আর বলতে যাচ্ছি না। একবার না জেনে প্রায় বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছিলাম। এই সব ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার বিপদটাই সেখানে। এঁদের অন্তর্প্রবাহের ধারা, কখন কোন্ দিকে, কী স্রোতে বইছে, তা অনুমান করা কঠিন, এবং মুহূর্তের একটি কথায়, কী প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবে, কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

সিংজী আবার বললেন, 'সীমা ওর নিজেকে আমার কাছে তুলে দিতে চেয়েছে, আমি নিতে পারি নি। কেন নিতে পারি নি, সেটাও সীমাই সব থেকে ভালো বুঝেছে। বুঝেও, আমার প্রাণের ইচ্ছাকে আমল দিতে চায়

নি। কারণ—কারণ তো একটাই, আমি প্রাণে মরেছি, ও তো মরে নি। ও যা ছিল, তা-ই আছে, কী ফিরিয়ে নেবো আমি ওর কাছ থেকে? বাড়িটা? যে সব অলংকার শাড়ি জামা, সুখে আর আরামে থাকবার জন্য আসবাবপত্র, আর গাড়িটা? কী লাভ আমার তাতে? আসল যা দিয়েছি, তা তো আর কখনোই ফিরে পাবো না! তবে আর কী হবে আমার, সেই সব নিতান্ত কতগুলো বস্তু ফিরিয়ে নিয়ে?'

সিংজী হঠাৎ থামলেন। মনে হলো, তাঁর মাথাটা যেন বুকের কাছে নেমে গেল। মাতাল হয়ে পড়লেন, না কি শরীর খারাপ বোধ করছেন?

আমার ভাবনা শেষ হবার আগেই, তাঁর গলার স্বর আমি শুনতে পেলাম, 'রাইটার সাহেব, এ সংসারে দু' জনের জন্য, আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একজন সীমা, আর একজন টাটার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, আমার ছেলে—আমার লাল।'

তাঁর শেষের কথাটা যেন আমার বুকে, একটি তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করলো, একটা কষ্টে টনটনিয়ে উঠলো। সম্ভবত, যে-দু'জনের জন্যে, তিনি সংসারের সব কিছু বিলিয়ে দিতে রাজী আছেন, সে-দু'জনকে কখনো ফিরে পাবেন না। সেইজন্যই, জীবনের আহৃত সমস্ত কিছুই ত্যাগে তিনি পরাঙ্মুখ নন।

সিংজী হঠাৎ মুখ তুলে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'সীমা কি ফিলিপকে ভালবাসে? ও কি ফিলিপের প্রেমে পড়েছে?'

তৎক্ষণাৎ ভিন্ন স্বরে, নিজেই জবাব দিলেন, 'না। সীমা হলো, সেই বিরল নারী জাতির একজন জন্ম লগ্নেই যারা উর্বশীর অংশ নিয়ে জন্মায়। তাদের আপনি স্বর্বেশ্যা বলতে পারেন, কিন্তু মর্তের গণিকা কখনোই না। কারণ মর্তের গণিকারাও প্রেমে পড়ে, ভালবাসে, ভালবেসে মরে, এমন কি, বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের, গণিকা জীবন ত্যাগ করে, স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার করতেও দেখা গেছে। কিন্তু স্বর্গের বেশ্যাদের তা কখনো দেখা যায় নি। উর্বশীর জন্য, শক্তিশালী রাজাকেও অভিশপ্ত হতে দেখা গেছে। সম্ভবত ওদের জন্ম লগ্নেই, হৃদয় নামক বস্তুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সীমা হলো সেই রকম স্বর্বেশ্যা। এক অর্থে, প্রেমই তার প্রকৃতি, জীবনের একমাত্র ধর্ম। ব্যক্তির কোনো সত্তা সেখানে স্থান পেতে পারে না। ব্যক্তি মানুষ যে-মুহূর্তে ওর প্রেমে পড়বে, সেই মুহূর্তেই তার কপালে লেগে যাবে, অভিশাপের দাগ। কটকে কতো জনের লেগেছিল জানি না। বোধহয়, ফিলিপও সেই

রাগ নিয়েই একদিন জার্মানীতে ফিরে যাবে। কিন্তু—।'

সিংজী কথা থামিয়ে, গেলাস তুলে, চুমুক দিয়ে, যেন বহু দূর থেকে, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসের তরঙ্গে, আপন স্বরকে ছড়িয়ে দিলেন, 'কিন্তু, মানুষ কী করবে? সে যে নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে?'

তিনি চুপ করলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কে যে নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি। বাইরে থেকে, যার ক্ষয়ের চিহ্ন মাত্র চোখে পড়ে না। হঠাৎ সিংজীর সে বাতাসে ভেসে আসা দূরাগত স্বর আবার শোনা গেল:

'পুট আউট দ্য লাইট, অ্যাণ্ড পুট আউট দ্য লাইট।
ইফ্ আই কোয়েঞ্চ্ দী, দো ফ্লেমিং মিনিস্টার,
আই ক্যান এগেন দাই করমার লাইট রেস্টোর,
শুড আই রিপেন্ট মী; বাট ওয়ানস্ পুট আউট দ্য লাইট ··!'

আবার সেই ওথেলোর কথা। সিংজীর স্বর আর আবৃত্তি, আমাকে সেই দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, ওথেলো ডেসডিমোনিয়াকে হত্যা করতে চলেছেন। থলকোবাদের এই বাংলোয়, নিবিড় বনের, পাহাড়ী টিলার এক মাচার ওপরে বসে আছি। এটা কোনো দিগ্বিজয়ী জেনারেলের ক্যাসল অট্টালিকা না। তথাপি, আমার বুকের মধ্যে যেন সিংজীর স্বর ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠলো। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি ওপর দিকে মুখ করে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ পানীয়র ঝলকে, অঙ্গার সদৃশ বটে, কিন্তু মোটেই কঠিন বা নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে না। সামান্য আলোয়, দেখতে পাচ্ছি, তিনি যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে, করুণ মুখে, নিঃশব্দে কিছু প্রার্থনা করছেন।

আমি কোনো কথা বললাম না। সমগ্র বনকে অতিমাত্রায় স্তব্ধ মনে হচ্ছে। ঝিঁঝির ডাকও যেন অনেক স্তিমিত। অতি নিঃশব্দে পৃথিবী তার অয়ন পথে ধাবমান। আমার মনে হলো, ধাবমান পৃথিবীর গতি যেন আমার হৃদ্‌স্পন্দনে বাজছে।

কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। সিংজীর স্বর শুনেই, আমার সংবিৎ ফিরলো, 'চলুন রাইটার সাহেব, খাওয়া-দাওয়া করে, শোয়া যাক।'

তিনি বন্দুক আর হুইস্কির বোতলটা হাতে তুলে নিলেন। আমি টর্চ লাইট, গেলাস দুটো আর জলের জাগ নিলাম। মাচা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'রাইটার সাহেব, নিশ্চয় ভাবছেন, ভারী ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'এই সব আবোল-তাবোল কথা আপনাকে শুনতে হচ্ছে।'

'আবোল-তাবোল হলে, নিশ্চয়ই শুনতাম না। আমার কাছে, সব কিছুই যেন খানিকটা স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছে।'

'সে কী, রাইটার সাহেব? আমি ভাবছিলাম, আমার নিজেকেই কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন লাগছে!'

'তা হলে, বোধহয় সঙ্গগুণেই আমার এরকম মনে হচ্ছে।'

সিংজী হেসে উঠে বললেন, 'সঙ্গদোষে বলুন।'

আমি হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে বারান্দায় উঠলাম। টেবিলের নিচে, হ্যারিকেনটা সলতে নামানো রয়েছে, একেবারে নিভিয়ে দেওয়া হয় নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সীমা আর কখনো এখানে এসেছে?'

সিংজী চমকে উঠে শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ?' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না, আমার সঙ্গে ছাড়া, সীমা আর কখনো এখানে আসে নি।'

বলতে বলতে তিনি জালের দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর চমকে ওঠা দেখে, আমি একটু অবাক হলাম। আমি তখনো বারান্দায়। জালের ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তিনি টেবিলের ওপর কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটার সলতে উসকে দিলেন। ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল হলো। আমার মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগলো। অথচ তা অকারণ। আমার অস্বস্তি হওয়ার কোনো কথাই নেই, তবু বারে বারেই মনে হচ্ছে, সীমা যখন সিংজীকে ছেড়েই গিয়েছে, তবে আর এই সব যোগাযোগের প্রয়োজন কী? আমি অনুমান করতে পারি, ফিলিপ এবং সীমার এখানে আসার প্রস্তাব সিংজী নিজে কখনোই দেন নি। ওরা নিজেরাই আসতে চেয়েছে। সিংজী তাঁর অতিথি সংকারের ব্যবস্থা করেছেন। সেটা তাঁর চরিত্রানুগ বটে, তথাপি, আমি স্বস্তি বোধ করছি না।

সিংজী জালের দরজাটা খুলে, আমাকে ডাকলেন, 'আসুন রাইটার সাহেব, আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছে।'

আমি ঘরের ভিতরে গেলাম।

সকালে, ঘুম ভেঙে, চোখ তাকাতেই মনে হলো, এক রাশ উজ্জ্বল আলো আমার চোখের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জালের দরজা দিয়ে, বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, মোরাম ছড়ানো চত্বরে, রোদের ঝলক। দেখে মনে হলো,

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। পাশ ফিরে দেখলাম, পাশের খাটে, সিংজী নেই। আমি খাট ছেড়ে উঠে, পাশের ঘরে গেলাম। সিংজী সেখানেও নেই। পিছনের জালের দরজা খুলে, বারান্দায় যেতে যেতেই কথাবার্তার শব্দ পেলাম। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে, সিংজী চৌকিদার গুরুয়ার সঙ্গে কথা বলছেন, আর গুরুয়া মাথা নাড়াচ্ছে।

সিংজী আমার দিকে পিছন ফিরে ছিলেন। তবু তাঁকে দেখেই বুঝতে পারছি, তাঁর স্নান হয়ে গিয়েছে। চোস্ত-এর ওপর পাঞ্জাবি পরেছেন, পায়ে স্যাণ্ডেল। গুরুয়া আমাকে দেখতে পেয়ে, সিংজীকে বোধহয় কিছু বললো। সিংজী আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সুপ্রভাত রাইটার সাহেব, ঘুম ভাঙলো?'

বলেই, আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই, গুরুয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'সাবকো জল্‌দি চা দো।'

বলেই আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে, হাতের ঘড়ি দেখলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'ক'টা বেজেছে?'

সিংজী বারান্দায় উঠে বললেন, 'বেশি না, সাতটা বেজেছে।'

মাত্র সাতটা! বললাম, 'বাইরের রোদ দেখে ভেবেছিলাম, আরো অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

দুজনেই ঘরে ঢুকলাম। সিংজী বললেন, 'পাহাড়ের ওপরে এরকমই মনে হয়। বেলা ন'টায় মনে হয়, ভরদুপুর। নি'চর তলে নেমে গেলে, এরকম মনে হবে না। বসুন, চা খান।'

আমি শোফায় বসে বললাম, 'আপনার তো দেখছি স্নান হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'তা হয়ে গেছে। আমার ঘুমটা একটু এমনিতেই কম। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে যায়। সামনের দিকে বারান্দায় গেছলেন নাকি?'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'না তো! কেন?'

'কালকের সেই মেয়ে দুটি এসেছে।'

আমার মনে পড়লো কোন্ মেয়ে দুটির কথা তিনি বলছেন। গতকাল এখানে আসবার সময়, পথের ধারে যে-মেয়ে দুটিকে পথরোধ করে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আগমনের সংবাদ আমাকে পরিবেশন করার উদ্দেশ্য কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করবে ওরা?'

সিংজী বললেন, 'কিছুই না। চৌকিদার, তার ছেলে আর বউ আছে কাজের জন্য। চৌকিদারের বউ মারা গেছে। বুধন—ওর ছেলে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে

চাকরি করে। যে কোনো সময়েই ওকে চলে যেতে হতে পারে। তাই মেয়ে ছটিকে ওদের সঙ্গে থাকতে বলেছি। কাজকর্ম করবে। কিছু উপুরি রোজগার হয়ে যাবে।'

শুকুয়া চা নিয়ে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'উপুরি রোজগার মানে?'

সিংজী বললেন, 'মেয়ে ছটিও আসলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ করে। ওদের কাজ হলো, বন পরিষ্কার রাখা। পরিষ্কার না রাখলেই, পাতার ডাঁই জমে, তার ভ্যাপসানিতে দাবানলের সৃষ্টি করে। বনবিভাগ ওদের এ জন্য কোনো মাইনে দেয় না। বনের মধ্যে ঘর বানিয়ে থাকতে দেয়, আর চাষ করবার কিছু জমি দেয়। সে সবই হলো নিষ্কর। কাজ ওদের তেমন থাকে না। একটা বিশেষ এলাকায় পাক দিয়ে ঘুরে আসে। দরকার হলে, কোথাও কোদাল চালায়, ঝাঁটা দিয়ে শুকনো পাতা ঝাড়ু দেয়, নয় তো নিজেদের চাষ-আবাদ নিয়ে থাকে। নগদ পয়সার মুখ প্রায় দেখতেই পায় না। তাই ওদের ছুজনকে বলেছি, আমরা যে কদিন আছি, ওরা এখানেই কাজ করবে, রোজ ছ'টাকা করে পাবে।'

কথা শেষ করে, সিংজী একটু হাসলেন। হাসিটা ইঙ্গিতপূর্ণ। আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'আমার ভাই তেমন ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু নেই। ছটি যুবতী মেয়ে, হেসে গেয়ে সব সময় কাজকর্ম করবে, ফাইফরমাস খাটবে, এসব আমার ভালো লাগে। আপনারও হয় তো লাগতে পারে।'

সিংজী আবার হয় তো আমাকে, এদেলবার স্থরসতিয়ার কথাই মনে করিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু তিনি নিজেই ভালো বোঝেন, একজনের বদলে, আর একজনকে পেলেই আসল বিষয়টি মেটে না। তা ছাড়া, জীবনে আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা, স্থরসতিয়ার সঙ্গে যেন আর কখনোই সাক্ষাৎ না হয়। আমাদের ছুজনের ছুজনকে যা দেবার ছিল, তা আমরা দেওয়া নেওয়া করেছি। জীবনে সব কিছুর হিসাব মেলানো যায় না, কে কী পেলাম, কাকে কতোটা দিলাম। আমি আর স্থরসতিয়া, জীবনের তথাকথিত বাস্তবের সীমানা লঙ্ঘন করেছিলাম। কিন্তু সেটাও জীবনের নির্দেশেই, এবং একই কারণে, আমরা আমাদের জীবনের পথে ফিরে গিয়েছি।

সিংজী হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে তাকালেন। যেন উৎকর্ণ হয়ে, কয়েক মুহূর্ত কিছু শুনলেন। বললেন, 'মনে হচ্ছে, একটা গাড়ির

শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু কোনো ভারী লরী বা ট্রাক না।'

আমিও উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলাম। তেমন কিছু শুনতে পেলাম না। সিংজী আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সকালে স্নান করেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি স্নান সেরে নিন। আমার মনে হচ্ছে, ফিলিপ আসছে। এক সঙ্গেই সবাই সকালবেলার খাবার খাবো।'

'ওঁদের কি সকালবেলাই আসার কথা?'

'হ্যাঁ, জানিয়েছিল, রাউরকেলা থেকে ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়বে। অবিশ্যি বুঝতে পারছি না। কতো ভোরে বেরোতে পারে, যে এর মধ্যেই পৌঁছে যাবে? দেখা যাক। আপনি সেরে নিন।'

আমি চা পান শেষ করে, প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে গেলাম। বাথরুমে স্নান করতে করতেই, মনে হলো, একটা গাড়ি বাংলোর চত্বরে এসে দাঁড়ালো। আমি স্নান শেষে জামা-কাপড় বদলিয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম, তখনই পাশের ঘরে, নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম, মোটামুটি একরকমের ইংরেজি ভাষায়, 'তোমাকে বলেছিলাম না, এখানে এলে তোমার খুব ভাল লাগবে?'

জবাবে পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'বাস্তবিক! অপূর্ব জায়গা, আর অপূর্ব এই বাংলো। আমি এতদিন রাওরকেলায় আছি, অথচ এমন সুন্দর জায়গাটাই দেখি নি?'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, আমি নারী কণ্ঠের হাসি ও কথা শুনতে পেলাম, 'আমি তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। এসব হচ্ছে, সিং সাহেবের জায়গা।'

সিংজীর স্বর শুনতে পেলাম, 'ভারত সরকার কথাটা শুনলে, এখুনি আমাকে কোতল করবে। এটা আমার জায়গা কখনোই না, সরকার সংরক্ষিত বন।'

নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'কিন্তু আমি জানি, সরকারের ওপরও সরকার আছে, অন্তত এই জঙ্গলে, আর সেই সরকারের নাম, অজিতকুমার সিং।'

কথা শেষ হতেই, খিলখিল হাসি বেজে উঠলো। আমি যেন একটা নতুন গন্ধ পাচ্ছি এ ঘরে, যা বিদেশী সুগন্ধির কথা মনে করিয়ে দেয়। সিংজীর গলা আবার শোনা গেল, 'আমি সরকারের ওপর সরকার নই, এই বনকে আমি ভালবাসি। এই বন আমার প্রেম। কিন্তু, আবার ঠিকাদার হিসাবে, এই বনই আমি ছিন্নভিন্ন টুকরো করি।'

অন্য পুরুষের স্বর শোনা গেল, 'সেটা রিয়্যালি ট্র্যাজেডি। জীবনযাপনের

প্রয়োজনে, আমাদের অনেক কিছুই করতে হয়, যা আমরা করতে চাই না।'

নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'কোথায় সিং, তোমার লেখক অতিথি কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না তো? তাঁকে নিয়ে আসো নি?'

সিংজীর স্বর, 'নিশ্চয়ই এনেছি। কাল আমি রাইটার সাহেবকে আনবার জন্য, এগেলবায় মোহনবাবুর আস্তানায় গেছলাম। গতকাল বিকেলে আমরা এখানে পৌঁছেছি। উনি স্নান করছেন, এখুনি আসবেন।'

নারীকণ্ঠ, 'স্নান আমাকেও করতে হবে। সেই গত কাল দুপুরে করেছিলাম, তারপর আর সময় পাওয়া যায় নি। গোটা রাতটা তো হৈ-চৈ করেই কেটে গেছে।'

সিংজীর স্বর, 'তাই নাকি? সারা রাত কোথায় হৈ চৈ করে কাটলো?'

নারীকণ্ঠ, 'ক্লাবে। কলকাতা থেকে কয়েকজন এজেন্ট এসেছিল। তারাই বিশেষভাবে একটা পার্টি দিয়েছিল। আমরা তো ক্লাব থেকে, ভোর রাত্রে বেরিয়ে এসেছি।'

সিংজীর স্বর, 'তা হলে তোমাদের কেবল স্নান না, আজ একটু ঘুমোতেও হবে বলো?'

নারীকণ্ঠ, 'ঘুম? এ জঙ্গলে এসে কোনোদিন ঘুমিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না, বরং—।'

নারীকণ্ঠ হঠাৎ থেমে গেল, আমি সিংজীরও কোনো কথা আর শুনতে পেলাম না। আচমকাই যেন কথোপকথনে ছেদ পড়ে, পাশের ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতা যেন স্বাভাবিক না তার সঙ্গে কোথায় একটা আড়ষ্টতাও আছে।

আমি পাশের ঘরে যাবো কী না ভাবছি। আমার আড়ষ্টতার কারণ, পাশের ঘরে দুজন আমার অপরিচিত, যদিও তাদের কথা ইতিমধ্যেই আমার অনেক শোনা হয়ে গিয়েছে। অনুমানের দরকার করে না, সিংজীর অতিথি ফিলিপ আর সীমা দাস পাশের ঘরে রয়েছে। সিংজী তখন যে উৎকর্ণ হয়ে, শব্দ শুনে বলেছিলেন, একটি গাড়ির শব্দ পাচ্ছেন, এবং অনুমান করেছিলেন, তাঁর অতিথিরাই আসছে, তা একেবারে অব্যর্থ। আমি কাচের দরজা দিয়ে, বাইরের দিকে তাকালাম। চোখে পড়লো, সিংজীর জীপের পাশেই, সাদা রঙের একটি বিদেশের তৈরি বড় গাড়ি। গাড়ির বাইরের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, নামী দামী এবং আরামদায়ক মোটরযান।

'রাইটার সাহেব, আপনার হয়ে গেছে?' পিছনে সিংজীর স্বর শোনা গেল।

আমি পিছন ফিরে বললাম, 'হ্যা। দেরি করে ফেললাম নাকি?'

সিংজী বললেন, 'না, দেরি হয় নি। তা হলে জলখাবার দিতে বলি। আসুন আপনার সঙ্গে আমার অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, চওড়া দরজার ওপরে, আর একজনের আবির্ভাব হলো। দৃষ্টিপাত মাত্র চিনতে পারলাম, সীমা দাস। সিংজীর ভাষায়, স্বর্বেশ্যা উর্বশী। কথাটা যে তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি, প্রথম দর্শনেই তা বুঝতে পারছি।

সীমা দাস, তেমন দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে না, কিন্তু হঠাৎ দেখলে, তবে তাকে দীর্ঘাঙ্গী মনে হতে পারে। প্রথম দৃষ্টিপাতেই, যা চোখে পড়ে, তা হলো, তার অলকগুচ্ছ, যার সঙ্গে এখনো জড়ানো রয়েছে, বাসী বেল ফুলের মালা। সুবর্তু নাভির নিচে, শাড়িবন্ধনীর সঙ্গে, রুপোর অলংকারের সঙ্গে চাবির ছড়া গোঁজা। রাত্রি জাগরণের ছাপ আছে তার চোখের কোলে, কিন্তু তা তাকে অসুন্দর করে নি। প্রমোদের ক্লান্তির মধ্যে একটা মদালস মাধুর্য থাকে, যার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সীমা দাসের ডাগর কালো চোখের কোলে তাই দেখতে পাচ্ছি। তার চোখের তারা ছুটি চঞ্চল না, হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখ ছুটি যেন ঢুলুঢুলু অথচ উজ্জ্বল। তার নাক টিকলো, টানা ভুরু আর এইরকম ঠোঁটকেই বোধহয় বিম্বোষ্ঠ বলে। পাতলা না, মোটাও না। মনে করিয়ে দেয়, ভারতীয় মন্দিরের গায়ে, ভাস্কর্যের বিলাসিনী নারীমূর্তিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সীমা যেন তা-ই ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ভাঙলে বা জীর্ণতার দাগ লাগলেও, যার বয়স কখনো বাড়ে না। তার মেদবর্জিত বাহু, গ্রীবা, নাভিস্থলের তুলনায়, তার বুক যেন অনম্র উদ্ধত অথচ নম্রতার একটা লক্ষণও আছে, যা তার দেহের সীমায় অকূল এবং অধরা হয়ে, শ্রীফলের মতো বৃন্তে বন্দী। ক্ষীণ কটির নিচেই, তার নিতম্বের স্থূলতাকে কোনোক্রমেই মেদভারাক্রান্ত বলা যায় না। তার বুকের থেকে কিঞ্চিৎ বর্ধিত, নিতম্বের গঠন অটুট। এখনো তার কপালে একটি অস্পষ্ট লাল ফোঁটা আঁকা, চোখে কাজলের দাগ। ঠোঁটে কোনো রঙ নেই।

সীমা দাসের শরীরে, প্রকৃতি যেন সেই রূপেই বিরাজ করছে, সিংজীর ভাষায় যাকে বলে, পুরুষের রক্তে আগুন ধরানো। এবং তা আছে তার চোখের দৃষ্টিতে, এবং হাসিতে। পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষায় সে থাকলো না, ছু হাত কপালে ঠেকিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় বললো, 'নমস্কার। আপনি নিশ্চয় অজিতের রাইটার সাহেব?'

একটি কথা বলে রাখা দরকার। গতকাল থেকে সিংজীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ সবই ইংরেজিতে হয়েছে। বাঙলা তিনি সামান্য বলতে পারেন। সেই হিসাবে, এদেলবায় মোহনবাবু বা সুরীনদের ছেড়ে আসার পরে, বনের মধ্যে আমি এই প্রথম বাঙলা কথা শুনলাম। আমার মনে আছে, সীমা বাঙালী পিতা এবং ওড়িয়া জননীর কন্যা। আমার কাছে যা নতুন লাগলো, তা হলো, সীমার 'অজিত' নাম উচ্চারণ।

আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে, নমস্কার বিনিময় করে বললাম, 'সাহেব কী না বলতে পারবো না, তবে রাইটার—মানে, লেখক বলতে পারেন। আপনি নিশ্চয় মিস সীমা দাস?'

সীমা ঠোঁটের একটি ভঙ্গি করে হেসে বললো, 'মিস মিসেস কিছুই আমি নিজের সম্পর্কে বলি না, সীমা দাস আমার নাম।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলে তো আপনাকে অসীমা বলে ডাকা উচিত, কারণ আপনি কোনো সীমাতেই বাঁধা থাকতে চান না?'

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর আমার মনে হলো, যেন তার সর্বাঙ্গই বললো, 'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল, আপনি লেখক।'

সিংজী বলে উঠলেন, 'হামে কুছু কুছু বাংলা বুঝে রাইটার সাহেব। আপনি সীমাকো যো অসীমা বাতালেন, ইয়ে বিল্কুল সাচ্চা। সীমা, অসীমাই আছে। উ কুথাও বান্ধা পড়তে চায় না।'

বলে তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন। আমি সীমার দিকে তাকালাম, ও আবার খিলখিল করে হেসে উঠে, সিংজীর ডানায় আস্তে একটি চাপড় মেরে বললো, 'অজিতকুমার সিং ঠিক বোলিয়েছেন, লেকিন বাঙলা না বোলিয়ে, হিন্দী বা ইংলিশি মে বতাইয়ে।'

সীমার কথায়, আমরা তিন জনেই হেসে উঠলাম। সিংজী ইংরেজীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, 'চলুন রাইটার সাহেব, ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়া যাক।'

আমরা মাঝের ঘরে গেলাম। খাটের ওপর এলিয়ে শুয়েছিল এক শ্বেতাঙ্গ। আমরা ঢুকতেই সে উঠে বসলো, এবং তার দৃষ্টি পড়লো প্রথম আমার দিকে। সিংজী পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমাদের পরস্পরকে। ফিলিপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করলো। তারপর এ ঘরের পিছনেই, ঢাকা বারান্দার ডাইনিং টেবিলে গিয়ে আমরা বসলাম।

খাবার দেওয়াই ছিল। আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। এই গভীর বনের মধ্যেও, যাকে বলে পুরোপুরি ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। দুধ, কর্নফ্লেকস, কলা,

ডিম এবং পরোটা। বোম্বাই প্যাকেট আনা সম্ভব হয় নি, আনন্দের টাটকা রাখা সম্ভব ছিল না। শহর থেকে বয়ে আনতে হয়েছে, বর্ণ কলা আর ময়দা। দুধ কলা ইত্যাদি বাসরই সংগ্রহ। অবিশ্যি এই বনের মধ্যে, চাল ডাল আটা তেল নুন, কিছুই পাওয়া যায় না। সবই আনতে হয়, পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে, বনের বাইরে থেকে। সিংজী সাহেব সে সব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছেন। কথাবার্তায় আগেই শুনেছি, তাঁর ভ্রমণ এবং থাকাখাওয়া সবই নাকি রাজকীয়। অবিশ্যি, এ দলবায়, মোহনবাবুর আয়োজনও কম রাজসিক ছিল না। তবু সেই বনের মধ্যে কোয়েনা নদীর ধারে পাতার ঘরে থাকাটা ছিল একরকম। আর এই বাংলোয়, আর এক রকম।

কিন্তু এই সব খাদ্যবস্তু দেখে, অন্য কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। গতকাল এখানে পৌঁছুবার পরে, পেঁয়াজ লংকা দিয়ে, চাল ভাজার ব্যবস্থাও, সিংজীই করেছিলেন। খাদ্য বিষয়ে, তাঁর রসজ্ঞানের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আপাতত আমি নীরব, কারণ বাকী তিনজনের মধ্যে কথাবার্তা প্রধানত রাউরকেলার বিষয়েই চলছে, যার মধ্যে আমার কোনো ভূমিকা নেই। আমি ফিলিপকে দেখছিলাম। তার চুলের রঙ ধূসর, আর পাতলা, কপালের সামনে থেকে অনেকখানি উঠে গিয়েছে। হাড় পুষ্ট ঋজু দীর্ঘ কান্তি ফিলিপের চোখ দুটিতে নীলের ভাবটাই যেন বেশী। তাকে হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আদৌ তা না, চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তার ধূসর চুলের রঙটা নিশ্চয় জন্মগত, ভারতীয় হলে বলা যেতো পাকা চুল। মেদের চিহ্নমাত্র তার শরীরে নেই। সেই হিসাবে, তাকে যথেষ্ট পরিশ্রমী মনে হয়। হাসিখুশীও যথেষ্ট, তার বয়সোচিত। কিন্তু লক্ষণীয়, সে বসেছে সীমার পাশ ঘেঁষে, এবং কথা বলতে বলতে প্রায়ই, সীমার কাঁধে বা কোমরে হাত রাখছে। যেন স্পর্শহীন থাকতে পারছে না। সীমাকে তার জন্য বিরক্ত বা আড়ষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে না। সিংজীও স্বাভাবিকভাবে কথা বলে যাচ্ছেন। একটা অস্বস্তির খচখচানি যেন আমার মধ্যেই রয়েছে।

অস্বস্তির কারণটা অবিশ্যিই, আমার কোনো সংস্কারগত না। প্রেমিকার প্রতি অনেকেরই আত্যন্তিক স্পর্শকাতরতা থাকে। ফিলিপেরও নিশ্চয় তা আছে। আমার অস্বস্তির কারণ সিংজী। তাঁর সামনে এই অনায়াস আচরণ, একটু অস্বস্তিকর এই কারণে, ফিলিপের সঙ্গে যোগাযোগের আগে, এই রমণী, সিংজীর অঙ্কশায়িনী হয়েছিল। কেবল তা-ই না, আমি সিংজীর অন্তরের কথাও জানি। এখনো পর্যন্ত সীমাকে নিয়ে তাঁর মনের অবস্থা, আমার কাছে ব্যক্ত

হয়েছে। সেই কারণেই অস্বস্তি। কিন্তু সিংজী যেন ফিলিপের আচরণকে মোটে লক্ষ্যই করছেন না, মুখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ে, খাচ্ছেন এবং কথা বলছেন।

সিংজীর মতো ব্যক্তির পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। নিজেকে তিনি কখনো দুর্বল মনে করেন না।

খাওয়ার শেষে চায়ের বদলে চৌকিদার শুকুয়া আমাদের পরিবেশন করলো কফি। যেন আমরা কোনো গভীর বনে নেই, নামী শহরের কোনো দামী হোটেলে বসে খাচ্ছি। কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে, ফিলিপ আর সিংজীর আলোচনার প্রসঙ্গ চলে গেল ব্যবসার বিষয়ে। সীমা ভ্রূকুটি করে বলে উঠলো, 'তোমাদের এসব কথা আমার ভালো লাগে না। আমি উঠছি, বরং স্নান সেরে নিই গিয়ে।'

ফিলিপ বললো, 'হ্যাঁ, তুমি তা-ই যাও।'

সীমা আমার দিকে তাকিয়ে বাঙলায় বললো, 'আমি উঠলাম। আপনার যদি এদের ব্যবসার কচকচি শুনতে ভালো লাগে, বসে বসে শুনুন। আধ ঘণ্টার আগে শেষ হবে না।' বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

সিংজী আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসলো ফিলিপও। আমি বললাম, 'আপনারা আপনাদের কথাবার্তা চালিয়ে যান, আমি বরং একটু আশেপাশে ঘুরে বেড়াই।'

সিংজী বললেন, 'তা ঘুরে বেড়ান, তবে একলা, পাহাড়ের নিচে, জঙ্গলা মাঠের দিকে যাবেন না। গেলে পাহাড়ের পিছনে, নিচের গ্রামের দিকে যেতে পারেন। তবে তারই বা দরকার কি? আবার ঠেলে উঠতে হবে। তার চেয়ে, পরে আমরা গাড়ি নিয়ে নামবো।'

আমি বললাম, 'তাই হবে। আমি বাংলোর আশেপাশেই ঘুরবো।'

কফি শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে, আমি আর ঘরের মধ্যে না ঢুকে, পিছনের বারান্দা দিয়েই নেমে গেলাম। বাঁ দিকে কিছুটা গেলেই রান্নাঘর। দেখলাম, সেখানে বিসোয়ারি দরজার কাছে বসে, কুলোয় চাল বাছাই করছে। আমাকে দেখেই একটু হাসলো। একবার একটু পরিচয় হয়ে গেলে, হাসি দিয়েই ওরা অভ্যর্থনা করে। তারপরই ও ঘরের ভিতর থেকে পিছন ফিরে, নিজের ভাষায় কিছু বলে উঠলো। দেখলাম, একটি বনবালা তরুণী ঘরের ভিতর থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো, এবং হাসলো। দেখেই চিনতে পারলাম, এ তরুণী গতকাল বিকেলের পথের বনবালা দুজনের, একজন। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে

হতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হাপানম্ ?'

তরুণী বনবালা অত্যন্ত অবাক হয়ে, ভুরু কুঁচকে, বিসোয়ারির দিকে তাকালো। বিসোয়ারির মুখেও পরম বিস্ময়। ওরা দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করে, আমার দিকে তাকালো। আমি বেশ মজা পেলাম, ওদের অবাক হওয়া দেখে। আমি যে হঠাৎ ওদের ভাষাতেই, এরকম একটা প্রশ্ন করতে পারি, ওরা তা ভাবতেই পারে নি। আমার বিদ্যার দৌড় কতোখানি, তা আমিই ভালো জানি। ওরা যদি পালটা আমার সঙ্গে, ওদের ভাষায় কথা বলে, তা হলেই সব ভাণ্ডা ফোড়।

অবাক তরুণীটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে, সম্মতি জ্ঞাপন করলো, ও হাপানম্। সাধারণ অর্থে হাপানম্ যুবতী বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে বিবাহিতা বধূ বোঝায়। আমি ওদের আর একটা দুর্বলতার কথা জানি—যদিও সেটাকে ঠিক দুর্বলতা বলা যায় না, ওরা প্রায় সব মেয়েরাই সিগারেট ধূমপান করতে ভালবাসে। ওরা আমার সিগারেটের দিকে বারে বারেই দেখছে। আমি পকেট থেকে, প্যাকেট বের করে, দুটি সিগারেট ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'পিও।'

ওরা আবার দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো, এবং দুজনেই হেসে উঠলো। বিসোয়ারি কুলো রেখে, উঠে কাছে এসে সিগারেট দুটি নিল। একটি দিল নতুন বনবালাকে, আর নিজে একটি। আমি দেশলাই বের করে কাঠি জ্বালতেই, বিসোয়ারি আগে ধরালো। তরুণীটিও এসে, সিগারেট ধরাতে গিয়ে, নিশ্বাসের ঝাপটায় কাঠি নিভিয়ে ফেললো। খুবই লজ্জা পেয়ে গেল, বিসোয়ারির দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি আবার একটা জ্বালিয়ে ওর মুখের কাছে ধরলাম। ও সিগারেট ধরালো, কিন্তু মুখের লালায় সিগারেট ভিজে উঠলো। এরকমটা ওদের প্রায় প্রত্যেকেরই হয়। কারণ ওরা সাধারণত ফিকা খেতে অভ্যস্ত, যা এক ধরনের বিড়ি। মুখের লালায় তা ভিজে গেলেও ক্ষতি নেই।

আমি নতুন বনবালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া নাম তুমকো ?'

সকলের মতো, একই ভঙ্গীতে মেয়েটি বললো, 'সুইয়া তো।'

যেন এ আর বলার কী আছে ? এ তো জানাই কথা। সুইয়া ওর নাম বলেই, জিজ্ঞেস করলো, 'তুম হমলোগকা বাত জানতা ?'

আমি হেসে বললাম, 'দো একঠো জানতা।'

বিসোয়ারি আর সুইয়া দুজনেই চোখাচোখি করে হেসে উঠলো। বিসোয়ারি এখানকার প্রচলিত ধরনের হিন্দীতে বললো, 'তোমার মুখে হাপানম্ শুনে আমরা ভেবেছিলাম, তুমি আমাদের কথা বলতে পারো।'

আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'পারি না। তবে, তোমাদের কথা আমার শিখতে ইচ্ছে করে। স্থইয়ার নামটা বেশ ভালো। এর কি কোনো মানে আছে?'

স্থইয়া বললো, 'আছে না? স্থইয়া মানে তো চিড়িয়া।'

বলে, দু হাত দিয়ে, ওড়বার ভঙ্গী করে দেখালো। চিড়িয়া—অর্থাৎ পাখি। স্থন্দর নাম। বাঙালীদের মধ্যেও এ নাম শোনা যায়। বললাম, 'বেশ ভালো তোমার নাম।'

বিসোয়ারি বলে উঠলো, 'আমার নামটা বুঝি খারাপ?'

আমি একটু থতিয়ে গিয়ে বললাম, 'তা কেন, তোমার নামটাও তো ভালো।

ওরা দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। স্থইয়া বললো, 'বিসোয়ারি বেস্পতিবার জন্মেছে, সেই জন্য ওর নাম বিসোয়ারি।'

আমি বললাম, 'তাই বুঝি? আর তুমি কি, জন্মের সময় আকাশে উড়েছিলে, তাই তোমার নাম রেখেছে স্থইয়া?'

স্থইয়া খুব লজ্জা পেয়ে, হেসে উঠে বললে, 'যাহ্! জন্মে আবার কেউ উডতে পারে নাকি? মানুষ কি কখনো উডতে পারে?'

বললাম, 'পারে, হাওয়াই জাহাজে উড়ে মানুষ হাজার হাজার মাইল চলে যায়।'

খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবু ওরা দুজনেই যেন বেশ অবাক হলো। বিসোয়ারি বললো, 'এই বনের আকাশে আমি অনেকবার হাওয়াই জাহাজ দেখেছি। আমাকে লাখ টাকা দিলেও, আমি কোনোদিন হাওয়াই জাহাজে চাপবো না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

ও সিগারেটে টান দিয়ে, খুব গম্ভীরভাবে বললো, 'ওতে পাপ হয়, বোঙা গোসা করবে।'

অদ্ভুত বিশ্বাস। এ বিষয়ে বলে কিছু হবে না জানি। বোঙা ওদের দেবতা ঠিক না। বনবাসীরা, আমাদের ঈশ্বর বলতে যা বোঝায়, বোঙা বলতে তা বোঝায় না। ওদের সবই হলো, অপদেবতা। মঙ্গল অমঙ্গল যা কিছু ঘটে, সবই অপদেবতার কৃপায় বা রোষে। বর্তমান যুগে অবিশ্যি, বনবাসীরা কিছু কিছু হিন্দু দেবদেবীর ভক্ত হয়েছে। অনেক সময়, হিন্দুদের নানা পুজা প্রাঙ্গণে ওদের দেখা যায়। এবং ভক্তি ভরে প্রণামও করে। হিন্দুর কালী দেবীই সম্ভবত এদের কাছে সব থেকে বেশী আকর্ষণীয়। সাঁওতাল পরগনার, রামপুর-

হাটা থেকে, এক গ্রামে দেখেছি, কালী পুজোয় শত শত সাঁওতাসরা আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে পাঁঠা। বলির উৎসবটা তারা বিশেষভাবে উপভোগ করে। মেতেও ওঠে তেমনি।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে, এগোবার উদ্যোগ করে পা বাড়ালাম। বিসোয়ারি ডাকলো, 'বাবুজী।'

আমি দাঁড়ালাম। বিসোয়ারি একবার বাংলোর বারান্দার দিকে দেখে, আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা বাবুজী, সিংজী সাহেবের বউ, ওই গোরা সাহেবটার সঙ্গে এলো কেন?'

ওর কথা শুনেই, বুঝতে পারলাম, সীমার কথা বলছে। ওকে দোষ দেওয়া যায় না। সীমাকে ইতিপূর্বে, ওরা সিংজীর সঙ্গেই দেখেছে। এবং সিংজী, এখানে সীমাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতোই বাস করেছেন। তাঁদের সেই জীবনযাপন যারা দেখেছে, বিশেষ করে এই বাংলোর লোকেরা, তাদের কাছে, এটা প্রশ্নের অতীত, সিংজী সীমার স্বামী কী না।

বিসোয়ারির প্রশ্নে আমি একটু অস্বস্তিবোধ করলাম। একবার তাকালাম বাংলোর দিকে। ভাবলাম, এ বিষয়ে মিথ্যা কিছু না বলাই সঙ্গত। কারণ, ওরা চোখের সামনেই দেখতে পাবে, ফিলিপের সঙ্গে সীমার আচরণ। তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, এবং সিংজীর স্ত্রী হিসাবে সীমাকে অন্যরকম ভাববে। সেটা সিংজী বা সীমা, কারোর দিক থেকেই বোধহয়, প্রার্থিত না। অবিশ্যি, ফিলিপ আর সীমার, এই বাংলোয় আগমনের ব্যবস্থা আর আয়োজন, সবই সিংজী নিজে করেছেন। প্রসঙ্গটা কি তাঁর নিজের মনে পড়ে নি? তাঁর মতো সচেতন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই তা ভেবেছেন। সীমা ফিলিপের সঙ্গে এলে, সকলের চোখের সামনে তাঁর মূর্তিও যে অসম্মানিত হবে তিনি তা নিশ্চয়ই জানেন।

বিসোয়ারি বলে উঠলো, 'কী বাবুজী, তুমি যেন খুবই ধোঁকায় পড়ে গেলে?'

আমি একটু চমকে উঠলাম। ভুলেই গিয়েছি, জটিল চিন্তাটা, বিসোয়ারির প্রশ্ন থেকেই উদ্ভাবিত। আমি বললাম, 'তোমরা ভুল জানো, ওই আওরত সিংজী সাহেবের বউ না।'

বিসোয়ারি তার সরল বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমার কথাটা ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, তাই সুইয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। সুইয়া বললো, 'এই তাবত জঙ্গল জানে, ওই আওরত সিংজী

সাহেবের জন্য আছে। আর তুমি বলছ, না? তবে ও কে?'

'সুইয়ার সঙ্গে বিসোয়ারিও, জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো। তারাও জঙ্গল জানে? সে তো আরো ব্যাপক ব্যাপার। সুইয়ার মতো বনবালা কখনো মিথ্যা বলবে না, আমি জানি। সিংজীর সমগোত্রীয়, জঙ্গলের বাইরের জগতের লোক যারা, ব্যবসাগত কারণে এই জঙ্গলে যাওয়া আসা করে, প্রকৃত ব্যাপারটা তারাই অনুমান করতে পারে। আমার মনে আছে, মোহন-বাবু জয়াইকেলায়, প্রথম যখন আমাকে সীমার কথা বলেছিলেন, তখন তিনি 'কংকোবাইন' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। জঙ্গলের বাইরের জগতের, সিংজীর পরিচিত মহল নিশ্চয়ই মোহনবাবুর মতোই ভাবেন, সীমা সিংজীর রক্ষিতা।

কিন্তু এ জঙ্গল তা জানে না। এই বনের মানুষরা, তা বিশ্বাস পর্যন্ত করতে চায় না। সিংজী এটাও নিশ্চয়ই জানেন। তবু, সীমা আর ফিলিপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য, তাদের এখানে আমন্ত্রণ করেছেন। জানি না, কী ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আমি যা জানি, সেই সত্যিটাই আমাকে প্রকাশ করতে হবে।

আমি বিসোয়ারি আর সুইয়ার ব্যাকুল জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওই অওরত সিংজী সাহেবের বউ না। এক সময়ে সিংজী সাহেবের সঙ্গে, ওর মহব্বত ছিল। এখন আর নেই। এখন ওর মহব্বত ওই গোরা সাহেবের সঙ্গে।'

আমার কথা শুনে, ওরা পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারলো না। এই বনের সমাজে, কতগুলো অধিকার রক্ষার বিষয় আছে। এ সমাজে, মেয়েরাই প্রধান, যে-কারণে, বিবাহের পণ মেয়েরই প্রাপ্য, ছেলের না। তথাপি, স্বৈরিণী বলতে যা বোঝায়, এদের সমাজে তার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু মেয়েদের ইচ্ছা বা বাসনাকে, কখনোই ছোট করে দেখা হয় না। সুরসতিয়ার মধ্যে আমি তার পূর্ণ প্রকাশ দেখেছি। সুরসতিয়া আমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছে, তার সঙ্গে সীমাকে কখনো মেলানো যাবে না। বেশ্যাবৃত্তির মতো কোনো পেশার কথা, বনের প্রাচীন অধিবাসীদের অজানা। অধুনা, যানবাহন আর শহর জীবন, যে-হেতু তাদের অনেক নিকটবর্তী করে দিয়েছে, তার-ফলে বৃত্তিটির বিষয়ে, বনের সমাজ যে কিছুই জানে না, তা হয় তো বলা যায় না, কিন্তু মূলত অজানা। তাদের চিন্তার মধ্যে এ বিষয় কখনো প্রবেশ করতে পারে না।

আমি আবার বললাম, 'সিংজী সাহেব কখনো বলেন নি, ওই অওরত তাঁর

বউ। বলেছেন কী ?'

বিসোয়ারি বললো, 'কেন বলবে ? সে কথা কে বলে ? সবাই নিজের চোখে দেখেই তো বুঝতে পারে। আমরা দেখে ভেবেছি।'

সুইয়া হেসে, ঘাড় কত করে জিজ্ঞেস করলো, 'ত, ওই অওরতটা কী ? ও কী করে ?'

একটা কথা আমার মনে এসে গেল, বললাম, 'ও হলো সুসুনকুড়ি।'

সুইয়া আর বিসোয়ারি নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো, কথাটা যেন ওরা বিশ্বাস করতে পারলো না। সুইয়া বললো, 'আমাদের তো অনেক সুসুনকুড়ি (নাচের মেয়ে) আছে, তারা তো এর তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না ?'

আমি বললাম, 'ও নিজের খুশী মতো, যখন যার সঙ্গে ইচ্ছা, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।'

ওরা দুজনে চুপ করে থেকে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো। তারপরে বিসোয়ারি তার নিজের ভাষায়, সুইয়াকে কিছু বললো। সুইয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। কী বললো, জানবার কৌতূহল হলেও, আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পিছন থেকে সুইয়া জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

আমি পিছন ফিরে বললাম, 'কোথাও না, এখানেই এদিক ওদিক ঘুরে দেখবো।'

কয়েক পা গিয়ে, আবার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সঙ্গে আর একজনের আসার কথা ছিল, সে কোথায় ?'

সুইয়া বললো, 'গোমারি তো ? ওকে চৌকিদার নিচে পাঠিয়েছে। গোমারির কিন্তু একটা সিগারেট পাওনা আছে।'

আমি হেসে বললাম, 'গোমারি এলে দেবো।'

ওরা হাসলো। আমি এগিয়ে গেলাম। ঘুরে, সামনের চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন বনের চেহারা আলাদা। রৌদ্রালোকিত বন এখন, সূর্যস্নান করছে। দিকে দিকে শাল গাছে, শাল ফুল তো আছেই। চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো গাছে, একটিও পাতা নেই, কেবল বর্ণাঢ্য ফুলে ভরা। হলুদ নীল-ই তার মধ্যে বেশী। তার মাঝখানে, রক্ত কুসুম যেন লেলিহান শিখার মতো জ্বলছে।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম কাঠের মাচার প্রান্তে। নিচের দিকে দেখলাম। বিশাল প্রান্তর, সবটাই ঝোপ ঝাড়ে ছাওয়া না। কিছুটা সবুজ

মাঠও আছে। পাহাড়ী টিলার নিচে, সমতল মাঠ। তারপরেই, কোয়েনার একটি শাখা, সূর্যচ্ছটায়, চিকচিক করে বহে চলেছে। শাখা নদীটির ওপারে, লাল মাটির রাস্তা। পাথুরে মাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই অভ্রের কুচি মেশানো আছে। রোদের আলো চিকচিক করছে।

এখন রোদের বেশ তেজ। কিন্তু মাচার দুপাশে, কয়েকটি গাছের ছায়ায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। মৃদু বাতাসে মনে হচ্ছে, চোখ বুজে আসছে। সম্ভবত মহুয়া ফুলের গন্ধে।

'ওহ্, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

বাঙলায় নারীকণ্ঠ শুনে পিছন ফিরে, যাকে দেখতে পাওয়া উচিত, তাকেই দেখলাম, সীমা দাস। তা ছাড়া, এরকম বাঙলা ভাষা বলবার আর কেউ এখানে নেই। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখছি।'

সীমা এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'এ জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। এবার নিয়ে এই বাংলোয় চারবার এলাম। প্রত্যেক বারই, এই তারা মাচায় এসে বসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।'

সীমা কথাটা বললো খুব সহজে। কিন্তু প্রত্যেকবারের সঙ্গে, এবারের কি কোনো তফাত নেই? সে কথা আমার বলা চলে না। আমি একজন বাইরের অতিথি মাত্র। আমি সীমার সাজ দেখলাম। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, মেয়েটিকে রুচিহীনা মনে হলো না। কচি দূর্বা ঘাস রঙের চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরেছে, আর সবুজ রঙেরই জামা। মুখে কোনো রঙ মাখে নি, কপালে ওর চওড়া লাল পাড়ের মতোই, টকটকে একটি লাল ফোঁটা কপালে পরেছে। সদ্যস্নাত চুল, এখনো ভেজা, আঁচড়ানো এবং খোলা। কিন্তু তার মধ্যেই, খোলা চুলের বাঁ দিকে, অলকগুচ্ছের সঙ্গে, টাটকা ফুলের গুচ্ছ, লতিয়ে জড়ানো। একটি সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। গন্ধটা ওর অলকগুচ্ছে জড়ানো ফুলের কী না, বুঝতে পারছি না।

সীমা একেবারে সামনের রেলিং ধরে দাঁড়ালো। আমি একটু সরে গিয়ে, ওর জায়গা করে দিলাম। ও বললো, 'ঠিক আছে, আপনি দাঁড়ান না, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আপনি এখানে আগে এসেছেন, না এই প্রথম?'

বললাম, 'এই প্রথম।'

সীমা একবার আমার দিকে দেখে, আবার দূরের বনের দিকে তাকালো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কোথায় ? কিংকী আর বিং ফিলিপ ?'

সীমা হেসে বললো, 'ওদের কথা আর বলবেন না। দেখা হলেই, ওরা এতো-কাজের কথা বলে, বিরক্তি ধরে যায়।'

ওর হাসির সঙ্গে, বিরক্তির যোগসূত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন বিরক্তির মধ্যেও, কোথাও একটি আনন্দ জড়িয়ে আছে। ও আবার বললো, 'প্রথম এসেছেন, আপনার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে ?'

আমি বললাম, 'অপূর্ব। আমি এরকম গভীর বনে আর কখনো আসি নি।'

সীমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নিশ্চয়ই এখানকার কথা বইয়ে লিখবেন ?'

হেসে বললাম, 'সেটা বলতে পারি না। এখন দেখে বেড়াচ্ছি, এটা একটা আনন্দ। লিখবোই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।'

সীমা বললো, 'জানেন, কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার নামটা জানতাম না, আপনার কোনো বইও পড়ি নি। অবিশ্যি, গল্পের বই আমার বিশেষ পড়াই হয় না। তা ছাড়া, বাঙলা বই হাতের কাছে কমই পাই, ওড়িয়া বই-ই বেশি।'

অতঃপর হয় তো আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, ও গল্পের বই পড়ে না, তো কী বই পড়ে। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। ও আবার বললো, 'তবে কটকে বাঙলা সিনেমা আমি দেখেছি। রাউরকেলাতেও মাঝে মধ্যে দু একটা বাঙলা সিনেমা আসে, দেখতে যাই। আপনার লেখক নাম জেনে আমার এখন মনে পড়ছে, আপনার একটা সিনেমা আমি দেখেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার সিনেমা না, আমার কোনো গল্পের সিনেমা রূপ আপনি দেখে থাকতে পারেন।'

সীমা হেসে উঠে, আমার দিকে পাশ ফিরে বললো, 'আমি অতশত বুঝি না। গল্পটা আপনার, এটা আমার মনে আছে, তাই বললাম, আপনার সিনেমা। কিন্তু আপনি জানেন তো, সেই সিনেমাটা উড়িষ্যায়, দু একবার দেখানোর পরেই তুলে নিয়েছে ? এ দেশের লোকের ধারণা, আপনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন।'

বললাম, 'জানি। কিন্তু ভারতের কোনো প্রদেশের লোক নিয়েই আমি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারি না, করিও নি। আমার দুর্ভাগ্য, উড়িষ্যাবাসী অনেকের মনে হয়েছে, আমি তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছি। আমি আদৌ তা করি নি। আপনার কী মনে হয়েছিল ?'

সীমা যেন একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে, কিছু বলতে গিয়ে, হেসে উঠলো। যেন, ঠিক কী বলবে, স্থির করতে পারছে না। আমি সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারও তা হলে সেইরকমই মনে হয়েছে?'

সীমা বললো, 'দেখুন, আমার বাবা বাঙালী বটে, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে উড়িষ্যায় থেকে, তিনি যেমন অনেকখানি ওড়িয়া হয়ে গেছেন, আমি তাঁর থেকে বেশী হয়েছি। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গেই আমার কেটেছে, মায়ের ইনফ্লুয়েন্সটা আমার মধ্যে বেশী পড়েছে। আপনারা—মানে, বাঙালীরা আমাদের কথা সব সময় বুঝতে পারেন না। কোন্ কথাটা আমাদের সেন্টিমেন্টে ঘা দিতে পারে, সেটা অধিকাংশ বাঙালীই, এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেন না।'

সীমার মুখে, হাসি থাকলেও, ওর কথার মধ্যে এমন একটি জোর আছে, তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনে হচ্ছে না, ও একেবারে অযৌক্তিক কিছু বলেছে, এবং আমি ওর কাছ থেকে ঠিক এরকম কথাও আশা করি নি, কারণ কথাগুলো, ভাববার মতো। ও আবার বললো, 'অবিশ্যি, সেজন্য সব দোষটা আপনাদের ঘাড়ে দেবো না, কিছুটা আমরাও দায়ী। আমি বাঙলা বই বিশেষ পড়ি নি, আগেই বলেছি। আমি জানি না, বাঙলা বইয়ে কোনো ভালো, ভদ্র, বিদ্বান আর আধুনিক ওড়িয়া চরিত্রের কথা লেখা হয়েছে কী না। হয়েছে কী?'

সীমা জিজ্ঞাসু চোখে, আমার দিকে তাকালো। ও যে আমাকে এমন একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে বুঝতে পারি নি। তা ছাড়া ওর মতো একটি মেয়ের কাছ থেকে, আমি ঠিক এরকম কথাবার্তা আশাও করি নি। তাই একটু অবাক চোখে, ওর দিকে তাকিয়ে, আমার পাঠক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হলো, 'হয়ে থাকলেও আমার তা জানা নেই।'

ও বললো, 'কিন্তু আপনার গল্পে একজন ওড়িয়া পাণ্ডার কথা আপনি লিখেছেন, যে-চরিত্র আপনার পাঠককে শুধু হাসাবে, মজা দেবে। সেইজন্যই, ওড়িয়ারা সিনেমাটা তাদের দেশে দেখাতে দেয় নি।'

আমি বললাম, 'আপনার কথা খুব সত্যি, এখানে সেন্টিমেন্টের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু অসত্য কিছু বলা হয় নি।'

সীমা বললো, 'তা জানি, মিথ্যা কথা কিছু বলা হয় নি, তবু মনে লাগে। আপনাদের নিয়ে লিখলে, আপনাদেরও মনে লাগতো।'

আমি সীমার দিকে তাকিয়ে, চুপ করে রইলাম। ও হেসে উঠে বললো, 'আপনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছি, না? কিন্তু সিনেমাটা এমনিতে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাই সিং-এর মুখে যখন শুনলাম, ও আপনাকে নিয়ে থলকোবাদের বাংলোতে বেড়াতে আসছে, ভাবলাম, তা হলে, এই সুযোগে, আমিও আর একবার ঘুরে যাই।'

আমি থলকোবাদে আসছি শুনেই কি সীমা এসেছে? সিংজীর কাছে অন্যরকম শুনেছিলাম। আমার ভাবনা শেষ হবার আগেই, সীমা আবার বলে উঠলো, 'তাছাড়া, ফিলিপেরও অনেকদিন থেকে শখ, এই বাংলোয় বেড়াতে আসবে। সেটা সিং না থাকলে হয় না। ও এক কথাতেই, চাইবাসা হেড কোয়ার্টার থেকে পারমিশন করিয়ে আনতে পারে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার -ব্যাপারটাও ওর ভালো রপ্ত আছে, ও এ জঙ্গলেরই মানুষ।'

জঙ্গলেরই মানুষ? কথাটা যেন খট করে কানে লাগলো। সীমা সম্ভবত সিংজীর অভিজ্ঞতার কথাই বলতে চেয়েছে। আমি বললাম, 'আমি দেখলাম, সিংজীকে এই বনে, সকলে খুব খাতির আর সম্মান করে।'

সীমা বললো, 'ওকে আপনি এই বনের আনক্রাউন্‌ড কিং বলতে পারেন। ওকে এখানে লোকেরা ভালবাসে, ভয়ও পায়। ও কারোর পরোয়া করে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আইন মেনে ও কখনো চলে না। কিন্তু বনের মানুষদের ও ভালবাসে, কখনো কারোর কোনো ক্ষতি তো করেই না, বরং উপকারই করে। আমাকে এই বনের নেশাটা, সিংই ধরিয়েছে।'

আমি সীমার ডাগর কালো চোখের দিকে তাকালাম। সীমাও তাকালো। কিন্তু আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ-ই যেন মনে হলো, কুসুমের লাল লেলিহান শিখা মেলে, সবুজ বন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এই পোশাকে ও যদি, বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে ওকে আলাদা করে চেনা মুশকিল। কিন্তু ওর দুটি চোখ শুধু নেই, যে-চোখের কালো তারা যেন প্রকৃতিরও একটি সংকেতে ঝলকানো। পাশ ফিরে ও এখন আমার মুখোমুখি। বনানীর সঙ্গে মিশে গেলেও, মানবীর শরীরের যে চির আকর্ষণ, তা ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত, যেন অগ্নিশিখার মতোই জ্বলজ্বল্ করছে। নিজে মনে করতে না চাইলেও, আমার ভিতর থেকেই যেন কেউ ঘোষণা করে, আমিও একজন পুরুষ।

সীমা ওর গলার স্বরে যেন, একটু রহস্য মিশিয়ে বললো, 'কিছু বলবেন বলে মনে হলো?'

বললাম, 'বলবার কিছু নেই, আপনার বনের নেশার কথাটা ভাবলাম।'

'কী ভাবলেন?'

সীমা ঘাড় কাত করে, চোখের তারা একটু ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করলো। ওর ঠোঁটের হাসিটার কী ব্যাখ্যা করবো, বুঝতে পারছি না। যদি খুব অশালীন না হয়, তা হলে বলা যায়, কী একটা রহস্যের হাতছানি যেন ওর চোখ আর ঠোঁটের হাসিতে চিকচিক করছে। বললাম, 'ভেবে, কিছুই উঠতে পারি নি। এ বনের আকর্ষণটা আমাকে পেয়ে বসেছে, বলতে পারেন, সেটাও একটা নেশার মতোই। কিন্তু আপনার নেশাটা কি, আমি ঠিক জানি না।'

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠলো, এবং রেলিং-এর দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো। ওর আগুন পাড়, সবুজ বন শাড়ির আঁচল খসে পড়লো খানিকটা। প্রায় কাঁচুলির মতো, ছোট জামায়, ওর উর্বশীর বুক আর মেদবিহীন সুবর্ত নাভিস্থল প্রকাশিত হলো। ও আঁচল তোলবার কোনো চেষ্টা করলো না, বাঁ হাত দিয়ে, সম্পূর্ণ পতন থেকে ধরে রাখলো। বললো, 'ঠিক বলেছেন। সকলেব নেশা তো একরকম হয় না। আপনার একরকম, আমার একরকম।'

সীমা দূরের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, যদিও তার মধ্যে কোনো বিমর্ষতা বা বিষণ্ণতা নেই। বরং ওর অন্যমনস্ক চোখ দুটি যেন, উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে, আর ঠোঁটের হাসিটি ক্রমে, ধীরে, বিস্তৃত হচ্ছে। আমার দিকে না তাকিয়েই, ও বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই সিং আপনাকে আমার বিষয় কিছু বলেছে?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য, একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সীমার চোখের দিকে দেখতে চেষ্টা করলাম। ও আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। দুই কালো ভুরুর মাঝখানে, লাল টকটকে ফোঁটা যেন, তৃতীয় নয়নের মতোই জ্বলজ্বল্ করছে। আমি বললাম, 'আপনি আসছেন, সিংজী এ কথা বলেছিলেন।'

সীমা ঈষৎ ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলো, 'শুধু এই কথা? আমার কোনো পরিচয় ও আপনাকে দেয় নি?'

আমি সহজভাবেই বললাম, 'আপনি ওঁর বন্ধু, এই পরিচয়ই দিয়েছেন— মানে, ওঁর কথা শুনে মনে হয়েছে, আপনারা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

সীমার চোখের কালো তারা দুটি যেন, অতি তীক্ষ্ণ হয়ে, আমার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে, বুকের গভীরে বিদ্ধ করলো। তারপরে ফিক্ করে একটু হেসে,

আবার মুখ বনের দিকে চোখ ফেরালো। বললো, 'ধরা পড়ে গেলেন রাইটার সাহেব।'

বলে, ঘাড় কাত করে, আবার আমার দিকে চোখ ফেরালো. 'আপনার কথার ভঙ্গী দেখেই বুঝলাম, আপনাকে সিং সবই বলেছে। তা না হলে, আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে পারতেন না। তবে হ্যাঁ, আপনার ভাষায়, কথাটি একদিক থেকে ঠিক আছে, আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে সিং বোধহয় ইদানীং আমাকে আর তা ভাবে না।'

ওর চোখে একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো। যেন, এ বিষয়ে ও আমার কাছ থেকেই কিছু জানতে চায়। প্রথম কথাবার্তা থেকেই, আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি, এই উর্বশীরূপিণী নারী একান্ত দেহসর্বস্ব না, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সম্ভবত, কাব্যে এই শ্রেণীর নারীকেই, রসিকা নাগরী বলা হয়েছে। আমি বললাম, 'আমাকে সিংজী সেরকম কিছু বলেন নি।'

সীমা আবার আমার চোখের দিকে তাকালো, এবং হেসে বললো, 'আপনাকে আমি কোনো দোষ দেবো না, বরং আপনাকে আমি রেসপেক্ট করছি। আপনি সকলের প্রতিই সম্মান দেখিয়েছেন।'

এই সময়ে, মোরামের পাথরে, পদধ্বনি শোনা গেল, এবং তা এগিয়ে এলো মাচার দিকে। সামনে সিংজী, পিছনে ফিলিপ। ফিলিপকে দেখে বোঝা গেল, সে স্নান করে, পোশাক বদলিয়ে এসেছে। সিংজী বললেন, 'এটাই অনুমান করেছিলাম, আপনারা দু জনেই বোধহয় এখানে আছেন।'

বলাবাহুল্য, আমাদের পরস্পরের আদানপ্রদানের ভাষণ আবার ইংরেজিতে রূপান্তরিত হলো। সীমা বললো, 'আর কোথায় যাবো বলে অনুমান করতে পারতে? এ বাংলোর এটাই তো সব থেকে সুন্দর জায়গা।'

সিংজী বললেন, 'আমার কাছে অবিশ্যি গোটা বনটাই।'

তিনি ফিলিপের দিকে ফিরে বললেন, 'এসো।'

ফিলিপ এগিয়ে এলো, আমিই পিছিয়ে গেলাম। কারণ পাশাপাশি, দুজনের বেশী দাঁড়াবার মতো প্রশস্ত জায়গা নেই। ফিলিপ সীমার পাশে দাঁড়িয়ে, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে, মুগ্ধ বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো, 'সুন্দর, সত্যিই সুন্দর।'

আমি মাচা ছেড়ে, মোরামের চত্বরের দিকে গেলাম। সিংজীও আমার দিকে এগিয়ে এসে, পকেট থেকে বের করলেন, তাঁর সেই বিশেষভাবে তৈরি বিড়ি। জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি চেপে, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসবেন নাকি?'

সিংজীকে বেশ নির্বিকার, সহজ আর শান্ত দেখাচ্ছে। তাঁর মনের শক্তি আছে জানি, তবু গতকাল রাত্রের, এই মাচায় বসা লোকটার সঙ্গে, তাঁকে যেন মেলাতে পারছি না। আমি ভুলি নি, তাঁর সেই ওথেলোর আবৃত্তি, 'পুট আউট দ লাইট···!' কেন বলেছিলেন, জানি না। হয় তো, গতকাল রাত্রে, তাঁর মানসিক আচ্ছন্নতার মধ্যে, কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকবে। যদিও আমি যেন অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, সত্যি যেন সেই মূর জেনারেল, হৃদয়ের আত্যন্তিক যন্ত্রণায় ফুঁসছেন আর কাতরাচ্ছেন। তাঁর বিষয়ে, আর যাই শুনে থাকি, তিনি অভিনয় করতে জানেন, এরকম শুনি নি। অথচ, অপূর্ব তাঁর বলার ভঙ্গী, একেবারে পাকা অভিনেতার মতো।

আমার অস্বস্তির কারণ, সীমার প্রসঙ্গে কথা বলার পরে, গতকাল রাত্রে, তিনি দু বার ওথেলোর বিশেষ কয়েকটি উক্তি করেছিলেন। আজ তিনি, অতিমাত্রায় শান্ত, অতিথিপরায়ণ। এটাও একটু অস্বস্তিদায়ক। তাঁর প্রাণের প্রতিক্রিয়া একটু অন্যরকমভাবে প্রকাশিত হলেই যেন ভালো লাগতো। আমি বললাম, 'চলুন, ঘুরে আসা যাক। ওঁদের ডাকবেন না?'

সিংজী বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের তো ডাকবই।'

বলে, গলার স্বর চড়িয়ে ডাকলেন, 'ফিলিপ।'

ফিলিপের জবাব শোনা গেল, 'হ্যাঁ।' সে মাচার প্রবেশ মুখে এসে দাঁড়ালো।

সিংজী বললেন, 'একটু ঘুরে আসবে নাকি? রাইটার ভাইকে নিয়ে, আমি বেরোবো।'

ফিলিপ পিছন ফিরে বললো, 'সীমা, বেড়াতে যাবে? সিংজী আর মিঃ রাইটার যাচ্ছেন।'

সীমা মাচা থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'হ্যাঁ, একটু বেড়িয়ে আসাই যাক। তা নইলে ঘুম পেয়ে যাবে। একেবারে দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমোব।'

তারপরে ফিলিপ আর সিংজী পরস্পর আলোচনা করে, স্থির হলো, সিংজীর জীপ গাড়ি নিয়ে বেরোনো হবে। সীমা বললো, 'জীপের পিছনের ঢাকনাটা তা হলে খুলে দিতে হবে।'

সিংজী ফিলিপকে অনুরোধ করলেন, 'তুমি একটু ঢাকনাটা খোলো আমি ভেতর থেকে আসছি।'

আমার চোখে পড়লো, রসুই ঘরের ওদিকে, বাংলোর কোণের আড়াল থেকে, জুইয়া আর বিলোয়াম্মি এদিকে তাকিয়ে দেখছে। সন্দেহ নেই, ওদের

জন্য সীমা আর ফিলিপ। এই প্রথম সীমাকে ওরা আর একটা পরিচয়ে দেখছে। এতদিন জানতো, সীমা সিংজীর স্ত্রী।

আমিও সীমাকেই দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, সিংজীর কথা কতোখানি সত্যি। এই রমণীকে দেখে যদি কোনো পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটে, তাকে দোষ দেওয়া কঠিন। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, শিল্পীর তৈরি পাথর প্রতিমা প্রাণ পেয়ে, সংসারের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিক থেকে ভাবতে গেলে, এটা একটা অপ্রাকৃত ব্যাপার। অতএব, সংসারের বাস্তবতায় সে সমস্যার সৃষ্টি করবেই।

সীমা আমার কাছে এসে, স্বর নীচু করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখছেন রাইটার সাহেব?'

দেখলাম, সীমার চোখের কালো তারা দুটি, আমার চোখের গভীরে বিদ্ধ। হঠাৎ আমার কাছে এসে, তাকে এ ভাবে কথা বলতে শুনে, একটু চমকালাম। পরমুহূর্তেই বুঝলাম, ওকে যে আমি লক্ষ্য করছিলাম, সেটা ওর লক্ষ্য থেকেও ফাঁকি যায় নি। বললাম, 'আপনাকেই দেখছিলাম।'

সীমা ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখছিলেন?'

বললাম, 'আপনার রূপ, আপনার সাজ। আপনার সাজ দেখে মনে হচ্ছে, সবুজ বনে, কুসুম গাছের লাল আগুন জ্বলছে।'

সীমা বলে উঠলো, 'চমৎকার! আর রূপ কেমন দেখলেন?'

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। একবার দেখলাম ওর আপাদমস্তক। বললাম, 'যদি ভরসা দেন তাহলে বলতে পারি।'

'এমন কথা, যে ভরসা দিতে হবে? বেশ, ভরসা দিলাম।'

'চিরদিনের হাতছানি থাকে যে রূপে, তা-ই আপনার রূপ।'

'চিরদিনের হাতছানি? কাকে হাতছানি?'

'ধরে নিন, চিরদিনের পুরুষ প্রাণকেই!'

সীমা হঠাৎ একটু হেসে উঠে, জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি সেই চিরদিনের পুরুষ?'

হেসে বললাম, 'কোনো ব্যতিক্রম নেই।'

সীমা চোখের তারা নিবিড় করে, যেন মন্ত্রোচ্চারণের মতো, জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি তবে আপনারও বাঞ্ছিতা?'

আমি সহজভাবেই হেসে বললাম, 'আপনি সকলেরই বাঞ্ছিতা। কিন্তু তার জন্য যে সাহস থাকা দরকার, আমার তা নেই।'

সীমা ভ্রুকুটি অবাক চোখে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'সাহস?'

বললাম, 'হ্যাঁ। একবারে সাহস তো সকলের থাকে না। আমারো নেই।'

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হেসে উঠলো ওর সমস্ত শরীর। আমি দেখলাম, যেন সমগ্র বনটাই হাসছে। রক্ত কুসুমের শিখা কাঁপছে। হাসি থামিয়ে ও বললো, 'এটা আপনার বিনয় কী না, বুঝতে পারলাম না রাইটার সাহেব।'

'কেন?'

'আপনার কথার মধ্যে একটা সত্যি আছে, আমি অনেকেরই বাঞ্ছিতা। আমাকে নিয়ে, বাবা ছেলের মধ্যে বিদ্বেষও দেখেছি। কিন্তু এ কথা কেউ বলে নি, তাদের কারোর সাহসের অভাব আছে।'

'তারা বোধহয় নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। তবে আমি বিনয় করি নি, সত্যি বলেছি।'

সীমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, 'কিন্তু আমি দেখেছি, সমস্ত শ্রেণীর লোক, এমন কি রিক্‌শাওয়ালা থেকে ভিখারি পর্যন্ত, আমার দিকে এক চোখ নিয়ে তাকায়।'

আমি বললাম, 'স্বাভাবিক। তারাও পুরুষ তো. সেটা ভুলে গেলে চলবে কেমন করে?'

সীমা বললো, 'এ কথা ভাবলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'সেটা অকারণ, বৃথা। একটা কথা মনে রাখতেই হবে, ধনী গরীব সব পুরুষের প্রাণই, একটা জায়গায় এক। আপনার মন খারাপ হওয়ার কারণ—.'

কথাটা শেষ না করে আমি হেসে উঠলাম। সীমা আমার দিকে ভ্রূকুটি অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালো। আমি বললাম, 'দেখুন, উর্বশী স্বর্গ ছেড়ে, মানুষ রাজার কাছে, স্বেচ্ছায় যেতে চায় নি। সেইজন্য প্রেমিক রাজার অভিশাপের নিয়তি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন দেবতারা। স্বর্গের পরিবেশেই উর্বশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, মর্ত্যের না। আপনার মন খারাপ হবার কারণটা বোধহয় তা-ই। যা দেবতার ভোগ্য, তার দিকে কেন মানুষের দৃষ্টি পড়বে?'

সীমা আমার চোখের দিকে নিবিড় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বললো, 'ঠিকই বলেছেন বোধহয়। আপনি তা হলে—।'

'মানুষ সেই অর্থে।' আমি ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠলাম।

সীমা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। এবং হঠাৎ ওর এক হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরলো। ওর নখ মৃদু বিদ্ধ হলো আমার হাতে, অন্যথায় তা

কোমল এবং স্বাভাবিক উষ্ণ। আমার দিকে আর একটু ঝুঁকে, স্বর অনেক নামিয়ে বললো, 'সাহস রাখুন, শিল্পীদের অধিকার দেবতাদের থেকে কিছু কম না।'

বলেই হাতটা ছেড়ে দিল। সীমার উপযুক্ত কথা। বললাম, 'ধন্যবাদ।'

'রাইটার সাহেব, আমরা রেডি।'

সিংজী ডাকলেন। দেখলাম, তাঁর হাতে ইটালিয়ান লাইড হ্যামার। কাছে গিয়ে বললাম, 'আমরা কি শিকারে যাচ্ছি নাকি?'

সিংজী হেসে বললেন, 'সভ্যতার কচকচি যতোই থাক্, আদি যুগ থেকে মানুষ এই সভ্যতার যুগেও শিকার করে বেঁচে আছে।'

কথাটা শুনে, আমার 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'-এর কথা মনে পড়ে গেল। সিংজী আবার বললেন, 'তবে, আপাতত আমরা শিকারেই ঠিক যাচ্ছি না। কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, এ জিনিস সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে।'

বলতে বলতে তিনি জীপের চালকের আসনে উঠে বসলেন। সীমা বলে উঠলো, 'জীপের ঢাকনটা না খুললেও চলতো। আমরা চারজনেই সামনে বসতে পারি।'

সিংজী বললেন, 'অসুবিধা কিছু নেই, যদি তোমাদের কষ্ট না হয়।'

বিপদ গনলাম আমি। তিনজন হয় তো বসা যায়। কিন্তু চার জন? দেখলাম, সীমাই আগে উঠে সিংজীর একেবারে গা ঘেঁষে বসলো। ফিলিপ বললো, 'মিঃ রাইটার এবার আপনি উঠুন।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, আপনি উঠুন, আমি ধারে বসেও, নিজেকে ঠিক রক্ষা করতে পারবো।'

সিংজী আমাকে বললেন, 'আপনি আপনার লোহার ডাণ্ডাটা শক্ত করে ধরে বসবেন, তা হলেই হবে।'

ফিলিপ তথাপি একটু দ্বিধা করলো, তারপর যতোটা সম্ভব সীমার গা ঘেঁষে বসে, আমাকে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিল। আমি উঠে বসলাম। সিংজী গাড়ি চালিয়ে দিলেন। মোরাম ছড়ানো, গোটা চত্বরটা অর্ধবৃত্তাকারে পাক দিয়ে, রসুইঘরের পিছন দিয়ে, আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগলেন। লাল ধুলো উড়লো চারদিকে।

গাড়ি কখনো ওপরে, কখনো নিচে নামতে লাগলো। তার মধ্যেই, সিংজী সাহেব মাঝে মাঝে গাড়ির গতি কমিয়ে, আমাকে বিশেষ বিশেষ গাছ চিনিয়ে

[illegible]। কোথাও কোথাও, অনেকখানি জুড়ে, আমলকীর বন। কোথাও বা অশ্বগন্ধা। মিৎতোজোটো—এক রকমের কাঁটাওয়ালা বন। কোথাও কেবল বাঁশঝাড়, কিন্তু বাঙলাদেশের বাঁশঝাড়ের মতো না। এ বাঁশ সরু, লম্বা, এবং তার বিস্তার অতি ঘন। তারপরে ক্রমেই গাড়ি গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলো। এতো গভীর, আমার হাতে মাকড়সার জাল স্পর্শ করলো। বাতাস ঠাণ্ডা ও ভেজা। কেউ একটি কথাও বলছে না, কেবল জীপের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মনে হচ্ছে, সূর্যবিহীন, অন্য এক গ্রহে আমরা চলেছি। সামনেই দেখা গেল, বিশাল বেতবন, যার তলা দিয়ে, অল্প চেষ্টাতেই যাওয়া আসা করা যায়। কিন্তু ওপরটা বেতের বনের বনাড়।

সীমা বলে উঠলো, 'এ কোথায় নিয়ে এলে সিং? এ জায়গায় তো আগে কখনো আসো নি?'

সিংজী হেসে বললেন, 'এবারে সবই একটু নতুন। সব জায়গায় কি সব সময় যাওয়া যায়?'

আমি সিংজীর মুখের দিকে দেখলাম। তাঁর স্থির দৃষ্টি সামনের দিকে। কোলের ওপর সাইড হ্যামার, তার বাঁটটা সীমার কোলের ওপর।

সীমা আবার বললো, 'এ জায়গাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

ওর স্বরে অস্বাচ্ছন্দ্যতা, মুখেও তারই অভিব্যক্তি। সিংজী সে কথার কোনো জবাব দিলেন না। গাড়ির গতি কমে এলো, কারণ রাস্তাটা খুবই খারাপ। সূর্যালোক এখানে প্রবেশ করতে পারে না। ঢালু পাথুরে সরু পথ ভেজা। যে কোনো মুহূর্তেই চাকা পিছলে পড়তে পারে, বিশেষত একবার যদি ব্রেক ফেল করে।

হঠাৎ জীপের সামনে, কিছু একটা ঝটপট করে দু পাশের ঝোপঝাড় দুলিয়ে, ছিটকে পড়লো। সীমা আর্তস্বরে বলে উঠলো, 'কী এটা?'

সিংজী বললেন, 'অনেকবার দেখেছ, ওটা একটা বনমোরগ ভয়ে পলালো।'

সীমা বললো, 'কিন্তু এরকম জঙ্গলে আমি আর কখনো আসি নি। এটা কী জঙ্গল?'

সিংজী বললেন, 'এটাকে বলা হয় লাকরা বন। লাকরা মানে, মুণ্ডা ভাষায়, বাঘ।'

শুনে আমার প্রাণ হিম! সীমা বলে উঠলো, 'এতো জায়গা থাকতে, তুমি বাঘের আস্তানায় এলে কেন?'

সিংজী বললেন, 'ভয় পাচ্ছো? আমার কাছে তো বন্দুক রয়েছে।'

ফিলিপ এই প্রথম কথা বললো, 'বন্দুক থাকলেও, বাঘ শিকার করা কি নিষিদ্ধ না ?'

সিংজী বললেন, 'হ্যাঁ, নিষিদ্ধ। কিন্তু নিজের জীবন বাঁচাবার কাছে, কিছুই কি নিষিদ্ধ ?'

ফিলিপ সীমার দিকে তাকালো। সীমাও তার দিকে একবার দেখলো। তারপরে সিংজীকে বললো, 'কিন্তু তোমার এখানে আসার দরকার কী ? ফিরে চলো।'

সিংজী জীপ থামিয়ে দিলেন। এঞ্জিন বন্ধ করলেন। আশ্চর্য, এই অন্ধকারপ্রায়, গভীর বনের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। যা খুবই অস্বাভাবিক। সামান্য দু একটা ঝিঁঝি ডাকলেও, গোটা বনটাকে, ভীষণ স্তব্ধ লাগছে।

সিংজী বললেন, 'ফিলিপ, তোমার ভয় লাগছে ?'

ফিলিপ বললো, 'আদৌ না। তবে বাঘ এসে পড়লে বিপদ হতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।'

সিংজী বন্দুকটা নিজের দুই উরুর মাঝখানে রেখে বললেন, 'তা আছি।'

সেই মুহূর্তেই সমস্ত বন কাঁপিয়ে একটা ভয়ংকর হাঁউ হাঁউ শব্দ হলো। সীমা দু হাতে ফিলিপের গলা জড়িয়ে ধরে, আর্তনাদ করে উঠলো। আমিও ভয়ে, যতোটা সম্ভব ধার থেকে আমার শরীর সরিয়ে আনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সিংজী, অকম্পিত হাতে বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'এটা কোত্‌রা হরিণের ডাক। আমাদের ভয়ে ডাকলো, না বাঘ দেখে ডাকলো, সেটাই ভাববার কথা।'

সীমার মুখ ভয়ে পাংশু, বললো, 'সিং, দয়া করে ফিরে চলো। আমার ভালো লাগছে না।'

এই অন্ধকার গভীর বনে, যেখানে চারপাশে মাকড়সার জাল ছড়ানো, ভেজা স্যাঁতসেঁতে, এখানে, সীমার সবুজ বনের রক্ত কুসুমের আগুন যেন কেমন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। সে উজ্জ্বলতা আর নেই।

আমি বললাম, 'সিংজী, ফিরে চলুন।'

সিংজী বললেন, 'ফিরে তো নিশ্চয়ই যাবো। আপনাকে দেখাবার জন্যই নিয়ে এলাম। সারেণ্ডা ফরেস্টের অনেক চেহারা। সবই একটু দেখে যান।'

বলতে বলতে তিনি চাবি ঘুরিয়ে এঞ্জিন চালু করলেন, জীপ আর একটু

খুশিতে নিয়ে গিয়ে একটু বিস্তৃত পরিসরে ঘুরিয়ে নিলেন। আমি দেখলাম, সীমার সুন্দর মুখ তখনো শান্ত।

বাংলোয় ফিরে এসে, আমার জন্যই একটি বিস্ময় প্রতীক্ষা করে ছিল। জীপ থেকে নেমে ঘরের দিকে যাবার পথেই সুইয়া ছুটে এসে বললো, 'বাবুজী, তুমি একবার রসুই ঘরে এসো।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সুইয়া ফিক করে হেসে উঠে, চোখের তারা কাঁপিয়ে বললো, 'বলতে পারবো না। তুমি এসো, তোমার মর্জি হলে।'

বলেই দৌড়ে চলে গেল। সিংজী বলে উঠলেন, 'রাইটার সাহেব, কী করবেন, সবই নসিব। দেখুন, আমাদের কারোর ডাক পড়লো না, কিন্তু আপনার ডাক পড়লো। যান ঘুরেই আসুন, দেখুন, হয় তো কিছু বলবে।'

সীমার মুখে এখন আবার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং হাসি ফিরে এসেছে। বললো, 'মনে হচ্ছে, কী একটা রহস্য যেন রয়েছে? আমরাও যাবো নাকি?'

সিংজী বলে উঠলেন, 'কী দরকার? যাঁকে ডেকেছে, তিনিই যান, তাঁর মুখ থেকেই আমরা সব শুনবো।'

সীমা চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'যান তা হলে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ সুইয়া আমাকে এ ভাবে কেন ডাকলো। গোমারি—ওর আর এক বান্ধবীকে আমার একটি সিগারেট দেবার কথা আছে। কিন্তু সেজন্য কি এমন জরুরি ডাক পড়বে? আমি মোরাম ছড়ানো চত্বর পেরিয়ে রসুইঘরের দিকে গেলাম। দেখলাম, রসুইঘরের দরজায় সুইয়া বিসোয়ারি আর গোমারি, তিন জনেই দাঁড়িয়ে আছে, আর তিন জনেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। আমি কাছে গিয়ে সুইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে সুইয়া, আমাকে ডাকলে কেন?'

ওরা তিন জনেই, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। সুইয় বললো, 'বাবুজী, অন্দরে এসো।'

এ আবার বনবালাদের কী রকম রহস্য! তিন বনবালার একজন যে গোমারি, সেটা আমার নিতান্তই অনুমান। আমি দরজার কাছে এগিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে বলো তো?'

বলে দরজায় দাঁড়াতেই, এক রাশ সাদা আর বেগুনী রঙের ফুলের গুচ্ছ যেন

আমার পায়ের কাছে হয়ে পড়লো। চমকে ওঠার অবকাশ পাবার আগেই, আমার পা স্পর্শ করে যে উঠে দাঁড়ালো, সে তৃপ্তি—তৃপ্তি ভৌমিক। ছোট নাগরার ব্লক ডেভলপমেণ্টের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাঙালী নার্স, যাকে ছেড়ে এসে-ছিলাম, এদেলবায় যাবার সময়। গতকালই এদেলবায়, ওর চিঠি পেয়েছিলাম লিংজীর কাছ থেকে। জানিয়েছিল, সুযোগ পেলে, থলকোবাদে এসে দেখা করবে। অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি!'

তৃপ্তি আমার থেকেও বেশী অবাক, কিছুটা যেন আহত স্বরেই উচ্চারণ করলো, 'আপনি! এ ক'দিনেই, তুমি থেকে আপনি হয়ে গেছি নাকি?'

তাও তো বটে। ছোট নাগরায়, যে-দিন তৃপ্তি ওর কোয়ার্টারের মাটির ঘরে, নিজে রেঁধে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিস, সেই দিন থেকেই যে ওকে তুমি বলে সম্বোধন করেছি! প্রায় অপরাধীর মতো মুখ করে বললাম, 'দুঃখিত। বন দেখতে দেখতে, একটু বিস্মরণ হয়ে গেছে। তুমি কখন এলে? কী ভাবে এলে?'

এতক্ষণে আমার নজরে পড়লো, চৌকিদার গুরুয়া সিমেণ্ট বাঁধানো উঁচু উনোনের ধারে দাঁড়িয়ে। তৃপ্তি বললো, 'শুধু বন দেখতেই ভুলে গেলেন? আমি ভাবলাম আর কিছু বুঝি!'

তৃপ্তির মুখে এখন হাসি। সাদা আর বেগুনি ছাপা শাড়ি পরেছে, আর জামাটা শুধুই বেগুনি রঙের। দু পাশে দুলছে দুই বেণী। ওর মাজা মাজা ফরসা রঙের মুখে, চোখের কাজল ছাড়া আর কোনো প্রসাধন নেই। বরং একটু ধুলাই লেগেছে। হাতে ঘড়িটি ছাড়া, অলংকার বলতে, কানের দুটি পাথর। সেই প্রথম দিন, ছোট নাগরার মন্দিরের সামনে, যেমনটি দেখেছিলাম, সেইরকমই। তফাত শুধু, সেদিন ছিল সামান্য একটি লাল পাড় সাদা শাড়ি, কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগ। একান্তই কর্মীরূপিণী। আজ ওর শাড়িটা দেখে, একটু সাজ করা চোখে পড়ে। এমন সাজ, ছোট নাগরায়, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার সময়ও করেছিল। তিসুয়ার ফুল লাগিয়েছিল কানে, যা অনেকটা ঝুমকার মতো দেখতে। যতো দূর মনে পড়ে, ওর চুলের খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছিলাম, মধুফুলের রক্তিম গুচ্ছ। কিন্তু আজ ওকে দেখে, তেইশ বছরের মেয়েটি মনে হচ্ছে না। দেখাচ্ছে যেন, লজ্জারক্তিম একটি অষ্টাদশী। অরাইকেলার গাজুলিমশাইয়ের মেয়ে, তিপুকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কী হতে পারে? সত্যি, নিতান্ত নানা জায়গায়

মুহূর্তে গিয়েই, খেয়াল ছিল না, তোমাকে আমি আপনি বলা ছেড়েছি তোমার ঘরে বসেই।'

তৃপ্তির মুখে একটু রঙ লেগে গেল। আরত চোখের তারায় লজ্জার ছটা। বললো, 'সেটাও তবু মনে আছে দেখছি। কিন্তু এসে যা শুনলাম, তাতে একটু ভয় পাচ্ছি।'

'কেন?'

'সীমা দাস নাকি এসেছে, কোন্ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে?'

'হ্যাঁ, রাউরকেলার স্টিল প্ল্যান্টের ফিলিপকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ভয় পাওয়ার কী আছে বল তো?'

'শুনেই কেমন ভয় লাগলো।' তৃপ্তি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সীমার সঙ্গে তো, সিংজী সাহেবের এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। বাইরে নানারকম কানাঘুষা শুনতে পাই। সে আবার সিংজীর কাছে, এই সাহেবকে নিয়ে এসেছে কেন?'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো থাকো জঙ্গলের রাজ্যে। বাইরের জগতের কানাঘুষা তোমার কানে আসে কী করে?'

তৃপ্তি ভুরু তুলে, ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'বাইরের জগতের লোকেরাই জঙ্গলে এসে শুনিয়ে যায়, তা নইলে আর আমরা জানবো কী করে বলুন?'

তৃপ্তির ভয়টা হয় তো একবারে অমূলক না, কেন না, কিছুক্ষণ আগে, সিংজী কেন ওই রকম একটি ভয়ংকর জঙ্গলে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক অনুমান করতে পারছি না। সীমাকে কোনোরকম পরীক্ষা করবার জন্য কী? কোত্‌রা হরিণ—অর্থাৎ, বার্কিং ডিয়ারের ডাক শুনে সীমা যেরকম আতঙ্কে শিউরে উঠে আর্তনাদ করে উঠেছিল, ওর মতো দুর্জয় নারীর কাছ থেকে, আমিও যেন তা প্রত্যাশা করি নি। সেই মুহূর্তে সিংজীর মনোভাব ঠিক না বুঝে আমিও যেন কেমন একটু ভয় পেয়েছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভয়ের কারণটা কী? কী ঘটতে পারে বলে তুমি আশঙ্কা করো?'

তৃপ্তি ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললো, 'তা ঠিক বলতে পারছি না। সিংজী হঠাৎ রেগে উঠে কখন কী ঘটাবেন, কে জানে? ওঁকে আমার এমনিতেই ভয় করে, তার ওপরে আবার সীমা এসেছে তার জার্মানী সাহেব বন্ধুকে নিয়ে।'

আমি এক মুহূর্ত ভেবে বললাম, 'কিন্তু এসব নিয়ে ভেবেই বা আমরা কী

করতে পারি বলো। তার চেয়ে, এসব চিন্তা থাক। তুমি কিন্তু এখনো আমার কথার জবাব দাও নি।'

'কী কথা?'

'কখন এলে, কী করে এলে?'

'ওহ্, এই কথা! আয়রন ওর খনির একটা গাড়ি ছোট নাগরার ওপর দিয়ে আসছিল। ওদের বললাম, রাজী হয়ে গেল। ওদের অবিশ্যি একটু ঘুরে যেতো হলো, ওরা যাবে কদলীবাদ হয়ে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এই রান্নাঘরে কেন?'

তৃপ্তি এবার মুখে আঁচল চেপে হাসলো, এবং বনবালাদের দিকে তাকালো। একবার মুখ ফিরিয়ে চৌকিদার শুক্রয়াকেও দেখলো। ওদের সকলের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তৃপ্তির আর আমার বাঙলা কথার কিছুই ওরা সম্যক্ বুঝতে পারে নি। তৃপ্তি বললো, 'ভাবলাম এখানে লুকিয়ে থেকে, আপনাকে চমকে দেবো।'

আমি হেসে বললাম, 'সেটা খুব সার্থকভাবেই দিয়েছ, আমি ভাবতেই পারি নি।'

তৃপ্তি আবার বললো, 'তা ছাড়া, সিংজী সাহেবের সামনে আমি হঠাৎ দেখা দিতে চাই নি। যদি রেগে যান?'

আমি বললাম, 'জানি না, তা যেতেন কী না। তবে, লোকটাকে বাইরে থেকে তোমরা যা দেখ, উনি ঠিক তা নন। আমি যে সিংজীকে দেখলাম, তিনি একজন পরম দুঃখী। অবিশ্যি, তাঁর চরিত্রের সবটুকু বিশ্লেষণ করবার মতো এখনো বুঝে উঠতে পারি নি।'

তৃপ্তি আবার বললো, 'রান্নাঘরে এসে ঢোকবার আর একটা কারণ, রান্না। দেখতে এলাম, ওরা কী রান্না করছে। আমাকে পেয়ে, ওরা নিজেরাই এটা সেটা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি আমার মতো বলে দিচ্ছিলাম। বাংলোতে রান্না করে করে, ওরা মুগের ডাল ছোলার ডালেও পেঁয়াজ দিয়ে বসে।'

আমি বললাম, 'তা হলে এবার চলো, এ ঘর থেকে যাওয়া যাক।'

তৃপ্তি সকলের দিকে একবার তাকালো। শুক্রয়ার দিকে ফিরে, ওদের ভাষায় কিছু বললো। শুক্রয়া হেসে মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু আমরা ঘর থেকে বেরোবার মুখেই গোমারি ওর নিজের ভাষায় কিছু বলে উঠলো। গোমারি এক বনবালা, যার রঙ দেখছি, সকলের মতো কালো না, একটু যেন মাজামাজি ...র দিকে ঝোঁক। প্রায় তৃপ্তির মতোই। তৃপ্তি আমার দিকে তাকিয়ে

বললো, 'গোমারি নাকি আপনার কাছে সিগারেট পায় ?'

আমি থমকে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি ওর একটা সিগারেট পাওনা আছে। কিন্তু ও তোমাকে কথাটা কী বললো ?'

তৃপ্তি বললো, 'বাবুজী আমাকে আমার পাওনা সিগ্‌তানা দিল না। সিগ্‌তানা হলো ধূমপান। বাকী দুজনকে বুঝি আগেই দিয়েছিলেন ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট গোমারির দিকে বাড়িয়ে দিলাম। গোমারি হেসে সিগারেট নিল। বিসোয়ারি বলে উঠলো, 'আমরা আর বাকী থাকছি কেন বাবুজী ?'

তৃপ্তি ভ্রূকুটি চোখে ধমকের স্বরে বললো, 'সিগারেট আর হাঁড়িয়া পেলে এরা আর কিছু চায় না।'

আমি আরো দুটো সিগারেট নিয়ে, সুইয়া আর বিসোয়ারিকে দিলাম। সুইয়া হঠাৎ ওর নিজের ভাষায় কী বলে উঠলো। তৃপ্তির মুখে লজ্জার ঝলক লেগে গেল। ও হাত তুলে সুইয়াকে মারতে উদ্যত হলো। সুইয়া এক লাফে ঘরের বাইরে গিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি তৃপ্তির মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু ও সহজভাবে তাকাতে পারলো না, খালি বললো, 'এদের মুখে কোনো কথা আটকায় না, ভারী অসভ্য !'

বলতে বলতে, ঘরের বাইরে গেল। আমিও গেলাম। সুইয়া তখন অনেক দূরে। আমার মনে পড়লো, তৃপ্তির বাড়িতে কাজ করে একটি বনবালা, যার নাম কয়ো। সেও একটা ঠাট্টা করে বলেছিল, 'কোথা থেকে তোমার বর ধরে নিয়ে এলে ?' জিজ্ঞেস করলাম, 'সুইয়া কী বললো ?'

তৃপ্তির মুখ যেন লজ্জায় আরো লাল হয়ে, নুয়ে পড়লো। আমি ওর ঘাড়ের কাছে দু পাশে ছড়িয়ে দেওয়া দুই বিনুনির মাঝখানে, কিছু চূর্ণ কুন্তল দেখতে পাচ্ছি। নত মুখেই বললো, 'সে কথা আমি আপনার সামনে উচ্চারণ করতে পারবো না।'

এর পরে আর কিছু জিজ্ঞেস করা চলে না। বললাম, 'তা হলে চলো, সিংজীর সঙ্গে দেখা করা যাক।'

এই কথা বলতে বলতেই মোরামের পাথরে পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখলাম, সীমা এগিয়ে আসছে। ওর চোখে ভ্রূকুটি কৌতূহল, দৃষ্টি তৃপ্তির দিকে। তৃপ্তিও মুখ তুলে তাকালো, এবং সীমাকে দেখে ওর মুখভাবের পরিবর্তন হলো।

হাসলো একটু দ্বিধা করে। সীমা কাছে এলে, তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? খুব চেনা চেনা লাগছে!'

তৃপ্তি বললো, 'আপনি আমাকে ছোট নাগরায় দেখেছেন, যখন সিংজী সাহেবের বাংলোয় সেখানে ছিলেন।'

সীমার চোখ দুটি তৎক্ষণাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, বললো, 'ঠিক, মনে পড়ে গেছে। আপনি ছোট নাগরা হেলথ্ সেণ্টারের নার্স, না?'

তৃপ্তি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

সীমা এবার আমার দিকে একবার দেখে আবার তৃপ্তির দিকে দেখলো, কিন্তু আবার আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার সঙ্গে এঁর কি আগেই পরিচয় ছিল?'

বললাম, 'না। এবার এসেই হয়েছে।'

সীমার ঠোঁটে এবং চোখে হাসির ঝিলিক ফুটলো, ঘাড়ে একটা দোলা দিয়ে, কেবল শব্দ করলো, 'ওহ্!'

শব্দটি সামান্য কিন্তু ভঙ্গী ও শব্দটি মিলিয়ে, অসামান্য। আমি আবার বললাম, 'ওর আসার কথা ছিল এদেলবায়। পারে নি, তাই এখানে চলে এসেছে।'

সীমা বলে উঠলো, 'তা হলে পুরুষদের মধ্যেও একটা হাতছানি থাকে।'

বলে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না, বললাম, 'যাই সিংজীর সঙ্গে দেখা করি।'

বাংলোর সামনের দিকে যেতেই চোখে পড়লো সিংজী ফিলিপকে নিয়ে, পানীয়সহ বসে গিয়েছেন। তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে প্রথমটা যেন চিনতে পারলেন না। তারপরে বলে উঠলেন, 'কৌন? তৃপ্তি?'

তৃপ্তি হিন্দীতে জবাব দিল, 'জী নমস্তে! হম আপকো সাথ্ যো :খত্ ভেজি থি উসমে—।'

সিংজী সাহেব হাত তুলে বলে উঠলেন, 'ও তো হম পহ্‌লেই শুন্ লিয়া। আয়ী তো বহুত্ আচ্ছা কিয়া। আও, ওপর উঠ্‌কে আও। অব্ তো তুম ভি মেরা মেহ্‌মান হ্যায়।'

আমাকে ইংরেজিতে বললেন, 'আসুন রাইটার সাহেব। খাবার আগে একটু অ্যাপিটাইজার নিয়ে নিচ্ছি।'

অ্যাপিটাইজার! সিংজী যেরকম গাড়ি চালিয়ে এলেন, সেই পরিশ্রমেই তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার কথা। হুইস্কি পানী নিয়ে, ক্ষুধার উদ্রেকের

প্রয়োজন নেই।' আমি সীমা তৃপ্তি, তিন জনেই বারান্দায় উঠলাম। সিংজী তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার অবিশ্যি ইংরেজিতে, 'তৃপ্তি, তুমি চান করে এসেছ ?'

তৃপ্তি সহজভাবেই বললো, 'হ্যাঁ, আমি তো বেশ বেলাতেই বেরিয়েছি।'

সিংজী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখ তৃপ্তি, আমার রাইটার ভাই এখানে এসেছেন বলেই এখানে এসেছ, তাই না ?'

তৃপ্তি থতোমতো খেয়ে বললো, 'হ্যাঁ তা, মানে, আমি—।'

'বুঝেছি, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।' সিংজী আরো গম্ভীর মুখ করে বললেন, 'কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে, তোমাকে হুইস্কি পান করতে হবে।'

তৃপ্তি উৎকণ্ঠিত স্বরে উচ্চারণ করলো, 'হুইস্কি ?'

বলে ও আমার দিকে তাকালো। আমিও অস্বস্তি বোধ করে সিংজীর দিকে তাকালাম। সকলেই তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ, হুইস্কি।'

বলেই, আবার স্বর নরম করে বললেন, 'তবে তোমার যদি খুব কষ্ট হয়, তবে জোর করবো না।'

বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন। এবং তাঁর হাসির সঙ্গে আমরা সবাই যোগদান করলাম। তৃপ্তির মুখ দেখে মনে হলো, ওর বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল।

সিংজী চিৎকার করে ডাকলেন, 'গুরুয়া, এ চৌকিদার! বুধন।'

গুরুয়া ছুটতে ছুটতে এলো, হাতজোড় করে। সিংজী বললেন, 'আরে বেটা, কুছ্ দেখ্ ভাল্ তো কর। পানী লে আয়, গিলাস বাগেরা লে আয়।'

'জী!' বলেই ছুট লাগালো।

সিংজী সবাইকে বসতে বললেন। সীমা বসলো, ফিলিপ আর সিংজীর মাঝখানের একটি চেয়ারে। আমি সিংজীর অন্য পাশে। আমার পাশে তৃপ্তি। সিংজী বললেন, 'দেখলেন তো রাইটার সাহেব, আপনার কীরকম নসীব। আপনি এখানে আসতে না আসতেই তৃপ্তি ছুটে এসেছে।'

তৃপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠলো, বললো, 'আমি আপনাদের সকলের কাছেই এসেছি।'

সিংজী বললেন, 'আমার কথাটা বলতে দাও। আমার কাছে কেউ এরকম ছুটে আসতে চায় না।'

সীমা বলে উঠলো, 'কেন, আমি এসেছি।'

সিংজীর গোঁফের ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটু হাসি ফুটলো, বললেন, 'তা সত্যি!' বলেই আবৃত্তি করে উঠলেন, 'ও ডার্ট য়ু ওয়্যার য়োরসেলফ, বাট, লাভ, য়ু আর নো লঙার য়োরস্ ড্যান য়ু য়োরসেলফ, হিয়ার লিভ্।'...

বলেই হেসে উঠলেন। আবার সেক্সপীয়র। সিংজী সেক্সপীয়রের সনেট থেকে আবৃত্তি করলেন। সীমার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটলো। একবার ফিলিপের দিকে তাকালো, তারপরে আমার দিকে। সিংজী বললেন, 'রাগ করলে নাকি সীমা?'

সীমা বললো, 'না, তোমাকে একটু চিনি তো!'

সিংজী বললেন, 'একটু?'

শুক্রয়া এলো, সঙ্গে বিসোয়ারি, একজনের হাতে গেলাস, আর একজনের হাতে জলের জাগ। টেবিলের ওপর সব রেখে, শুক্রয়া জিজ্ঞেস করলো, 'অওর কুছ হুকুম হ্যায় সাব?'

সিংজী বললেন, 'হুকুম একঠো হ্যায়। তুম দুপহর কে খানা খাকে গাঁওকো গনজুকো বোলায়েগা, হামারা নাম উসকো বলো। আভি যাকে আচ্ছা সে খানা বানাও।'

'জী!' শুক্রয়া চলে গেল।

সিংজী সাহেব চারটি গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন। বাকী রাখলেন একটি। আমি বললাম, 'আমাকেও দিচ্ছেন নাকি?'

সিংজী বললেন, 'কেন, আপনি পান করলে, তৃপ্তি রাগ করবে?'

আমি হেসে বললাম, 'না, আমি পান করলে তৃপ্তি রাগ করবে কেন? দিনের বেলাটা ঠিক—।'

'অল্প নিন, রাইটার সাহেব।' সীমা বলে উঠলো, 'আমাদের একটু সঙ্গ দিন। অবিশ্যি মিস ভৌমিক নিলে, আমি খুব খুশী হতাম।'

তৃপ্তি বললো, 'একজনের দেখা ভালো।'

'মানে মাতলামির সাক্ষী থাকতে চাও।' বলে সিংজী হেসে উঠে গেলাস তুলে ধরে বললেন, 'ফর দ্য ট্রুথ্ অ্যাণ্ড র‍্যাডি হ্যাপিনেস্।'

বিকালে কোথাও গাড়ি নিয়ে বেরোবার ইচ্ছা কারোরই ছিল না। দুপুরের খাওয়াটা রীতিমতো বেশী হয়েছিল। মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, ডিমের ডালনা, মুরগীর মাংস, শুকনো মিষ্টি। শুকনো মিষ্টি, সিংজীই সঙ্গে এনেছিলেন।

তাঁবুরেও একটা গুরুতর বিয়ের সমাধান করতে হয়েছে, কে কোথায় শোবে, তা নিয়ে। সিংজী প্রথমেই বলেছিলেন এক নম্বর সিঙ্গল বেড্ ঘরে তিনি নিজে থাকবেন। দু নম্বরের ডাবল বেডে, ফিলিপ আর সীমা। তিন নম্বরের ডাবল বেডে আমি আর তৃপ্তি।

হয় তো তিনি ইচ্ছা করেই ঠাট্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, তৃপ্তি থাকবে সিঙ্গল বেড ঘরে। বিকেলে চায়ের আসরের সময়, গঞ্জু নামক এক ব্যক্তি এলো। গঞ্জু কোনো নাম না, একটি বিশেষ পদ। মুণ্ডা ভাষায় গঞ্জুয়াসি বলতে বোঝায়, যে লোকটি সকলের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে এবং গ্রাম সমূহের দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপরে। তাকে বলা হয়, গঞ্জু।

সে এসে প্রায় আভূমি প্রণত: হয়ে, সবাইকে নমস্কার করে দাঁড়ালো, বললো, 'হুজুর হম গঞ্জু মহাদেও।'

সিংজী বললেন, 'শুনো মহাদেও, হমারা মেহ্‌মান লোগ্ আয়া। রাউরকেলা কারখানা কা ইয়ে এক বড়া সাহাব ভি অ্যায়া।'

মহাদেও সবাইকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানাতে লাগলো। সিংজী বললেন, 'তুম গাঁও-মে বাতা দো, কাল শাম কো, ইধার নাচা গানা করনে পড়েগা। খানে পিনে কা খরচা হমরা। যো যেত্‌না হাঁড়িয়া পিনে সকৃতা, সিগ্‌রেট পিনে সকৃতা, ভাত অওর শুয়োর কা গোস্ত্ খানে সকৃতা মিলেগা।'

মহাদেও গঞ্জু একেবারে নত হয়ে পড়লো। সিংজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠার যাও।'

বলে ঘরের ভিতরে গেলেন, বেরিয়ে এসে এক গোছা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'শও রূপয়া হ্যায়। আজ হাঁড়িয়া বানানে শুরু করো অওর কিসিকো পাস্ সে বরা (শূকর) লে লাও। কাল সবেরে অওর রূপেয়া লে যায়েগা, হাঁ?'

'বহুত আচ্ছা সাব।' গঞ্জু মহাদেবও আবার সবাইকে সেলাম দিয়ে চলে গেল।

সীমা ঘর থেকে তাস নিয়ে বেরোলো। বললো, 'খেলা যাক, রামি। মিনিমাম বোর্ড মানি দু টাকা।'

সিংজী বললেন, 'এসো বসা যাক।'

প্রমাদ গণলাম আমি। বিষয়টি আমার মোটেই জানা নেই। সীমা আমাকে ডেকে বললো, 'বসুন।'

আমি বললাম, 'ওটা আমি জানি না।'

সীমা তৃপ্তিকে বললো, 'আপনিও কি না জানার দলে ?'

তৃপ্তি বললো, 'না, জানি। কিন্তু আমার খেলবার টাকা নেই।'

সীমা বললো, 'আপনাকে আমি টাকা দিচ্ছি।'

সিংজী বলে উঠলেন, 'না, ধারের টাকা দিয়ে জুয়া খেলা চলে না। তার চেয়ে তৃপ্তি তুমি রাইটার সাহেবকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো।'

তৃপ্তির মুখে একটু লজ্জার ছটা লেগে গেল। আমি বললাম, 'আমরা বসে খেলা দেখি।'

সীমা বললো, 'সিং ঠিকই বলেছে, আপনারা বরং একটু বেড়িয়েই আসুন।'

বলে ও আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নাচালো। তৃপ্তি তা দেখতে পেয়ে মুখ অন্যদিকে ঘোরালো। আমি তেমন সংকোচ বোধ করছিলাম না। বনে বেড়াতে এসে, বসে থাকার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। তৃপ্তির সংকোচ ভেঙে দিয়ে আমিই ডাকলাম, 'এসো আমরা ঘুরে আসি।'

সিংজী উঠে বললেন, 'একটু পানীয় নিয়ে বসা যাক। কিন্তু তৃপ্তি অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসো।'

তৃপ্তি বললো, 'আমরা দূরে কোথাও যাবো না।'

তৃপ্তি আর আমি এগিয়ে গেলাম। তৃপ্তি বললো, 'বাঁ দিক দিয়ে আসুন। একটু খাড়াই আছে কিন্তু ধাপ কাটা আছে সাবধানে নামবেন।'

বাঁ দিকে গিয়ে, খাড়াইয়ের চেহারা যা দেখলাম, অসাবধান হলে হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র না। এবং নামতে গিয়ে দেখা গেল, আমার থেকে অসুবিধাটা তৃপ্তিরই বেশী। বললাম, 'তোমার পক্ষে ধাপগুলো একটু বেশী উঁচু, নামবে কী করে ?'

তৃপ্তি সলজ্জ হেসে বললো, 'আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে, আমার একটা হাত ধরবেন ?'

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তৃপ্তি চেপে ধরলো। আমি বললাম, 'পড়লে দু জনের এক সঙ্গে পড়াই ভালো।'

তৃপ্তি হঠাৎ থেমে পড়ে বললো, 'আমি কিন্তু সে কথা একবারও ভাবি নি।'

আমি হেসে বললাম, 'তার জন্য তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ?'

তৃপ্তি আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'তোমাকে খাটো করবার জন্য কিছু বলি নি। পড়বো না সে বিশ্বাস আমার আছে।'

বেশ খানিকটা নেমে একটা রক্ত কুসুমের তলায় আমরা দাঁড়ালাম। পাশেই দুটো শাল গাছ, ফুলে ভরা। তৃপ্তি বললো, 'এসে অবধি আপনাকে

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বারে বারে ভুলে যাচ্ছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলো তো?'

তৃপ্তি বললো, 'আমি এখানে এসেছি বলে আপনার খারাপ লাগছে না তো?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'হঠাৎ এ কথা বলছো কেন? আমার সঙ্গে তো তোমার বনে বনে ঘুরে বেড়াবার কথাই ছিল।'

তৃপ্তি বললো, 'তবু বলছি যদি আপনার কোনোরকম—।'

কথা শেষ না করে ও আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো, 'আমি কিন্তু আপনার জন্যই এসেছি।'

আমি বললাম, 'তুমি না এলে, আমার বনভ্রমণ পূর্ণ হতো না।'

তৃপ্তি লজ্জিত হয়ে মুখ নামালো। পরমুহূর্তে দুজনেই চমকে উঠলাম, কয়েকটি মেয়ে-গলার সম্মিলিত হাসিতে। আমাদের ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, পড়ন্ত বেলার রক্তিম রোদে ঝোপঝাড় কাঁপিয়ে, তিনটি মুখ দেখা দিল। বিনোয়ারি, গোমারি আর সুইয়া। ওরা তিন জনেই আমাদের দিকে হাত তুলে নেড়ে আবার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তৃপ্তি বলে উঠলো, 'ভারী পাজী।'

আমার সেই কথাটি আবার মনে পড়ে গেল, যা তৃপ্তি উচ্চারণ করতে পারে নি। বললাম, 'এবার তো ওরা কিছু বলে নি, কেবল হেসেছে।'

তৃপ্তি আমার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়েই হেসে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে, অন্যদিকে তাকালো। ওর মুখে, রক্তিম রোদ পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

তৃপ্তি মাথা নেড়ে জানালো, 'কিছু না।'

তবু হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিল। আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটেছে?'

তৃপ্তি মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সুইয়ার কথাটা মনে পড়ছে।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।'

তৃপ্তি একবার চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে দেখলো তারপরে আবার রোদের দিকে মুখ করে বললো, 'সুইয়া তখন বলছিল তোমরা দীখু (সমতলবাসী) মেয়েরা তো সিগারেট খাও না, খালি চুমো খেতে শিখেছ।'

বলেই তৃপ্তি আঁচল দিয়ে ওর গোটা মুখটা ঢেকে ফেললো। বনবাসীরা

চুম্বনে যেটেই রপ্ত না, কোনো আবেগও বোধ করে না। আমি তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ওর বয়স মন সব কিছুর সঙ্গে এই আচরণটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনটা ভারি হয়ে উঠছে। দমদমে বিধবা মা, ছোট ভাই বোনদের জন্য ওর এই বয়সটা কাটছে গভীর বনবাসের নির্বাসনে। তথাপি তরুণী প্রাণ তো জীবন্ত আছে। একটি ফুলের কলি ফুটতে চায়। সেই ভ্রমর যে কোথায় আছে, যে ওর পাপড়িতে ঝাপ্‌টা দেবে, কে জানে। আমি যে নই, তা আমি জানি।

তৃপ্তি আস্তে আস্তে মুখ থেকে আঁচল নামিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি হাত বাড়িয়ে ওর একটি হাত ধরলাম, ডাকলাম, 'এসো, নিচে যাই।'

ও জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি রাগ করলেন?'

বললাম, 'রাগ করবার মতো কথা তুমি কিছু বলো নি।'

'তবে আপনার মুখটা এমন ভার দেখাচ্ছে কেন?'

'ভার হয়ে গেলে কী করবো?'

'ভার করবেন না।'

আমি তৃপ্তির দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বরং আমি যেন শক্তি পাই এই আশীর্বাদ করবেন।'

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় হ্যাজাক হ্যারিকেন আর মশালের আলোয় বাংলোর চত্বর আলোকিত হয়ে উঠলো। বনবালা আর বনবাসী যুবকদের নাচ গানের সঙ্গে, মাদল বেজে উঠলো। সেই গান আর বাজনার মধ্যে, জেগে উঠলো একটা আদিমতা।

এরকম নাচ আমি আগেও দেখেছি, মলুটি গ্রামে মৌলীক্ষা দেবীর মাঠে, সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের। কিন্তু ঠিক এরকম না। বারো থেকে তিরিশ বছরের মেয়ে এবং পুরুষরা নাচছে। মেয়েরা পরস্পরকে পিছন থেকে জড়িয়ে, এক এক গুচ্ছে সারি সারি ভাগে নাচছে। তাদের মুখোমুখি পুরুষরা। মেয়েদের শরীর এক তালে, এক সঙ্গে, সাপের মতো দুলে উঠছে। পুরুষদের নাচে বীরের ভঙ্গি।

সিংজী দুপুর থেকেই সুরা পানের ঝলকে লাল হয়ে আছেন। তিনি একলা না, সীমা আর ফিলিপও প্রচুর পান করেছে। সীমা আর ফিলিপ নাচের আসরে নেমে হই হুল্লোড় করছে। সীমাকে অনেক সময় বনবালাদের

থেকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। মশাল ও হ্যাজাকের আলো আঁধারিতে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে। সিংজী বিকাল থেকেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চমকে উঠেছি, তাঁকে আপন মনে বিড়বিড় করতে দেখে। তৃপ্তিকে সে কথা বলেছি। তৃপ্তির ধারণা সেটা নিতান্তই অত্যধিক সুরা পানের কারণে।

আমি আর তৃপ্তি, বারান্দায় চেয়ারে বসে, নাচ দেখছিলাম। বারান্দার একটু দূরে কোল আঁধারে, সিংজী একলা বসেছিলেন। দু' একবার মনে হয়েছিল, তিনি যেন কিছু বলে উঠলেন, কিন্তু বুঝতে পারি নি কিছুই। এক সময়ে দেখলাম ঝকঝকে সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা সিংজী চত্বরে নেমে গেলেন।

চত্বরে এখন মদমত্ত নাচের উৎসব। মাদলের উদ্দাম তাল, পাহাড়ে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সারা চত্বরে মেয়ে পুরুষের ছায়া ও মূর্তি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ধুলা উড়ছে। কম করে একশো নারী পুরুষ নাচছে। তার মধ্যে সিংজী হারিয়ে গেলেন।

আমি সিংজীকে দেখবার জন্য, মাচার দিকে ফিরলাম। সেই মুহূর্তে এই মদমত্ত উৎসবের সমস্ত শব্দকে ভেদ করে একটি নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ যেন চত্বর থেকে ধ্বনিত হয়ে সহসা বহু দূরের খাদের দিকে নেমে গেল। পরমুহূর্তেই পুরুষ স্বরের চিৎকার শোনা গেল, 'স্টপ! স্টপ! স্টপ! সীমা সীমা!'···

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, 'ফিলিপ ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করছে, আর চিৎকার করে ডাকছে, 'সীমা! সীমা!'···

দেখলাম, নাচের ভিড়ের মধ্য থেকে সিংজী বেরিয়ে আসছেন। আসছেন বারান্দার দিকেই। তৃপ্তি হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরলো। মনে হলো, ওর হাত থরথর করে কাঁপছে। সিংজী বারান্দায় উঠে এলেন, শুধু শুনতে পেলাম, 'হুজ্ ব্রিদ্ ইনভিজ্ দিজ হ্যাণ্ডস্ হ্যাভ নিউলি স্টপড।' ·

আবার সেই ওথেলোর কথা! কিন্তু আশ্চর্য, মদমত্ত নাচের উৎসব উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হতে লাগলো।

ফিলিপ ছুটে এলো, চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, 'সিং, সীমা কোথায়? কার আর্তনাদ শোনা গেল?'

সিংজী তাঁর হুইস্কির পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, 'জানি না।'

ফিলিপ চিৎকার করে উঠলো, 'সিং, আমার মনে হলো, আমি সীমার

আর্তনাদ শুনেছি।'

সিংজী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি শুনি নি।'

ফিলিপ এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে, নাচের আসরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হিন্দীতে চিৎকার করে বললো, 'বন্ধ করো, মেম্ সাব্ কো মারডালা। বন্ধ্ করো নাচা গানা।'···

ফিলিপের পাগলের মতো ব্যবহারে, নাচ গান থেমে গেল। সিংজী হঠাৎ ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন, এক হাতে থ্রি জিরো থ্রি রাইফেল আর এক হাতে টর্চ লাইট নিয়ে। চত্বরে নেমে, সকলের সামনে চিৎকার করে, বনবাসীদের ভাষায় কিছু বললেন। তার পরে বাঁ দিকের ঝোপ ঝাড়ে ছাওয়া, সুঁড়ি পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে সবাই অনুসরণ করে, রেলিং টপকে নেমে গেল।

তৃপ্তি হঠাৎ আমার বুকের জামা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রুদ্ধ আর্তস্বরে বললো, 'বুঝতে পারছেন, কী সর্বনাশ হয়ে গেল? আমি আগেই বলেছিলাম, সীমা আবার কেন এখানে এসেছে।'

আমি যেন তখনো একটা ঝাপসা অন্ধকারে। তৃপ্তির কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'কী হয়েছে?'

তৃপ্তি আমার বুকের কাছে মুখ রেখে, প্রায় কেঁদে উঠে বললো, 'বুঝতে পারলেন না? সীমাকে সিংজী ছুঁড়ে খাদে ফেলে দিয়েছেন।'

আমার বুকে ছুরি বিঁধে যাওয়ার মতো, সিংজীর ওথেলো আবৃত্তির কথা মনে পড়লো। 'হুজ ব্রিদ ইনভিড দিজ হ্যাণ্ডস···।'

তৃপ্তি হঠাৎ আমার বুকে মুখ রেখে কেঁদে উঠলো। আমি ডাকলাম, 'তৃপ্তি!'

তৃপ্তি কান্না চুপি চুপি স্বরে বললো, 'আমি জঙ্গলের কোনো কিছুকে ভয় পাই না, কিন্তু মানুষকে পাই।'

বললাম, 'তবু মানুষের মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে। ভয় পেলেও, বিশ্বাস রাখতেই হবে।'

তৃপ্তি বললো, 'জানি। আমি তো এখন একজন মানুষের কাছেই আছি।'

আমি ওর মাথায় হাত দিলাম। বললাম, 'চলো সীমাকে আমরাও গিয়ে খুঁজি।'

প্রায় মধ্যরাত্রে সীমার মৃতদেহ নিয়ে একদল মেয়ে পুরুষের সঙ্গে ফিলিপসহ সিংজী ফিরে এলেন। রক্তাক্ত সীমা, মর্ত্যের উর্বশী, যার গলার আর তলপেটের কাছ দিয়ে ভেদ করে গিয়েছে, শুকনো ভাঙা গাছের তীক্ষ্ণাগ্র ডাল। আমার কানে বাজছে, সিংজীর পরশু রাত্রের স্বর, 'পুট আউট দ্য লাইট, অ্যাণ্ড পুট আউট দ্য লাইট!'...

ভেবেছিলাম, সিংজী আর ফিলিপের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বোধহয় অনিবার্য। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সীমার মৃতদেহের পাশে বসে, ভোর পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে কেবল মদ্য পান করলেন। আকাশ পরিষ্কার হবার আগেই, সিংজী আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনি আর তৃপ্তি ফিলিপের গাড়িতে চলে যান। ফিলিপকে আমি বলে দিয়েছি, ও গিয়ে পুলিসকে খবর দেবে। আমি পুলিস এলে সীমাকে নিয়ে যাবো।'

আমি সিংজীর মুখের দিকে তাকালাম। সিংজী আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'রাইটার সাহেব, এই বন আমার প্রেম। এই বনেই তার অস্তিত্ব শেষ।' শেষ কথা হলো, 'ইট ইজ টুউ লেট!'...

আবার সেই ওথেলো! ডেসডেমোনিয়াকে হত্যার মুহূর্তের উক্তি। কিন্তু লোকটি আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন, শ্রদ্ধা আর প্রেমের মধ্যে।

আমি আর তৃপ্তি ফিলিপের সঙ্গে ফিরে চললাম। ফিলিপ চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। এক সময়ে সে শুধু বলে উঠলো, 'ইট ওয়াজ মাই ফল্ট। আমিই সীমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছিলাম।'

ছোট নাগরায়, তৃপ্তির কোয়ার্টারের সামনে ফিলিপ গাড়ি দাঁড় করালো। তৃপ্তির সঙ্গে আমিও নামলাম। ওর চোখে জল। সকালের প্রথম রোদ উঠেছে, বন তার নিজের রূপে ফুটছে। তৃপ্তি কথা বলতে পারছে না। আমি শুধু বললাম, 'সিংজীর মতো আমিও মনে করি, এই বন আমার প্রেম।'

তৃপ্তি যেন কান্নার ভারেই আমার পায়ের কাছে নত হয়ে পড়লো। আমি ওকে দু' হাতে তুলে দাঁড় করালাম। ও ভেজা চোখ মেলে তাকালো। আমি মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। কিন্তু চোখ জলে ভেসে গেল। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে, দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলাম।

তৃপ্তি চমকে আমার দিকে তাকালো। ঠোঁট কাঁপলো, বলা হলো না কিছু। ফিলিপ গাড়ি চালিয়ে দিল। পিছনে রক্তিম ধুলা উড়ছে।

মনে মনে আশা বিস্তর। যদি তার কিছুটুকুও বলতে পারতাম, তবে এ জীবনে তরে যেতে পারতাম। কিন্তু বলতে পারলাম না। না, বোধহয় ভুল বললাম। বলার থেকে করার কথাই ভাবছিলাম। ভুল বললাম। এও ভুল। মনের বিস্তর আশার কথা, আসলে ভ্রমণের কথা। বলাও না, করাও না। যাওয়া। 'মন চলো' কথাটা অনেকবার গেয়েছি। ও-গাওনাতে আর নিজের মনেই তেমন কোনো সুরের ঝংকার বাজে না। কেন না, যাকে 'কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে' তার যথার্থ মর্মটাই আজতক বুঝে উঠতে পারলাম না। বাগান তো অনেক ঘোরা হলো। চলো, কুঞ্জবনে তো অনেক ঘোরা হলো। সেটা 'কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান' কী না, নিজের অনুরাগের টানে গিয়েছিলাম কী-না, তাও ধরতে পারিনি।

অথচ একটা অনুরাগের টান আমাকে বারে বারে ঘরের বাহির করেছে, করেনি কোনো ঘর-বিবাগী বৈরাগ্যের সংসারত্যাগী, উপাস্তের আরাধনা। চিনতে পারিনি সেই অনুরাগের স্বরূপকে। এ যেন অনেকটা সেই, 'আমার ঘরের কাছে আরশিনগর, সেথায় এক পড়শী বসত করে। আমি একদিনও দেখিলাম না তারে।'…এ ছকের কথা না, হকের ধন না। এ বৃত্তান্ত বড় জটিল। নগরের নাম আরশি, বসতকারী পড়শীটির দেখা একদিনও পাওয়া গেল না। আমার অনুরাগেরই মতন। সেও আমার আরশিনগরের পড়শী, অথচ তার স্বরূপ চিনলাম না। এই না-চেনাটা, না দেখারই মতন।

মনে মনে বিস্তর আশার গভীরে সেই অনুরাগ ঠাঁই করে আছে। অনুরাগের স্বরূপ চিনিনি, কিন্তু বিস্তর আশার একটি আশা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সেই আশার কথা বলতে যে অক্ষম, তার কারণও আগেই বলেছি। এমন এক ভ্রমণে আমার তখনো যাওয়া হলো না, যাকে বলতে পারি, সে আমার অক্ষয় ভ্রমণ। অক্ষয় ভ্রমণ? তাও আবার হয় নাকি? অক্ষয়ের যে ভ্রমণ, সে তো বিশ্বসংসারে নিরন্তর চলছে। আমি তুমি, আমরা সবাই সেই ভ্রমণে আছি। তাকে বলি, মানবাত্মার অমর ভ্রমণ।

আসলে, ইচ্ছে করে, যাই এক অবাক অলীক ভ্রমণে। ইচ্ছাটা মনে এলো সহজে। কিন্তু অবাক পথের ঠিকানা জানি না, অলীক ভ্রমণের যাত্রার দিনক্ষণ

সময় পরিমা, কিছুই জানা নেই। ইচ্ছা তো অনেক কিছুই করে। রাতের অন্ধকারে তেপান্তরের মাঠে শুয়ে, সন্ধ্যাকলির মতন নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, ছায়াপথের হাতছানিও দেখেছি। না, বিজ্ঞান আর উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা যে-আকাশচারীরা আকাশ ভ্রমণ করে এসেছেন, তাঁদের মতন ভ্রমণে আমি নেই। ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে, যে-হাতছানি আমি দেখেছি, তার চিত্র আলাদা, বৃত্তান্ত ভিন্ন। আমি এই গ্রহের অন্ধকার তেপান্তরের আকাশ-মুখো শুয়ে দেখেছি, সেই ছায়াপথের দুধারে নিবিড় আর অপরূপ বৃক্ষের সারি, ফলেফুলে ভরা বনরাজি। এই গ্রহের জন্মকাল থেকে অচিন, এমন সব বিহঙ্গের গান শুনেছি। দেখেছি, তার মাঝখান দিয়ে, কারা যেন চলে গিয়েছে পায়ের দাগ রেখে। হয়তো সে-পথ গিয়েছে কোনো, আমার কল্পনার থেকেও অধিকতর আশ্চর্য এক গ্রহান্তরে। না, আমাকে বুঝিও না হে পণ্ডিত, ওটি গ্রহের ছায়া মাত্র। আমার ছায়াপথের স্বপ্ন তাতে ভাঙবে না।

কিন্তু হায়, ছায়াপথের ঠিকানাও আমার জানা নেই। সেই কোন্ শিশুকাল থেকে, ছায়াপথের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছি। যেমন করে দূরে বনের পথ হাতছানি দিয়ে অনেকবার টেনে নিয়ে গিয়েছে, তেমনি ছায়াপথের হাতছানি দেখে আসছি আশৈশব। হাত বাড়িয়ে কেউ টেনে নিয়ে যায়নি।

অতএব রইলো অলীক অবাক ভ্রমণ। বরং এই গ্রহেই খুঁজে ফিরি ছায়াপথের ঠিকানা। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে। বাস্তবপন্থী বন্ধুবান্ধবদের বোঝাতে পারিনি, ওটা আমার ঈশ্বর সন্ধানে যাত্রা না। তীর্থ বলা যায় বটে। কারণ আমি গিয়েছিলাম ভারতদর্শনে। না, অকারণ আমার ঝোলা হাতড়ে কোনো দার্শনিকতা আবিষ্কারে চেষ্টা করো না। বৃথায় যাবে। এমন কি ইতিহাসের তত্ত্ব তল্লাসেও যাই নি। বড় কথা বলবো না যে, 'ভারত আত্মা'র খোঁজে গিয়েছিলাম। ভারতের আত্মা যে কোথায় বিরাজে, আজতক ধ্যানে জ্ঞানে তার হদিস পাই নি। পেলে, সেখানেই লুটিয়ে পড়ে থাকতাম। আপনাদিগের আন্তর্জাতিকতা চেতনায় ঠেক লাগল কি? লাগলে মার্জনা করবেন।

আমার ভারতদর্শন সহজ ভাবের বিষয়। কচি শিশুটিকে কোথায় তুমি পূর্ণরূপে দেখতে পাবে? মায়ের কোলে। এই পূর্ণ রূপটি কেবল সুন্দর না, যে-কারণে 'বন্তেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে।' শিশুর হাসি কান্না খুনসুটি, সব মিলিয়ে সে যেমন মায়ের কোলে পূর্ণরূপে বিরাজ করে, প্রয়াগের সঙ্গমের কূলে, তেমনি আমার ভারতদর্শন্ হয়েছিল। শহর নগর গ্রাম জনপদে

ঘুরে, ভারতকে গ্রহান্তরের দেখার সঙ্গে, এই দেখাটার তফাত আছে। এখানে তার কোনো আড়াল আবডাল নেই, জীবনযাপনের নানা তুচ্ছতা নেই, জীবনের প্রয়োজনে আত্মগোপনের প্রয়াস নেই। এইখানে সে স্বরূপে বিরাজ করে।

বিশ্বদর্শনের ব্যাপারটা আমার জানা নেই। কালাপানির দিকে অনেককাল তাকিয়ে থেকেছি, ভাসতে পারি নি। যার সঙ্গে কথা বলি, সে-ই বলে, এই হুস করে উড়ে বেড়িয়ে বিলাত দেখে এলাম। না, গ্রহের অন্ত পিঠের খবরও আমার জানা নেই। ইচ্ছা থাকলেও, দূরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাতে পারি না। সেই কারণেই বলছিলাম, মনে মনে আশা বিস্তর। কিন্তু বহুদূরে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবো ডানার ঝাপটায় তাগদ থাকলেও, উপায় নেই। জগৎ সংসারের নিয়ম বড় কড়া। পা বাড়াতে গেলেই, এত হাত এগিয়ে আসে, তাদের খাঁই মেটাই, এমন সাধ্যি নেই। তবু চলো, এবার যাই এক বহু বহু দূরের ভ্রমণে।

কতোদূর ?

তা হলে একটা রগড়ের কথা শোনাই। রগড়টা দেখেছিলাম, ছেলেবেলায় নৈহাটির রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের থিয়েটারের মঞ্চে। নাটক শুরুর আগে নানান গাওনা বাজনা। তার মধ্যে একজন এলেন ক্যারিকেচার দেখাতে। আজকাল বোধহয় তাকেই বলে কৌতুক নকশা। ভদ্রলোক মঞ্চে এলেন। অনেক ক্যারিকেচার আর আজগুবি গল্প শুনিয়ে, আমাদের বিস্তর হাসালেন। হল ভরে হাসির খিলখিল খলখল গর্‌রা যাকে বলে। ভদ্রলোক সেই হাসির হুই-হুল্লোড়ের মধ্যে চিৎকার করে বললেন, 'এবার নাটক শুরু হবে। আমি আমার শেষ ক্যারিকেচারটা দেখিয়ে বিদায় নেব। সবাই একটু কান দিয়ে শুনবেন।··· হ্যাঁ, ব্যাপার হলো, আমাদের দেশের রেলগাড়ির হুইসল তো অনেক শুনেছেন। পি-ই-ই-ই, পি-ই-ই-ই।··· তা একটা রেলগাড়ি জার্মান থেকে আসছিল ফ্রান্সে। ভাবছেন, জার্মান থেকে ফ্রান্সে রেলগাড়ি আসে কী না? ধরে নিন, আসে। তা, সেই জার্মান রেলগাড়ির এঞ্জিনের হুইসল কেমন বাজে, সেটাই আপনাদের শোনাবো।' বলে, ভদ্রলোক দু হাত তুলে মুখের কাছে চোঙা ফোঁকবার ভঙ্গি করলেন, আর তাঁর গাল দুটো উঠলো ফুলে, চোখ দুটো হয়ে উঠলো গোল। আমরা দর্শকরা একেবারে স্তব্ধ। একটা পিন পড়ার শব্দ তো দূরের কথা, নিশ্বাসের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছিল না। জার্মান রেলগাড়ির বিচিত্র ভোঁ শোনবার জন্য, আমরা সবাই তখন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছি। না জানি কি নতুন শব্দই শোনা যাবে।

ভদ্রলোক হঠাৎ মুখের কাছে থেকে হাত সরিয়ে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছেন না, না ? আচ্ছা, এবার শুনুন।' বলে আবার হাত তুলে মুখের সামনে চোঙা বাজাবার ভঙ্গি।

আমরা আরও রুদ্ধশ্বাস। বলতে গেলে, গোটা শরীরের সমস্ত অনুভূতি তখন কানের পর্দায় ঠাঁই নিয়েছে। সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড কেটে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের মুখ বিকট হয়ে উঠেছে, প্রচণ্ড চেষ্টা করেও যেন জার্মান রেল এঞ্জিনের শব্দটা বের করতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ, হঠাৎ-ই ভদ্রলোক মুখের সামনে থেকে হাত নামিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক এইরকমভাবে সবাই চুপ করে থাকুন, এখুনি নাটক শুরু হবে। গণ্ডগোলে নাটক হয় না।' বলেই তিনি মঞ্চের আড়ালে অন্তর্হিত !

সত্যি কথা বলতে কি আমার থেকে অনেক বয়স্করাও তখনো বিভ্রান্ত, স্তব্ধ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হঠাৎ হাসি আর হাততালির শব্দে হল ফেটে পড়েছিল। ক্যারিকেচারিস্ট আসলে আমাদের চুপ করাতেই চেয়েছিলেন।

কয়েক যুগ আগের সেই নকশাটা মনে পড়ে গেল, নিজের নকশা করার পাওনাটা ফাঁদবার তরে। আসলে, এবার যে যাবো অনেক দূরের ভ্রমণে, সেই দূরত্বটা এতোই দুস্তর, ইস্তক বর্ধমান ইস্টিশান পর্যন্ত তোমাদের টেনে নিয়ে যাবো না। গরুর গাড়িতে যদি যাই, তা হলে নেমে পড়বো বগিলা ইস্টিশনেই। আর যদি মনে করি, বাবার ছেলেবেলার আমলের মোটর যানে যাবো, যাদের চাকা এখনো লোহার শিক দিয়ে গড়া—সে যাকে বলে 'স্পোক', অথবা তিন চাকার সাইকেল রিকশায় তা হলে নেমে পড়বো বগিলার একটা ইস্টিশানের পরের ইস্টিশান মেমারিতে।

কী মনে হচ্ছে ? যাত্রাটা বড্ড কাছে ? একেবারে যেন ঘরের উঠোনেই ? চলোই না একবার দেখি। রওনা তো দিই। দুয়ার থেকে অদূরেই এই যাত্রাটা হয়তো শেষপর্যন্ত দেখা যাবে, সত্যি অনেক দূরের পথ।

•

আমার এই যাত্রাটা ঠিক, যাকে বলে ঝোলা কাঁধে করে ঘুরতে বেরিয়ে পড়া, ঠিক তেমনটি না। অথচ কোনো মহৎ কর্ম নিয়ে বেরোইনি। গন্তব্য একটা থাকলেও, একরকমের বেরিয়ে পড়া বললেও বলা যেতে পারে। তবে তুমি আপনার মনে, আমি আপনার মনে, যে-যার মতন চলো বেরিয়ে পড়ি, এ যাত্রাটা ঠিক সেই রকমের না।

একটা কথা তো অনেকবারই গেয়েছি, ঘরবিবাগী নই আমি। বৈরাগ্যের

কারণে ঘর ছেড়ে বেরোইনি। সেই হিসাবে, একটা কথাই আমার নিজের মনের সঙ্গে মন মাথামাখি, আসলে যা কিছু দর্শনেই বেরোই, সবকিছুরই উদ্দেশ্য নিজের মুখোমুখি হওয়া। 'আত্মদর্শন' শুনতে যদি গুরুগম্ভীর মনে হয়, তাহলে বলি, নিজেকেই দেখতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। নিজের মুখোমুখি হওয়া, কিন্তু একান্তে না। দশজনের মধ্যে। এই দেখাটার সঙ্গে অন্য মতে দেখার তফাত এই, আমি কোথায় খাটো, কতোখানি, নিজের সকল দীনতাকে চিনতে পারি। আর সংসারের চারপাশে, যাদের মুখের দিকে কখনো ভালো করে তাকিয়ে দেখার অবকাশ ঘটে না, অথবা একটু স্পষ্ট করে বললে, বলা যায়, যাদের চেনার কখনো দরকার হয়নি, ধরেই নিয়েছি দিনযাপনের প্রাত্যহিকতার গ্লানিতে আবর্তিত হচ্ছে আমার চারপাশে, হঠাৎ তাদেরই মধ্যে মনুষ্যত্বের এক আশ্চর্য প্রকাশ, এমন কি মহত্বের আবিষ্কারে নিজের দীনতায় কেবল, বুকের কাছে দু হাত জড়ো করে অবাক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি নি। আপনা থেকেই আমার করজোড় উঠে যায় কপালে, অনির্বচনীয় এক সুধায় ভরে যায় বুক এবং চোখ। বারংবার বলি, 'নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।'

এই নমস্কারটা দেবদেউলের দরজায় দাঁড়িয়ে, কোনো বিগ্রহের উদ্দেশে না। এই মুক্ত গ্রহের উপরিতলে যে-বিগ্রহ কোটি আপন লীলায় মগ্ন, নমস্কার তাদেরই উদ্দেশে।

যাক এসব কথা। যে-কথাটি মুখ্যতঃ বলার তা হলো, এবারের যাত্রাটা আমার একলা না। অবিশ্যি দলবেঁধে বনভোজনেও না। এ ভ্রমণের রকম কিছু কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের। কিন্তু তা না হয় হলো। সে-কথায় পরে এলেও হবে। আসতে, যথাযথ ভ্রমণ গমন কোথায়? ধরতাই তো ধরে দিলাম একরকম। গরুর গাড়িতে যদি যাই, তাহলে নেমে পড়বো বাগিলা ইস্টিশনে। নেহাত সময় মতন গরুর গাড়ি যদি এসে না পৌঁছায়, তা হলে হাঁটা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেন না, এ তো আর বড় গঞ্জ বা টাউন যাকে বলে, তা না। সেখানে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নানা যানবাহন। দরদস্তুর করে একটায় চেপে বসলেই হয়।

কিন্তু গরুর গাড়ি? তার ব্যবস্থাপনার আভিজাত্য আলাদা। এক মাস আগে না হোক, নিদেন দু সপ্তাহ আগে চিঠি ছাড়তে হবে, অমুক দিন, তমুক ট্রেনে, অমুক সময়ে যাইয়া পহুঁচাইতেছি। যথাসময়ে গরুর গাড়ি যেন তথায় উপস্থিত থাকে, এই সংবাদ অবগত করাইলাম। আজকালকার দিনে বড়-মানুষদের যথাস্থানে যথাসময়ে বাড়ির মোটরগাড়ি পাঠাবার সংবাদের থেকে

গরুর গাড়ি পাঠাবার বিষয়টি মোটেই ছোটখাটো ঘটনা না। গরুর গাড়ি পাঠাবার কথা তখনই ওঠে, যখন পিত্রালয়ে কন্যা বা শ্বশুরালয়ে বধূর আগমন ঘটে। অবিশ্যি জামাই বাবাজীবনের একলা আসার সংবাদ থাকলেও, গৃহস্থকে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। বিশেষত বাবাজীবন যদি নতুন হন। জামাই আদর বলে একটা কথা আছে তো। যা নাকি প্রথম প্রথম, বিয়ে বাড়ির গন্ধের মতন কাজ করে। তারপরে শ্বশুর জামাই, যে-যার নিজেরটা ছাখ গিয়ে। আর বাড়ির ছেলে একলা হলে তো কথাই নেই। বগলে ঝোলা, হাতে জুতা, মাথায় ছাতা, ছেলে মাঠের আল ভেঙে ছুটে চলেছে। ছেলের এলেম ছাখো দিকিনি!

এক জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক দাদার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বলেছিলেন, 'তোমরা তো দেখলে, বীরসিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগর বীর, ঝড়বৃষ্টির রাত্রে কূলকিনারাহীন উত্তাল ভয়ংকর দামোদর নদ পেরিয়ে মাতৃদর্শনে গেলেন। কেবলই কি মায়ের টান? গৃহে যে নববধূটি ছিলেন, তার কথা কি একবারও মনে হয়নি! কেবলই মাতৃভক্তির কারণে রাত্রের অন্ধকারে সেই ভয়ংকর নদীতে ঝাঁপ?'...

শুনলেও কানে আঙুল! কার সঙ্গে কাদের তুলনা। বিদ্যাসাগর কখনো নববধূর বিরহে কাতর হয়ে, মায়ের নামে এমন বিপদসঙ্কুল মরণে ঝাঁপ দিতে পারেন? ওসব ঠাট্টা, ঠাট্টাই! তবে, অন্য এলেমদার ছেলেদের কথা আলাদা। এমন কি যে-কারণে রামের লঙ্কা ধ্বংস, অন্যদিকে ট্রয়ের যুদ্ধ, সেক্ষেত্রে যদি বা রমণীরত্ন সীতা ও হেলেনের কথা বলতে পারো, কিন্তু খবরদার! বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ওসব ঠাট্টা তামাশা একদম না।

অবিশ্যি জানি, গরুর গাড়ির কথা শুনলে, এখনো অনেক বাবুদিগের মনে ঠেক লেগে যাবে। ভারতবর্ষের বড় বড় শহর দেখেই যারা ভারতবর্ষের আদি অন্ত বলতে পারে, তাদের কথা আলাদা। গো-যান তারা ছবিতে দেখেছে। হয়তো মনে মনে জানে, ওটা প্রাগৈতিহাসিক যান। প্রাগৈতিহাসিককালের বটে, আধুনিককালেও, গো-যানই যে এ দেশের সব থেকে বেশি মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এ সংবাদও তারা বইয়ে পড়ে চমৎকার যায়! কিন্তু বিশ্বাস করে কী না জানি না।

যাই হোক, এসব সাতকাহন কথায় দরকার নেই। আগে স্থান বন্দন। অর্থাৎ গন্তব্যের সন্ধান। নিরালা ইস্টিশন বাগিলায় নেমে, গরুর গাড়িতে গেলে যাত্রা পশ্চিমে। আধ ক্রোশটাক পথ হতে পারে, মাঝে উত্তর-দক্ষিণে

লম্বা হয়ে চলে গিয়েছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। কথায় বলে বঙ্গের দুয়ার। গন্তব্য পশ্চিমেই, কিন্তু জি টি রোডটুকু পার হবার আগে দশবার এদিক ওদিক দেখে নিতে হয়। গরুর গাড়ির গরুরও কি সহজে যেতে চায়? এক একটা করে লরি ট্রাক বাস যমদূতের মতো গর্জন করে, ভড়ি ঘড়ি যাতায়াত করছে। আর গাড়ি নিয়ে গরু ফোঁস ফোঁস করে, দে ছুট উল্টোদিকে। তখন শোনো চালকের বয়ান! উঁহু, ওসব কথা লিখে প্রকাশ করতে গেলেই, একেবারে রাম রাম! লোকে যে গাড়িটানা বলদকেও এমন ভাষায় গাল দিতে পারে, গ্রামে না গেলে কোনোদিন ভাবতে পারতাম না। শ-কার ব-কার খুব সামান্য ব্যাপার, এত বেশি ম-কারান্ত, কলমের ফুটকি দিয়ে সারা ছাড়া উপায় নেই।

হ্যাঁ, কোনোরকমে গরুর গাড়িটাকে একবার জি টি রোড পার করাতে পারলেই, পশ্চিমের মাঠের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বলদ জোড়া তখন বড় উল্লাসেই যেন বাঁই-বাঁই করে ছুটবে। চালককে তখন কেবল একটু আওয়াজ দিয়ে গেলেই হবে। এবার খালের ওপর শান বাঁধানো সাঁকো পেরিয়ে, সোজা পশ্চিমে। একেবারে সোজা না, কেননা; পথ কখনো নাকবরাবর সোজা হয় না। ওটা শোনা যায় বটে। তবে এঁকেবেঁকে গেলেও গতি পশ্চিমেই। তারপরে গ্রামের মুখে এসে বাঁদিকে এক ঠাঁই শ্মশান, আর এক ঠাঁই কবরস্থান। ডান দিকে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। হেলথসেন্টার যাকে বলে। এখান থেকেই বটতলা দিয়ে এবার মোড় ঘুরে উত্তরে।

তার আগেই কিন্তু গ্রামের পোস্ট অফিসের বাঁকটা ছাড়িয়ে এসেছি সেই জি টি রোডের ওপরেই। ডাকঘরের ঠিকানা হলো চোতখণ্ড। অথবা বলো চৈত্রখণ্ড। কালপ্যাচার বঙ্গদর্শন যারা পাঠ করেছে, তারা এক ডাকেই চোত্‌-খণ্ডকে চিনবে। না, এখানে কোনো ইস্টিশন নেই, কিন্তু ঝাঁপানের মেলার জন্য বিখ্যাত। হোথায় জগৎগৌরী আছেন, তাঁর থানেতেই ঝাঁপানতলা। প্রথম দর্শন ঘটেছিল স্বয়ং কালপ্যাচার সঙ্গে। তারপরে নানা ভাবে অনেকবার। সে-বৃত্তান্ত আলাদা, পরের কথা পরে। তবে একটু গাওনা গেয়ে রাখি। ঝাঁপানের মেলাটি বড় রমরমা। কেবল যে মাল আর সাপুড়েরা আসে শতেক সাপের ঝাঁপি নিয়ে, আর খেলা দেখাতে, তাই না। জগৎগৌরীর থানে বলির রক্তারক্তি কাণ্ডও এমন কিছু না। তবে দ্রব্যের বড় ঢেলখেল। অর্থাৎ কী-না কারণবারি। যাবৎ কারণেই কারণবারি, আর তার কারণেই লাঠালাঠি মারামারি। একবার তো সাঁওতালরা তীর ধনুক নিয়েই যুদ্ধে অবতরণ করেছিল। পরিণতি পুলিসের আগমন, আর যুদ্ধ ঠেকাতে গুলিচালনা।

মৃতের সংখ্যা এখন আর মনে করতে পারি না। তবে সেই থেকে বর্ধমানের সদর কর্তাদের মাথায় টনক নড়ে ওঠে, যখনই কানে যায়, শ্রাবণ মাস পড়েছে সামনেই চোত্‌খণ্ডের ঝাঁপানের মেলা। তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রেরণ।

এ তো গেল একদিকের পথের কথা। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে, বগিলা থেকে এক ইষ্টিশন এগিয়ে মেমারিতেও নামা যায়। মেমারিকে গঞ্জ বলবো, না হাট বলবো, বুঝে উঠতে পারি না। জংশন ইষ্টিশন হলেও একটা কথা ছিল। তাও না। তবু দু পাশে ধু-ধু মাঠের মাঝখানে নিরালা বগিলা ইস্টিশনের পরেই মেমারি যেন টাউন। নামেরই বা কী বাহার। লেখা আছে বটে 'মেমারি'। স্থানীয় উচ্চারণে 'ম্যামারি'। হাট-বাজার দোকান-পাট বিস্তর। খানকয়েক ধানকল আছে। গঞ্জ হয়ে ওঠবার ওটা একটা বড় কারণ। পাকা কোঠাবাড়ি বানাবার লোহা সিমেণ্ট ইট সুরকির গোলাও আছে। এমন না যে হাটের দিন, সপ্তাহের বাদবাকি দিনগুলো গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে।

আদৌ তা না। সকালে বিকালে সব সময়েই বাজার খোলা। সন্ধ্যা-রাত্রের বাতি জলবার পরেও গিয়ে দেখেছি, মৎস্যবিক্রেতা বা বিক্রেত্রী মাছের গায়ে জলের ঝাপটা মারছে। অথচ, বর্ধমান যেতে তার পরের ইষ্টিশনের নামই বোধহয় রসুলপুর। মেমারির মতন জমজমাট হাটবাজার সেখানে দেখি নি।

এ সব তো গেল হাটবাজারের কথা। সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন স্থানান্তরে গমনাগমন কারণে তা হলো যানবাহন। হুগলির চুঁচুড়া, ওদিকে বর্ধমানের কথা আলাদা। এ লাইনে মেমারির মতন এত সাইকেল রিকশার ভিড় কোথাও দেখিনি। আর দেখিনি মোটরযান। বাসের কথা আলাদা। সে তো বৈঁচি থেকে বৈদ্যপুর আমদাবাদে যাবার জন্যও বাস মেলে। আবার বৈদ্যপুর থেকে বাসে সোজা চলে যাওয়া যায় কাটোয়া।

আবার সোজা! সোজা পথ বলে কিছু নেই। সব পথই এঁকেবেঁকে গিয়েছে। কিন্তু অবাক জলপানের মতন অবাক মোটরগাড়ি ও-তল্লাটে মেমারি ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। অন্য তল্লাটের কথা হলে আলাদা। যেমন জলপাইগুড়ি। অথবা এককালে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণে সোনারপুরেও দেখেছি সেরকম মোটরগাড়ি। আজকালকার মতন সে-সব গাড়ি না। সে-সব গাড়ি আজকাল কলকাতায় সযত্নে বাঁধিয়ে রাখবার মতন। রাখাও হয়। সে-সব গাড়ি যখন কলকাতার রাস্তায় সেজেগুজে বেরোয়, তখন পথচারীরা পুরনো কলকাতার চিত্র কল্পনা করার সুযোগ পায়। বোধহয় পুরনো কলকাতার গন্ধও পায়।

মেমারিতে মোট খানচারেক সেরকম গাড়ি দেখেছি। বাঁধানো ছাদ বলে ওসব গাড়ির কিছু নেই। ইচ্ছা করলে মাথার ঢাকনা পিছনে গুটিয়ে রাখতে পারো। ভালো পাদানি আছে গাড়িতে। এখনকার প্রাইভেট গাড়ির মতনই ড্রাইভারের সামনে আর পিছনে বসবার জায়গা। গাড়ির চাকার চেহারা হালের মতন মোটেই না। টায়ার টিউব সবই আছে। কিন্তু চাকার রিম আলাদা। অনেকটা সাইকেলের চাকার মতনই মোটা মোটা লোহার স্পোক। হ্যাঁ, এ গাড়ির ছাতে মাথায় সবখানেই তালি। বলতে গেলে, ঢেউ খেলা সদীতে, গরুর গাড়ির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। তবু মোটরগাড়ি! দরজা বন্ধ হয় না? পা রাখবার জায়গা খসে যাচ্ছে? কোনো ভাবনা নেই। পাকানো পাটের দড়ি আছে কী করতে?

তা যদি বলো, কলকাতার হালের ট্যাকসিরই বা কী অবস্থা? দড়ি দিয়ে দরজা বাঁধা, এমন ট্যাকসি কলকাতার বুকেও মাঝে মধ্যেই চলাফেরা করতে দেখতে পাই। তবে হ্যাঁ, বলতে পারো গোটা মোটরগাড়ির প্রায় আপাদমস্তক দড়ি দিয়ে বাঁধা, ওসব দেখতে হলে এখনও কলকাতার দূরে দূরান্তরেই পাওয়া যায়। কিন্তু এসব গাড়ির 'আধুনিক' নামের কোনো কৌলিন্যের দাবি নেই। বরং আছে আমাদের জন্মকালেরও আগের সৃষ্ট, এই মান্ধাতা গাড়ির বড় গৌরববোধ। এখনো যা জান আছে, আজকালকার রকমারি রঙের হংসরাজ পক্ষিনী মেঘদূতের তা নেই। নেহাত বর্ষাকালে কাদামাটির যা একটু ভয় আছে। নইলে কে চেয়েছে তোমার কাছে রেশম-মসৃণ পীচের রাস্তা? ধান কাটা মাঠের ওপর দিয়েই এসব গাড়ি বাঁই-বাঁই করে ছুটে চলে যাবে। পিছন থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না, কেবল নিশ্চিত্র একরাশ ধুলা। অবিশ্যি আর একটা কথা আছে। চাবি ঘোরালেই এসব গাড়ি স্টার্ট নেয় না। হ্যাণ্ডেল মারতেই হবে।

এরকম একখানি গাড়ির কথা তোমাদের মতন আমিও পড়েছি। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক'। তার থেকেও বড় কথা, সেই গাড়িকে সিনেমার পর্দায় দেখেছি এক চিত্রময় কাব্যের রূপে। সেই চিত্রের নির্মাতা ছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত ঋত্বিক ঘটক। সেই 'অযান্ত্রিক' নিয়েই বলতে গেলে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তা যদি বলো, তা হলে অমন একখানি গাড়ির চলমান চিত্র আগেই দেখেছিলাম নাম যার 'মসিয়েঁ হুলো'জ হলি ডে'। স্মৃতিশক্তি আমার তেমন তীক্ষ্ণ না। একটু মনে আছে, ছবিটা ছিল ফরাসী দেশের।

এখানে একটা কথা না বলে রাখলে দিনকালের হিসাবে একটু গোলমাল

থেকে যাবে। আগে এসব গাড়িকে এক ধরনের বাসের পারমিট দেওয়া ছিল। যেগুলি এখনও আছে কোথাও কোথাও। একখানি অ্যামব্যাসাডরে চেপে আঠারো কুড়িজন নির্বিবাদে চলে যায়। এসব মোটরগাড়িকে জলপাইগুড়ি বা সোনারপুরে যখন দেখেছি তখন এদেরও হিসেবে এরা কম করে দু ডজন যাত্রী নিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে যেতো। এসব গাড়ির বাড়তি পাওনা দু পাশের পাদানি, যা নেই আজকালকার কোনো গাড়িতেই। এমন কি মিনি না কী বলে, তা থেকে শুরু করে একতলা দোতলা বাসেরও পাদানি নেই। মাডগার্ডের সামনে বসা তো, একমাত্র ভাগ্যবান যাত্রীর ভাগ্যেই ঘটতো ড্রাইভারের দেখবার মতন একটু ফাঁক থাকলেই হলো।

আমার গন্তব্য গ্রামের পথের ঠিকানায় আবার আসি। মেমারিতে ওরকম একখানি গাড়ি ভাড়া করে যদি সেই গ্রামে যেতে চাই, তবে আগে দাম দস্তুর। অবিশ্যি দরাদরি করবার তেমন সুযোগ নেই। যে-কখানি গাড়ি মেমারি ইষ্টিশনে আছে, তাদের সকলের 'এক দর'। আট টাকার জায়গায়, খুব কম হলে, সাত টাকা। এখন তেলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণ।

মেমারি থেকে এমন একখানি মোটরগাড়িতে গেলে, রেলের লেবেলক্রশিং পার হয়ে, জি টি রোড ধরে ফিরতে হবে দক্ষিণে। আসলে মেইন লাইন দিয়ে যেতে হলে, পথ একটাই। মেমারি থেকে দক্ষিণে এসে আবার সেই বগিলার বরাবর, গাড়ি লাফিয়ে চলে যাবে ডাইনে ঘুরে পশ্চিমে। অগ্রহায়ণের শেষে, আর বৈশাখের মাঝামাঝি যদি হয় বসে বসে গাড়িতে দোল খাও। মোটর-গাড়ি একবার নামবে ধান কাটা মাঠে, আর একবার উঠবে গরুর গাড়ি চলা কাঁচা রাস্তায়। যতো যন্ত্রণা এখানেই। গরুর গাড়ির একটি চাকা নেমে যাবে এক ফুটের বেশি আর একটি চাকা উঠে থাকবে এক মাপে। ভয় নেই, কাত হয়ে পড়ে যাবো না। দরজা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আছে।

থাকলেই বা অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো। সোজা হয়ে বসবার উপায় নেই। ড্রাইভারও সে-কথা বোঝে। গাড়ি চালাতে তার অসুবিধাও কম না। তখন গরুর গাড়ির চালকের মতনই গরুর গাড়ি চলা রাস্তার ওপর তার রাগ, আর সেই রকম সব মোক্ষম গালাগাল।

পথ সেই একই। ক্যানেলের ওপর শান বাঁধানো সাঁকো পেরিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আসতে—অর্থাৎ শ্মশানের কাছ থেকে মোড় নিয়ে উত্তরের পথে। তারপরে গন্তব্যে গিয়ে যখন পৌঁছালে, প্রথমে মনে হবে চোখে যেন কেমন ঝাপসা দেখছি! জবাবটা প্রথম পাবে পরিধানের বস্ত্রাদির দিকে তাকালেই।

হায়, এত সাধের পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে বড় শখ করে মোটরগাড়ি চেপে বলতে গেলে কুটুমবাড়ি যাওয়া। তার আগেই জামাকাপড়ের দুর্দশা দেখে লজ্জায় পড়তে হবে। যেন ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে আসা হয়েছে। তারপরে আরশিতে নজর করতে গিয়ে, দেখা গেল, নিজেকেই চিনতে পারছি না।

কি করে চেনা যাবে? মাথার চুল শণহুড়ি সাদা, ভুরু জোড়া থেকে ইস্তক চোখের পাতাগুলো পর্যন্ত ধুলায় সাদা। তখন বোঝা গেল মুখের মধ্যে এত কিচকিচ করছে কিসে? মুখের ভিতর তো আর এক ঝাঁক চড়ুই ঢুকে নেই, যে কিচকিচ ডাকবে? যা করে, সবই ধুলায় করে। এই উৎপাতটি ভোগ করতে হয় না, মেমারি থেকে সাইকেল রিকশায় এলে।

কিন্তু রিকশায় এলে তার থেকেও বড় উৎপাত গরুর গাড়ি চলা কাঁচা রাস্তার অর্ধেকই প্যাডেলে চাপ দিয়ে চলা যায় না। তখন রিকশাওয়ালা বেচারাকে রিকশা থেকে নেমে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝেই নামতে হয়। নিজেরা রিকশাটি ঠেলে নিয়ে গেলেই ভালো হয়। কাঁচা রাস্তায় খানা খন্দ থাকবেই। তার ওপরে শুকনো ঋতুগুলোতে গ্রামের পথে চলতে সুবিধা বটে। পায়ের পাতা-ডোবা ধুলোকে তো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। রিকশার চাকা যখন সেই ধুলোয় ডুবে যায় রিকশাওয়ালার সাধ্যি কি, প্যাডেলের চাপে চেন ঘুরিয়ে চাকা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

বলছি বটে, তবু রিকশায়ও কখনো সেই গ্রামটিতে যাইনি। গিয়েছি, কয়েকবারই গিয়েছি। সে সব বৃত্তান্তে পরে আসছি। আগে গ্রামটিকে বন্ধন করি। তার আগে যানবাহনের শেষ কথাটা বলে নিই। এই সব মোটরগাড়ি, সাইকেল রিকশা যাই হোক বর্ষায় গরুর গাড়ির অথবা যাকে বলে হন্‌টন্‌ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ট্রাকটর হলে কেমন হবে জানি না। অন্তত সর্বত্রগামী জীপ জোড়ও যে বর্ষাকালে সেই গ্রামে পৌঁছে দিতে পারবে না, সে-কথা হলফনামায় সই করে বলতে পারি।

কথায় বলে, সাধে কি আর বাবা বলি? গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। সাধে কি আর ভারতবর্ষের গ্রামে এখনো গরুর গাড়িই একমাত্র নির্ভরশীল বাহন? অনিবার্য কারণেই গো-যানই এখনো যাতায়াতের ব্যবস্থা। হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাঘাট কিছু হয়েছে। আর বাবুদিগের কথানুযায়ী, বিজলি বাতি নিয়ে যাবার জন্ত বিস্তর শাল কাঠের আদিশ্রাদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের গ্রাম এখনো সেই গ্রামই আছে।

পরিবর্তন কি কিছুই হয়নি? হয়েছে। কিছু লোকের সাইকেল হয়েছে,

কাঁচ আর ঝুপির জায়গায় অনেক ঘরেই হয় তো হ্যারিকেন জলতে দেখা যায়। আর সারা দিন মাঠে ঘাটে খাটার পরে ব্যাটারি সেটের ট্রানজিস্টারে গান বাজনা শোনা যেতে পারে। গ্রামের ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বর্ষার রাত্রে ট্রানজিস্টারে গান যে কেমন জমে, তা যারা বাজায় তারাই জানে। জানে, কারণ, তারা ওসব শোনেই না। অন্ধকার বর্ষার রাত্রে ট্রানজিস্টারের থেকেও গৃহস্থের বুকে কেবল ডাকাতের ভয়ে বিজলি হানাহানি। কে বাজাবে যন্তরটি?

তবু বলি, এই ব্যাটারি নামক বস্তুটি গ্রামের শব্দ তরঙ্গে এক বৈপ্লবাত্মক উৎপাতের সৃষ্টি করতে পেরেছে। শহরের মতন ব্যাটারি চালিত মাইকে গ্রামেও আজকাল যেকোনো উপলক্ষেই সারা দিনরাত গান বাজে। রাজনৈতিক প্রচার কর্ম থেকে সিনেমা সার্কাসের গাওনাও হয়।

আমার গন্তব্যস্থল গ্রামটিতে পৌঁছনোর পথের কথায়, দুটো জায়গার নাম বলেছি। সদর পথের ঠিকানায় সবাই সেই জায়গার নাম জানে। চৈত্রখণ্ড আর ইস্টিশন মেমারি। পথের আরও ঠিকানা আছে। সে সব আরও বেশি নামী দামী জায়গা। গ্রাম বাংলার ইতিহাসে সে-সব জায়গার নামের বিস্তর কীর্তন করা হয়েছে।

সেই পথ দিয়ে আমার গন্তব্যে যেতে হলে, হাওড়া থেকে কর্ড লাইনের গাড়িতে আমাকে উঠতে হবে। বেলুড় জংশন থেকে যে-গাড়ি শক্তিগড় জংশন হয়ে চলে গিয়েছে বর্ধমান। এই পথেই পড়ে জৌগ্রাম, কুলীনগ্রাম। দুই ইস্টিশনের দূরত্ব তিন মাইল। আমি কুলীনগ্রামে নামতে পারি। অথবা পারি জৌগ্রামেও। যেখানেই নামি, আমার গন্তব্যস্থলের দূরত্ব এই দু জায়গা থেকেই, দু-তিন মাইলের বেশি না। কিন্তু হেথায় মোটরগাড়ির আশা তো আকাশ-কুসুম কল্পনা। সাইকেল রিকশা থাকলেও আমার গন্তব্যে নিয়ে যাবার মতো রাস্তা তার নেই।

হ্যাঁ, গরুর গাড়ির চলার রাস্তা আছে বটে। এতোই মেঠো, সাইকেল রিকশা কখনো যেতে রাজী হয় না। যানবাহনের মধ্যে সেই গরুর গাড়ি, না তো দু চাকার সাইকেল। অন্যথায় নিজের ওপর ভরসা-শ্বনটন। বর্ষার কাদ আর দক না হলে হাঁটতে খারাপ লাগে না। অবিশ্যি মেমারি থেকে কুলীনগ্রা হয়েও গন্তব্যে আসা যায়। মেমারি থেকে কুলীনগ্রামের দূরত্ব পাঁচ মাইল। কিন্তু সে আসাটা অনেকটা ঘুরিয়ে নাক দেখাবার মতন। দরকার কী? মেইন রোডের রাস্তা মেইন রোডেই থাক। কর্ড রোডের রাস্তা কর্ডে।

কুলীনগ্রাম বসু রামানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট। এ তত্ত্ব তল্লাস সকলের জানা

কুলীনগ্রাম আসলে বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। চৈতন্যদেব কোনোকালে কুলীনগ্রামে আসেন নি। কিন্তু নানাভাবেই বলা হয়েছে, কুলীনগ্রাম আর তার বসুবংশকে চৈতন্যদেব নাকি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, ভালবাসতেন প্রাণের তুল্য। তার প্রমাণ কেবল বসু রামানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট না। কবি মালাধর বসু।

'বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইচ্ছামতী যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি।

যক্ষ রক্ষ সর্বজনে করিয়া বিনয়

মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।'

অনেকে নাকি বলে থাকেন, মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' বাংলা ভাষার আদি কাব্য। এই কথাটিতেই আমার ঠেক লেগে যায়। কেতাবের হিসাবে দেখছি চৌদ্দশো তেহাত্তর খৃষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা শুরু হয়ে, শেষ হয়েছিল চৌদ্দশো আশিতে। ভালো কথা। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে। কাব্যে আর দোহায় তফাত কী, আমার তেমন জানা নেই। দোহা কি কেবলই গান? বাউল গানের মতন? তা হলে অবিশ্যি কাব্য বলতে বাধা আছে।

তবু যেন মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে। চর্যাপদের দোহাগুলো রচিত হয়েছিল বাঙলায় হাজার বছর আগে। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, সাধকদের নিজেদের সাধন কথার গুপ্ত প্রকাশ। যে কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের গান বা দোহাগুলোকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যাভাষা' সন্ধ্যাকালের আবছায়ার মতনই স্পষ্ট আর অস্পষ্টতার মাঝামাঝি সেই সব গানেব ভাষা। বুঝি বুঝি করেও বুঝতে পারা যায় না যেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় উহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে বড় অশ্লীল হইয়া পড়ে।

এ সেই বাউলেরই কথার মতন, 'আপন সাধন কথা/না কহিবে যথা তথা।' কেন? না দেহতত্ত্বের নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়া সেই সব গানে গূঢ় ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। যাহা চর্যাপদ, তাহাই বাউল গান। আসলে তো গান না, সবই সাধন ভজন তত্ত্ব কথা। কিন্তু অশ্লীল কী না, সে-বিষয়ে আমায় ধন্দ আছে। যে-জন দেবতার নাম জপ তপ করে, সেও কি আর সব কথা ভেঙে বলে? অশ্লীলতার কারণে না, সব কথা সবাইকে বলা যায় না। তা হলে তো রাজাদিগের মন্ত্রী মহাশয়েরা যখন মন্ত্রগুপ্তি গ্রহণ করেন, সেও অশ্লীল হয়ে যেতে পারে।

এই ভাখ, কী কথায়, কী কথা এসে গেল। আসলে সেই, 'কথা পড়লো

সকার মাঝে / যার কথা আর গায়ে বাজে।' খুলে বলতে চেয়েছিলাম, চর্যাপদের সৌহার্দ্যেও আশ্চর্য কবিত্বময়। কিন্তু কাব্যের রূপে সে আসে নি। বেশ, নাই বা এলো। আমার ঠেক লেগে যায় অন্তখানেও। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যও কি মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' থেকে আধুনিক? কারণ, স্বয়ং চৈতন্যদেব নাকি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পাঠ করে ভাবাবেগে আপ্লুত হতেন।

ইতিহাসের ছাত্তর নই আমি। তবু মনে জিজ্ঞাসা জাগে গৌড়েশ্বর সামস-উদ-দীন ইউসুফ কি হোসেনশার আগে ছিলেন না? না কি পরে? দেখছি, মালাধর বসুকে তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেছিলেন।

'গুণ নাকি অধম মূর্খ্যে নাহি কোন জ্ঞান
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।'

অথচ হোসেনশার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। না, ইহার মধ্যে আমি রাজনীতির সন্ধান করব না। উহাতে আমার কাজ নাই। কিন্তু হোসেনের খোজা রক্ষের কালো রূপ দেখে যে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণরূপ দর্শনের ভাবাবেশ হয়েছিল, সেও তো কোনো এক চৈতন্য জীবনচরিত কাব্যেই পড়েছি।

হুঁ ভাবছো জ্ঞান দিচ্ছি। অতএব ওসব ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আপাতত থাক। কুলীনগ্রামে পা দিয়ে আগে তার ধুলা নিয়ে মাথায় ছোঁয়াও। কেন না, কেবল তো ঠাকুর রামানন্দ বসু বা মালাধর নন। যবন হরিদাসও হেথায় নানা লীলা করে গিয়েছেন। আরও যদি শুনতে চাও, তবে শোন:

'কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়
শুকর চরায় ডোম, সেই কৃষ্ণ গায়।' ··

কুলীনগ্রাম বা জৌগ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা পরেও করা যাবে। আগে আমার গন্তব্য গ্রামটিকে চারদিক থেকে বন্ধন করি। একদিকে বৈষ্ণব শ্রীপাট, অন্যদিকে যোগগ্রাম—মানে জৌগ্রামের জলেশ্বর শিব। উভয় গ্রামের ধুলা মাথায় করে, দক্ষিণ পুবে হাঁটা দিলে, দু-তিন মাইলের মধ্যেই আমার গন্তব্যের সেই গ্রামখানি। দিগন্তবিসারী শস্যের মাঠ পেরিয়ে গ্রামটির প্রবেশ মুখেই বহে চলেছে ছোট এক নদী। নদীটির নাম কী?

তা হলেই হয়েছে। আজ পর্যন্ত রাঢ়ে বঙ্গের পথে পথে এত ঘুরলাম, এত নদনদী দেখলাম। কিন্তু এমন কোথাও শুনি নি, নদীর নাম কেবলই নদী, তার আর কোনো নাম নেই। গ্রামের যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, নদীর নাম কী? না নদী। ইস্তক খালেরও নাম থাকে। জীবনে এই প্রথম জানলাম, আর দেখলাম, এক গ্রামের সীমানা দিয়ে নামহীন নদী অজগরের মতন এঁকে-

বেঁকে বয়ে চলেছে। প্রথম নজরে মনে হবে, ছোটখাটো খাল বিশেষ। আসলে নদী। উঁচু তার পাড়।

আমার গন্তব্যস্থল গ্রামে, যদি কুলীনগ্রাম বা জৌগ্রাম থেকে আসি, তবে এই নামহীন নদীর বুকে শান বাঁধানো সাঁকো পেরোতে হবে। সাঁকোটি দেখলেই মনে হবে, এ সাঁকোর বয়স বেশি না। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সাঁকোটি তৈরি হয়েছে। গ্রামটি স্বাধীনতার দুটি স্বাদ পেয়েছে। একটি জি টি রোডের দিক থেকে পশ্চিমে এলে গ্রামে প্রবেশের মুখে ডানদিকে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কুলীনগ্রামের দিক থেকে এলে বাঁধানো সাঁকো। এর বেশি কিছু খুঁজতে গেলে, এ পাড়া ওপাড়ায় খান দুই তিন টিউবওয়েল।

তা, স্বাধীনতার এ স্বাদটুকুও এক গণ্ডগ্রামের পক্ষে কম কী? হ্যাঁ, এবারে এসো গ্রামের নামে। চারদিক থেকে এতো যে নামী জায়গা দিয়ে গ্রামটিকে বন্ধন করলাম, এ গ্রামের নাম কী? নামহীন নদীটিকে না হয় ধরে নিলাম দামোদরের একটি কম বেগবতী একটি শীর্ণ ধারা। সাঁকোটি হবার আগে নৌকায় পারাপার চলতো। অবিশ্যি বৈঠা বা লগির তেমন দরকার নেই। এপার থেকে জোর কদমে এক ঠেলা দিলেই নৌকা ওপারে পৌঁছে যেতো। বর্ষাকালে বড় জোর একখানি লগি। কারণ বর্ষায় নাকি ইনি আবার কিছু কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ধারণ করেন। তখন অজগরের গতরখানি ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং হয়ে ওঠে খরস্রোতা। তবে কী না, বর্তমানের সাঁকোটি কেবল স্বাধীনতার স্বাদ দেয়নি। গোযানের যাতায়াতকে সহজ করাই শুধু তার কাজ না। দর্শনেও সে মনোমোহন। দু পাশের বুক সমান রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ছোট নামহীন নদীটির স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অথবা দূরান্তরের মাঠের পথে চোখ মেলে দাঁড়ালে মনে হয় পৃথিবীর কোনো এক নামহীন কোণে এসে দাঁড়িয়েছি, হেথায় কেবল নিজের সঙ্গে নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়ানো চলে।

দাঁড়িয়েছি অনেক দিন। একা, এবং অনেকের সঙ্গেও। কিন্তু সে-সব কথা পরে। যে-গ্রামের পাঁচ দশ মাইলের মধ্যে এত সব নাম করা জায়গা, সে-গ্রামের নাম কী? কী আছে সেই গ্রামে? কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির বাসস্থান? না, সেরকম কোনো খবর নেই। চারপাশের নানা নামী জায়গার মাঝখানে বিন্দুর মতন একটি ছোট গ্রাম। বিন্দু নাম হলে মন্দ হতো না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, গ্রামের নাম 'ফুলটুসি'। আমার গন্তব্য গ্রামের সেরকম একটি নামও হতে পারতো। বাংলাদেশের অনেক গ্রামেরই কী

আশ্চর্য সব আহ্লে আর আবিক নাম আছে। আমার এই গন্তব্য গ্রামের নাম দুর্গাপুর। নামটা শুনলেই, নতুন এক শিল্পনগরীর কথা মনে পড়ে যায়।

কিন্তু না, এ দুর্গাপুর, সে-দুর্গাপুর না। এ দুর্গাপুরের আগে আর একটি শব্দ আছে, শুঁড়া দুর্গাপুর। বাঙাল কি আর সাধে কয়! প্রথম যখন সেই গ্রামে যাই, উচ্চারণ করেছিলাম, সুরা দুর্গাপুর। তোবা তোবা! সুরা মানে তো মদ্য। তাই দিয়ে আবার কোনো গ্রামের নাম হতে পারে নাকি? কিন্তু শুঁড়া মানেই বা কী? আভিধানিক অর্থে তো দুই মানে পাচ্ছি। শুণ্ডা থেকে যদি শুঁড়া হয়ে থাকে, তা হলে তো, শুণ্ডার মানে হস্তিনী, অথবা হায়! সেই মদ্য? অথবা শুঁড়া কথাটা গ্রাম দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে অন্যভাবে এসেছে? নামহীন নদীর মতোই, এ কথারও যথার্থ কোনো জবাব খুঁজে পাইনি। শুঁড়া যদি বিশেষ বর্ণকে বোঝায়, তাও ভুল। সেক্ষেত্রে শুঁড়ি বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুঁড়ি দুর্গাপুর উচ্চারণ আমি কখনো শুনিনি। শুঁড়া, অথবা শুঁড়ো দুর্গাপুর, এইরকম শুনেছি।

আমার ওই গন্তব্য গ্রামও জেলা বর্ধমানেই অবস্থিত। শিল্পনগরী দুর্গাপুরও তাই। অথচ এই দুর্গাপুরের আগে শুঁড়ার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। হস্তিনী দুর্গাপুর অথবা মদ দুর্গাপুর, এ কথা বলাও দুষ্কর। এমন আজব নামও কি সম্ভব? সংস্কৃতে শুণ্ডিনী শব্দ পেয়েছি। তাকে বোধহয় শুঁড়ির স্ত্রীলিঙ্গে বলা হয়েছে। শুঁড়ির সঙ্গেও মদের একটি যোগাযোগ আছে, যে-কারণে শুঁড়িখানা। অর্থাৎ পানশালা। শুণ্ডিনী বোধহয় একাধারে মদ প্রস্তুতকারিণী এবং বিক্রয়কারিণী। কেননা, পানশালায় রসবতী শুণ্ডিনীর কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কিন্তু হায়! এত কথা বলেই বা ফয়দা কী? লোকে বলে, শুঁড়া দুর্গাপুর। আমিও তাই বলি। আমাদের এই বাংলাদেশ শুধু কেন পৃথিবীর তাবত গ্রামের অনেক এমন নাম আছে, যার অর্থ খুঁজতে গেলে, অকূলপাথারে পড়তে হয়। অতএব, আমার গন্তব্য গ্রামের নাম শুঁড়া দুর্গাপুর। কেবল নিজেকে বাঙাল ভেবে দুয়ো দিলাম, এটাই যা আক্ষেপ। সুরায় আর শুঁড়ায় মোটেই তফাত নেই! কেবল এক অর্থে ছাড়া। শুঁড়া—বা শুণ্ডার এক অর্থ হস্তিনী।

পথ বন্ধন করে গ্রাম শুঁড়া দুর্গাপুরকে না হয় খুঁজে পাওয়া গেল। রাঢ়ে বঙ্গে অনেক গ্রামেই গিয়েছি। শুঁড়া দুর্গাপুরে কেন? কিসের আকর্ষণ?

ইতিহাসের পাঞ্জি পুঁথিতে কুত্রাপি এ গ্রামের নাম লেখা নেই। তবে কী আকর্ষণে কিসের দর্শনে এমন একটি গ্রাম আমাকে টানলো?

আমার এক বন্ধু একদা এসে বললো, 'শ্বশুরবাড়ি যাব।'

পরম আনন্দের কথা। শ্বশুরবাড়ি যাবে যাও, সে-কথা বলবার দরকার কী? বন্ধুটি তখন বলতে গেলে নববিবাহিত।

অবিশ্যি যদি দু-চার বছরকে নতুন বলা যায়। বললাম ঘুরে আয়।

বন্ধু বললো ঘুরে তো আসবই। তুইও সঙ্গে চল। যে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলি তার বাপের বাড়ির দেশটা একবার দেখে আসবি না?

কথার মধ্যে সত্য ছিল। কেন না বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল কনের কলকাতাস্থ পিসতুতো দাদার বাড়িতে। অতএব বন্ধুপত্নীর পিত্রালয় অবধি গমন করতে হয়নি। আর বলতে গেলে সেই বিবাহের বরকর্তা ছিলাম আমিই। আসলে বরকর্তা ছিলেন আমার পিতৃহীন বন্ধুটির অগ্রজ, শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষাল। আমরা মহাদেবদা বলেই ডাকি।

তিনি শুধু নামে মহাদেব না, কাজেও। কথাটি শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলি। না, তিনি সাধুদিগের সপ্তমী—অর্থাৎ গঞ্জিকায় আদৌ আসক্ত নন। ভাঙ কালে-ভদ্রে। কিন্তু ওই শুণ্ডাই যতো কাল করেছে। দোহাই তোমাদের এ ক্ষেত্রে কেউ যেন হস্তিনী ভেবে নিও না। অভিধানের আর এক অর্থে, শুণ্ডা, মানে মদে তাঁর কিঞ্চিৎ বেশি আসক্তি।

অগ্রজ মহাদেবদারই বরকর্তা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'ভায়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা তুমি দেখ, তুমিই ওকে নিয়ে যাও। আমি বরযাত্রীদের সঙ্গে বাসে, একটু গল্পগুজব করতে করতে যাবো।'

সে গল্পগুজব যে কী গল্পগুজব, তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। আমার বন্ধুটিরও মনোগত বাসনা বোধহয় সেই রকমই ছিল। কারণ বলা যায় না, বরের গাড়িতে যেতে যেতে মহাদেবদা হয়তো ভাইয়ের কোল থেকে টোপরখানি তুলে নিয়ে বলতেন, 'দে, টোপরটা আমি একবার পরে দেখি। সেই কবে একবার তোর বউদিকে বিয়ে করে আনতে গিয়ে পরেছিলাম। আর তো পরা হয়নি। এই ফাঁকে একবার পরে নেওয়া যাক।'···বলেই টোপরটি মাথায় চাপিয়ে হয়তো চলন্ত গাড়ি থেকে পথচারীদের চমকিয়ে হেঁকে উঠতেন, 'দেখ হে দেখ, বিয়ে করতে যাচ্ছে আমার ভাই, টোপর পরেছি আমি।'

এমন দুর্দান্ত ঠাট্টা একমাত্র মহাদেবদার পক্ষেই সম্ভব। অবিশ্যি পেটে দ্রব্য থাকলে। আর ভাইয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, পেটে দ্রব্য থাকবে না মানে? থাকতেই হবে এবং ছিলও। যে-কারণেই হোক বরের গাড়ি যোগাড়যন্ত্র করে বরের বেশে বন্ধুকে নিয়ে আমাকেই যেতে হয়েছিল। সে বিয়েও এক পর্ব বটে। যতোটা না বিয়ের জন্য তার থেকে বেশি গাড়ির কারণে। যে-বন্ধুটি আমার অনুরোধে তার পুরনো বিলিতি মডেলের গাড়িটি নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল, তখনো গাড়ি চালনায় তার শিক্ষানবীশী পর্ব একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। যতো দূর জানি, তার কোনো চালকের লাইসেন্সও ছিল না। তার ওপরে কলকাতার ট্রাফিকের আইনকানুনও ছিল না তার অধিগত। কলকাতার উত্তরের পঁচিশ মাইল দূর থেকে কীভাবে যে বর বন্ধুকে নিয়ে পৌঁছেছিলাম সে অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক না। এখন মনে হয় পরম কৌতুকজনক। তবে আমার অবস্থাটা রীতিমতো করুণ হয়ে উঠেছিল।

করুণ অবস্থার কথাই যদি বলতে হয় তাহলে আমার বন্ধুটির শুধু বিয়ে কেন? সে আমাকে জ্বালিয়েছে তার অনেক আগে থেকেই। শ্রীমান ব্যর্থ প্রেমিক না। প্রেমে যে অনীহা ছিল, এমনও বলা যায় না। কিন্তু প্রেমেই যতো আড়ষ্টতা। ও-কাজটি ও কখনো করে উঠতে পারেনি। ওদিকে চিলে কোঠার অবিবাহিত যুবকটির বালিশের তলায় খাতাখানি বের করে পড়ে দেখ, প্রেমের কবিতার ঢেল খেল। অবিশ্যি কেবল প্রেমের কবিতাই পাতায় লেখা থাকতো, সে-কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। প্রচুর সর্বহারা বিপ্লবের কবিতাও ছিল। এমন কি তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রপত্রিকায় ওর সেই সব বিপ্লবী কবিতা কয়েকটা ছাপাও হয়েছিল।

এখন বুঝছ রসিকজন, যে জান সন্ধান। কার উদ্দেশেই বা প্রেম নিবেদনের কবিতা। আর হৃদয় জুড়ে বিপ্লবের ঝড়ই বা কেন বহে যেতো। তার মানে প্রেমও চাই, বিপ্লবও চাই। দুটোকে কোনোক্রমেই সমার্থক করা যায় কী না, হায়, আমি তো আজতক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন, প্রেমে ও যুদ্ধে কোনো নিয়ম নীতির দ্বারা চালিত হওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধকে বিপ্লবের আখ্যা দিতে গিয়ে আমি না আবার প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাই। কারণ বিপ্লবের তত্ত্ব এতোই শতাধা বিদীর্ণ আর মতবিরোধের কূটকচালিতে ভরা, সরাসরি যুদ্ধের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

যাই হোক আমার বন্ধুটির অবিবাহিত জীবনে প্রেমের ফুল ফুটেছিল কী না জানি না। শুনি তো, ডুবে জল খেলে, শিবের বাবাও নাকি টের পান না।

তবে আমি জানতে পারি নি। আর বিপ্লব ঘটেছিল কী না, সেটা, ও-ই ভালো বলতে পারে। অতএব, এমন একটি বন্ধুর জন্ত, চলো মেয়ে দেখতে প্রেমের ফুল ফুটুক না ফুটুক, বিয়ের ফুল তো ফুটতেই হবে। যে-কোনো একটা ফুলে প্রেমের সন্ধান মিলবে।

জীবনে কোনোদিন এই একটি কাজ আর কারো জন্মে করতে হয়নি। অবিশ্যি আমি মেয়ে দেখতে গেলেই কি আর গৃহস্থেরা তাঁদের কন্যাটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমার সামনে এনে বসাবেন? ছেলের বন্ধু হতে পারি, কিন্তু আমাকে মানবেন কেন? অতএব যেখানেই মেয়ে দেখতে গিয়েছি সঙ্গে মহাদেবদা। খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার! দ্রব্য চাপিয়ে নিলেই সর্বনাশ। তবে কথা রাখতেন। যেখানেই মেয়ে দেখতে গিয়েছি, আগে মেয়ে দেখা তারপরে দ্রব্য চাপানো এবং সেই সঙ্গে দেখা মেয়ের রূপের বাখান। সেই সঙ্গে আমাকে ধমক, তোমাকে দিয়ে কিস্‌সু হবে না।

আমার অবাক জিজ্ঞাসা, 'কেন আমি আবার কী দোষ করলাম দাদা?'

দাদার চোখ লাল! 'তুমি মেয়েটাকে হাসাতেই পারলে না। দাঁতগুলো দেখব কেমন করে?'

হ্যাঁ, এটা একটা দোষ বই কি। কিন্তু একটি অচেনা মেয়েকে কী বলে হাসানো যায়, সে-সব কথা আমার আয়ত্তে নেই। মেয়ে হাসাবার তুকতাকও জানি না। আবার আমারই বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছি, তারা আর কিছু পারুক না পারুক, পথেঘাটে অচেনা মেয়েদের দিব্যি হাসিয়ে দেয়। না তার মধ্যে ওই কী বলে অশালীন অরুচিকর নীতিবিগর্হিত কোনো ব্যাপার থাকে না। ছেলে বা মেয়ে সবাইকেই যেখানে সেখানে হাসাবার প্রতিভা নিয়েই তারা জন্মেছে। যেমন আমার এই বন্ধুটি, যার বিয়ের পাত্রী দেখবার জন্ম কোন্ ধ্যাদধেড়ে গোবিন্দপুরে না গিয়েছি!

একবার সেই কোন্ বৈঁচিগ্রামের পশ্চিমে ব্যারেলা গ্রামে এক মেয়ে দেখতে গিয়ে, মহাদেবদার বার বার চোখ কটমটানো দেখেই বুঝেছিলাম, তিনি আমাকে মেয়েটিকে হাসাতে বলছেন। কন্যাটি তখন অধোবদনে বসে আছে আমাদের সামনে। পাশেই তার দাদা। নিজেদের সম্পত্তি সামগ্রীর প্রতাপ দেখাতে, দোনলা বন্দুকটা পর্যন্ত মহাদেবদাকে দেখিয়ে হাতের কাছে রেখে দিয়েছেন। মহাদেবদা মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে করছেন। পুকুরে কেমন মাছ আছে, ছিপ ফেললেই ধরা যাবে কী না, এসব জিজ্ঞেস করছেন। আর থেকে থেকে আমার দিকে কটমটে চোখে তাকাচ্ছেন। যার অর্থ, 'হাসাও,

মেয়েটাকে হাসাও, দাঁত দেখতে হবে তো!'···তারপরেই আবার কন্যার দাদাকে বলছেন, 'বন্দুক দিয়ে মাছ শিকার করা দেখেছেন?'

কন্যার দাদার চোখ কপালে। বন্দুক দিয়ে মাছ শিকার? তিনি ঠাট্টা ভেবেই হেসে বলেছিলেন, 'কী যে বলেন ঘোষালমশাই, বন্দুক দিয়ে কি মাছ শিকার হয়?'

'আলবৎ হয়।' মহাদেবদার গর্জন। 'দেখতে চান? চলুন আপনাদের কতো বড় পুকুরে কতো ওজনের মাছ আছে, এখুনি শিকার করে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আমার তখন নাসারন্ধ্র স্ফীত। গন্ধ নেবার চেষ্টা করছি। দাদা কি আগেই কোথাও থেকে দ্রব্য চাপিয়ে এসেছেন নাকি? তা না হলে অচেনা গৃহস্থের বাড়ি বসে, বন্দুক দিয়ে মাছ শিকারের বীরত্ব প্রকাশ? না আসলে দ্রব্যগুণ না, দাদার কথাবার্তার রকম সকমই একটু এইরকম। কিন্তু আমাকে ঠিক চোখ কটমট করে যাচ্ছিলেন, 'হাসাও, হাসাও।'

কী বিপদ। হাসাতে না পেরে আমি ঘামতে আরম্ভ করেছিলাম। আর বলতে গেলে একটি রুগ্ন অসুস্থ মেয়ে মাথা নিচু করে বসে ঘামছিল। শেষ পর্যন্ত আমি মরীয়া হয়ে কন্যার দাদাকে, প্রায় তোতলার মতন বলেছিলাম, 'ইয়ে, মানে, ওকে একটু হাসতে বলুন না।'

কন্যার দাদা নিজেই হেসে উঠে বলেছিলেন, 'হাসতে বলব? নিশ্চয় বলব।' বলেই ভগিনীর প্রতি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, 'এই, হাস, শীগগির হাস। হাস বলছি।'

আমি তো ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক তাঁর ভগিনীকে কাতাকুতো দিয়ে হাসাবেন কী না? কেন না, উনি যতোই ভগিনীকে হাসবার হুকুম দিচ্ছিলেন, ভগিনীটির ঠোঁট যেন ততই শক্ত হয়ে এঁটে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক শেষটায় নিজের হাতে ভগিনীর টেপা ঠোঁট দুটি জোর করে ফাঁক করে দিয়েছিলেন, 'নে এবার হাস, হাস বলছি।'

হাসি না, কন্যাটির তখন বোধহয় কান্না পাচ্ছিল। চকিতের মধ্যেই আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, কন্যাটির ওপর পাটির সামনের দুতিনটি দাঁতের রঙ অনেকটা সবুজ শ্যাওলার মতন। ভাবী বন্ধুপত্নী হিসাবে, দাঁতের রঙ আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু জীবনে বহু রঙের দাঁতের অধিকারিণী মহিলার সঙ্গে বিস্তর হেসে কথা বলেছি। তেমন কিছু মনে হয়নি। আমাদের দেশে, কতোজনই বা আর দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে? কিন্তু ব্যারেলা না বেরালার সেই কন্যাটি তার দাঁত সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই, হাসতে দ্বিধা করেছিল।

অথচ, অনেক ভালো মুক্তাদন্ত হাসিনী মেয়েকেও হাসতে দেখিনি, হাসাতেও পারিনি।

ভাবছো, মেয়ে দেখা ব্যাপারটা কী নির্মম আর নিষ্ঠুর ছিল। রুচিহীন অশ্লীল। আর এখন সবই ভারি শালীন আর রুচিশীল। হ্যাঁ, অবস্থা না, ব্যবস্থা কিছুটা বদলিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই বোঝা যায় আপনা রুচির পরিবর্তন কতোটা হয়েছে। মনোবৃত্তির দিক থেকে, এখনো পাত্রের ক্ষেত্রে সোনার আংটি বাঁকা হলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাত্রীটি হাওয়া চাই সুগৌরী, রূপসী, বয়স অনধিক এত, স্বাস্থ্যবতী চারুশীলা, সঙ্গীত পারঙ্গমা ··কতো কী। যেন বিয়ে করে একেবারে ইন্দ্রের অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে ঠাঁই দেবে। সংসারের কুত্রাপি হাত লাগাতে হবে না। তার সঙ্গে বরপণের কথাটা কাগজে উল্লেখ করা যায় না। ওটা গোপনেই সারতে হয়। বন্ধুর যে হয়নি, সেটা আমার বলবার দরকার নেই। কন্যার অভিজ্ঞ পিতামাতা মাত্রই জানেন।

ব্যতিক্রম যেটুকু চোখে পড়ে, তা প্রেমজ বিবাহ। তাও দেখেছি প্রেমজ বিবাহে দানপত্তরের ছড়াছড়ি। আর খবরের কাগজে ব্যতিক্রম দেখা যায়, নেহাত বিপত্নীক অথবা প্রৌঢ় বয়সের পাত্রের ক্ষেত্রে। তখন যেমন তেমন, একটি বিয়ের দায় তাদের নিজেদের।

অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, ব্যবস্থার রকমফের মাত্র। তবে, আমার ক্ষেত্রে জীবনে এটাও একটা অভিজ্ঞতা বটে। বন্ধুর বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যাওয়া। শুধু কি কন্যার হাসি দেখলেই হবে। ভদ্রসমাজে কহনে না যায়, আমার বন্ধুটি বড় অসহায়ভাবেই বলেছিল, 'গায়ের রঙটা একটু দেখে নিস।'

'কীরকম দেখতে হবে? ফরসা তো?'

বন্ধুর জবাব, 'না, খুব ফরসা না হলেও হবে। তবে কালো যেন না হয়।'

রঙের ফেরে আমি নেই। কারণ আমাদের এই রঙীন দেশে, নানা রঙের ছড়াছড়ি। শুনি নাকি, বিদেশের গোরারা, ভারতের মানুষের বিবিধ রঙ দেখে অনুমান করে, গায়ে রঙ মেখেছে। এক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক দাদা পূর্ব ইউরোপ থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'ওরা আমাদের গায়ে আঙুল ঘষে দেখেছে, সত্যি এত রকমারি রঙ আমাদের, আসলে রঙ মেখেছি কী না···'

আমি বন্ধুকে বলেছিলাম, 'কালো ধলো বুঝি না, একটা যা হোক কিছু সঠিক বলে দে।'

বন্ধুটি আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল। যেন, জীবনে

আমাকে সেই প্রথম দেখছিল। তার পরে শালা বলে কী না—হ্যাঁ, এর পরে শালা ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না, 'তোর গায়ের রঙটা কালোর ওপর মাজা মাজা। তোর তলপেটের মতো রঙ হলেই হবে।'

প্রথমটা আহাম্মুকের মতন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার তলপেটের মতন রঙ? সে আবার কী? বন্ধুটি আমার অবস্থা বুঝে ভেঙে বলেছিল, 'বুঝলি না? তলপেটটা তো সব সময়ে ঢাকা থাকে, গায়ের রঙের থেকে ওখানটা ফরসা। তাই বলছি, তোর তলপেটের মতো রঙ হলেই হবে।'

কী সহজ কথা! তোমরা কি কখনো এমন আজব কথা শুনেছো কখনো? গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে, এক ঘর লোকের সামনে, কন্যাটিকে দেখে, আমি আমার তলপেটের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে'নেবো? শালীনতার কথা না হয় বাদই দিলাম। সম্ভব অসম্ভব বলেও একটা কথা আছে তো! শেষটায় উন্মাদ প্রমাণিত হয়ে, আচ্ছা মতন মধ্যমনারায়ণের দ্বারা সজুত হয়ে বাড়ি ফেরা? নিকুচি করেছে বন্ধুর বিয়েব! রইলো তোর পাত্রী দেখা।

তা বললে তো হয় না। অরক্ষণীয় কন্যার মতন, বন্ধুটির অবস্থাও যে তখন অরক্ষণীয় যুবক আর এ ধরনের অরক্ষণীয় যুবকদের লক্ষণই হলো, আজ তার মাথাব্যথা। কাল তার পেটে গোলমাল। ওদিকে ঘুম নেই, খালি চোখের কোলে কালি পড়ছে তবু বলতে হবে, বন্ধুটির মেজাজ কখনো তেমন খারাপ হয় নি। তবে যা-ই খায়, গায়ে লাগে না। লাগবে কী করে? বিয়ের জল বলে নাকি একটা কথা আছে? আর সেটা কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রেই না, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সমান।

অতএব রইলো বলে চুপ করে থাকতে পারিনি। আর সত্যি কথা বলতে কি, দু এক জায়গায় চোখের ধন্দে, কোনোরকমে কাপড় সরিয়ে নাভির আশপাশটা দেখেও নিয়েছি। লজ্জার মাথা খেয়ে, একথাটা স্বীকার করতেই হচ্ছে। কিন্তু কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাইনি। বন্ধুটির আবার বায়নাক্কাও ছিল। তিনি নিজে মেয়ে দেখতে যাবেন না। অবশেষে, মহাদেবদা, আমাদের আর এক বন্ধুকে নিয়ে, খোঁজ খবরসহ, গুঁড়া দুর্গাপুরের মেয়ে পছন্দ করে এসেছিলেন।

দাদার পছন্দের কথা শুনেই, পাত্র বন্ধু অন্য বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিল। কন্যার পিতা চাটুয্যেমশাই কলকাতারই এক প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতেন, থাকতেনও কলকাতার মেসে। কন্যা পছন্দের কথা শুনেই তিনি কন্যাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কলকাতাস্থ ভাগিনেয়র গৃহে। তখন বাকি

সব কথাবার্তা পাকা করার ব্যবস্থা। এমন সময়ে, পাত্র বন্ধু আমার হাতে একটি চিরকুটে লেখা, চাটুয্যেমশাইয়ের নাম আর টেলিফোন নাম্বার ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মেয়েকে কলকাতায় আনা হয়েছে। তুই একবার গিয়ে ফাইনাল দেখে আয়। এই হচ্ছে মেয়ের বাপের অফিসের টেলিফোন নাম্বার। একটা টেলিফোন করে দিয়ে বল, তুই একবার মেয়েকে দেখতে যাবি।'

আমার মতন বেয়াকুফ তো আর গাছে ফলে না, বন্ধুটির কথানুযায়ী আমি সহজ আর সরল ভেবেই চাটুয্যেমশাইকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলাম, 'আমি পাত্রের বন্ধু, এই আমার নাম, আমি একবার মেয়েকে দেখতে যাবো।'

চাটুয্যেমশাই কেবল অতিশয় মহদাশয় ব্যক্তি ছিলেন না। মনের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত সরল, আর তাঁর ছিল একটি উদ্বেগপ্রবণতা। সামান্য কারণেই উদ্বিগ্ন আর ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। এমন কি অসহায় শিশুর মতনই তাঁর দুচোখের কোল ভিজে উঠতো। তার অবিশ্যি কারণও ছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন না, কিন্তু অপুত্রক ছিলেন। ছটি কন্যার জনক। জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই বিয়ের পরিণতির পিছনে একটি ব্যথাতুর কালো ছায়া ছিল। আমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। পছন্দের কথা যখন পাকাপাকি, তখন হঠাৎ আমার টেলিফোন পেয়েই মহাশয়ের মাথায় হাত। ধরেই নিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল ঘটেছে, বিয়ে বুঝি ভেস্তে যায়। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে মহাদেবদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, 'আপনার ভাইয়ের বন্ধুর আবার এই টেলিফোন কেন? আপনি আর আপনার ভাইয়ের এক বন্ধু তো আমার মেয়েকে পছন্দ করেছেন।'

মহাদেবদাই ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'এতে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। আমার ভাইয়ের অনুরোধেই ওর বন্ধু আপনাকে টেলিফোন করেছে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার ভাইয়ের বন্ধুকে নিয়ে আমি আপনার ভাগ্নের বাড়িতে যাবো, তারপরেই আপনি ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসবেন।'

আগে বুঝতে পারলে, আমি চাটুয্যেমশাইকে কখনোই ওরকম উত্যক্ত করতাম না। চরিত্রের দিক থেকে, আমি চাটুয্যে পরিবারের কাছে একটি পাকা ভিলেন। কারণ তাঁরা তো ধরেই নিয়েছিলেন পাত্রের আসল এজেন্ট আমি। পাত্রীকে দেখে গিয়ে, আমি বন্ধুকে যা বলবো তাঁর ওপরেই সব নির্ভর করছে। আমি হ্যাঁ বললে, হ্যাঁ, না বললে না। ফলে আমি যখন মহাদেবদার সঙ্গে কন্যার পিসতুতো দাদার বাড়িতে গিয়েছিলাম কে জানতো, আমার ভূমিকা

তখন যমদূতের। কন্যার বাবা, পিসিমা, পিসতুতো দাদা, সকলেই আড়ষ্ট। এপাশে ওপাশে দরজা জানালা থেকে কয়েকটি বালক-বালিকার মুখও উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছিল। তার মধ্যে দশ বারো বছরের ফ্রক পরা একটি মেয়ের চোখে তো রীতিমতো নালিশ-বিদ্ধ দৃষ্টি।

অল্প সময়ের মধ্যেই, পাত্রীকে আমার সামনে উপস্থিত করানো হয়েছিল। আর পরিষ্কার মনে আছে, প্রথম দর্শনেই আমি বলে উঠেছিলাম, 'বাহ্, সুন্দর।'

মুগ্ধ চিত্তে ওরকম বলাটাও একরকমের বেয়াকুবি। ভাবী বন্ধু পত্নীটি তার আয়ত চোখের কালো তারা দুটি ঘুরিয়ে, চকিতেই একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিয়েছিল। কেন? আমি ঠাট্টা করছি কী না, তা-ই বোঝবার জন্য? চাটুয্যেমশাই যুগপৎ উদ্বিগ্ন খুশি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ আপনার মনের কথা তো বাবা?'

ছি ছি ছি, এমন পরিস্থিতিতেও মানুষ পড়ে? মুগ্ধ চোখ কি ছলনা করতে জানে? অন্তত আমি তো জানি না। আমি রীতিমতো কুণ্ঠিত লজ্জায় বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই। এ আবার আপনি কী বলছেন?'

তারপরেই পরিচয়ের পালা। আমি চাটুয্যেমশাই এবং পিসিমাকে প্রণাম করেছিলাম। পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রবাবুও বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁকেও প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। তিনি অতিশয় ভদ্রলোক, কিছুতেই তখন পায়ে হাত দিতে দেন নি। শ্রীমতী পাত্রী তখনো দাঁড়িয়েছিল। আমিই বলেছিলাম, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যান।'

চাটুয্যেমশাইয়ের মুখের স্বস্তি ভাবটি তখন দেখবার মতন। পিসিমাই শ্রীমতীকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। আর চাটুয্যেমশাই তখন আমাকে, আমার টেলিফোন পাবার পরে, তাঁর মানসিক অবস্থার কথা বলেছিলেন। শুনে আমি দাঁতে দাঁত পিষেছিলাম। অর্থাৎ বন্ধুর ওপর রাগ হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ওর জন্যে যতো মেয়ে দেখা হয়েছিল, গুঁড়া দুর্গাপুরের শ্রীমতীই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।

আমার বন্ধুটি তখন শিয়ালদায় আমার জন্যে রীতিমতো ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল। ভেবেছিলাম, ওর মুখোমুখি হয়েই যা মুখে আসে, তাই বলবো। বলতে পারিনি। ওর চোখ মুখের অবস্থা দেখে, হেসে বলেছিলাম, 'চমৎকার! কিছু বলবার নেই।'

'সত্যি!'

আহ্, বন্ধুর মুখে হাসিটি তখন দেখবার মতন।

বন্ধুর নামটা এবার বলা দরকার। মহাদেবদার ভাই যখন, তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই মহাদেবেরই আর এক নাম, শঙ্কর ঘোষাল। কথাটা ও অবিশ্যি মিথ্যা বলে নি। বেলেঘাটার খালের ধারে, সি আই টি-র সেই ফ্ল্যাটে মশা আক্রান্ত সারা রাত জেগে, পরের দিন বেরোতে বেশ বেলাই হয়েছিল। অমন ভয়ঙ্কর মশা আর কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারি না।

রাত্রি জেগে কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান দেখবার অগ্রহ ছিল না। শুনি নাকি বিবাহে, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্যান্য লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের থেকে অনেক বেশি অর্থবহ বলা হয়। হবে। হিন্দু ধ্যান ধারণার এ দিকটা আমার জানার বাইরে। খেয়ে, এবং ছাদনাতলার বিয়ে দেখে, প্রায় মধ্যরাত্রে আমি আর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সেই বিশেষ ঘরটিতে শুতে গিয়েছিলাম, যে ঘরে বরকে প্রথম আপ্যায়ন করে বসানো হয়েছিল। ঘরে ঢুকে, মেঝের ওপরে গদির বুকে চাদর বিছানো, কোঁচকানো বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলাম। মাসটা ছিল ফাল্গুন। গরম ছিল মন্দ না। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল।

পাখার নিচে শুয়েও মশার আক্রমণ থেকে রেহাই ছিল না। বারে বারে চোখ বুজতে গিয়ে ভাবছিলাম, ঘরে এত জোরালো আলো জ্বলছে, মাথার ওপরে বনবন ঘুরছে পাখা। তবু এত মশার দৌরাত্ম্য ঘটেছিল কেমন করে। ভাবছিলাম, আর মাঝে মাঝে, যে-দিকটায় আলো কম, সেদিকের দেওয়ালের গায়ে চোখ পড়ছিল। একটা কৌতূহলও বোধ করছিলাম। ঘরের সব দেওয়ালই সাদা। কেবল আলো কম দেওয়ালটাই প্রায় কালো। কেবল কালো নয়, মাঝে মাঝে দেওয়ালটা যেন নড়ছিল বা কাঁপছিল। এক একবার কালো দেওয়ালটার খানিক খানিক জায়গা সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আবার দেখতে দেখতেই কালো!

কী রকম ব্যাপার? জাগ্রত অবস্থায়, আমার তো মহাদেবদার মতন 'বিচিত্র দর্শন' ঘটবার কোনো কারণ ঘটেনি। বিয়ে বাড়ির ঢেকুর ওঠা খাবার ছাড়া, আমার পেটে দ্রব্য বলতে তাম্বুলের রস ছিল। কালো দেওয়াল নড়া-চড়ার এমন ভৌতিক কাণ্ড দেখছিলাম কেন? অন্য দু চার বন্ধুকে ডেকে বলার উপায় ছিল না, তারা তখন ক্লান্ত, ঘুমে অচৈতন্য।

ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তি দিচ্ছিল না। একদিকের দেওয়াল কালো, আর মাঝে মাঝেই যেন সেই দেওয়াল এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করছিল। এক এক জায়গায় খামচা খামচা সাদা হয়ে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে উঠে বসেছিলাম। দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে দেওয়ালটার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। কী জানি, দেখবো

হয়তো কাছে যেতেই সে দেওয়াল সরতে আরম্ভ করেছে।

অবিশ্বাস্ত ব্যাপার! কাছে গিয়েই ফণা তোলা সাপ দেখার মতন ছ পা পেছিয়ে এসেছিলাম। মশা! মশা! বেলেঘাটার মশা। এখনকার কথা আমি বলতে পারি না। বেলেঘাটার সি আই টি বিল্ডিং-এর সেই দেওয়াল আস্তীর্ণ মশা আমি দেখেছিলাম পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। বেলেঘাটাবাসি-গণ, আমাকে মার্জনা করিবেন, আমি সত্য বৈ মিথ্যা কহিতেছি না। মিনিটে সহস্র তীর বিদ্ধ হওয়ার মতো মশার আক্রমণ ছ চারবার সহ্য করেছি। এমন জায়গায়ও গিয়েছি, যেখানে দিনের বেলা পায়ে পায়ে, গায়ের সঙ্গে মশা ফেরে। কিন্তু এমন অদ্ভুত কাণ্ড আমি দেখিনি। মশার দেওয়াল।

আসলে মৌমাছির চাকের দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকালে যেমন বোঝা যায়, চাকের গায়ে মৌমাছিরা নড়াচড়া করছে, আমি ক্ষুদ্রাকৃতি মশা আস্তীর্ণ গোটা দেওয়ালটাকেই নড়তে দেখেছিলাম। তারপর আর ঘুমের আশা করা যায় না। করিও নি। বরং ঘুমন্ত বন্ধুদের ডেকেছিলাম, বাইরে যাবার জন্ত। সেটা ছিল আরও অসম্ভব। সারা দিন আর মধ্যরাত্র পর্যন্ত হৈচৈ করে, পেট ভরে খাবার পরে ঘুম, সহজে তা ভাঙবার না। মশাকে তাদের থোড়াই কেয়ার। শুনেছি, কোনো এক প্রাকৃতিক বেগে নাকি মানুষের বাঘের ভয় থাকে না। এ ক্ষেত্রে ঘুম ভাঙানো সেই রকম কঠিন। অতএব ধূমপানের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে জেগে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। রাতটা জেগে কেটেছিল। পরের দিন বন্ধুর গাড়িতে চেপে ফিরেছিলাম, নব বরবধূকে নিয়ে। সঙ্গে সেই দশ বারো বছরের ফ্রকপরা মেয়েটি। প্রথম দিন বেলেঘাটায় মেয়ে দেখতে গিয়ে, যার চোখে দেখেছিলাম নালিশ-বিদ্ধ নজর। তারপরে আর নালিশ ছিল না, কেবলই হাসি।

পরিচয়ের দিক থেকে, সে নববধূর পঞ্চম ভগিনী। অতএব নাম তার পঞ্চমী। বেণী দোলানো বালিকাটির চোখে মুখে কথা। ক্ষণে হাসি, ক্ষণে মান অভিমান। পঞ্চমীর কথাগুলো যেন গ্রামীণ শিল্পের এক ভাণ্ডার। আমি মনে মনে যতো হেসেছিলাম, অবাক তার থেকে কম হইনি। ওর কোমরে তখন আঘাত, ফলে পা টেনে টেনে চলছিল। বৃষ্টি এবং বানের তোড়ে ওদের গুঁড়া দুর্গাপুরের ঘরের মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল ওর কোমরে···কিন্তু সে সব কথা পরে।

শঙ্কর এসে যখন গুঁড়া দুর্গাপুরে যাবার কথা বললো, তেমন কুণ্ঠাবোধ করলাম না। ইতিমধ্যে কয়েক বছরে, ওর শ্বশুর চাটুয্যেমশাই যতোবারই

জামাইবাড়িতে এসেছেন, ছ'একবার আমার বাড়িতেও পায়ের ধুলা দিয়েছেন। আপনি সম্বোধন বিয়ের রাতেই শেষ। আমাকে তাঁর দেশের বাড়ি ওঁড়া দুর্গাপুরে যাবার জন্ম কয়েকবারই বলেছেন। উনি এলেই সঙ্গে পঞ্চমী। ওর চোখ ঘুরিয়ে কথার ধরতাইটাই এইরকম, 'পাড়াগাঁ বলে কি আমাদের বাড়ি যেতে নেই? আপনাদের হিল্লি দিল্লি কলকাতার থেকে আমাদের পাড়াগাঁ অনেক ভালো।'

সত্যিই তো। এ কথাটা পঞ্চমী না বললে আমি জানবো কী করে? তবে, ওর ঠোঁট বাঁকানো, চোখ ঘোরানো, বচন বাখান শোনবার জন্তই বলেছি, 'কী আছে পাড়াগাঁয়ে? ধুধু মাঠ পুকুর ডোবা বাঁশঝাড়। ওসব দেখবার জন্ম পাড়াগাঁয়ে গিয়ে লাভ কী?'

'ও, আপনি খালি ওসবের কথাই ভাবলেন?' পঞ্চমীর চোখের তারায় ঠোঁটের কোণে অভিমান ছায়া ফেলেছে, আবার পরমুহূর্তেই, চোখের দৃষ্টি চটুল হয়ে উঠেছে ওর বয়স ছাড়িয়ে, 'আমাদের কথা ভাবলেন না? খালি বাঁশঝাড় আর পুকুর ডোবার কথাই ভাবলেন? একবার না হয় সেখানকার মানুষদের দেখতেই চলুন। লেখকরা নাকি মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে?'

পঞ্চমী একথাটাও জানে! কিন্তু লেখকরা কি সত্যি মানুষ দেখতে ভালবাসে? আমি ওর সঙ্গে সে তর্কে আর যাইনি। বলেছি, 'ঠিক আছে, সময় এলেই যাবো।'

শঙ্করের কথা শুনে, সে-সব কথা মনে পড়লো। তারপরেই ভাবলাম, অফিস আদালত কোথাও ছুটি নেই। হঠাৎ এমন একটা সময়ে ও শ্বশুরবাড়ি যাবার আমন্ত্রণ নিয়ে এলো কেন? জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন তো তোর ছুটিছাটা নেই? এ সময়ে যাবার হঠাৎ কী দরকার পড়লো?'

সে-কথা যদি আমি বুঝবো, তা হলে তো মানুষ চেনার গৌরব করতে পারতাম। শঙ্কর বললো, 'ছুটি নেই, তবে অফিস থেকে ছুটি নিয়েই যাবো ভাবছি।'

'আমাকে নিয়ে যাবার জন্ম?' অবাক হয়ে বললাম, 'তার দরকার কী? তোর যখন ছুটিটুটি থাকবে, তখন ঘুরে আসা যাবে। তাড়া কিসের?'

শঙ্কর ওর গোঁফে তর্জনী ঘষলো, মাথা চুলকালো ছু'একবার। গোঁফের ফাঁকে লুকানো হাসিটা চোখে পড়েও পড়েনি। বললো, 'মনে যখন হয়েছে, চল ঘুরেই আসি। তোর তো আর ছুটিছাটার ঝামেলা নেই। গ্রাম বেড়াতে তো তুই ভালইবাসিস। শীতের এই সময়টা ভালই লাগবে।'

আমার মনে কোথায় একটা খটকা লাগলো। শঙ্কর তো অফিস থেকে সহজে ছুটি নিয়ে কোথাও যাবার পাত্র না। তাও আবার বেড়াতে এবং শ্বশুর-বাড়িতে আমাকে নিয়ে? নিতান্ত আমারই জন্য? মুহূর্তেই মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিদ্যুৎ হেনে গেল। হায়, কবে আর আমার আক্কেল হবে হে? আমি ভুরু কুঁচকে শঙ্করের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বউ এখন কোথায়?'

যতোদূর জানি, শঙ্করের মথায় উকুন নেই। চুলের ঘনত্ব কিছু কম। তবু বারকয়েক মাথা চুলকে বললো, 'ইয়ে, ও-মানে ওর কথা বলছিস? ও তো এখন বাপের বাড়িতেই আছে।'

শালা! সম্বোধনটা মনে মনেই করলাম, হেসে বললাম, 'বুঝেছি, কবে যাবি?'

শঙ্কর বললো, 'আজই। কতোটুকু পথ? পায়ে হেঁটে গেলে বগিলায় নামবো। গরুর গাড়ির জন্য খবর দেওয়া নেই। নইলে মেমারিতে নেমে রিকশায় যাবো।'

ঘড়িতে সময় তখন বেলা দশটার কাছাকাছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন রওনা হবি?'

'এখন বললে এখনই।' শঙ্কর যেন পা তুলেই রয়েছে, 'আর নয় তো চান করে মুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়া যাবে। নেবার মধ্যে দু একখানা জামা-কাপড়, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। দাঁত মাজার দাঁতন বিস্তর জুটে যাবে। পেস্ট ব্রাশ লাগবে না।'

বললাম, 'ঠিক আছে। তুই খেয়ে নিয়ে গাড়ির সময় দেখে আয়, আমি তৈরী হচ্ছি।'

শঙ্করের কথা মতো, মেমারিতে নামাই স্থির হয়েছিল। কেন না, বগিলা থেকে হাঁটা পথের কষ্ট ও আমাকে দিতে চায়নি। কিন্তু এবারের যাত্রাটার রকম-সকমই আলাদা। কাঁধে ঝোলা নিয়ে তো ইতিপূর্বে অনেকবারই বেরিয়ে পড়েছি। এবারে যে কেন কোট পাতলুন, ইস্তক গলায় একটা টাই বেঁধে নিয়েছি, নিজেই জানি না। অজান্তেও অনেক সময়, নিজেকে ক্লাউন সাজিয়ে ফেলি। যাচ্ছি তো পাড়াগাঁয়ে। সেখানে আমার ছুঁচলো জুতো, কোমর হাঁটু চাপটি খাওয়া পাতলুন, চন্দ্রবোড়া সাপের মতন ইটালিয়ান টাই দেখবে কে?

কেন? বন্ধুর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকেরা। এ যাত্রা তো আর এমনি আমার ডানা মেলে দেওয়া উড়ে যাওয়া না। বলতে গেলে তো, কুটুমবাড়িই যাচ্ছি। সহবত বলে একটা কথা আছে। সহবতের সঙ্গে সাজগোজই চাই। শঙ্কর যেমন তেমনই ছিল। ফিনফিনে ধুতির মালকোঁচা, গায়ে পাঞ্জাবি, তার ওপরে একখানি কোট। হ্যাঁ, পাঞ্জাবির ওপর কোট এখনো কিছু কিছু চোখে পড়ে। সব থেকে বেশি চোখে পড়ে বাংলাদেশের বাইরে, পশ্চিমে। বিশেষত দেহাতে।

মেমারি ইস্টিশানে নেমে, আশপাশের লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথম বুঝলাম, আমি একটি দর্শনীয় জীব এসে হাজির হয়েছি। জজ ম্যাজিসট্রেট না হতে পারি, আমি যে একজন ডাক্তার, সে বিষয়ে যেন কারোর কোনো সন্দেহ ছিল না। ইস্টিশান থেকে, বাজারের সামনে চত্বরে নেমে দেখলাম, গোটা দুয়েক সেই বিখ্যাত মোটরগাড়ি। অন্য পাশ থেকে জনাকয়েক রিকশাওয়ালা ছুটে এলো, 'আসুন বাবু, কোথায় যাবেন?'

শঙ্কর বললো, 'গুঁড়া দুর্গাপুর। কতো নেবে?'

প্রথম দর উঠলো পাঁচ টাকা। এক টাকা নেমে, চার টাকায় যখন রফা হবার মুখে আমি মোটরগাড়ি দুটো দেখিয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কোথায় যায়?'

শঙ্কর বললো, 'সবখানেই যায়।'

'গুঁড়া দুর্গাপুরেও যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর বললো, 'তা যাবে। তবে টাকা বেশি লাগবে।'

'কত বেশি?'

'জিজ্ঞেস করে জানতে হয়।'

বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বলে কথা! পাড়াগাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে যাবো, ভেবেই মন টং। কালকূটের মেজাজই তখন আলাদা। বললাম, 'চল, নেহাত গলা কাটা ভাড়া না চাইলে, মোটরেই যাবো!'

দুজনেই পায়ে পায়ে মোটরগাড়ি দুটোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বহুকাল এমন গাড়ি চাপা হয়নি। দুটো গাড়ির একটা ফাঁকা, লোকজন নেই, আর একটার চালকের আসনে বসে, একটা চোদ্দ পনরো বছরের ছেলে বিড়ি টানছিল। শীতের মাত্রা কি খুব বেশি? ছেলেটার গায়ে তো দেখছি বুক খোলা একটা পুরনো শার্ট। কিন্তু কান মাথা ঢেকে একখানি মাফলার জড়ানো। এই কি চালক নাকি? শঙ্করই জিজ্ঞেস করলো, 'ড্রাইভার কোথায় ভাই?'

'আছে এদিকে ওদিকে।' ছেলেটা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আমার দিকে তাকালো। বোধহয় একবার ভাবলো, বিড়িটা ফেলে দেবে বা লুকোবে কী না। তারপরে বোধহয় ততোটা ভক্তি হলো না। সমানে বিড়ি টেনে যেতে লাগলো।

শঙ্কর বললো, 'একবার ডাকো দেখি ড্রাইভারকে।'

'ড্রাইভার বলুন আর মালিক বলুন, সবই আমার মামা।' ছেলেটা নিজেই প্রায় খোদ মালিকের মতন বললো, 'কোথায় যাবেন?'

শঙ্কর জবাব দেবার আগেই দেখি ছেলেটা বিড়ি ছুঁড়ে ফেললো দূরে। দম গিলেই ধোঁয়া আটকে রাখলো বুকে। লাফ দিয়ে নামলো গাড়ির দরজা খুলে। ব্যাপার কী বোঝবার জন্য ছেলেটার নজরে, নজর ফিরিয়ে দেখলাম বাজারের দিক থেকে একজন মাঝবয়সী লোক এগিয়ে আসছে। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা, কয়েকদিনের আকাটা গোঁফ-দাড়ির অবস্থাও সেইরকম। পরনে ময়লা একখানি ধুতির ওপরে, চেক-কাটা শার্ট। শার্টের ওপরে হাতকাটা, বিবর্ণ একটা সোয়েটার। বুকের বোতাম খোলা, তার ফাঁকে ময়লা একগাছি পৈতাও দেখা যাচ্ছে। তার মানে ওনার-কাম-ড্রাইভার মামা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ? কী কারণে চোখ দুটো কিঞ্চিৎ লাল, বুঝে উঠতে পারলাম না। মুখে টেপা পানের খিলিতে গালের এক পাশ, খোঁচা গোঁফ দাড়িতে একখানি কাঁকরোল। বাঁ হাতের মোটা আঙুলের ফাঁকে সিগারেট।

অনুমান করতে অসুবিধা হলো না, ড্রাইভার আর মালিক, যাই বলুন, ইনিই সেই মামা। তাই ভাগিনেয়র অমন ভয় ভক্তি তটস্থ ভাব। কাছে এসে আমাদের দিকে চোখ তুলে দেখে ভারি আর মোটা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়ি ভাড়া করবেন?'

শঙ্কর বললো, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন?' সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল, অনেকটা কলকে টানার মতন।

শঙ্কর বললো, 'দুর্গাপুরে—মানে, শুঁড়া দুর্গাপুর!'

'শুঁড়া দুর্গাপুরে কার বাড়ি যাবেন?' জিজ্ঞেস করতে করতে একবার চোখের কোণে আমাকে দেখে নিল।

ড্রাইভারের এত তত্ত্বতল্লাস কিসের? যেন, তেমন অপছন্দের বাড়ি হলে যাবে না। নাকি আত্মীয়তা যাচাই হচ্ছে? মহাশয়ও ব্রাহ্মণ তো।

শঙ্কর বললো, 'চাটুয্যেবাড়ি, শিবনাথ চাটুয্যের বাড়ি।'

'বোয়েছি।' সিগারেটে আবার এক কলকে কাটানো টান। আঙুলের টোকা মেরে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আর একবার আমাদের দেখে নিল, 'যাব। আট টাকা দেবেন।'

'আট টাকা!' শঙ্কর হতাশ চোখে আমার দিকে তাকালো। কিন্তু আমি মোটেই হতাশ হইনি, বরং আমার তখন ড্যানচি বাবুর উৎফুল্ল প্রাণ। রিকশাকে যদি চার টাকা দিতে হয়, আট টাকায় মোটরগাড়ি তো সস্তা। আরাম করে যাবো, পৌঁছুবো তাড়াতাড়ি। এর আবার তাকাতাকির কি আছে? এবার আমিই মুখ খুললাম, 'তাই দেব।'

শঙ্কর আমার মুখের দিকে একবার তাকালো, তারপরে মুখ টিপে হাসলো। ভাবখানা যা ভালো বুঝিস। শীতের দুপুর গড়িয়ে, নরম রোদের ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে। আর দেরি না করে উঠে পড়াই ভালো। কিন্তু সেটা আমার ভাবনা। মালিক-কাম-ড্রাইভার হাঁক দিল, 'নেত্য কাজে লাগে যা।'

নেত্য সেই ভাগিনেয় তখন গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বললো, 'এই লেগে যাচ্ছি।'

'যান, আপনারা আর দাঁড়িয়ে কেন? নিজেদের কাজকর্ম সেরে নিন তাড়াতাড়ি।' মামা গাড়ির সামনের চাকা খুলতে খুলতে বললো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কাজকর্ম আমাদের আর কী? এবার রওনা দিলেই হয়।'

'সেকি মশাই, শ্বশুরবাড়ি যাবেন, আর বাজার টাজার মিষ্টি মাষ্টা কিছু কেনাকাটা করবেন না?' মামাই তার লাল চোখে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হচ্ছে, তাও এর জানা? আমি একবার শঙ্করের দিকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হচ্ছে, কে বললো আপনাকে?'

কাঁকরোল ফোলা গাল মুখটি হাঁ করে, মামার হাসিখানি দেখবার মতন। সিগারেটে আবার এক কলকে-ফাটানো টান দিয়ে বললো, 'বলবে আবার কে মশাই? আন্দাজি বলে দিলাম। নাও হতে পারে। তা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গেলেও কিছু কিনবেন কাটবেন তো। হাতে তো জামাকাপড়ের ব্যাগ ছাড়া কিছু দেখছি না।'

আমি নিজেই এবার লজ্জা পেয়ে বললাম, 'বলেছেন ঠিকই, আমার এই বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।'

ও সব মশাই আমরা দেখলেই বুঝতে পারি।' মামা বললো, 'মোটর-গাড়িতে তা নইলে আজকাল আর কে চাপে? তবে পোশাক দেখে তো আজকাল কিছু বোঝা যায় না। আর্দালিকে দেখে সায়েব মনে হয়, সায়েবকে আর্দালি।' বলেই মেমারির ইস্টিশান চত্বর ফাটিয়ে হা হা করে হাসি।

নিজেকে আহত ভাববো না উদ্বিগ্ন ভাববো, বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু আমার হাত আপনা থেকেই নেকটাই স্পর্শ করলো। একবার তাকিয়ে দেখলাম নিজের কোট পাতলুন জুতোর দিকে। তার মানে, লোকটা আমাকে অপমান করছে নাকি? আর্দালিকে সায়েব আর সায়েবকে আর্দালি মনে হয়। অর্থাৎ পোশাক দিয়ে আসল জামাইয়ের বিচার হয় না। আমি শঙ্করের দিকে তাকালাম। উনি তখন মুখ টিপে হাসছেন। ডেকে বললো, 'চল একটু ঘুরে আসি। বাজার একটু করতেও হবে।'

চমৎকার। এরা নিজেদের দেখছি, নিজেরা ভালো চেনে। অথচ বাজারের কথা শঙ্কর আমাকে একবারও বলেনি। মামা আবার বললো, 'হাতের মালপত্তরগুলো গাড়িতে রেখে যান, ওগুলো আর বই করবেন কেন?' বলেই এক হাঁক, 'এ্যাই নেত্য, বাবুদের মালগুলো গাড়িতে তুলে রাখ।'

নেত্য এক লাফে আমাদের সামনে হাজির। হাত বাড়িয়ে প্রায় ছোঁ মেরেই, আমাদের দুজনের হাতের ব্যাগ নিয়ে গাড়ির দরজা না খুলেই পিছনের সীটে রেখে দিল। মামা আবার বললো, 'হ্যাঁ, আপনারা সেরে আসুন, আমি ততক্ষণ নাটবলটুগুলো টাইট দিয়ে নিই। মাঠের রাস্তায় যেতে হবে তো।'

নাট বল্টু টাইট! তার মানে গাড়ির অবস্থা বেশ ঢিলে। তার ওপরে আবার মাঠের রাস্তা? কিন্তু আমার যতোদূর মনে পড়ে, শঙ্কর আমাকে ভালো রাস্তা ঘাটের কথা বলেছিল। মামার সামনে কথা না বাড়িয়ে আমি শঙ্করের সঙ্গে বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। আমার ড্যাফি উৎফুল্ল প্রাণ তখন রাগে ফুঁসছে। প্রথমেই বললাম, 'লোকটা বলছে মাঠের রাস্তা। আর তুই সেই রাস্তায় রিকশা নিয়ে যেতে চাইছিলি?'

'রিকশাও যায়।' শঙ্কর আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো, 'তুই গেলেই দেখতে পাবি। আমি নিজে কতো বার রিকশায় গেছি। বর্ষাকালের কথা অবশ্য আলাদা।'

শঙ্করকে চিরকালই বোঝা একটু মুশকিল। কখন কী ভাবছে, বোঝা যায় না। আচমকা এক একটা কথা বলে। আর মনে মনে হাসে। মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো কিছু ধরা যায় না। আমি সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

'তা হলে লোকটা মাঠের রাস্তা বললো কেন?'

'কী জানি!' শঙ্কর হালকা চালে বললো, 'ওরা মোটরগাড়ি চালায় ওদের কাছে কাঁচা রাস্তাই হয়তো মাঠের রাস্তা।'

মনের সন্দেহ দূর না হলেও, আমি বাজারের কথা বললাম, 'তুই তো একবারও আমাকে বলিসনি, তুই বাজার করে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছিস? লোকটা বললো, তাই তোর মনে পড়ে গেল?'

'তাই আবার কখনো হয় নাকি?' শঙ্কর ইতিমধ্যে কখন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীতে নস্যির টিপ নিয়েছিল। ফড়াৎ শব্দে নস্যি টেনে নিয়ে বললো, 'আমরা যে যাচ্ছি সে খবর তো দেওয়া নেই। পাড়াগাঁ জায়গা, কিছু কিনে কেটে না নিয়ে গেলে, ভাত ডাল আর ডিংলের চচ্চড়ি ছাড়া কিছুই হয়তো জুটবে না।'

ডিংলে যে কুমড়ো, সেটা আমার জানা। এবং ওর কথাটাও যুক্তিযুক্ত, কোনো সন্দেহ নেই। তবু আমি ঝেঁজে বললাম, 'সেটা আমাকে বলিসনি কেন?'

শঙ্কর গোবেচারার মতন মুখ করে বললো, 'সে আমি তোকে ঠিকই বলতাম। চাপাচাপির ব্যাপার তো কিছু নয়। একটু মিষ্টি তো কিনতেই হবে। খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না। লোকটা বলে ফেললো, আর তুই আমার ওপর রেগে যাচ্ছিস।'

রাগের তখনো আরও বাকি ছিল। আমি আর্দালি আর সায়েবের তুলনাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বললাম, 'বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তুই আমাকে বললিনা কেন, এইসব স্যুটটুট পরার দরকার নেই?'

শঙ্কর অধিকতর গোবেচারা মুখ করে বললো, 'নাও ঠ্যালা। এ আবার আমি কী বলবো? তোর যা ইচ্ছে হয়েছে, তাই পরে এসেছিস। তবে—।' ঠেক নিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে?'

শঙ্কর এবার ওর এক ধরনের গা জ্বালানো হাসি হেসে বললো, 'আমি মাইরি গোড়া থেকেই ভাবছি, তুই হঠাৎ সাহেব সাজলি কেন? তুই বাহান্ন ইঞ্চি বহরের ধুতি পরিস। এ সময়ে পাঞ্জাবীর ওপরে শাল চাপিয়ে আসবি, সেটাই তো ভালো ছিল। তা না স্যুট ফুট পরে—।' কথা শেষ না করে হোহো করে হেসে উঠলো।

এক হাসির অর্থ ও আমাকে দেখে প্রথম থেকেই মনে মনে হাসছিল।

কিন্তু কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছিল না। আমি নিজেই এখন একটি হাস্যকর চরিত্র, যদিও এই মুহূর্তে তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। রেগে বললাম, 'তা এ কথাটা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বলতে কী হয়েছিল ?'

'আচ্ছা, শালা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?' শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'এই নিয়ে তোকে এত ভাবতে হচ্ছে ? ক্ষতিটা কী হয়েছে ? পরে এসেছিস বেশ করেছিস।'

আমি জেদের স্বরে বললাম, 'মোটেই না। মামা লোকটার কথা শুনলি না ? ওর আর্দালি আর সায়েব বলার মানে কী ?'

শঙ্কর হেসে বললো, 'লোকটা তোকে জামাই ভেবেছিল। তাতেই বা ক্ষতি কি ? শঙ্করের নির্বিকার হাসি আর কথা শুনে, আমার মেজাজ গেল আরও চটে। ওকে মারবার জন্য হাত তুলে বললাম, 'ইয়ারকি হচ্ছে।'

শঙ্কর আমার হাতটা ধরে ফেলে, হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো আর মুহূর্তেই, আমার মনের ওপর জট পাকানো ঢাকনাটা হঠাৎ যেন খুলে গেল। ওর হাসিটা সংক্রামিত হলো আমার মধ্যেও। দুজনেই হাসতে লাগলাম। তারপরে দুজনে মিলে মেমারির বাজারে বাজার করলাম। শীতের বাজারের সবজিমাত্রই লোভনীয় আর মুখরোচক। ফুলকপি বাঁধা কপি থেকে, কিছুই প্রায় বাদ দিলাম না। আমাদের কপালে নেহাত ভেটকি বা চিংড়ি জুটলো না, অতএব বৈকালিক বাজারেও একটি কাতলা মান রক্ষা করলো। ঝাঁকা মুটে বলতে যা বোঝায়, তা এখানে মিললো না। কিন্তু বস্তা হাতে একটা ছেলেকে পাওয়া গেল। বস্তাবন্দী বাজার করে যখন সেই মোটরযানের কাছে ফিরে এলাম, দেখলাম, গাড়ির মাথার ঢাকনার সঙ্গে তলা অবধি দড়ি দিয়ে বাঁধাছাঁদা হয়ে গিয়েছে। মামাও তার ভাগিনেয়কে নিয়ে প্রস্তুত।

আমি বললাম, 'পেছনের কেরিয়ারটা খুলুন, বাজারগুলো রাখতে হবে।'

মামার কাঁকরোল কোলা গাল তখন সমান। একখানি অতি বিস্তৃত তাম্বুলরঞ্জিত হাসি মুখ ব্যাদান করে দেখিয়ে বললো, 'ও কেরিয়ারের কিছু নেই মশাই। আর দড়িও নেই যে বাঁধব। গাড়ির ভেতরেই ঢুকিয়ে নিন না।'… বলে খচাং করে পিছনের একটা দরজা খুলে, বস্তা হাতে ছেলেটাকে বললো, 'নে, ঢেলে দে সব। মিষ্টির হাঁড়ি টাড়ি নেই তো ?'

'না।' বলে হেটুয়ে ছেলেটাও বলা নেই কওয়া নেই, সব আনাজপাতি সবজি পিছনের আসনের নিচে ঢেলে দিল।

মামা বললো, 'নিন, এবার বসে পড়ুন। দেখি, দিনের আলো থাকতে

থাকতে ফিরতে পারি কী না।'

শঙ্কর ইতিমধ্যে মজুরি দিয়ে ছেলেটাকে বিদায় করেছে। দুজনে উঠে বসতে গিয়ে, পা রাখবার জায়গা পাই না। তবু তার মধ্যেই কোনো রকমে, আনাজপাতির ফাঁকে পা নাবিয়ে দিলাম। মামা বললো, 'নে নেত্য, এবার দরজাটা দড়ি বেঁধে দে।'

এখনো বন্ধন? হ্যাঁ, এখনো বন্ধন। নেত্য এক টুকরো গরু বাঁধবার দড়ি এনে, দরজা বন্ধন করলো। কিন্তু বসতে গিয়ে, আধ শোয়া অবস্থা। অন্যথায় সামনের সীট ধরে সোজা হয়ে বসতে হয়। পশ্চাদ্দেশে, একদিক পাহাড় শীর্ষ, অন্য পাশে খাদ। কোনো দিকেই স্বস্তি নেই। মামা হাঁকলো, 'নেত্য হ্যাণ্ডেল মার।'

শুরু হলো হ্যাণ্ডেল মারা পর্ব। ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রের আর্তনাদ, বহু রকমের আহত পশুদের চিৎকার বেজে উঠলো, আর মোটরগাড়ির হ্যাঁচকার সঙ্গে, আমাদেরও হ্যাঁচকা খেতে হচ্ছিল, তারই ফাকে ফাঁকে, মামাকে মনে হচ্ছিল, একটা অতি ক্ষ্যাপা ষণ্ডকে বাগে আনবার জন্য, বিকৃত কঠিন মুখে সে খুনী হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে খিস্তি আর খেউড়।

আমি শঙ্করের মুখের দিকে তাকালাম। শঙ্কর আমার মুখের দিকে। হাসতেও ভরসা পাচ্ছি না। হঠাৎ গাড়ি লাফ দিয়ে উঠলো, আর জেট প্লেনকে হার মানানো শব্দ গর্জে উঠলো। নিত্য দৌড়ে হ্যাণ্ডেলের রড নিয়ে, লাফিয়ে সামনের আসনে বসলো। দরজাটা টেনে আর চেপে ধরে রইলো। মামা একটা দুর্দান্ত পশুকে যেন পরাস্ত করে, এক পাক ঘুরে নিয়ে ছুটলো।

প্রথমে শঙ্কর ছিটকে পড়লো আমার গায়ে। যেন আমাকে ঠেসে ধরলো এক কোণে অথচ ও সোজা হয়ে বসবার জন্য, আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারপরেই গাড়ি আর একটা বাঁক ফিরতেই, শঙ্কর ছিটকে পড়লো এক পাশে। আমি ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সামনের আসনটা আঁকড়ে ধরলাম। একে বলে মোটরগাড়ি চেপে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। দিক ঠিক করতে গিয়ে বুঝলাম, গাড়িটা প্রথম বাঁয়ে ঘুরে কিছুটা উত্তরে গিয়ে, আবার বাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে একটা ঝাঁকানিতেই শঙ্করকে তুলে দিয়েছে আমার গায়ের ওপর থেকে। গাড়ি এখন পশ্চিমমুখী ছুটেছে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে লেবেল ক্রশিং। মামা বললো, শালা বর্ধমান লোকালটা লেট আছে। বাপের ভাগ্যি, গেট খোলা, তা নইলে এখন আধ ঘণ্টা...।'

আধঘণ্টা কী করে কাটতো, মামার সেই ভাষার প্রতিধ্বনি করা সম্ভব না।

যদিও খেউড়খানি বড়ই প্রচলিত। লেবেলক্রশিং পেরিয়ে জিটি রোডের মোড়ে আসতেই শঙ্কর বললো, 'দাঁড়ান একটু, এখান থেকে মিষ্টি কিনবো।'

'বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আনেন নি?' মামা বাঁ ঘেঁষে দাঁড় করালো, গলার স্বরে বেশ বিরক্তি, 'এসব দোকানের মিষ্টি কি ভালো? যা নেত্য, দরজার দড়িটা খুলে দে। বাবুদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে দে, গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করা যাবে না। এঞ্জিন বন্ধ করলে আবার হ্যাণ্ডেল মারার হ্যাপা আছে।' নেত্য লাফিয়ে নেমে দরজার দড়ি খুলে দিল। আমিও শঙ্করের সঙ্গে নামলাম। শঙ্কর বললো, 'এই মোড়ের দোকানের মিষ্টিই ভালো, আমার শ্বশুরমশাই বলে দিয়েছেন। আসলে গাড়ির দরজা খুলতে হবে, সেই জন্য ড্রাইভারটা ওকথা বলছে।'

আমার কাছে সবই সমান। তবে ড্রাইভার মালিক মামার ভাব-ভঙ্গি কথাবার্তায় রীতিমতো চোখ পাকানো ধমক। কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা। গন্তব্যে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিলেই শেষ। মিষ্টির দোকানে ঢুকে শঙ্কর আগেই রসগোল্লার দিকে ঝুঁকলো। আমি দেখলাম, মাখা সন্দেশের দলাটা সদ্য কাঠের বারকোষে মাখানো, নলেন গুড়ের সুবাস ছাড়ছে। ঢেউয়ের বুকে মোচার খোলা ডিঙের মতন, পথের মোটর-যানের যা হাল, রসগোল্লা কিনলে আর আস্ত হাঁড়িশুদ্ধ পৌঁছানো যাবে না। আমি বললাম, 'রসগোল্লা ছেড়ে দে। শুকনো সন্দেশই ভালো, তবু নিয়ে যাওয়া যাবে। রসগোল্লার হাঁড়ি আস্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

শঙ্কর এক মুহূর্ত ভেবে বললো, 'মন্দ বলিসনি। এর আগে মোটরগাড়িতে যাইনি তো, খেয়াল ছিল না।'

আমি একবার সন্দিগ্ধ চোখে শঙ্করের দিকে দেখে দরদাম করে, দু কেজি মাখা সন্দেশ দিতে বললাম। শঙ্কর অবাক হয়ে বললো, 'দু কেজি! এত কী হবে?'

'লোক কি কিছু কম আছে তোর শ্বশুরবাড়িতে?'

শঙ্কর যেন একটু বিব্রত হয়ে বললো, 'না, তা না, তবে—।'

'তবে ওই দু কেজিই।' সন্দেশ নিয়ে আবার গাড়িতে ওঠা। আবার দরজা বন্ধন। গাড়ির এঞ্জিন তখনো সমানে গর্জাচ্ছিল। নেত্য লাফ দিয়ে সামনে উঠে বসতেই গাড়ি বাঁ দিকে মোড় ফিরে, জি টি রোডের দক্ষিণে ছুটলো। তার মধ্যেই শঙ্কর আমাকে পশ্চিমের পাকা রাস্তাটা দেখিয়ে বললো, 'ওই রাস্তাটা কুলীনগ্রামের দিকে গেছে।'

জি টি রোড ধরে গাড়িটা ছুটলো মোটামুটি ভালই। কালসির মোড়ে এসে, ডাইনে মোড়। হ্যাঁ মোড়ের নাম কালসি, এ কথাটা বলতে ভুলেছিলাম। পাশাপাশি চৈত্রখণ্ড। ডানদিকে মোড় নেবার আগে, গাড়ি এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো। তারপরেই যেন এক লাফে কাঁচা রাস্তায় পড়ে, চার পায়ে ধূলা উড়িয়ে ক্যাপা ষাঁড়টা ছুটলো। দু পাশে ধানকাটা মাঠ। কোথাও কোথাও দু'এক ফালি সবুজ গালিচা, সম্ভবত আলুর চারা বা অন্য কিছু লাগানো হয়েছে। ছোলাও হতে পারে। কোথাও মাটি চষে, মই লাগিয়ে সমান করা হয়েছে। নতুন বীজ ছড়ানোর অপেক্ষা। শীতের মরসুমের চাষ এখন, বোধহয় একেই বলে রবিখন্দ।

ইতিমধ্যে ধুলো কী পরিমাণ গাড়িতে ঢুকছে, গায়ে মাথায় ছড়াচ্ছে, খেয়াল নেই। দু পাশের খোলা মাঠের মাঝখানে পড়ে, মনটাও যেন দূরবিসারী আকাশে ডানা মেলে দিল। হঠাৎ দেখি একটা এলোমেলো কালো জাল, যেন বাতাসের ধাক্কায় আকাশে উঠল। এক লহমায় ছুটে গেল আমাদের গাড়ির মাথার ওপর দিয়ে। দক্ষিণের মাঠে গিয়ে ঝপ করে পড়লো। তারপরেই গাড়ির গর্জন ছাপিয়ে কানে এলো কিচিরমিচির কলরব। জালটাকে মাঠের মাঝখানে নড়তে চড়তে দেখে বুঝলাম, জাল না, বিশাল এক ঝাঁক চড়ুই। ধানকাটা মাঠে, এই ওড়া ঝাঁপের খেলাকে কি বলে? চড়ুইভাতি?

নাগরদোলায় চেপেছি, কি ঢেউয়ের বুকে ডিঙিতে, ওসব খেয়াল নেই। এপাশ থেকে ওপাশে ছিটকে পড়ছি, শঙ্করের সঙ্গে ধাকাধাকি লাগছে। তবু বিকালের হলুদ নরম রোদ, আকাশে ওড়া পায়রার ঝাঁকের পাখনায়, রঙ নিয়ে কী ছিনিমিনিটাই না খেলছে। ঝাঁকের বাইরে এসে এক একজনের আবার ডিগবাজী খাওয়ার বহরখানি দেখ। গাড়ির গর্জন ছাপিয়েও পাখসাপটের ঝাপটা শোনা যাচ্ছে। এত খুশির ডিগবাজী খেলাটা কাকে দেখানো হচ্ছে? ঝাঁকের মধ্যেই কোনো রূপসী কবুতরীকে? নাকি অপরাহ্ণের সূর্যকে এও এক নমস্কারের ভঙ্গি? অন্যথায় বল, ধানকাটা মাঠের বুকে পেট পূজার ভোজনটি বেশ জমেছে। চড়ুইয়ের ঝাঁকের মতন তারাও দল বেঁধে একবার এখানে নামছে, একবার ওখানে। কোথায় ওদের ঘর? গেরস্থ-পোষা? নাকি আপনি পোষা? ওদের ওড়াউড়ি ঝাঁপাই ঝোড়া দেখে আপনি পোষাই মনে হচ্ছে। কোথায় কোন মন্দিরচূড়ায়, নাটমন্দিরের দালানে, গাছের উঁচু ডালে রাত কাটাবার আস্তানা আছে। মানুষের সংসারের আশেপাশে, নিজেরা নিজেদের সমাজে তুমি আপনার আমি আপনার মনে বিহার করছে। কিন্তু চিত্রগ্রীব

নাম কে দিয়েছিল ওদের ?

কে আবার ? কথাকারের দৃষ্টি আর সৃষ্টি যখন একাকার হয়, তখনই তার ধ্যান থেকে নামের উদয়। এমন কথাকারের চরণে গড় করি। তুমি তো টেবিল চাপড়ে কথা গড়ো না। ধ্যানের আনন্দে গড়ো। হায়, এমন পেলাম না হে, যথার্থ একখানি নাম দিই।

গাড়ির গর্জন বাড়ছে। স্টিয়ারিং ধরা মামার হাতের পেশি, মুখের চোয়াল এমন শক্ত হয়ে উঠেছে, যেন গাড়িটা এঞ্জিনে টানছে না, সে নিজেই ঠেলে তুলছে। একে ঠিক গর্জন বলে না, আহত পশুর চিৎকার। বোঝা যাচ্ছে, গাড়ি ওপরে উঠছে। সামনে আকাশের গায়ে ঠেকে আছে রেলিংঘেরা বাঁধানো সাঁকো। সাঁকোর বাঁদিকে, উঁচু বাঁধের রাস্তা চলে গিয়েছে।

শঙ্কর শুয়ে পড়েছিল। কোনোরকমে লাফ দিয়ে উঠে, সামনের আসন চেপে ধরে বললো, 'খালের ওপর সাঁকো। বাঁদিকের বাঁধের রাস্তা চলে গেছে চোৎখণ্ডের দিকে।'

আমি শুয়ে পড়ার ভয়ে আর সামনের আসন থেকে হাত নামাইনি। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলাম দূরের বাঁকে নরম রোদ চিকচিক আয়না। আয়নায় বাঁকা রেখা। খালের জল টানে চলেছে। কিন্তু দূরের দক্ষিণে যে গ্রামটি দেখতে পাচ্ছি, সেই আমার আগের দেখা, জগৎগৌরীর থান, ঝাঁপানতলা আর চৈত্রখণ্ড গ্রাম কী না, বুঝে উঠতে পারলাম না। অন্যভাবে, অন্যদিক থেকে দেখাতো। একই মুখ, আর এক রকম দেখায়।

'হেই শালা গাড়ল…।' মামা এমন চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে উঠল, বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করা আমার সাধ্যি না।

ব্যাপার কী ? শঙ্কর বললো, 'সর্বনাশ!'

সাঁকোর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওপারের ঢালু থেকে একটা গরুর গাড়ির দুটো বলদের দুজোড়া শিং দেখা যাচ্ছে। মামার চিৎকার শুনেই দুজোড়া শিং বাঁদিকে ফিরলো তারপরেই চোখের বাইরে। মামা বোধ হয় আমাদেরই সাক্ষী মেনে বললে, 'শালার কাণ্ড দেখেছেন ?'

…যাচ্ছেতাই একটা খারাপ খিস্তি দিয়ে বললো, 'শালা গাড়ি নিয়ে উঠে আসছিল, মোটরের শব্দ পাসনি ? মরবে শালা।'

শালা হলো মামার বাক্যির প্রথম ধরতাই। আমি তখনো ব্যাপারটার নির্যাস বুঝে উঠতে পারিনি। শঙ্করের চোখে মুখে উদ্বেগ। ও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। মামার গাড়ি সাঁকোর ওপর বাঁধানো চত্বরে উঠে থামলো,

যদিও এঞ্জিনের গর্জন থামলো না। তার পরে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'শালার কাণ্ডটা দেখেছেন?'

শুধু কাণ্ড না, ভয়াবহ কাণ্ড। আমার তো বুক ধড়াস করে উঠলো। দেখলাম, সাঁকোর উলটো দিকে, উত্তর দিকের ঢালুতে গরুর গাড়িটা ঝুলছে। গরুর গাড়ির চালক, খালি গা, নেংটিপরা লোকটি সারা গায়ের শক্তি দিয়ে, বলদ দুটোর জোয়াল চেপে ধরে আছে। বলতে গেলে, খালি গরুর গাড়িটা ঝুলছে। বলদ দুটো মোটরের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত লাল চোখে ফোঁসফোঁস করছে। যে কোনো মুহূর্তেই কম করে পঁচিশ ফুট নিচে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে।

দেখা গেল, চালক আর বয়স্ক তিনজন, উত্তরের ঢালুতে দাঁড়িয়ে গাড়িটা ঠেলে ধরে আছে। বোধ হয় মাঠে কাজ করছিল। আপদ দেখে ছুটে এসেছে। গাড়িটার একপাশে একটা বাবলা গাছ। শঙ্কর বলে উঠলো, 'বাবলা গাছের সঙ্গে গাড়িটাকে বেঁধে ফেললেই তো হয়।'

মামা ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্করের মুখের দিকে এমন জলন্ত চোখে তাকালো, যেন ভস্ম করে দেবে। শঙ্কর যে একজন যাত্রী এবং গ্রামের জামাই, মামার চোখের নজর দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। ভাবলাম শ-কার ব-কার শুরু করবে কী না। না, সে সব কিছুই করলো না। যেমন মুখ ফিরিয়েছিল তেমনি ঘুরিয়ে নিল, একটা কথাও বললো না। শঙ্করের অপ্রস্তুত মুখ দেখে বুঝলাম, একটা বেফাঁস পরামর্শ ও দিয়ে ফেলেছে।

'আপনি চালিয়ে নিয়ে চলে যান, ডেরাইভার দাদা।' গরুর গাড়ির চালক মাঠ কাঁপানো চিৎকার করে হাঁকলো, 'আমরা ইদিকে সামাল দিচ্ছি।'

মামা লাট্টু গিয়ারে টান মেরে বললো, 'শালা সামাল দিতে পারিস ভাল, নইলে…।' যা বললো, তা উচ্চারণ করা সম্ভব না। কারণ, একটা গরুর গাড়ি খালের বদলে, উচ্চারণের অযোগ্য সেরকম কোনো জায়গায় গিয়ে পড়তে পারে না।

মামা কথাটা বলেই, গাড়ি চালিয়ে দিল। মোটর সাঁকো পেরিয়ে ঢালুতে নামতেই, একসঙ্গে অনেকগুলো গলার চিৎকার শোনা গেল, 'সামলে, সামলে।'…পিছনে কাঁচ বলে যে বস্তুটি ছিল, সেখান দিয়ে দেখতে গেলাম। সবই ধুলোয় ঝাপসা, কিছুই চোখে পড়লো না। শঙ্কর বলে উঠলো, 'গরুর গাড়িটা বোধ হয় নিচেই পড়ে গেল।'

মামা তখন বাইরে মুখ বাড়িয়ে পিছনেই দেখছিল। শঙ্করের কথা শুনেই

বেন, মুখ ভিতরে এনে, পিছন ফিরে বললো, 'আপনাকে বলেছে। মুখ বাড়িয়ে দেখুন না, শালারা ঠিক সামলে নিয়েছে।' বলে আমার দিকে ফিরে তাকালো, 'চাষাদের ওই এক দোষ। শুনছিস শালা একটা মোটরের আওয়াজ হচ্ছে, একবার দেখবি তো? তা না বলদের পেটে হেঁকে হুই হুই করে উঠে এল। এই যদি নিচে পড়ে যেত, তখন আপনাদের দেখতে হত না, ফিরতি পথে শালারা আমাকে আটকাত। বলদ উলটে পড়ে মরেও যেতে পারত।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গরু দুটো কি মোটর দেখে ভয় পেয়েছিল?'

'সে তো পেয়েই ছিল।' মামা সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'সাঁকোটা কত সরু দেখলেন না? দুটো গাড়ি পাশাপাশি যাবার জায়গা নেই। আর আমাকে যদি ওই সোলোপে বেরেক মারতে হত তো আপনাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না।' বলে গাড়ির গতি একটু কমিয়ে, স্টিয়ারিং থেকে এক হাত নামিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে নেত্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'একটা সিগ্রেট বের করে দে, আর একটা কাটি জ্বাল।'

মামার কথা থেকে, সোলোপ যে ঢালু সেটা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু ব্রেক মারতে গেলে, আমাদের আর খুঁজে পাওয়া যেতো না কেন? ব্রেক ধরে না? অথবা একবার স্টার্ট বন্ধ হলে, আবার হ্যাণ্ডেল না মারলে গড়িয়ে যেতো? তার মানে, গরুর গাড়িটার পড়ে যাবার যে সম্ভবনা ছিল, আমাদেরও তাই ছিল? ভাবা যায় না। মোটরগাড়ি চেপে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এর নাম! ভুলে যাই, যে রাস্তায় যা মানায়, সেরকম মানানসই চলাই ভালো। বেমানানে যতো গোলমাল।

নেত্য বাঁদিকের খোলা দরজাটা কী কায়দায় চেপে রেখে, মামার ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দিল, আর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল, সে রহস্য ওরই জানা। দরজাটা যে বন্ধ হয় না সে তো মেমারিতে গাড়ি ছাড়বার সময়েই দেখেছি। মামা কলকে টানা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়েই, হঠাৎ আবার খিস্তি, 'শালাদের কাণ্ডটা দেখেছ?' বলে সমতল রাস্তায় আচমকা ব্রেক কষলো।

আমার আর শঙ্করের চিবুক ঠুকে গেল সামনের আসনে। এক রাশ ধুলা উড়ে গেল গাড়ির ওপর দিয়ে। ভিতরেও ঢুকলো। কিন্তু ওই 'ইয়েদের' কাণ্ডটা কী? মামাই মুখটা তুলে বললো, 'মাঠের দুদিকে জল যাবার জন্ত রাস্তা কেটেছিস, তা শালা ভাল করে বোজাবি তো। দেখুন, এক হাত সমান

পত্ত রয়েছে। এটা কি গরুর গাড়ি? চাকা ভেঙে যাবে না!'

সত্যিই তো। রাস্তা যারা কেটেছিল, আবার বুজিয়েছে, তারা মোটরগাড়ির মর্ম জানবে কী করে? এমন গাওনা গাইব না, মন চল চাপি মোটরগাড়ি/ যাব বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। কথাটা মামা মিথ্যা বলেনি। যথেষ্ট সাবধানে নালা পার হতে গিয়েও মনে হলো, উটের পিঠে চেপেছি। রোদটা হঠাৎ যেন ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল। গাড়ি প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে উত্তরে মোড় নিল। শঙ্কর বললো, 'এই হলো আমড়ে। ডাইনে শ্মশান, বাঁয়ে কবরস্থান।'

আমি ডাইনের ব্যাপারটা তেমন বুঝলাম না, বাঁয়ে দেখলাম বড় একটি জলাশয়। পশ্চিমের হলুদে এখন রাঙা আভাস, তারই ছটা জলাশয়ের বুকে। ইস্তক শালুক ফুলের ফোটা পাপড়িতে। সামনে নাক বরাবর দেখতে পাচ্ছি একটি ঝাড়ালো বটগাছ। শঙ্কর ডানদিকে দেখিয়ে বললো, 'হাসপাতাল।'

আসলে হেলথ সেণ্টার। একটা সাইনবোর্ডও রয়েছে, লেখাটা ঠিক পড়া গেল না। হলদে রঙের দেওয়াল, মাথায় অ্যাসবেস্টাসের চাল। পাশে আরও কয়েকখানি ঘর। ঘরের সামনে ছোটখাটো বাগানে, বড় বড় গাঁদা ফুলেও লাল রোদের আলগা ছোঁয়া। তার মধ্যেই লাউমাচা বা সীমের মাচা। লক্ষ্য করলে দু চারটে বেগুন গাছও চোখে পড়ে। এখনো বাঁশের সঙ্গে খাটানো দড়িতে, দু-তিনখানি শাড়ি জামা শুকোচ্ছে।

গাড়ি এগিয়ে চললো। বটগাছ ছাড়াতেই, ডানদিকে একটা মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। বাঁদিকে ছোট একটা ডোবা। এক গাদা স্যাংটো ছেলে-মেয়ে, গাড়ির শব্দেই বোধ হয় ছুটে এলো। ওদের কি শীত নেই? না কি শীতই ওদের ছেড়ে গিয়েছে? খড়ি-ওঠা কালো গাগুলো দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই।

সামনেই যে গন্তব্য গ্রামটি একেবারে হাত ধরা সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠেক লেগে গেল সামনে একটি জলাশয় দেখে। জলাশয়টি মাঝারি একটি পুকুর। এই শেষ বেলার জলেও এখন দু-চার রমণী, জলের বুকে কলসী ডুবিয়ে, নিজেদেরও বুক ডুবিয়ে আছে। তদের তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানার ফাঁকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখের তারাগুলো গাড়ির দিকে ঘুরে, নিজেদের সঙ্গে চোখা-চোখি করছে। স্বাভাবিক। কে এল গো? কাদের বাড়ি, কোন্ পাড়ায়? ডাইনে দেখতে পাচ্ছি নিবিড় গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঘর। এসব কারণে ঠেক লাগেনি। দেখলাম, পুকুরের ধার দিয়ে, আমাদের যাবার রাস্তাটা সরু হয়ে এসেছে। রাস্তার গা বাঁচাবার জন্য পুকুরের ধারে ধারে বাঁশের খুঁটি পোতা।

বাঁদিক থেকে একটি মোটা আমগাছের গুঁড়ি মোষের মাথার মতন রাস্তার দিকে এগিয়ে এসে পথটাকে সংকীর্ণতর করেছে। গরুর গাড়ি চলে, খানে খানে রাস্তা পুকুরের দিকে ভেঙে পড়েছে। দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠলো। কোনো মামার ক্ষমতা নেই, পুকুরের জলে পতন থেকে এ রাস্তায় গাড়ি বাঁচিয়ে চলে। আমি উৎকণ্ঠিত ত্রাসে ডেকে উঠলাম, 'মামা, ও মামা দাঁড়ান।'

মামা 'মামা' সম্বোধনে অবাক মুখে ফিরে তাকালো। গাড়িও দাঁড়ালো, "কী বলছেন?'

'কোথায় যাচ্ছেন?' আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মামা অবাক চোখে একবার শঙ্করের দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'কেন, চাটুয্যেবাড়ি যাবেন বলছিলেন যে?'

শঙ্করও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই যাবো। কিন্তু যাবেন কী করে? গাড়ি যাবার মতো রাস্তা কোথায়? গাড়ি তো পুকুরে পড়ে যাবে।'

'কী যে অলক্ষুণে কথা সব বলেন মশাই।' মামার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো, 'গাড়ি চালাচ্ছি আমি, আর আপনি বলছেন পুকুরে পড়ে যাবে?' বলেই গাড়ি আবার চালিয়ে দিল।

মনে মনে বললাম, 'অসম্ভব!' মুখে বললাম, 'করছেন কী যাবার জায়গা নেই, তবু আপনি যাবেন? গাড়ি পড়ে গেলে?'

'আব্বার বলে গাড়ি পড়ে গেলে।' মামা না থেমেই বললো, 'পড়লে তো মশাই আমার গাড়ি পড়বে, আপনার কী?'

আমার কী? কী বলতে চায় লোকটা? যেমারিতে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, কাঁকরোল কোলা গাল আর লাল লাল চোখ দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহটা এখন প্রায় পাকা হলো। এ লোকের মাথার ঠিক থাকতে পারে না। আমি এবার ধমকেই বললাম, 'আমার আবার কি মশাই? আমার প্রাণটা যাবে। আপনি গাড়ি দাঁড় করান আমি নেমে যাই।' বলেই আমি তাড়াতাড়ি দরজার দড়ি খোলবার চেষ্টা করলাম।

শঙ্কর একবার আমাকে ডাকলো। আর মামা বিরক্ত হয়ে একবার আমার দিকে দেখে, মুখটা শক্ত করে আওয়াজ করলো, 'ধ্যেৎ যত্তসব আজগুবি কথা। এ গাঁয়ে এ রাস্তায় কি নতুন আসছি।' বলেই লাট্টু গিয়ারে এক টান।

আমার চোখ আপনিই বুজে এলো। মনে হলো গাড়িটা বর্শাবেঁধা শুয়োরের

মতন একটা চিৎকার দিয়ে লাফ মারলো। আর পর মুহূর্তেই শুনলাম, 'আসতে না পারলে তো আগেই বলে দিতাম। মাঝ পথে সোয়ারি নামিয়ে দেব, এমন গাড়ি আমি চালাই না।'

গাড়িটা যে জলে পড়েনি, সন্দেহ নেই। কারণ, তখনো চলছিল। একবার তাকিয়ে দেখলাম, আশেপাশে পুকুরের চিহ্ন নেই। বাঁদিকে একটা পাকা বাড়ি, বাঁশঝাড়। গাড়ি ডানদিকে মোড় নিচ্ছে। সন্ধ্যার ছায়া যেন হঠাৎই নিবিড় করে নেমে এলো। শঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এসে গেছি।'

'ওসব কথা বলবেন না, বুঝলেন?' মামা নিশ্চয়ই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, গাড়ি ঘুরিয়ে দিল বাঁয়ে। ডাইনে আবার একটি পুকুর পানায় ভরতি। কিন্তু রাস্তা অনেকখানি চওড়া। এই প্রথম গাড়ির ভেঁপু বেজে উঠলো, 'পঁক্—পঁ—ক্—পঁক্! পকোঁড়!…'

একরাশ ধুলা উড়িয়ে গাড়ি দাঁড়ালো, মামা বললো, 'চাটুয্যে বাড়ি।'

সামনে তাকিয়ে একটা জলাশয়ের রেখা চোখে পড়লো। একটু আগের বাঁকেই সন্ধ্যার ছায়ায় যতটা গাঢ় মনে হয়েছিল, গাড়ি দাঁড়াতে দেখলাম, ততোটা নেই। দিনের আলো এখনো আছে। কিন্তু মুহূর্তেই গাড়িটাকে একপাল ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরলো। নেত্য নেমে গিয়ে আমাদের দরজার দড়ি খুলে দিল। গাড়িটা থামাবার আগেই দেখেছিলাম, ডানদিকে ছোট একটা ডোবার ধারে, একটি টিউবয়েল। সেখানে বালতি হাতে, কলসী কাঁখে বধূ কন্যাদের ভিড়। দরজা খুলে নামবার পরে প্রথম চোখে পড়লো ছোট একখানি পাকা ঘর। তার দরজা বন্ধ। সামনেই—আমার হিসাবে পুবদিকে খোলা চত্বর। দেখলেই বোঝা যায়, গোবর মাটি দিয়ে লেপা পরিচ্ছন্ন উঠোন। অথচ কোনো ঘরের দরজা নেই। দক্ষিণ মুখে, উঁচু একটি ঘর কিন্তু তার সামনে কোনো দেওয়াল নেই। রাস্তার ছোট পাকা ঘরখানির লাগোয়া মাথায় খড়ের চাল তিনদিকে দেওয়াল তোলা উঁচু ঘরটিকে দালানের মতন দেখাচ্ছে।

মোটরগাড়িটি শিশুদের কাছে একটি দ্রষ্টব্য সন্দেহ নেই। ওরা হইচই চিৎকারের মধ্যে লাফাচ্ছে, হাসছে, গাড়ির গায়ে হাতড়াচ্ছে। চেনা মুখ একটিও দেখবার আগে, হঠাৎ কে যেন এসে আমার একটা হাত চেপে ধরলো, 'ও বাবাগো, কী বলবো ভেবে পাচ্ছিনে, আঁ? সত্যি সত্যি আমাদের মনে

পড়েছে ? সত্যি সত্যি এলেন ?'

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, পঞ্চমী। পঞ্চমীই তো ? এখনও দেখছি ফ্রক পরা, দুদিকে দুটি কালো চকচকে বিনুনি ঝুলছে। ওকে কি প্রথম থেকে দেখেই বয়স ভুল করেছিলাম ? এখনো যেন সেই প্রথম দেখা দশ বারো বছরের মেয়েটির মতনই আছে। পার্থক্য যা চোখে পড়ছে, সেটা হলো একটু ছাড়া দিয়েছে। আর প্রথম থেকে দু চারবার যা দেখেছি, বালিকা ছাড়া কিছু মনে হয়নি। চার বছর পরে বালিকাটিকে এই প্রথম যেন কিশোরী রূপে দেখলাম। এখন বড় জোর চতুর্দশী কিংবা তারো কম, ত্রয়োদশী।

মেয়েদের বেড়ে ওঠার রহস্যটা তো এ জীবনে জানা হলো না। গতকাল যাকে দেখেছি, এইটুকু বালিকা পরের দেখাতেই সে যেন আসন্ন বর্ষার কূলে দাঁড়িয়ে, কিশোরী মূর্তিতে এক ভারী রমণীর পূর্ণ মূর্তি! আসলে, বাকপটীয়সী পঞ্চমী ওর বাকচাতুর্যে আর চোখ মুখের ভঙ্গিতেই ওর বয়সকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওর ছুটে এসে অনায়াসে হাত ধরা থেকেই বোঝা যায়, দেহে যদি বা কিশোরী হয়েছে, মনে এখনো তার অবকাশ আসেনি। তারপরেই দেখ, আমি কিছু বলবার আগেই, ও আমার আপাদমস্তক দেখে, প্রায় শিউরে উঠে বললো, 'ই মা গ, সারা গা মাথা যে ধুলোয় ভরে গেছে! ধুলোখেলা করে আসা হলো কী ?' বলেই আমার গা মুখ মাথা, হাত দিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করলো।

'এই পঞ্চমী, ও কী করছিস ?' এক রমণী কণ্ঠে কিছুটা লজ্জা মেশানো অবাক স্বর, 'ও ভাবে কি ধুলো ঝাড়ে ? লাগবে যে ?'

পঞ্চমী ঘুরে দাঁড়িয়ে, যেন চোখ পাকিয়ে বললো, 'কেন, লাগবে কেন ? আমি কি তোমাদের জামাইয়ের বন্ধুকে মারধোর করছি ?'

পঞ্চমী যাঁকে বললো আমি তাঁর দিকে তাকালাম। রমণী সধবা, বয়স তিরিশের বেশি কখনো না। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে ? আগে দেখেছি নাকি কখনো ? আটপৌরে লাল পাড় শাড়িতে ঘোমটা টানা। কপালে টকটকে লাল টিপ। ঘোমটার ফাঁকে দেখা যায় ঈষৎ সিঁথিখানির রেখা রাঙা। ছিপছিপে ছোট গড়ন। গায়ের জামাটিও সাদা। নাকে একটি নাকছাবি। দু হাতে দু গাছা শাঁখার সঙ্গে সোনা বাঁধানো লোহা। বাকি দু-চার গাছা চুড়ি কিসের, মালুম পাচ্ছি না। কালো সরু ভুরুর নিচে, টানা কালো চোখ দুটিতে দীঘির গভীরতা। আর কালোর যদি আলো দেখতে চাও, তা হলে এই দেখ, রূপে ইনি শ্যামা।

শঙ্কর আমার কাছে এসে বললো, 'আমার বিয়ের সময় দেখেছিস। মমতার বড়দি।' বলে ও এগিয়ে গিয়ে বড়দিকে প্রণাম করলো।

আমি তো কখনো রামকৃষ্ণ পত্নী সারদাময়ীকে দেখিনি। ছবি দেখেও বুঝতে পারি না, তিনি শ্যামা ছিলেন, না গৌরী ছিলেন। এখন বড়দিকে দেখে, সেই মূর্তিটির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বয়স দিয়ে তো এখানে বিচার না। সম্পর্ক দিয়ে আমিও এগিয়ে গিয়ে, বড়দিকে প্রণাম করলাম। করতে গিয়ে দেখলাম, তাঁর লাল পাড়ের নিচে, দু পায়ে উজ্জ্বল আলতা। বড়দি জড়সড় হয়ে ঘোমটা আরও খানিক টেনে দিয়ে বললেন, 'থাক ভাই, হয়েছে। সুখে থাকো।'

কেন যেন মনে হলো, কথাটা প্রাণের গভীরে গিয়ে পৌঁছালো। একটা অনির্বচনীয় সুখের অনুভূতিই যেন হলো। পঞ্চমী অবিশ্যি আমার হাত ছাড়েনি। বলতে ভুলেছি, বন্ধুপত্নীর ভালো নাম মমতা। বড়দির নাম নমিতা। নমিতা মমতার পরে, মালতী সুমতি। তারপরে পঞ্চমী আর ষষ্ঠী। চেনা আমার সকলেই। বিয়ের রাত্রে তো বটেই, তারপরেও দু-একবার ওদের দেখেছি। তবে আমার সঙ্গে ভাবের ঘরে অগ্রাধিকার যদি কারো থাকে, সে আমারই হাত ধরা পঞ্চমী।

ইতিমধ্যে দেখছি, ছোট শিশুর দল গাড়ি ছেড়ে এখন আমাদের চারপাশে ঘিরে ধরেছে। আমার হিসাবে, দক্ষিণে যদি খোলা উঁচু দালানটি হয়, তা হলে, উত্তরে আর পুবে ঘরের দেওয়াল। তার মধ্যে পুবের ঘরের দেওয়াল পাকা ইঁটের গাঁথনি। উত্তরে উঁচু মাটির দেওয়াল। জানালায় দুটি মুখ। একটি তরুণীর, একটি বালিকার। বালিকাটির ফরসা মুখ, তরুণীর ফরসা মুখ যেন কিঞ্চিৎ রোদে পোড়া জলে ভেজা, অথচ বর্ণে একই। মুখের মিল তো আছেই, দুজনের চোখের দীর্ঘ পাতা যেন কাজল টানা। দু জোড়া চোখেই উদ্দীপনাময় কৌতুক। কখনো দেখিনি।

উত্তর আর পুবের কোণ থেকে সরু গলি পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো আরো দুটি মুখ। একজন যদি ষোড়শী, অন্যে অষ্টাদশী। অষ্টাদশী মালতী আর ষোড়শী সুমতি। গ্রামীণ গৃহস্থঘরের এমন একটি সময়ে এসেছি, সকলেরই গা ধোয়া, চুল বাঁধা, আলতা পরা শেষ। জামাইয়ের আচমকা আগমন সংবাদে শাড়ি জামা বদলাতে নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই আপ্যায়ন করতে আসতে যা একটু দেরি। চোখাচোখি হতেই হাসি বিনিময়। এই দুটি মুখেও, নমিতা মমতার মতনই, শ্যামা আর দুর্গার রঙ পালটা-পালটি। মালতী মমতার

মতনই, এ বয়লী সুবর্ণা। সুমতী শ্যামাঙ্গিনী। সেই তুলনায় পঞ্চমী না-গৌরী, না-শ্যামা। ওকে মাজা মাজা বললেও যেন ঠিক বোঝায় না। কচি পাতায় চিকন কিরণের উজ্জ্বলতা, এই যেন ওর রঙের বর্ণনা। ষষ্ঠীর রংটা শ্যামের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-গাঢ়তা। ওকে কাছে-পিঠে দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু কাছে-পিঠে, নানা কোণে অনেককেই দেখতে পাচ্ছি। সকলেই প্রায় নানা বয়সের রমণী ও কন্যাকুল। দু চারজন বয়স্ক পুরুষ দূরে দাঁড়িয়ে আচমকা জামাই আগমনের উৎসব দেখছেন। কেউ বা হুঁকোটি হাতেই তুলে রেখেছেন। টানবার কথা ভুলে গিয়েছেন। পঞ্চমীর খরখর খরতা কারো বোধহয় ধার ধারে না। বলে উঠলো, 'তুমি কী গ বড়দি? জামাই কি বাড়িতে নতুন এলো?'

বড়দি তাঁর শান্ত কালো চোখে অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে পঞ্চীর দিকে তাকালেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'মন্দিরে ঠাকুরদালানে জামাই মাথা ঠেকালে না, তোমাকে পেন্নাম সেরে নিল?' পঞ্চমীর কথা শুনে কে বলবে, ও এক বড় জোর চতুর্দশী কিশোরী। এ হলো পঞ্চমীর বচন, বয়সের আগে আগে চলে।

বড়দি জিভ কেটে, লজ্জিত হেসে বললেন, 'ও মা, তাই তো? ও ভাই শঙ্কর, তুমি মন্দিরে দালানে মাথা ছোঁয়াওনি?'

শঙ্কর বিষয়টির তেমন গুরুত্ব না দিয়ে, দক্ষিণের উঁচু দাওয়া দালানের দিকে এগিয়ে গেল। পঞ্চমী আমার হাতে টান দিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'চোট লাগলে বলবেন। আসুন।' বলে প্রথমে টেনে নিয়ে গেল সেই উঁচু দাওয়ার কাছে। বললো, 'দেখবেন, কপাল ঠেকাতে গিয়ে যেন আবার চোট না লাগে। এটা আমাদের ঠাকুরদালান।'

আমি দাওয়ায় হাত ঠেকিয়ে কপালে ছোঁয়াতে গেলাম। পঞ্চমী বলে উঠলো, 'বাস্‌রে, সারা রাজ্যের ধুলো মেখে এসে, এখন দালানে কপাল ছোঁয়াতে যতো মাটি লাগার ভয়?'

'না, ঠিক সেজন্য নয়, এমনি।'—আমি নমস্কারের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলাম।

পঞ্চমী ঘাড় নেড়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে বললো, 'না গো মশাই, এখানে কপাল ঠেকাতে হয়।'

অগত্যা, নিশ্চয়ই! অবিশ্যি দালানের উচ্চতা মাথার সমানই প্রায়। সেখানে মাথা ছোঁয়াবার পরে পঞ্চমী টেনে নিয়ে গেল পাকা দরজা বন্ধ ঘরটির সামনে, 'এটি সর্বজয়ার মন্দির, মাটি ছুঁয়ে নমস্কার করুন।'

এবার আর সহজে পঞ্চমীর ধমক খেতে রাজী হলাম না, জিজ্ঞেস করলাম,

'কী ভাবে? সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে প্রণাম করবো?'

পিছনে খিলখিল হাসি শুনে, মুখ ফিরিয়ে দেখি, মালতী আর সুমতি। আর পঞ্চমী? সোজা হাত তুললো আমার মুখ বরাবর। মালতী যেন উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'ও কিরে পঞ্চী, মারতে যাচ্ছিস নাকি?'

'ছি ছি পঞ্চী, তোর কি কোনো মানামানি নেই?' সুমতি তার সঙ্গে জুড়ে দিল।

পঞ্চমী ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে তাকালো দুজনের দিকে, 'ছাখ সেজদি, নদি, তোরা আমার পেছুতে লাগতে আসিস না। তোরা সবাই দেখছিস, আমি খালি ওঁকে মারতে যাচ্ছি, না? তবে নে, তোরাই ওঁকে নিয়ে যা করবার, কর। আমি সরে যাচ্ছি।' বলে সজোরে ঘাড় ফেরালো, দুই বিনুনি ঝাপটা খেলো দুই গালে। পা বাড়ালো সরে যাবার জন্য।

ঠাকুরদালানের সদর চত্বরে নানা নাটকের এই অঙ্কটি বিশেষ কারো চোখে পড়লো না। এবার আমাকেই উদ্যোগ নিয়ে পঞ্চমীর হাত টেনে ধরতে হলো, 'আরে, যাচ্ছো কোথায়? আমি তোমার হাতছাড়া হবোই না।' বলে মালতী আর সুমতির দিকে একবার দেখলাম, কিন্তু হাসলাম না।

পঞ্চমীর ডাগর চোখের তারা দুটো, বাকি ভগ্নীদের মতন ভ্রমর কালো না, ঈষৎ পিঙ্গল। অথবা বলা যায়, হালকা খয়েরি। ওর সেই চোখের তারায় সন্দেহ। দিদিদের দিকে একবার দেখে, ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম করতে বলেছি?' পাছে মালতী সুমতির সঙ্গে চোখাচোখি হলে হাসি পায়, অতএব ওদের দিকে না তাকিয়ে বললাম, 'তা নয়। জানি না তো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তুই হাতটা তুলেছিলি কেন?' মালতী হেসে জিজ্ঞেস করলো।

পঞ্চমী বললো, 'ওঁর ঘাড় ধরে নিচু করতে চেয়েছিলাম। আর তোরা দেখলি আমি মারতে যাচ্ছি।'

এ সময়েই বড়দি ডাকলেন, 'অ মালু, সুমি, গাড়িতে কী সব রয়েছে। কালোর বউকে নিয়ে, তোরা ওগুলো ঘরে তোল।'

মালতী সুমতি সরে গেল। পঞ্চমী তখনো গজ্‌গজ্‌ করছে, 'বাবু একেবারে ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাচ্ছেন, তাই দেখে সকলের বুক ফেটে যাচ্ছে!' আমার দিকে তাকিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসি চেপে প্রায় চোখ পাকিয়ে বললো, 'সাষ্টাঙ্গে বলিনি, মন্দিরের চৌকাট ছুঁয়ে কপালে ঠেকান, তা হলেই হবে।'

একেই কি বলে, ঢাকের বহর যতো বড় বাজনা তার থেকে বেশি। আমি

নিচু হয়ে সর্বজয়ার দরজার চৌকাট স্পর্শ করে কপালে ছোঁয়ালাম। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই মহিলার ব্যাকুল স্বর শুনতে পেলাম, 'ওলো নমি, শঙ্কর এসেছে শুনলাম? কই আমার শঙ্কর কই?'

পিছন ফিরে দেখলাম, পশ্চিম দিক থেকে, গাড়ির পাশ দিয়ে, থানের ঘোমটা টানতে টানতে পিসিমা এগিয়ে আসছেন। হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়, পায়ে আর তেমন শক্তি নেই। তবু যেভাবে আসছেন, পড়েই না যান। এই পিসিমারই একমাত্র ছেলে, নরেনদার বেলেঘাটার ফ্ল্যাটে, শঙ্করের বিয়ে হয়েছিল। শঙ্করের শাশুড়ী তার ছ কন্যা রেখে মারা গিয়েছেন। ছোট কন্যা ষষ্ঠীর তখন এক বা দু বছর বয়স। বলতে গেলে, শিবনাথ চাটুয্যে মশায়ের কন্যারা এই পিসিমার হাতেই লালিত-পালিত।

বড়দি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পিসিমার হাত ধরলেন। পিসিমার তখন ছোট বালিকার মতন ঠোঁট ফুলে উঠেছে। অভিমানের স্বরে বললেন, 'আমি বাড়ির ভেতরে দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়েছিলাম। এই দেখলাম, তোরা আমার ঘরে চুল বেঁধে আলতা পরছিলি। আমার বুঝি একটু চটকা এয়েছিল। তার মধ্যেই শুনি, জামাই এসেছে, জামাই এসেছে। কাদের জামাই কোন বাড়ির? ধড়ফড় করে উঠে দেখি টেঁপি দুলেনি খড় কাটছে। ও বললে, মাতুর বর এয়েছে! অ্যাঁ? মাতুর বর এয়েছে, তোরা আমাকে ডাকিসনি?' মাতু এক্ষেত্রে মমতা, শঙ্করের স্ত্রীর আটপৌরে নাম। বড়দি অপ্রস্তুত হেসে বললেন, 'তোমাকে ডাকবো না, তাই কখনো হয় পিসিমা? এই তো সবে গাড়ি থেকে নেমে ঠাকুর মণ্ডপে আর সর্বজয়াকে পেন্নাম করেছে।'

বড়দির কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর পিসিমার কাছে এগিয়ে গিয়ে, নত হয়ে প্রণাম করলো। পিসিমা শঙ্করের ঘাড়ে এক হাত রেখে, অন্য হাত ওর চিবুকে ঠেকিয়ে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করলেন, 'শতায়ু হও বাবা, সুখে থাকো। তা হঠাৎ কোনো খবর-টবর নেই, সম্বাদ সব ভালো তো? তোমার মা দাদারা সব ভালো আছে তো?'

শঙ্কর বললো, 'সবাই ভালো আছে। আচমকাই এলাম।' আমার নামটা উচ্চারণ করে বললো, 'ওকেও এবার ধরে নিয়ে এসেছি।'

পিসিমার এবারকার অবাক ব্যাকুলতা অন্য রকম। ছেঁচা পান চিবানো আর মিশি লাগানো গোটাকয়েক অবশিষ্ট দাঁতে হেসে, চারদিকে যেন অস্থির চোখে দেখতে লাগলেন, 'কই, আমাদের লেখক বাবা কোথায়? ও মা কোজ্জাব গো, কোথায় সে?'

পিসিমার কথার মাঝখানেই পঞ্চমী আমাকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। আমি কাছে গিয়ে পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আনন্দে পিসিমার চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। আমার চিবুক ছুঁয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করে চুমোর শব্দ করে বললেন, 'ও বাবা তুমি যে সত্যি আসবে, কখনো ভাবিনি।'

গ্রাম নগরে জীবন কোথাও সহজ সরল না। কুটিল ভ্রূকুটি জটিল জ্বালা, সবখানেই আছে। তবু বিভেদ আছে রূপে। আবেগ কোথাও বহু ভাষে, তরল হয়ে গলে। কোথাও নির্বাক, চোখের গভীরে বারেক আবর্তিত হয় মাত্র। সমালোচকের চোখ নিয়ে আমি এই গণ্ডগ্রামে আসিনি। লোক চরিত্রের বিচারে অক্ষম। কিন্তু গ্রামীণ রূপের এই স্নেহ স্নিগ্ধ স্বরূপে, আমার দু চোখের নগর-নজর ছাপিয়ে আর একটা অরূপ হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল। বললাম, 'একথা কেন বলছেন পিসিমা? কেন আসবো না?'

'আসবে বই কি বাবা, নিশ্চয় আসবে।' পিসিমা পিঠে হাত স্পর্শ করে বললেন, 'শঙ্করের মুখে মেয়েদের মুখে ক-বারই শুনেছি, তুমি আসবে। বড় ভালো লাগছে বাবা। শঙ্কর আমাদের জামাই, তুমিও আমাদের জামাইয়ের মতন।'

আবার জামাই প্রসঙ্গ কেন? আমি তো আমিই। আমি এসেছি বন্ধুর-শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে। কিন্তু কী যায় আসে আমার বিব্রত হওয়াতে? তার আগেই শোন পঞ্চমীর কথা, 'জামাইয়ের মতন কী গো পিসিমা? ও তো জামাই-ই!'

এবারে পিসিমাও ঠেক খেয়ে গেলেন। পঞ্চমীর কথা কোন দিক থেকে আসে, গতিবিধি সকলের বোঝবার উপায় নেই। আর কথা যদি একবার সভার মাঝে পড়ে, কারো না কারো গায়ে বাজে। সেটা যেমন ভাবেই হোক। এপাশ ওপাশের ভিড় থেকেই রমণী স্বর শোনা গেল, 'কোন্ বাড়ির জামাই, কার বর লো পঞ্চী?'

পঞ্চমী ওর ঝকঝকে চোখে রোখপাক করে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকালো। ঠিক কারো উদ্দেশ্যে না, যেন সভার উদ্দেশ্যেই বললো, 'এর একজনের বটেই, এ গাঁয়ের কোনো মেয়ের না হতে পারে। তবে সেই মেয়ে এ চাটুয্যে বাড়ির মেয়ের মতনই। আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো, বলে দেবে।'

বড়দি হেসে উঠলেন। সেই সঙ্গে, গাড়ি থেকে আনাজপাতি মাছ মিষ্টি কালোর বউকে দিয়ে নামাতে নামাতে, মালতী সুমতিও হাসলো। পিসিমারও

যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল। ছেঁচা পান আর মিশি লাগানো কয়েকখানি দাঁতে হাসতে হাসতে ঘোমটা টানলেন, 'হ্যাঁ, পঞ্চী ঠিক বলেছে। মনে পড়েছে বটে।'

পঞ্চমী আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলো। চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'কি ব্যাপার আপনারও কি ধন্দ লেগে গেল নাকি?'

'না না, আমার আবার ধন্দ লাগবে কেন?' তাড়াতাড়ি বললাম। আমার ধন্দ লাগলেই বা তার ধার ধারছে কে? আসলে আমার বৈবাহিক সূত্রটাকে পঞ্চমী ওর পৈতৃক পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে নিয়েছে। অতএব আমায় 'জামাতা' নামক পরিচয়টাকে ও আলাদা করে দেখতে রাজী না। যদিও কবুল করেছি আগেই, মেয়ে দেখা, সম্বন্ধ করা, মন্ত্রতন্ত্র, সাতপাক ঘোরা আর লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের জমপেশ একখানি বিয়ে আমার কোষ্ঠিতে লেখেনি। বিয়েটা এক অর্থে যেমন সামাজিক আর এক অর্থে অনেকটাই ব্যক্তিগত। আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মতনই কোনো বন্ধনকেই কদাপি মেনে নিতে পারিনি।

'কই রে নেত্য, সব বাঁধা-ছাঁদা হলো?' মামার স্বর শোনা গেল।

জবাবে নেত্য বললো, 'কম্‌পিলিট!'

মামার মতনই ভাগিনেটি ব্যস্তবাগীশ। কথাগুলো শোনবার পরেও খেয়াল থাকা উচিত ছিল। কিন্তু পঞ্চমী তখন আমাকে উত্তর-পুব কোণে বাড়ির ভিতর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর আমি দেখছিলাম, আশেপাশের সব চোখগুলো তখন মালতী সুমতি আর কালোর বউয়ের হাতে বয়ে নিয়ে চলা আনাজপাতি মাছ, মিষ্টির দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখছিল। আগন্তুক অতিথিদের থেকেও তাদের অবাক উৎসুক চোখের আকর্ষণ যেন সেদিকেই বেশি।

'ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে চলে যেতাম।' মামার স্বর শোনা গেল।

আমি সাপের ছোবল খাবার মতন চমকিয়ে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলাম। শঙ্কর আমার আগে আগে, বড়দির সঙ্গে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছিল। ও থমকিয়ে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'তুই যা, আমি দিয়ে আসছি।'

পঞ্চমী অবিশ্যি আমার হাত ছাড়লো না। পাশে পাশে আর একটি মেয়েও প্রথম থেকেই গায়ের সঙ্গে লেগেছিল। পঞ্চমীর থেকেও বয়সে কিছু ছোট। আমার গলার টাইটার দিকেই ওর অবাক দৃষ্টি। আমি গাড়ির কাছে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করতে করতে বললাম, 'মাপ করবেন দাদা, একদম ভুলেই গেছলাম।'

'ও রকম হয়েই থাকে।' মামা বললো, 'কিন্তু আবার দাদা কেন? মামা বলেই তো ডেকেছিলেন।'

তাও তো বটে। মনে মনে জিভ কেটে বললাম, 'সরি।'

'কী বললেন?' মামা জিজ্ঞেস করলো।

আমি থতিয়ে গিয়ে বললাম, 'মানে, দুঃখিত।'

'এতে আবার দুঃখের কী আছে।' মামা আমার হাত থেকে টাকা নিয়ে বললো, 'মামা বলে যখন একবার ডেকেছেন, তখন মামাই। আমার মশাই সব ভাগনে ভাগনী নিয়ে ঘর, নিজের বেলায় মা ষষ্ঠীর কৃপা হয়নি। চলি। নেত্য হ্যাণ্ডেল মার।' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে গাড়ির দরজা খুললো।

আমার মুহূর্তেই মনে হলো কোথায় যেন খচ্ করে একটা বেসুর বেজে উঠলো। সেটা ভালো করে বোঝবার আগেই মামা আবার ডেকে বললো, 'শুনুন। তখন পুকুরের ধারে খুব ভয় পেয়ে গেছলেন। গাড়ি জলে পড়লে, আমরাও ডুবে যেতাম। রাস্তার মাপের আন্দাজ না থাকলে, গাড়ি চালাতাম না।' বলেই ষ্টিয়ারিং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

গাড়ির এঞ্জিন তখন গ্রাম কাঁপিয়ে গর্জাচ্ছে। নেত্য লাফ দিয়ে উঠতেই এক রাশ ধুলা উড়িয়ে বেরিয়ে গেল। মামার ঘরের কথায় বেসুর কেবল না। আর একটা কথাও কেমন যেন খচখচিয়ে দিয়ে গেল। 'গাড়ি জলে পড়লে আমরাও ডুবে যেতাম।'...জীবন মন সম্পর্কে এত কাহন গেয়ে শেষ পর্যন্ত ঠেক খেয়ে আছি নিজের কাছেই। তারপরে আর কেমন করে বলি, কোনো বন্ধনকেই মানি না। গাড়ির ভিতর চারটি প্রাণী থাকতেও, কেবল নিজের প্রাণ বন্ধনের কথাটাই ভেবেছিলাম। নিজেকে কেবল দীন মনে হচ্ছে না, নিজের দীনতার হদিস কেমন করে পাওয়া যায়, এ জিজ্ঞাসাটা কাঁটার মতন বিঁধতে লাগলো।

'কী হলো গো আপনার?' পঞ্চমী আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ড্রাইভারের কথায় যে একেবারে মন মরা হয়ে গেলেন?'

চমকিয়ে উঠে হেসে বললাম, 'ও কিছু নয়।'

পঞ্চমী বললো, 'কিছু যে নয়, সে তো দেখতে পেলাম। এখন চলুন।' ও হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

পাশে পাশে গা ঘেঁষে চলা মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কে?'

'ও বড়দির মেয়ে রাধা।' পঞ্চমী বললো।

রাধা যেন এই প্রথম লজ্জা পেয়ে, একটু দূরে সরে গেল। আমি ওর হাত ধরে আমার কাছে টেনে নিলাম।

পঞ্চমীর হাত ধরা হয়েই বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো, উঠোনের ডানদিকে ছুটি ধানের মরাই। প্রায় মাঝ বরাবর মস্ত এক আমগাছ। দক্ষিণ দুয়ারি দুই ঘর। শান বাঁধানো দাওয়া। দুই ঘরের মাঝখানে খানিকটা রকের ওপারে পাঁচিল। জল ভরা বালতি কলসী ঘটি দেখে বোঝা গেল, ওখানেই হাত মুখ ধোয়ার জায়গা। পুবদিকেও একখানি ঘর, তার লাগোয়া আর একখানি নিচু চালের ছোট ঘর। দেখে মনে হলো ছোট ঘরটি ইটগাঁথা পাকা। অথচ শান বাঁধানো দাওয়ার ওপর দক্ষিণ দুয়ারি ঘর দুখানির মাটির দেওয়াল, মাথায় খড়ের চাল। পুবের ঘরও মাটির দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল। উত্তর দিকের সীমানা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওদিকেই রয়েছে লাউয়ের মাচা।

উঠোনে দাওয়ায় তখনো নানা বয়সের মহিলা রমণী বালিকাদের ভিড়। তার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলো হাঁস প্যাকপ্যাক আওয়াজ তুলে দক্ষিণ আর পুবের ঘরের মাঝখানে, সরু ফালি জায়গা দিয়ে ঢুকছে। ওদিকে একটা খোলা দরজা দিয়ে, চোখে পড়েছে একটি জলাশয়ের অংশ বিশেষ, খানিকটা পড়ো জমি আর ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল।

দক্ষিণ দুয়ারি দুখানি ঘর পুবে পশ্চিমে পাশাপাশি। পঞ্চমী আমাকে পুবের দাওয়ায় সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললো, 'জুতো জোড়া খুলে দাওয়ায় উঠে বসুন।'

শঙ্কর তখন দাওয়ার ওপরে। মালতী দাওয়ায় শতরঞ্চি পাতছে। পিসিমা আমার কাছে এসে ব্যস্ত ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'শিবু যদি জানতে পারতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে চলে আসতো। বেচারী যখন শুনবে, তার বড় মন টাটাবে। এমন দিনে সে বাড়ি না থাকলে কি জমে?'

শিবু—শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করের শ্বশুর মহাশয়। আমি পিসিমাকে কিছু বলবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে এক রমণা বেরিয়ে এলেন। মমতা না? প্রথমেই আমার মনে হলো। ধরেই নিয়েছিলাম, মমতার বর এসেছে, অতএব সে সহসা সকলের সামনে আসবে না। কিন্তু যাকে দেখলাম, সেকি মমতা না? মমতার স্বর্ণ উজ্জ্বলতা থেকে, এ তরুণী রমণীর রঙে একটা যেন কুসুম-কিরণ আভা। নীল পাড়, জমিতে বুটি, তাঁতের শাড়ি পরা মূর্তিখানি প্রায় প্রতিমার মতনই। মাথায় ঘোমটা টানা। কপালে সিঁদুরের টিপ। পায়ে সকলের মতই আলতা পরা। হাতে শাঁখা নোয়া চুড়ি নাকে নাকছাবি। ডাগর কালো চোখে কি কাজল টানা হয়েছে? বুঝতে পারলাম না। একবার

আমার দিকে দেখে, রমণীর দৃষ্টি পড়লো শঙ্করের দিকে। মুখে হাসি, এবং আমাকে চমকে দিয়ে প্রথম সম্বোধন, 'ভালো আছো তো শঙ্কর?'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে রমণীর পা স্পর্শ করে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললো, 'ভালো। আপনি ভালো আছেন তো?'

আমি পঞ্চমীর দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কিন্তু পঞ্চমী সেই রমণীর দিকেই যেন বিরূপ রুষ্ট চোখে তাকিয়েছিল। রমণী যে মমতা না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি ইনি মমতার থেকে মাথায় কিঞ্চিৎ খাটো। হাজার হলেও মমতা তো পঞ্চমীর দিদি। মমতার কালো ডাগর চোখের দীপ্তিতে যে ঝলক আছে, এই রমণীর তা নেই। মমতার সঙ্গে এঁর গাত্রবর্ণের তফাতের কথা বলেছি। এখন দেখছি ওঁর কালো ভুরু দুটি মমতার থেকে কিঞ্চিৎ মোটা এবং সেই ভুরুর নিচেই তাঁর কালো চোখে, দীপ্তির থেকে একটা অন্যমনস্ক বিষণ্ণতাই যেন রয়েছে। অথচ মুখে হাসি। এ রূপের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এ শিখরদশনাকেও রীতিমতো রূপসীই বলতে হবে।

শঙ্কর কিছু না বললেও, রমণীই আর একবার আমাকে দেখে, শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ।' শঙ্করের উত্তর সংক্ষিপ্ত।

রমণী সিঁড়ির কাছে নেমে এসে আমাকে ডাকলেন, 'এসো বাবা, উঠে এসে বস।'

আমি দেখলাম, সবাই যেন কেমন আড়ষ্ট। পঞ্চমীর মুখে তেমনি বিরূপ রুষ্টতা। শঙ্কর যেন অপ্রস্তুত। কিন্তু আমাকেও শঙ্করের অনুকরণে, এগিয়ে গিয়ে রমণীকে প্রণাম করতেই হলো। রমণী বললেন, 'থাক বাবা, হয়েছে। তোমার কথা শুনেছি, তুমি বই লেখ তো।'

তিনি তাও জানেন। অথচ এই বয়সের রমণী বাবা সম্বোধন করছেন। তাঁর কোনো পরিচয় পাচ্ছি না। পঞ্চমী যেন কিছুটা ঝেঁজেই বললো, 'ওসব কথা পরে হবে। তুমি এখন ওদিকে যাও তো।' দেখিয়ে দিল নিচু দাওয়া পুবের ঘরের দিকে।

রমণী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বললেন, 'হ্যাঁ তাই যাই। তোরা দেখা-শোনা কর।'

আমি পঞ্চমীর দিকে তাকালাম। পঞ্চমী হাত তুলে বললো, 'জানবেন, জানবেন, এত তাড়া কিসের? আগে জুতো জোড়া খুলুন।'

তাও তো বটে। নতুন আগন্তুকের এত কৌতূহলই বা কেন? তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ওপর পা তুলে জুতোর ফিতে খুলতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এত ধুলা কখন লাগলো? জুতো জোড়া চেনাই মুশকিল! অথচ এলাম তো মোটর-গাড়িতে চেপে। ফিতে পর্যন্ত ধুলায় বিবর্ণ। পঞ্চমী বললো, 'কী দেখছেন?'

'জুতোয় এত ধুলো লাগলো কী করে, তাই ভাবছি।' নিচু হয়ে ফিতে খুলতে খুলতে বললাম।

পঞ্চমী চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'জুতোর ধুলো দেখেই এত? তবু তো এখনো নিজের চেহারাটা দেখেননি।'

'ঘর থেকে আয়না নিয়ে এসে দেখা, নিজেদের চেহারাগুলো একবার দুজনেই দেখুক।' দাওয়ার ওপরে রমণী স্বর।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, শ্রীমতী মমতা। বোধ হয় সাজাবার থেকে, গুছিয়ে তোলবার শেষ ছোঁয়া দিতেই একটু সময় লেগে গিয়েছে। অথবা নিতান্তই স্বামীর অগমনে নিজেকে ইচ্ছা করেই একটু আড়াল করে রাখা। চোখে চোখ পড়তে সম্ভাষণ সামান্যই, 'এসে পড়লেন তাহলে?'

তারপরেই সিঁড়ির অন্য পাশ দিয়ে নেমে, পুবের ঘরের দিকে গেল।

আমি জুতো খুলে আগে টাইয়ের বন্ধনী খুললাম। দাওয়ার উপর উঠতেই ঘরের ভিতর থেকে আয়না হাতে বেরিয়ে এলো সুমতি। এগিয়ে দিল শঙ্করের দিকে। শঙ্কর হেসে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'ওকে দাও, আমাকে দিতে হবে না।'

পঞ্চমী সুমতির হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে আমার মুখের কাছে তুলে ধরলো। 'দেখুন।'

এক কথায় চমৎকার। মাথার চুল, ভুরু, চোখের পাতা, সবই ধুলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। গাল কপাল গলাও বাদ নেই, সাহেবি কোটখানির ওপরে মোটা একটি পলেস্তারা। শার্টের কলারও তাই। কেবল উচ্চারণ করলাম, 'ইস!'

'আর আমি ঝেড়ে দিতে গেলাম বলে, ভাবলো, আমি সোনার অঙ্গে পেটাচ্ছি।' পঞ্চমী ঘাড় বাঁকিয়ে বললো।

দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবেছি শ্যামা। মোটর-গাড়িতে আসার খেসারত এমনি করে দিতে হয়। শঙ্করের দিকে তাকিয়েই আমার ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। পঞ্চমী আয়নাটা সুমতির হাতে চালান করে দিল। সামনেই খড়ের চালের সঙ্গে ঝোলানো দড়ির গা থেকে

একটা শুকনো গামছা টেনে নিয়ে, আমাকে ঠেলে দিল ভুই ঘরের মাঝখানে পাকা রকের কাছে। তারপরে কাকে বলে ঝাড়ুনি। আমার আপত্তি করার কোনো কারণ ছিল না। এরকম গামছা ঝাড়ুনি না দিলে এই শীতের ধুলা ঝরবার না। তবু পিসিমা শশব্যস্ত উদ্বেগে বলে উঠলেন, 'ওলো ও পঞ্চা, মা, একটু আসতে ঝাড়। লাগবে যে।'

'লাগুক!' পঞ্চমী নিচু স্বরে চিবিয়ে বললো, যা নিঃসন্দেহে পিসিমার কানে গেল না, 'একি বাবা ফুলের শরীর, পাপড়ি ছরকুটে যাবে? সকলের এক কথা আর ভালো লাগে না। এত দরদ তো নিজেরা এসে ঝেড়ে মুছে পোস্কার করলেই হয়। দেখি—।' পঞ্চমী ঘাড় ধরে আমার মুখটা নামিয়ে ভুরু চোখ মায় গলা আর গলার ভিতর বুকের কাছ পযন্ত মুছে দিল, 'যান, এবার গিয়ে আয়নায় মুখটা দেখুন!'

দেখবার দরকার ছিল না, পঞ্চমীর হাতের গামছাখানা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। ইতিমধ্যে দাঁতে দাঁত ঠেকলেই সেখানে চড়ুই কিচমিচ ডাক ডেকে উঠছিল। আমি সামনের ঘটি নিয়ে, বালতি থেকে জল তুলে মুখ কুলকুচো করলাম কয়েকবার। পঞ্চমী বলে উঠলো, 'আহা, জলটা তো আমি দিতে পারতাম।'

মুখটা কিঞ্চিৎ সাফ মালুম করে বললাম, 'ঠিক আছে।'

'এস, এবার তুমি এস তো মেজ জামাই।' পঞ্চমী শঙ্করকে ধরে টেনে নিয়ে গেল, দাওয়ার পশ্চিমে। গামছাটা একবার ঝাড়া দিতেই ধুলায় ধুলা।

শঙ্কর বললো, 'আমাকে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছিলে না।'

'হিংসে হচ্ছে নাকি?' পঞ্চমী ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে হাসলো, 'কী করবো বলুন, নতুনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। জানেনই তো নতুনের কদর বেশি।' বলে একবার চোখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে শঙ্কর-ঝাড়ুনি শুরু হলো।

সুমতি হাসছিল। আমি বললাম, 'জামা কাপড়ের ব্যাগ কোথায়। এগুলো ছাড়তে চাই।'

সুমতি ব্যস্ত হয়ে বললো, 'ঘরে ব্যাগ রেখেছি, আসুন।'

বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়ায় কিঞ্চিৎ আলোর আভাস আছে। ঘরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার। আশেপাশে তাকিয়ে জানালা খুঁজলাম। কোনোদিকেই কিছু চোখে পড়লো না। সুমতি নিচু হয়ে, সলতে কমানো একটা হারিকেন হাতে তুলে নিল। কল ঘুরিয়ে দিতেই, প্রথমবার চাঁদের মতন বড় হয়ে উঠলো।

[illegible] আলোকিত হলো। কিন্তু [illegible] জোর থাকে কোথায়। ছেলেবেলায় [illegible] লোডায় টিপটিপি বটে, এখন হারিকেনের আলোয় নিজেকে কেমন ভূতে মনে হয়। নিজের ছায়াটা দেখতে পাই না পাই, সুমতির মস্ত বড় ছায়াটা দেখতে পেলাম, খাটের ওপর ছাড়িয়ে মাটির দেওয়ালে গিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, ঘরে ঢুকেই বাঁদিকে বড় একটা খাটে বিছানা পাতা। ডানদিকে কী আছে, বিশেষ চোখে পড়লো না। সামনের দেওয়ালে কুলুঙ্গি তাকটাক কিছু আছে। বোধহয় কিছু বইপত্র ছাড়া, দু-একটা ফটোও মাটির দেওয়ালে টাঙানো।

সুমতি সরে গিয়ে একপাশে হারিকেনটা ধরতেই, জামাকাপড়ের ব্যাগ দেখতে পেলাম। সুমতি বললো, 'দরজাটা ইচ্ছে করলে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, জামাকাপড় বদলে নিন। আমি দরজার বাইরেই আছি।' ও ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

আমি দরজাটার ছিটকিনি খুঁজতে গিয়ে পেলাম, পাশে রাখা কাঠের হুড়কো। হুড়কোটাই আঁটলাম। ব্যাগের মুখ খুলে, জামাকাপড় বের করতে গিয়ে, হাত দিয়েই টের পেলাম, ধুলো কিচকিচ করছে। হারিকেনটা তুলে দেখলাম, ভুল না। ব্যাগের মধ্যেও ধুলো ঢুকেছে। সব বের করে ঝাড়লাম। কোট প্যান্ট শার্ট যাবতীয় পোশাক খুলে আগে পায়জামা পাঞ্জাবি বের করে পরলাম। তোয়ালেটা নিলাম কাঁধে। কাগজের মোড়ক থেকে বের করলাম স্যাণ্ডেল। কিন্তু এসব কোট প্যান্ট কোথায় রাখবো?

কোথায় আবার? ব্যাগটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে, তার ওপরেই আপাতত পাট করে রেখে, ঘরের এদিকে ওদিকে তাকালাম। আর মুহূর্তেই, লক্ষ্মীর সেই কোমর টেনে টেনে খুঁড়িয়ে চলা ছবিটা ভেসে উঠলো। আশ্চর্য, এসে অবধি একবারও তো মনে পড়েনি। তার থেকেও আশ্চর্যতর লক্ষ্মীকে একবারও কোমর টেনে চলতে দেখিনি। ওর চলাফেরা আর সকলের মতন স্বাভাবিক আর সপ্রতিভ। এ মুহূর্তে কথাটা মনে পড়লো, কারণ শুনেছিলাম, বৃষ্টি আর বানের জলে ঘরের দেওয়ালের নিচে ও চাপা পড়েছিল। সে-ঘর কি, এ ঘর?

আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দরজার সামনেই শঙ্কর লক্ষ্মী আর সুমতি। রাধাও আছে। পিসিমা ইতিমধ্যে দাওয়ায় উঠে বসেছেন। দাওয়ায় একটি হারিকেন জ্বলছে। পুবের নিচু দাওয়া ঘরে আর সামনের নিচু চালা পাকা ঘরেও লণ্ঠন আলো কাঁপছে। বাইরে দিনের আলো, এইটুকু

সময়ের মধ্যেই একেবারে বিলীয়মান। উঠোনের তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে, মালতীকে যেন উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। মরাইয়ের কাছে, একজন মুনিষ কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটছে। পশ্চিমের দাওয়া ঘেঁষে, বোধহয় কাজের বউই খসখস শব্দে খড়কাটা বঁটিতে খড় কাটছে।

ঐ আমার পাশ দিয়ে সুমতি ঘরে ঢুকলো। শঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এতক্ষণে তোকে চেনা যাচ্ছে।'

মনের ভিতর পুরনো অসহায় রাগটা উস্‌কে উঠতে যাচ্ছিল। কেন যে মরতে সাহেব সাজতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। ঘরের ভিতরে তিন বার শাঁখ বেজে উঠলো। পিসিমা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'হরি হরি। জয় মা সর্বজয়া…।' আরও যেন কিছু বললেন, বুঝতে পারলাম না। দেখলাম পঞ্চমী, রাধা, আর রাধার পাশে ওর থেকেও একটি ছোট ছেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। বোধহয় বড়দের অনুকরণে, একটা অভ্যাস। বাইরে উঠোনে তুলসীতলায় মালতী তখন গলবস্ত্র হয়ে হাঁটু পেতে প্রণাম করছে।

শাঁখ বেজে যাবার পরেই, সারা বাড়িতে যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এলো। কুড়োলের ঘা পড়ছে না, বঁটিতে খড় কাটা হচ্ছে না। মনে হলো, সকলেই এখন দিনান্তের শেষে, আসন্ন রাত্রের বুকে দাঁড়িয়ে সন্ধিক্ষণকে নমস্কার জানাচ্ছে। আশেপাশের গাছে গাছে, এখনো ঘরেফেরা পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে সময়ের এক অতন্দ্র আর নিরন্তর সঙ্গী, ঝিঁঝির ডাক। আশেপাশের বাড়ি এবং আরও দূরান্ত থেকে শঙ্খধ্বনি ভেসে এলো।

শঙ্কর গেল ঘরে। পঞ্চমী স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বললো, 'রাধা, দুখু, তোরা তক্তপোশটার ওপরে উঠে বোস। পায়ে পায়ে ঘুরিস না।'

রাধা আর দুখু যেন বড় অনিচ্ছাতেই, দাওয়ার পুবে রাখা তক্তপোশের দিকে এগিয়ে গেল।

দুখুকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ছেলেটি কে?'

'বড়দির ছেলে।' পঞ্চমী বললো, 'তোয়ালে নিয়ে কী করবেন? হাত মুখ ধোবেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ। একটু হাতে পায় চোখে মুখে জল না দিলে চলছে না।'

পঞ্চমী হারিকেনটা হাতে নিয়ে খোলা রকের দিকে পা বাড়িয়ে বললো, 'আসুন।'

আমি বললাম, 'আলো লাগবে না।'

[illegible] না জানলে, [illegible] আমি, [illegible]।' পঞ্চমীর বচন, 'আপনি, [illegible] তো? [illegible] দেখবেন, ধকের পাঁচিলের দিকে বেশি এগোবেন না, পেছল আছে।' [illegible] দেওয়ালের গায়েই একটি কুলুঙ্গি থেকে সাবানের বাক্সো নামিয়ে দিয়ে বললো, 'এই নিন সাবান।'

মনে পড়লো, সাবান আমিও এনেছি। কিন্তু সে-কথাটা বলতে বাধলো। পঞ্চমী বালতিতে ঘটি ডুবিয়ে জল তুলে দিল, 'নিন, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি, আপনি হাত মুখ ধোন।'

বললাম, 'ওটা তো আমিই পারি।'

'আপনি কী না পারেন?' পঞ্চমী যথারীতি ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, 'তবু যদি আপনার বাড়ির বাথরুম আমার না দেখা থাকতো। নিন, নিন।'

মুখ থেকে কথা খসানোই মুশকিল। আমি পঞ্চমীর মুখের দিকে তাকালাম। ওর জোড়া বিনুনির সঙ্গে, কপালের গাঢ় খয়েরি রঙের টিপটা এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। অনেকটা ওর চোখের তারার মতই রঙ। ওর কিশোরী শরীরে হাঁটু ঢাকা জামাটা লাল সাদা ফুল ছিটানো। বললাম, 'পঞ্চমী, তোমার কোমরটা যে সেরে গেছে, এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।'

'এতক্ষণে যে খেয়াল পড়েছে, সেই আমার ভাগ্যি।' পঞ্চমী বললো, 'অনেক মুখ দেখছিলেন তো, তাই খেয়াল হয়নি।'

সোজা কথায় পঞ্চমী নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ ঘরের দেওয়ালে চাপা পড়েছিলে?'

'যে-ঘর দেখছেন, এটিই।' বলে ও কলের জলের মতনই, ঘটি থেকে জল ঢাললো।

আমি, অগত্যা পঞ্চমীব কাঁধে তোয়ালেটা তুলে দিয়ে, হাত মুখ পা ধুয়ে নিলাম। শঙ্করও লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে এগিয়ে এলো। পঞ্চমী বললো, 'শুধু এই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে থাকতে পারবেন না, শীত করবে। গরম কিছু এনেছেন তো?'

উলের সোয়েটার আর শাল এনেছি। তবু বললাম, 'না আনলেও, কিছু কি জুটবে না?'

'জুটবে। মোটা মোটা কাঁথা আছে।' পঞ্চমী বললো, 'যান, এখন ঘরে গিয়ে, গরম যা এনেছেন, একটা কিছু চাপান। একে পাড়াগাঁ, তায় মাঘ মাস। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে আমাদের দুর্নাম হবে।'

আমি কিছু বলবার আগেই পিসিমা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, গরম কিছু গায়ে

চাপিয়ে রাখো।'

টাঙাটা যেন কেবল শহুরে লোকদের জন্যই। এঁদের কারো কিছু যায় আসে না। যার যা ধুতি বস্ত্র গায়ে আছে, তাতেই চলে যাবে।

মালতী এলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে। হাতে ওর কাঁসার বগি থালায় চায়ের ধূমায়িত কাপ। বললো, 'চা এনেছি। ঘরে বসবেন, না বাইরের দাওয়ায়?'

গরম চা দেখে যেন প্রাণটা উথলিয়ে উঠলো। বললাম, 'বাইরেই বসবো। চাদরটা জড়িয়ে আসি।' ঘরে ঢোকবার আগে, নিচু ঘরটির জানালায়, লন্ঠন আলোয় সেই রমণীর মুখ আবার পাকা দেখতে পেলাম। তিনি তাকিয়েছিলেন এদিকেই। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসাটা আবার খোঁচা হয়ে উঠলো। কে উনি? ওঁর প্রতি পঞ্চমীর অমন রুষ্ট বিরূপতাই বা কেন?

চা আর তাজা মচমচে মুড়ির সঙ্গে তেলে ভাজার আসর জুড়োতে না জুড়োতেই নতুন আসরের আয়োজন হয়ে গেল। চায়ের আসরেই আবির্ভাব হলো পবনের। এমন একটি গ্রামের তুলনায়, পবনের আদ্দির পাঞ্জাবি, ধুতি, গায়ে একখানি ভাঁজ করা চাদরে রীতিমতো ঝলক দিচ্ছে! ডিগডিগে লম্বা, মাথার চুল যথাসাধ্য উল্টে পেতে আঁচড়াবার চেষ্টা হয়েছে। তবে চুলের সামনেটা কিঞ্চিৎ ঢেউ তুলে ফোলানো। ঘাড়ের পিছনে ক্ষুর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে চাঁছা। ওটাই রূপোলি পর্দার নায়কোচিত ইস্টাইল! দাওয়ার সামনে এসে বললো, 'কী খবর শঙ্করদা। কোনো খবর-টবর নেই, হঠাৎ? খবর সব ভালো তো?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ভালো।' শঙ্কর ডাকলো, 'এসো পবন।'

পবন নিচে স্যাণ্ডেল খুলে রেখে উঠে এলো। সেই ফাঁকেই পঞ্চমী আমার পাশ থেকে ফিসফিস করে বললো, 'দু চক্ষে দেখতে পারিনে।'

পবন দাওয়ার ওপর উঠে এসে বললো, 'বাড়িতে মা দিদির কাছে শুনলাম, আপনারা গদাই চক্কোত্তির মোটরগাড়িতে এসেছেন।'

পঞ্চমী কেন পবনকে দু চক্ষে দেখতে পারে না, সেটা পরে জানা যাবে। আপাতত মামার নামটা জানা গেল, গদাই চক্রবর্তী। পিসিমা একটু আগেই বিদায় নিয়ে, তাঁর বাড়ি গিয়েছেন আহ্নিকে বসবার জন্যে। গ্রামের বাড়িতে তিনি একলাই আছেন। এক দুলে বউ তাঁর ঘরবাড়ি দেখাশোনা করে। তাঁর সারাদিনের খাওয়া ওঠা বসা এ বাড়িতেই। বিশ্রামের সময় নিজের ভিটায় যান। রাত্রে দুলে বউয়ের বর বাইরের দাওয়ায় শোয়। একটা ব্যাটাছেলে না থাকলে চলে কেমন করে। ঘরে তিনি দুই ভাইঝি, সুমতি আর ষষ্ঠীকে নিয়ে শোন। সেটাও ভয়ের কথা। চোর ডাকাতের নাকি ভারি উৎপাত।

বিশেষ করে ঐ রাখালটার সজাগ না থাকলেই সবাই কেটে ধান চুরি। ডাকাতির আশঙ্কা তো বরাবরকার। তার ওপরে চাটুয্যে বাড়ি আর পিসিমার বাড়িতে পুরুষ বলতে কেউ নেই।

ইতিমধ্যে যেটুকু পঞ্চমী, শঙ্কর আর পিসিমার কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তা হলো, এ চাটুয্যে বাড়ি দুই অংশে ভাগ। দক্ষিণ দুয়ারি পাশাপাশি দুই দিকে পশ্চিমের অংশের অংশীদার শিবনাথ চাটুয্যে মশায়ের অগ্রজ কালীনাথ। সপরিবারে বরাকরের দিকে কোথায় থাকেন। উপলক্ষ চাকরি এবং রুজি-রোজগার। কালীনাথ একদিক থেকে সৌভাগ্যবান। চাটুয্যেদের বংশরক্ষার একমাত্র সন্তে একমাত্র পুত্রের জনক তিনি। বৎসরে এক বা একাধিকবার তিনি গ্রামে আসেন। অবিশ্যি তার প্রধান কারণ, ধান চালের হিসাব বুঝে নেওয়া। যতটা বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বৎসরের খোরাকি, ততোটা চাকরিস্থলে নিয়ে যান। বাকিটা, খড় সমেত, সবই বিক্রি করেন।

পশ্চিমাংশের দুই ঘরের দরজা বন্ধ এবং ফাঁকা দেখে, আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি। অবিশ্যি জ্যাঠামশাইয়ের— অর্থাৎ কালীনাথ চাটুয্যেমশায়ের ধান চাল বিক্রির বিষয়টি তাঁর নিজস্ব হলেও, ঘর দরজার দেখাশোনাব দায়িত্ব এই বাড়ির প্রমীলা মহলের ভাইঝিদের ওপরেই। পিসিমার কথা থেকে বুঝেছি, দাদা কালীনাথকে তিনি তাঁর ন্যায্য শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই করে থাকেন, কিন্তু অনুজ শিবনাথের প্রতি তাঁর স্নিহ-বিগলিত প্রাণ বেশি কাতর।

এই সব কথাবার্তার মাঝখানেই, পিসিমা আহ্নিকের জন্য বিদায় নিয়েছেন। সারাদিনেব গড়িয়ে যাওয়া দুপুবে তিনি একবার অন্ন গ্রহণ করেন। কিন্তু বলে গিয়েছেন পঞ্চমী বা ষষ্ঠী যেন তাঁকে সময় মতন আবার এ বাড়িতে নিয়ে আসে। চায়ের মজলিশের ফাঁকে, পুবের এবং রান্নাঘরে, কুটনো কোটা, উনুন জ্বালানো, রান্নার আসর বসেছে। সেখানে উপস্থিত না থেকেও বুঝতে পারছি, রান্নার প্রধান দায় দায়িত্ব মমতার হাতে। বড়দি সেখানেই আছেন। আর সেই রমণী, যাঁর পরিচয় এখনো অবাক কৌতূহলের খোঁচা হয়ে বিঁধে আছে আমার মনে। মালতী পঞ্চমী আর ষষ্ঠী আমাদের দাওয়ার আসরে ছিল। ষষ্ঠী বাইরের চেহারায় ও আচরণে অনেকটা পঞ্চমীর বিপরীত। ও নিজেকে একটু আড়ালে আবডালে রাখতে ভালবাসে। বেশি কথা, এবং কথায় কথায় হাসি নেই। হঠাৎ দেখলে ওকে আড়ষ্ট আর লজ্জিত মনে হয়। আসলে ও যখন মুখ খোলে, তখন বাকি সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। রাত্রে শোবার সময়,

ধারালো ছেনো নিয়ে খোর। শায়ের ষষ্ঠী বড়দির মতন, বয়সে শঙ্করের থেকে ছোট হলেও, শাহুকের দিক থেকে ও একেবারে উগ্রচণ্ডী খড়্গধারিণী কালী। ষষ্ঠীকে সবাই ভয় পায়। অথচ এই ষষ্ঠীকেই আমাদের দাওয়ার আসরে, আমি প্রায় জোর করেই টেনে এনে বসিয়েছি। সুমতি আমাদের আসরে থেকেও মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। যে যে আসরেই থাক, কর্তব্যে ফাঁকি থাকলে চলবে না।

জীবনে রাঢ় বঙ্গের কিছু কিঞ্চিৎ গ্রাম আমি আনা যানা করেছি। অতিথি হিসাবে আশ্রয় পেয়েছি নানা গৃহে। কিন্তু মাঘের শীতার্ত অন্ধকার আকাশের আবছায়ায় তারার ঝিকিমিকি, উঠোনের ওপর বিশাল এক আমগাছ, একপাশে দুটো মরাই, একটি ইঁটের পাঁচিল, আর খানকয়েক ঘর ঘিরে একটি ছোট উঠোন, কাঠের খড়ের ধোঁয়া আর কেরোসিনের হারিকেন লম্ফর গন্ধ ছড়ানো, এই সব কিছুর মধ্যে বড়দির ছেলে খুদে বালক দুখু আর একটি মুনিষ ছাড়া, কোনো পুরুষ নেই, এমন একটি গৃহের কথা মনে করতে পারি না। পিসিমা ছাড়া, বয়সের দিক থেকে সকলেই তরুণী কিশোরী বালিকা। শহরের বুকেও এমন বুকের পাটাওয়ালা প্রমীলা গৃহ, চোখে পড়েনি।

এ গৃহে প্রথম প্রবেশের সময় বাইরের চত্বরের আশেপাশে কয়েকজন নানা বয়সের পুরুষকে দেখেছিলাম। তাঁরা কে কোন্ গৃহের অধিবাসী, এ বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন, কিছুই জানি না। পবনকেই প্রথম দেখলাম, পোশাকে-আশাকে কথায় চেহারায়, এ বাড়ির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একজন যুবা পুরুষকে। তবু পঞ্চমী তাকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না।

শঙ্করের পাশ থেকে মালতী উঠে, পঞ্চমীর পাশে এসে বসলো। জায়গার অভাব হবার কথা না। কারণ এখানে সকলেই সুজন। যতো ছোট জায়গাই হোক, তেঁতুল পাতায় নজন ধরবার মতন, মন আছে সকলেরই। যা করে মন। মন না করলে, দু বিঘাতেও দুজনের জায়গায় কুলায় না। পবন শঙ্করের পাশে বসে, গায়ের চাদরখানা পাট করে রাখলো কোলের কাছে। কেন, শীত নেই নাকি? আমাদের সবাইকে তো কিছু না কিছু জড়াতে হয়েছে। শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, 'গদাই চক্কোত্তির মোটরগাড়িতে এসেছি, সে-কথা তুমি জানলে কী করে? চেনো নাকি?'

'মেমারিতে কে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যাচ্ছে আমি জানবো না?' পবন তার সরু গোঁফ জোড়া বিস্তৃত করে। পানের ছোপ ধরা দাঁত দেখিয়ে হাসলো, 'চোকখণ্ড থেকে মেমারিতে গিয়ে শুনলাম, গদাই চক্কোত্তির গাড়ি নাকি [illegible]

[illegible] এসেছে। শুনে কেমন খটকা লাগলো। একে তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, বাড়িতে [illegible] এসেছে, তারা নাকি বিস্তর বাজারও করেছে। শুনে, আমার মনটা ভেবড়ে গেল। চাটুয্যেবাড়ি, কোন্ চাটুয্যেবাড়ি? আমাদের বাড়িতে তো শালা বিস্তর বাজার করে, মোটরগাড়িতে চেপে আসবার কেউ নেই। এক জামাই, সে তো একবার বে করতে এসেছিল আমাদের বাড়িতে, তারপরে আর এমুখো হয়নি। ভেবেছিলাম, মেমারি থেকে একবার কুলীনগ্রামের ছাত্তরের বাড়ি হয়ে আসবো। মনটা মানলো না, তাই চলেই এলাম।'

শঙ্কর বললো, 'খুব ভালো করেছো। কুলীনগ্রামে গেলে, আজ রাত্রে আর তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।'

'অথচ শুধু সাইকেল না, টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কুলীন-গ্রামে যাবো বলে।' পবন পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট একটি টর্চ লাইট বের করে, বোতাম টিপে দুবার জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিল।

ছাত্তর মানে, ছাত্র, এবং আমি ধরেই নিলাম, পবন তা হলে ইস্কুলে শিক্ষকতা করে। আশেপাশের গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ছাত্রও পড়ায়। সে কথা বলতে বলতে, তার ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে দেখছিল। মালতী নাক টানার একটা শব্দ করে বললো, 'পবনদা, রোজ রোজ রাত্রে সাইকেল ঠেঙিয়ে, কুলীনগাঁয়ে তুই বুঝি কেবল ছাত্তরের বাড়ি যাস?'

'আর কোথায় যাবো? তোদের যেমন কথা।' পবনের সরু গোঁফে চোরা হাসি, চোখেও ঝিলিক দিল।

শঙ্কর বললো, 'ওসব কথা থাক পবন। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই—।'

'ও আর আপনি কী করাবেন।' পবন বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আমি বাড়িতে ঢুকেই শুনে নিয়েছি। উনি তো আপনার সেই লেখক বন্ধু? নমস্কার দাদা।' বলেই সে জোড়হাত তুলে, কপালে না ঠেকিয়ে, একপাশে বেঁকিয়ে যে-ভঙ্গিটি করলো, বিরজু মহারাজ দেখলে নিশ্চয় চিন্তিত হতেন।

আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। তার আগেই পবন বললো, 'আপনার কথা শঙ্করের মুখে অনেক শুনেছি, এদের মুখেও শুনেছি।' পঞ্চমীদের দেখিয়ে দিল, 'বড় খুশী হলাম দাদা' বলে আর একবার সেই বিরজু মহারাজকে ভয় পাইয়ে দেওয়া নমস্কারের ভঙ্গি। অবিশ্যি অতীব বিনীত। হাসিটি খুবই আন্তরিক। গলার স্বরও কিঞ্চিৎ ভরাট আর কোমল হয়ে উঠলো।

শঙ্কর আমাকে বললো, 'এর নাম পবনচরণ চাটুয্যে।'

'উ হুঁ হুঁ শঙ্করদা।' পবন বাধা দিয়ে বললো, 'পবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।'

শঙ্কর বললো, 'ভুল হয়ে গেছে ভাই। যাই হোক, পবন হলো এ বাড়ির জ্ঞাতি—পঞ্চমীদের খুড়তুতো দাদা। পাশেই এদের বাড়ি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি ইস্কুলে পড়ান।'

'ইস্কুলে?' পবন যেন গাছ থেকে পড়লো।

এদিকে মালতী পঞ্চমী ষষ্ঠী একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলো। মনে হলো পুবের এবং রান্নাঘর থেকেও হাসির অস্পষ্ট ঝঙ্কার ভেসে এলো। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বললো, 'না না, পবন একজন মাস্টার তবলচি।'

'না না, শঙ্করদা, মাস্টার ফাস্টার বলবেন না।' বলে আমার দিকে ফিরে আবার সেই জোড় হাতের ভঙ্গি, 'আমি দাদা সামান্য একজন তবলা বাজিয়ে। তবে গুরু আমার কেরামতুল্লা খান সাহেব। সপ্তাহে রোজ একদিন করে কলকাতায় যাই তালিম নিতে। আশেপাশে কিছু ছাত্তর আছে—আছে মানে, ছাড়ে না বলেই শেখাই। আর বুঝতেই পারছেন, দিনকালের কী অবস্থা। ছাত্তরদের দৌলতেই হাতখরচটা উঠে যায়। তবে হ্যাঁ, আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে গুরু আমার কাছ থেকে মাইনে নেন না, বিনা মাইনেতেই শেখান।'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বললো, 'সেটা তুমি গুণী ছাত্র বলেই। মুখেই দু একটা বোল শোনাও না।'

'ব্যস্ত কেন, হবে হবে।' পবন তার পাঞ্জাবি পরা সরু লম্বা হাতখানি তুললো, তারপরেই পুবদিকে মুখ তুলে গলা চড়িয়ে বললো, 'কই রে মাতু, একটু গরম পানি-টানি দিবি নাকি?'

রান্নাঘরের দিক থেকে মমতার জবাব এলো, 'দেব, বোস।'

আমি পঞ্চমীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। পঞ্চমীও স্বর নামাতে জানে। বললো, 'চা।'

গরম পানি-টানি যার নাম। সুমিতা রান্নাঘরের দিক থেকে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'জামাইবাবু, আপনারা চা খাবেন আর?'

শঙ্কর বললো, 'পবনের সঙ্গে আমরাও এক আধ চুমুক খাই।'

'নিশ্চয়ই।' পবন নিজের হাঁটুতেই চাপড় মেরে, হঠাৎ কোমর বাঁকিয়ে, 'তেরে কেটে ধিং তাক ' ইত্যাদি নানারকম বোল শুনিয়ে দিল। তার সঙ্গে মাথা ঝাঁকুনি। আমার সাধ্যি নেই, সে সব বোলগুলো মুখস্থ বলি। আমার

পাশ থেকে পঞ্চমী, ওর স্বভাবসিদ্ধ বয়স ছাড়ানো স্বরে উচ্চারণ করলো, 'মরণ!'

গরম পানি আসছে, তা শুনেই বোধ হয় পবনের বোল তাল মুখের বুলিতে আর হাঁটুর চাপড়ে বেজে উঠলো। তারপরেই, 'কই রে পঞ্চী, এখনো বসে আছিস যে বড়?' পবন বোল থামিয়ে হাঁকলো। 'গপ্‌পো করে সময় মাটি করছিস কেন? হারমোনিয়ামটা বের কর। দাদাকে গান-টান শোনা।'

পবনের কথাটা আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকে হেনে গেল। পঞ্চমীর যে এ গুণটা আছে, সে-কথা তো ভুলেই গিয়েছি। শঙ্করের বিয়ের পরে, ও যে আমাদের বাড়িতে বসেই গান শুনিয়ে এসেছে। অবিশ্যি গানের কথা শুনেই যদি কেরামতুল্লার নামেব পরে কেউ ভারি রকমের কিছু আন্দাজ করে বস, তাহলে ঠেক খেতে হবে। পঞ্চমী পঞ্চমীর মতনই গায়। ও কোনো বড় ওস্তাদের কাছে দূরেব কথা, কেবল গাইতে জানে, এমন কারো কাছেও তালিম নেয়নি। ওর সবটাই এখানে ওখানে, কলকাতায় কখনো কখনো, নিতান্ত রেকর্ডে শুনে, গলায় তুলে নেওয়া। তার মধ্যেই হয় তো কলকাতায় চাটুয্যে মশায়ের খিদিবপুরের আস্তানার আশেপাশে, নরেনদার বেলেঘাটার ফ্ল্যাটের কোনো মহিলাব কাছে, কিছু কিছু গান তুলেছে। আব সেই গানগুলো নিজের গলায় তুলে নেওয়াটাও, একান্ত ওর নিজস্ব। তাতে কারো চক্ষু চড়কগাছে উঠলে, কিছু কবার নেই। পঞ্চমী তো তাদের কাছে গান শেখেনি? তাদের কারোকে গান শুনতে মাথার দিব্যিও দেয়নি।

পবনেব কথা শুনেই পঞ্চমী ওর মুখটা চেপে ধবলো আমার পিঠে। মাথা নাড়ানোটাও টেব পেলাম। অর্থাৎ, লজ্জা পেয়েছে। গান গাইবে না। এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না। বললাম, 'পঞ্চমী, অনেক কিছুই আমার খেয়ালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কথাটা আমার মনেই ছিল না।'

পঞ্চমী আরও জোবে মুখটা আমাব পিঠে চেপে, হাত দিয়ে কাঁধ ধরলো, অস্ফুট আওয়াজে যা শোনা গেল, 'উঁ না না।'…

পঞ্চমীর জড়তা নেই, খরতা আছে। ওর মুখের কথার তোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। তার সঙ্গেই একটা ব্রীড়া আর লজ্জা মিলিয়ে, পঞ্চমী অন্য এক কিশোরী। এই লাজে লাজানো আচরণে কোথাও জেদ নেই, গান না গাওয়ার প্রতিজ্ঞাও নেই। ওর মতো মেয়ের আত্মপ্রকাশের, এ আর এক রূপ। আমি শঙ্করের দিকে একবার তাকালাম। ও আমাকে চোখ টিপে ঘাড় ঝাঁকালো। ঘাড় ঝাঁকালো পবনও। আমার কৌতূহলটা আরও বেশি, এর আগে পঞ্চমীকে হারমোনিয়াম বাজাতে দেখিনি। আরও যদি সত্যি বলতে

হয়, এ বাড়িতে হারমোনিয়মের অস্তিত্বের কথা আমার চিন্তায়ও আসেনি।' পঞ্চমীকে আর একটু সহজ করে নেবার জন্যই বললাম, 'তা ছাড়া, পঞ্চমীর যে হারমোনিয়ম আছে, আর ও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে পারে, তাও জানতাম না।'

মালতী বললো, 'ওটি বলতে হবে না। শিবনাথ চাটুয্যের সব থেকে আদরের মেয়ে।'

'আর তোরা বুঝি খুব অনাদরের?' পঞ্চমী তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে উঠলো।

মালতী হেসে বললো, 'তা বলিনি। কিন্তু বাবা যেই শুনলে, মেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করতে চায়, অমনি কলকাতা থেকে ঘাড়ে করে হারমোনিয়ম এনে হাজির।'

'আহা, আর তোরা যেন বাবার কাছে চেয়ে কিছু পাস না।' পঞ্চমীর আবার ফোঁস।

কী দরকার এইসব ফোঁসফাঁস প্রসঙ্গে। আমি বললাম, 'আমি তো জানি চাটুয্যেমশায় তাঁর সব মেয়েকেই সমান ভালবাসেন।'

শঙ্কর জুড়ে দিল, 'পাই টু পাই মেপে। নেহাত কোনো মেয়ে ফুটবল খেলতে ভালবাসে না। বাসলে, তাও এনে দিতেন।'

সবাই হেসে উঠলো। পঞ্চমী হাত তুলে, মারতে উদ্যত হয়েও, হেসে ফেললো। শঙ্কর বললো, 'তবে আমি জানি, এক মেয়ে ডাংগুলি খেলতে এখনো ভালবাসে, কিন্তু চাটুয্যেমশাই গাছের ডাল কেটে ডাংগুলি বানিয়ে দেননি।'

ষষ্ঠী তৎক্ষণাৎ আমার ডান পাশ থেকে ফুঁসে উঠলো, 'জামাইবাবু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

আবার সেই কথা! মমতার কাছে কথাটা শিখেছিলাম, 'কথা পড়লো সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।' শঙ্করের উদ্দিষ্ট কন্যাটি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে দিল। ষষ্ঠীকে আমি ডাংগুলি খেলতে দেখিনি বটে। তবে ওর মাথা চাড়া দেওয়া, ইতিমধ্যেই বেশ হাতে পায়ে লম্বা চেহারার মধ্যে একটি ডানপিটে ছেলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

শঙ্কর বললো, 'আমি তো কারো নাম করিনি? তবে আমি এ গাঁয়েই দেখেছি, একটা ছেলে গাদি খেলতে চুরি করেছিল বলে, একটি মেয়ে তাকে শালা বলে চাঁটি মেরেছিল।'

ষষ্ঠী পা দাপিয়ে হাঁকলো, 'অ মেজদি, ছাখ না জামাইবাবু কী সব বলছে।'

মেজদি হলো মমতা। পঞ্চমী বললো, 'আহা, ওকি ষষ্ঠী, পা দাপাচ্ছিস কেন? গায়ে লাগবে না?'

রান্নাঘরের দিক থেকে মমতার নির্দেশের স্বর ভেসে এলো, 'আচ্ছা, এখন ওসব থাক। পঞ্চী, হারমোনিয়মটা বের করে নিয়ে আয়।'

'যাহ্, শালা, এখন সবই আমার ওপর দিয়ে।' পঞ্চমী অনায়াসেই শকার দিয়ে বলে উঠলো।

কথাটা আমার কানে লাগলেও, তেমন অস্বাভাবিক লাগলো না। গৃহস্থ কন্যাদের অনেকের মুখেই শ-কারান্ত বিশেষণ অনেকবার অনেক গৃহে শুনেছি। শহরের অভিজাত কন্যার কণ্ঠে শুনেছি, উচ্চারণেব অযোগ্য খেউড়ও। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজীতে বটে! আমি বললাম, 'পঞ্চমী তোমার হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শুনবো না, একি কখনো হয়? চলো, আমিও তোমার সঙ্গে হারমোনিয়মটা নিয়ে আসি। তুমি একলা পাববে না।'

'আমি ওব সঙ্গে যাচ্ছি।' ষষ্ঠী উঠে দাঁড়ালো।

পঞ্চমী আমাব পিঠে একটা চিমটি কেটে, ষষ্ঠীব সঙ্গে ঘবের মধ্যে গেল। পবনমোহন এবার নিজেই মেতে উঠলো, 'তাহলে তবলাই বা আর বাকি থাকে কেন? কী বলেন দাদা?'

দেখলাম, পবনেব ঘাড বাঁকানো, ছোট ছোট ঝকঝকে চোখের হাসিতে একটি মজলিশি ঝিলিক। আমি বললাম. 'নিশ্চয়ই।'

পবন মালতীব দিকে তাকিয়ে বললো, 'যা তো ভাই মালু, আমাদের বাড়ি গিয়ে ধীবাকে বল, আমাব ডুগি তবলা নিয়ে আসতে।'

মালতী উঠে দাঁড়াতেই, শঙ্কর বললো, 'সত্যি ধীরা আর রাণীদিকে তো আমাদের আসরে দেখছি না। মালতী, তুমি রাণীদিকেও ডেকে নিয়ে এসো।'

পঞ্চমী আর ষষ্ঠী হারমোনিয়মের দুদিকের হাতল ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে এলো। আমি ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে সরে গেলাম। শঙ্কব উঠে দাঁড়িয়েই পডলো। পঞ্চমী আর ষষ্ঠী, মাঝখানে হারমোনিয়ম নামিয়ে রাখলো। পঞ্চমী প্রথমেই আমাকে বললো, 'মাটির দেয়ালে ঠেসান দেবেন না, শালে জামায় মাটির দাগ লেগে যাবে।'

নজর কোনোদিকে কম নেই। আমি দেওয়াল ছেড়ে একটু সরে এলাম। পঞ্চমী শঙ্করকে বললো, 'আপনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন? আপনাকে আমি উঠতে বলেছি?'

শঙ্কর হাসে কম, হাসায় বেশি। অবিশ্যি হাসতে শুরু করলে দু-চার

পাড়া জানতে পারে। সে-সোল্লাস হাসি। বিশেষ সময়ে শোনা যায়। বললো, 'হারমোনিয়মটা রাখবে তো, তাই উঠলাম।'

'তা হলে দাঁড়িয়েই থাকুন। হারমোনিয়মটা যেন আপনার জায়গা হাতিয়ে নিয়েছে।' পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিকে ফিরে বললো, 'যা, ওঘর থেকে মাদুর এনে শতরঞ্জির পাশে পেতে দে। জামাইবাবুর বসবার জায়গা হচ্ছে না।'

শঙ্কর বসে বললো, 'দেখো, হারমোনিয়মে আওয়াজ আটকালে আমাকে গালাগালি দিও না যেন।'

'আপনি হারমোনিয়মের ওপর চেপে না বসলেই হলো।' পঞ্চমী হারমো-নিয়মটা শতরঞ্জির শেষ সীমায় টেনে নিয়ে গেল, 'ওখানে আবার পবনদার ডুগি তবলা বসবে। কিন্তু দ্যাখ্, পবনদা, তুই যেন আমার গানের সঙ্গে তবলা বাজাসনি।'

পবন বললো, 'তা হলে কার গানের সঙ্গে তবলা বাজাবো?'

ষষ্ঠী মাদুর এনে শতরঞ্জির পাশে বিছিয়ে দিল। বসবার জায়গা হয়ে গেল অনেকখানি। তবে ঘরে ঢোকার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। অবিশ্যি কেউ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে এলে, পুবের দাওয়ায় উঠে, তক্তপোশের পাশ দিয়ে এসে ঢুকতে পারবে। পঞ্চমী বললো, 'তা আমি জানিনে। তোর ওই ধে রে কে টে ধি ধাং-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি গাইতে শিখিনি, পারবও না।'

ইতিমধ্যে মালতীর সঙ্গে দুজন এসে হাজির। দুজনের মুখ দেখেই চিনতে পারলাম। একটি বালিকা, অপরটি তরুণী, দুটি মুখই ঠাকুর দালানের চত্বর থেকে, উত্তরের উঁচু ঘরের জানালায় দেখেছিলাম। মুখের আদলে আশ্চর্য মিল, কেবল বয়স আর বর্ণের যা তফাত। কিন্তু হারিকেনের আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দুজনের কেউ চোখে কাজল টানেনি। অথচ হরিণী চোখ বলতে যদি কিছু বোঝায়, সেই হিসাবে উভয়েই মৃগনয়না। বালিকাটির বয়স রাধার থেকে দু এক বছরের বড় হতে পারে। ওর নামই নিশ্চয় ধীরা। আর একজন কী রাণীদি? তিনি ঘোমটা টানেননি বটে, কপালেও নেই সিঁদুরের টিপ। কিন্তু ওর চুলের সিঁথেয় সিঁদুরের রেখা স্পষ্ট। দু হাতে শাঁখা আর লোহাও আছে। আর কোনো অলংকার নেই। মাথার চুলে খোঁপা বাঁধা আছে, কিন্তু তেমন তৈলাক্ত না। তাঁর কুরঙ্গিণী চোখের তারায়, অনধিক পাতলা ঠোঁটের ব্রীড়াজড়িত হাসি মুখে, কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্যের ছায়া পড়েছে। নিতান্ত হাতে কাচা সামান্য একটি, প্রায় মলিন লাল পাড় শাড়ি আর লাল জামা ওঁর গায়ে। আবছা মেঘের আড়ালে রোদের মতনই, ওঁর

ছিপছিপে শরীরে, তারুণ্যের লাবণ্য মেদবর্জিত আর শ্রীময়ী। বয়স অনুমান করতে পারি না। মমতার থেকে খুব বেশি বড় কী?

ধীরা ওর বালিকা বয়সে, রীতিমতো উজ্জ্বলা। দাওয়ার নিচে থেকেই ডুগি তবলা তুলে দিল পবনের সামনে। শঙ্কর ডাকলো, 'আসুন রাণীদি, বসুন। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'এই একটু ঘরের কাজ নিয়ে ছিলাম।' রাণীদি লাজে হেসে বললেন।

মালতী বললো, 'কেন মিছে বলছিস রাণীদি। আমি গিয়ে দেখলাম, তুই অন্ধকার ঘরে চুপটি করে বসে আছিস। পাশে ধীরা শুয়ে।'

রান্নাঘরের ওদিক থেকে মমতার স্বর ভেসে এলো, 'নতুন মানুষ দেখে, রাণীদি লজ্জা পেয়েছে।'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আমাকে দেখিয়ে বললো, 'রাণীদি, আমার বন্ধু।'

'জানি।' রাণীদি একবার চোখ তুলে আমার দিকে দেখলেন, মুখে হাসিটি লেগেই ছিল।

কী আশ্চর্য আমার ভাগ্য. রাণীদি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন না। এমন একটা অপোশাকী ব্যাপারের মাধুর্য, এরকম মুখোমুখি হাসি বিনিময় ছাড়া, কোথাও মেলে না। আমি এক মুহূর্তেই যেন সহজ হয়ে গেলাম. ডাকলাম, 'আসুন রাণীদি, বসুন।'

বয়স রাণীদির যাই হোক, শঙ্করের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। অতএব আমারও তিনি রাণীদি। বললেন, 'এই যে বসছি। একবার ওদিকটা ঘুরে আসি।' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

পবন হাঁকলো, 'এই ধীরা, ডুগি তবলার বিঁড়ে আনিসনি? শীগগির নিয়ে আয়।'

ধীরা ওর সেই কালো মুখ চোখে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকালো। একটু বা উদ্বেগও সেই দৃষ্টিতে, বললো, 'ওই যা, একদম ভুলে গেছি। যা অন্ধকার, তোমার ডুগি তবলা খুঁজে বের করতেই হিমসিম খেয়ে গেছি।'

'কেন, ঘরে আলো জ্বলছে না?' পবন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

ধীরা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো, কোনো জবাব দিল না। পবন বললো, 'বুঝেছি। ঘরে এক ফোঁটাও কেরোসিন তেল নেই বুঝি? আমাকে ওবেলা বললে, বিজয়ের দোকান থেকে এনে দিতাম।'

কোথায় যেন একটা বেসুর বেজে উঠলো। আমি চকিতেই একবার পরনের ধুতি পাঞ্জাবি আর পাট করা চাদরখানির দিকে দেখে নিলাম। জীবনে

খোলস তো কিছু কম দেখিনি। কিন্তু কেরামতুল্লার ছাত্রটির বাড়িতে, একফোঁটা কেরোসিনের অভাবে রাত্রে ঘরে আলো জ্বলেনি, কথাটা যেন বুকের কোথায়, শক্ত কিছু দিয়ে চেপে ধরলো। হয়তো, এটা আমার চিন্তারই বাড়াবাড়ি, কারণ পবন সোৎসাহে বললো, 'মাতুর কাছ থেকে আজ রাত্রের মত এক লম্ফ তেল ধার নিয়ে যা। তার আগে বিঁড়ে ছুটো নিয়ে আয়। এই যে, আমার টর্চটা নিয়ে যা।' পকেট থেকে টর্চটা বের করে ধীরার দিকে এগিয়ে দিল।

ধীরা টর্চ লাইট নিয়ে, বোতাম টিপে আলো জ্বেলে, বাইরের দরজার দিকে চলে গেল। ইতিমধ্যে রাণীদি রান্নাঘরের দিক থেকে এগিয়ে এসে মাটিতে পা ঝুলিয়ে দাওয়ার একপাশে বসলেন। মালতী এখন আমার বাঁয়ে, শঙ্করের ডাইনে। বললো, 'রাণীদি, তুই এদিকে এসে বোস।'

রাণীদির মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে, যা না থাকলে, ওঁর মুখের সবটুকুই হয়তো মেঘে ঢেকে যাবে। অথচ হাসিটি করুণ বৈরাগ্যে ভরা। বললো, 'বেশ আছি ভাই, তোরা বোস।'

পবন নিজেব হাঁটুতে চাপড় মেরে বললো, 'নে পঞ্চী, শুরু কর। তোব বেতালা গান আগে হয়ে যাক, তারপরে তাল নিয়ে বসবো।'

পবনের বলার অপেক্ষাতেই যেন পঞ্চমী হারমোনিয়মের সামনে বসেছিল। দেখলাম, ওর মুখ নত, চোখের দৃষ্টি হারমোনিযমের দিকে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। হারিকেনের সলতে স্থিব অকম্পিত। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। হারমোনিয়ম বেজে উঠলো। বেজে উঠলো এত জোবে, প্রায় চমকিয়ে উঠলাম। চমকিয়ে উঠলো যেন, এই প্রথম রাতেই নেমে আসা গ্রাম্য নিশুতি। অথচ দেখছি হারমোনিয়মের রিডের গোড়া যথাযথ ঢাকা দেওয়া আছে। পঞ্চমী কী একটা গানের সুর বাজিয়ে চলেছে, ধরেও যেন ধরতে পারছি না। হঠাৎ হঠাৎ চেনা লাগছে, অথচ চিনতে পারছি না। কিন্তু বেশিক্ষণ ধন্দে ভুগতে হলো না, পঞ্চমী গান ধরলো, 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে না শুকনো ফুলের মত। কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মত।'

যদি প্রশ্ন করো, গলাখানি কেমন, তবে জওয়াব হলো, রেওয়াজ করা সাধা গলা তো না। সারাদিন জল ঘাঁটাঘাঁটি, আর অষ্টপ্রহর হাঁকডাক বচনবাচন লেগেই আছে। ফলে, সুরেলা চাঁছাছোলা গলা যে হবে না এটা ধরেই নেওয়া যায়। সুর? নিখুঁতের আশা করা অর্থহীন। পঞ্চমীর গান শুনে নিজের গলায় তুলে নেওয়ার নিজস্ব পদ্ধতির কথা আগেই বলেছি। গায়কী? হ্যাঁ,

আমারও মনে হলো, ও কেন যে রবিঠাকুরের গান গাইতে গেল। একে তো এসব গানের আধুনিক সংস্করণ নানা গলায় শুনে শুনে কান পচে গিয়েছে। তার জন্য গানটির কোনো ক্ষতি হয়নি, নামী গায়কেরা গানটির আসল রূপকে নিজেদের বিকৃতি দিয়ে বিকৃত করেছে। আধুনিক গানের গলা কাঁপানিটা যে কে আবিষ্কার করেছিল, কে জানে। তবু পঞ্চমীকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। কিছু কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হলেও ও পুরো গানটি, একবারও না থেমে শুনিয়ে দিল। তবে হারমোনিয়মটার কর্কশ আওয়াজ থেকে থেকেই ওর গলাটা ছাপিয়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে ধীরা ডুগি তবলার বিঁড়ে পৌঁছে, আবার কেরোসিন তেল ধার করে বাড়ি চলে গিয়েছে। বুঝতে পারছি, পবনের হাত নিশপিশ করছে। সে বাঁয়া তবলার গোটা কয়েক বোল বাজিয়ে বললো, 'এসব গানে আসর জমে না। এক আধটা গজল ঠুংরি না হলে হয় ?'

আমি বললাম, 'এ গানটাও ভালো হয়েছে।'

পঞ্চমী লজ্জায় আড়ষ্ট হলেও, চোখের কোণে আমার দিকে তাকালো, 'মোটেই নয়, মিছে কথা বলছেন।'

'মিছে বলবো কেন ?' বললাম, 'তবে তোমার হারমোনিয়মের শব্দটা আর একটু কম হলে ভালো হয়। কীর্তন বাউল-টাউল কিছু জানা নেই ? তাই ধরো না।'

পঞ্চমী ঘাড় বাঁকিয়ে তেরছা চোখে তাকালো, 'আপনি বুঝি আমাকে তেমন গাইয়ে ভেবেছেন ? কটা গানই বা আমি জানি ?'

'কেত্তন তো জানিস।' রাণীদি বললেন, মুখে সেই হাসি।

পঞ্চমী তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললো, 'হারমোনিয়ম বাজিয়ে কেত্তন গাইতে পারিনে।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বলতে গেলাম, হারমোনিয়ম ছাড়াই গান হোক। তার আগেই পবন বলে উঠলো, 'অ্যাঃ, হ্যাঁ, মনে পড়ে গেছে রে পঞ্চা। তোর সেই গানটা গা তো, ঠুংরির আমেজ আছে, তালেও ভালো মেলে, সেই গানটা-গা।'

'কোনটার কথা বলছিস ?' পঞ্চমী ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে নিজেও স্মরণ করার চেষ্টা করলো।

পবন হাত তুলে বললো, 'আরে সেই গানটা রে, যেটা বেশ তালে তালে গাইতে প্যারিস।'

পঞ্চমী কয়েক মুহূর্ত পবনের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ হেসে আমার দিকে দেখলো। তারপরে মাথা নিচু করে, হারমোনিয়মের বেলো চেপে রিডে আঙুল টিপলো। আমার কথাটা দেখছি মনে আছে, হারমোনিয়মের আওয়াজ করলো আস্তে, গানের সুর বাজালো, তারপরেই গাইলো, 'আমি যাব না, যাব না যাব না ঘরে। বাহির করেছে পাগল মোরে।'

পঞ্চমীর গলার স্বরটা নতুন করে তৈরি করবার কিছু ছিল না। কিন্তু গানটা গাইলো প্রায় নিখুঁত। আর পুরোপুরি তাল মিলিয়ে। গানের মধ্যেই লক্ষ করেছি, সুমতির হাত ধরে পিসিমা এসে, দাওয়ার একপাশে বসছেন। পবনের তবলা বাজিয়ে সুখ হয়েছে। আমি বললাম, 'সাধু সাধু। পঞ্চমী, খুব ভালো গেয়েছো।'

'আহা, শিবুটা নেই এ সময়ে।' পিসিমা তাঁর নিজের মনেই আছেন, 'সে থাকলে বড় খুশি হতো। এসব নিয়ে থাকতেই তো সে ভালবাসে।'

পিসিমার কথা শেষ না হতেই, বাইরের দরজার কাছে, মহাশঙ্খনাদের মতন, পুরুষের মোটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'কালভৈরব। কালভৈরব কোথায় গেলি।'

একটা কুকুরের গোঙানি শোনা গেল। মুহূর্তেই আসরের চেহারা গেল বদলিয়ে। সকলেই যেন উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো অন্ধকার উঠোনের দিকে। কারো মুখে একটি কথা নেই। কেবল পবন বলে উঠলো, 'যাহ্ শালা, হয়ে গেল!'

সকলের সঙ্গে আমিও তাকিয়ে দেখলাম. দীর্ঘ দেহ এক পুরুষমূর্তি বাইরের দরজার অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মতন ভেসে উঠলেন। এগিয়ে এলেন আস্তে আস্তে দাওয়ার দিকে। মূর্তি কিছু স্পষ্টতর হলো, তাঁর গায়ে একটি সামান্য সুতীর চাদর। ধুতি উঠেছে প্রায় হাঁটুর কাছে। খালি পা। মাথার চুল ধূসর। খুব স্পষ্ট না দেখতে পেলেও, মনে হলো গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। কিন্তু কয়েকদিন বোধহয় কামানো হয়নি। গলার স্বরে 'কালভৈরব' ডাক শুনে কাপালিক বলে সন্দেহ হয়েছিল। জামাকাপড় দেখে সেরকম কিছু মনে হলো না। তবে পাশে একটি কালো কুচকুচে কুকুর, তার চোখ দুটো হারিকেনের আলোয় চকচক করছে। সে আমাদের দিকে তাকালেও বারে-বারেই দীর্ঘমূর্তির হাত চেটে দিচ্ছিল। দীর্ঘমূর্তি ধমক দিলেন, 'আহ্, কাল-

ভৈরব, এখনো কি বাবা আমার হাতে প্যাজ মুড়ির গন্ধ আছে?’

‘এ্যাজ্ঞে?’

দীর্ঘ মূর্তির জিজ্ঞাসার জবাবে মনুষ্য কণ্ঠ শুনে, আমি চমকিয়ে অবাক চোখে কুকুরটার দিকে তাকালাম। এখানে কি কুকুরেও কথা বলে? মুহূর্তেই আমার তীব্র সন্দেহের নিরসন করে, দীর্ঘমূর্তির পিছন থেকে একটি কালো কুচকুচে মানুষের মুখ উঁকি দিল। তার পরনে আদৌ কোনো বস্ত্র আছে কী না, বুঝতে পারলাম না। এক বস্ত্রেই তার সারা গা আর উরতের অনেকখানি উঁচু পযন্ত ঢাকা। কালো মুখটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, বোধহয় চুলও কুচকুচে কালো। দীর্ঘমূর্তির পাশে তার খাটো মূর্তি অনেকটা বামনের মতন দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটোও কুকুরের মতনই যেন চকচক করছে।

দীর্ঘমূর্তি গুরুগম্ভীর স্বরে ধমকে দিলেন. ‘হারামজাদা তোকে বলেছি? আমি কাল‌ভৈরবকে বলেছি।’

নিশ্চয়ই কুকুরটির নাম কালভৈরব। কারণ নামোচ্চারণ মাত্রই সে গলা থেকে গোঙানো শব্দ বের করে, আবার দীর্ঘমূর্তির হাত চেটে দিল।

প্রথমে মুখ খুললেন পিসিমা, ‘করালী নাকি রে?’

‘হ্যাঁ দিদি।’ করালী নামক দীর্ঘমূর্তি জবাব দিয়ে আরও দু পা এগিয়ে এলেন, ‘শুনলাম শঙ্কর এয়েছে তার এক বন্ধুকে নিয়ে। ভাবলাম, যাই একটু দেখা করে আসি।’

মহাশঙ্খনাদের মতন স্বর বটে, কথাগুলো যেন তেমন স্পষ্ট না। পঞ্চমী আমার কানের কাছে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, ‘পবনদার বাবা, করালীকাকা গিলে-কুটে এয়েছে, বুঝতে পারছেন তো?’

‘গিলে-কুটে?’ আমি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সেটা কী?’

পঞ্চমী ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললো, ‘আহা বুঝতে পারছেন না? মদ গিলে এয়েছে।’

আমারই বোঝা উচিত ছিল, করালীকাকার গলার স্বরে মহাদ্রব্যের গুণ বিরাজ করছে। রাণীদি বলে উঠলেন, ‘তা তুমি আবার এ সময়ে আসতে গেলে কেন বাবা? কাল সকালেই তো আসতে পারতে। শঙ্কর আর তার বন্ধু তো রাত্রেই পালিয়ে যাচ্ছিল না।’

‘ভাখ তো দিদি, একি একটা কথার কথা হলো?’ করালীকাকার গুরু-গম্ভীর স্বরে বিমর্ষতা, ‘জামাই এয়েছে, বন্ধু এয়েছে, সবাই বসে গান বাজনা করছে, আর আমি একবারটি আসবো না?’

পিসিমা যেন ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে বললেন, 'আসবি বই কী ভাই, আসবি না? শিবুটা নেই, কিছু জানতেও পারলে না। দে লো, করালীকে একটা বসবার জায়গা করে দে।'

করালীকাকা মুহূর্তে একবার টললেন, তারপরেই সিঁড়ি টিঁড়ির ধার না ধরে, নিচে থেকেই দাওয়ায় পা তুলে দিয়ে উঠে এলেন। উঠলেন একেবারে পবনের কাছেই। পবন শঙ্করের দিকে খানিকটা ছিটকে সরে গিয়ে রুষ্ট স্বরে ঝেঁজে বললো, 'তোমার ওই ময়লা পায়ে আমার জামা কাপড় মাড়িয়ে দিও না।'

মালতী তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গেল, আর ঝটিতি একখানি আসন এনে, শতরঞ্চির পশ্চিমে পেতে দিয়ে বললো, 'বস কাকা।'

'বসছি রে, বসছি।' কবালীকাকা বললেন, 'কই শঙ্কর আর তার বন্ধু কোথায় গেল?'

শঙ্কর তাড়াতাডি উঠে, হাত বাড়িয়ে করালীকাকাকে প্রণাম করে বললো, 'এই যে আমি। কেমন আছেন কাকা?'

'সাত বিঘের বর্গায় যেমন থাকা যায়, তেমনি আছি বাবা।' করালীকাকা বললেন, 'তোমার কাছে তো লুকো ছাপা কিছু নেই।' বলেই হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন, 'তা বাবা সত্যি কথা বলতে কি, বেশ আছি। ভালই আছি? আমার থেকে অনেকে আরো খারাপ আছে। সেটাও দেখতে হবে তো? না কি বল বাবা? অ্যাঁ? দিদি কী বল?'

করালীকাকার হাসি শুনে, কালভৈরব প্রথমে গুড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়লো বারকয়েক, তারপরে লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে, তাঁর হাত চেটে দিল। সেই কালো মূর্তিটির সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় হাসছে। পিসিমা বললেন, 'সে তো সত্যি কথা ভাই। লোকের দুঃখের কি শেষ আছে?'

'এ্যাই, এ্যাই যা বলেছ।' করালীকাকা হাত মেলে ধরে বললেন, 'যার শেষ নেই, তা নিয়ে খারাপ থেকে লাভ কী?'

'অ্যাঁ? কই হে শঙ্কর, তোমার বন্ধু কোথায়?'

মানুষটির প্রাণখোলা হাসি আর কথায়, আমার কেমন যেন ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে। দুঃখী হয়ে যারা দুখ তাড়ানি হয়, তাদের থেকে মনকাড়ানি মানুষ অনেক ভালো। আমি নিজেই উঠে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'আজ্ঞে এই যে আমি।'

'বাহ্, বেশ ছেলে।' কারালীকাকা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,

'কে যেন বলছিল তুমি আবার বই-টই লেখ। বাহ্, বেশ বেশ। তোমাদের মতন ছেলেরা গাঁয়ে এলে, গাঁয়ের ইজ্জৎ বাড়ে, কী বল দিদি, অ্যাঁ?

পিসিমা বললেন, 'তা বই কি। তুই বোস করালী। চা খাবি নাকি একটু?'

'চা? না না না।' যেন বিষ খাওয়ার কথা বলেছে, এমনভাবে মাথা নাড়লেন এবং তাঁর জন্য পেতে দেওয়া আসনে বসে আমাকে বললেন, 'ওঠ বাবা, তোমার জায়গায় বস।'

আমি সরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলাম। কালভৈরব করালীকাকার পাশেই পিছনের দু পায়ে ভর রেখে বসেছে। তার দাঁত আর লাল জিভটা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ছে। সেই গায়ে একখণ্ড বস্ত্র, কালো কুচকুচে লোকটি উঠোনের উপরেই উটকো হয়ে বসেছে। মুখে কোনো কথা নেই, কিন্তু তার সাদা দাঁতও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি পঞ্চমীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উঠোনে বসেছে, ও কে?'

'মহাদেবের নন্দী ভৃঙ্গি জানেন তো?' পঞ্চমী ফিসফিস করে বললো, 'ও হলো তারই একটি। ওর নাম গোবরা বাউরি। করালীকাকার রাতের দোসর।'

রাণীদি হঠাৎ এবার একটু যেন কাঁচের চুড়ির ঝনাৎকারে হেসে উঠলেন, 'যা বলেছিস পঞ্চী।'

পঞ্চমী হাসলো, কিন্তু আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। রাণীদি যে উৎকর্ণ হয়ে বা যে-ভাবেই হোক, আমাদের কথা শুনতে পেয়েছেন ভেবে লজ্জা পেলাম। আমি ওঁর দিকে তাকালাম। উনিও তাকিয়েছিলেন। হেসে মুখ ফিরিয়ে গোবরের দিকে, আবার পঞ্চমীর দিকে ফিরে বললেন, 'কী রকম ভুতের মতন বসে আছে দ্যাখ। তোদের খাওয়া পর্যন্ত বসে থাকবে হয়তো?'

এবার ষষ্ঠীর নিচু শক্ত স্বর শোনা গেল, 'ঠেঙিয়ে তাড়াবো।'

রাণীদি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই করালীকাকা বললেন, 'দিদি তুমি চায়ের কথা বললে, তার চেয়ে কিছু ভাজাভুজি এক আধটুকু পেলে খেতাম।'

'এখন ভাজাভুজি কিছু হবে না। চা আসছে।' ধীরা এবার বাপকে ঝেঁজে বললো।

রান্নাঘরের ওধারের আড়াল থেকে মমতার স্বর ভেসে এলো, 'দিচ্ছি

কাকা বস।'

'হা হা হা, শোন আমার মাতু মা কী বলছে।' করালীকাকা অট্ট হেসে, মহানাদে বেজে উঠলেন, 'কইরে পঞ্চী, তোরা কী গাইছিস, গা। নইলে আমার দিকেই হারমনিয়াটা এগিয়ে দে। আজ আমিই গাই।'

রাণীদি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মরেছে।'

শঙ্কর বলে উঠলো, 'এ খুব ভালো কথা। দাও পঞ্চী, হারমোনিয়মটা এদিকে দাও।'

মালতী আর ষষ্ঠী উঠে পড়লো। ধীরাও উঠে ওদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে চলে গেল। শঙ্কর নিজেই উঠে হারমোনিয়মটা দু হাতে তুলে, করালীকাকার সামনে বসিয়ে দিল, 'কাকা, এতবার এসেছি, আপনার এ গুণটা আছে কখনো বলেননি তো?'

'এসব কথা কি যেচে মেগে বলার কথা বাবা?' করালীকাকা বললেন, 'এক সময়ে যখন যাত্রা পালাটালা করেছি, তখন আমাদের একটা শ্যামাসঙ্গীতের দল ছিল, বুঝলে? করালী চাটুয্যের গান তখন সবাই শুনেছে। ওরে হ্যাঁ বাবা, মিছে বলবনি, তখন সাঁইত্রিশ বিঘে ছিল। বেচে খেতে খেতে এখন সাত বিঘেয় পৌঁছেছে। তা হোক, চলে তো যাচ্ছে। এখনো গাইতে সাধটাধ হয়। তা ছাড়া তোমার বন্ধু এয়েছে, গাই—।' কথা শেষ করবার আগেই, কালভৈরব মুখ বাড়িয়ে তাঁর গাল চেটে দিল।

জানি না, এ কালভৈরবের সন্তোষ প্রকাশের পদ্ধতি কী না। করালীকাকা আদরের স্বরেই যেন একটু বকলেন, 'আচ্ছা কালভৈরব, কী করচিস বাবা!'

কালভৈরব যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল। উঠোন থেকে শোনা গেল, 'এজ্ঞে।'

'এই গোবরা হারামজাদা! তোকে বলেছি কিছু?' করালীকাকা গর্জে ধমক দিলেন।

অন্ধকার উঠোনে একপাটি সাদা দাঁতের ঝলক। কোথায় যেন বামাকণ্ঠেই শোনা গেল, 'যমের অরুচি।'

রাণীদি বলেননি, সেটা লক্ষ্য করেছি। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখ টিপে হাসছে। পবনমোহন তার পিতার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখছে, এবং তার লম্বা নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। করালীকাকা বেলো চেপে, হারমোনিয়মে আওয়াজ তুলতেই, সুমতি এলো কাঁসার থালায় চায়ের কাপ নিয়ে। পঞ্চমীর সামনে থালাটা রেখে, দুটো আলাদা বাটিতে রাখা তেলেভাজা

দেখিয়ে বললো, 'একটা কাকা, আর একটা পবনদাকে দে। রাণীদি, তুমি রান্নাঘরে এস।'

রাণীদির মুখে সেই হাসি। এখন অনেকটাই আবছা। উঠে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। পঞ্চমী তেলেভাজার একটি বাটি তুলে, করালীকাকার দিকে এগিয়ে দিল। করালীকাকা বাজনা থামিয়ে বাটিটা নিয়ে শুঁকে বললো, 'বাহ্, মনে হচ্ছে বেগনি ভাজা। এসময়ে এসব বেশ মুখে রোচে।' বলে একটি তুলে মুখে দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাটিটা নিজের ডানদিকে রেখে একটি ভাজা দু টুকরো করে কালভৈরবের মুখের কাছে ধরলেন, 'নাও বাবা, তোমাকে আগে না দিলে, তুমি আমাকে খেতে দেবে না।'

কালভৈরব অতি ভদ্রভাবে, আলগোছে করালীকাকার হাত থেকে তেলেভাজাটি মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল। করালীকাকা বাকিটুকু মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। পঞ্চমী পবনকে তেলেভাজা আর চা দিল। আমাকে আর শঙ্করকে দিল চায়ের কাপ। এই সময়ে উঠোন থেকে আবার শোনা গেল, 'এজ্ঞে।'

করালীকাকা তখন আর একটি ভাজা তুলে মুখে দিয়েছেন। কিছু বলতে গেলেন, একটা গোঙানো শব্দ ছাড়া কিছু বেরলো না। সুমতি এক টুকরো শালপাতায় বোধহয় তেলেভাজা নিয়েই, গোবরের সামনে গিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এই নাও তোমার এঁজ্ঞে।'

অন্ধকারে সাদা দাঁতের ঝলক। মুখে কথাটি নেই। শালপাতাটি হাতে নিয়েই, তেলেভাজা মুখে পুরলো। কালভৈরব একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলো। করালীকাকা শেষ ভাজাটি ভেঙে, এক টুকরো কালভৈরবের মুখের কাছে বাড়িয়ে দিলেন, 'নাও, এই শেষ। এবার গান গাইবো!'

কালভৈরব আগের মতনই তেলেভাজার টুকরো মুখে নিল। করালীকাকা বাকিটা মুখে পুরে, হারমোনিয়মে আওয়াজ তুললেন। পঞ্চমীর থেকে তাঁর আঙুল রিডের ওপর কিছু দ্রুত, কিন্তু থেকে থেকেই আঙুল বে-ঘরে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাজিয়ে হাতটাকে বোধ হয় রপ্ত করে নিতে লাগলেন, নিজেই বললেন, 'অনেককাল হাত পড়েনি তো। যাই হোক, দিদি। তা হলে ধরি?'

এখনো দিদির অনুমতির অপেক্ষা? পিসিমা বললেন, 'ধর ভাই।'

করালীকাকা মহানাদে ধরলেন,

'বাগ্‌দিনী সাজ সেজে
চল মা আমার সঙ্গে চল।

হাতে সরা নে মা তারা

তাতে করে ছেচবি জল।’…

‘ছেচবি’ শব্দে কিছু কাজ ছিল, কিন্তু জল উচ্চারণ করতে কালভৈরব আর থাকতে পারলো না। করালীকাকার গাল চেটে দিল। করালীকাকার গানের আনন্দেই কালভৈরব বাহবা দিল কী না বুঝতে পারলাম না। তিনি বললেন, ‘কী হচ্ছে কালু, গাইতে দিবিনে ?’

কালভৈরবের এটা বোধ হয় ডাকনাম। সে লজ্জিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। করালীকাকা বললেন, ‘কইরে পবনা, বাজা।’

পবন চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, ‘তালটা অবশ্যি ঠিকই আছে।’ বলে মাথায় দু হাত মুছে, বাঁয়া তবলায় চাঁটি মেরে বোল তুললো। করালীকাকা আবার গোড়া থেকে ধরলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই কালভৈরবের গাল চাটা। এবার অবিশ্যি করালীকাকা থামলেন না। কোনোরকমে বাঁ হাতে বাঁ গালটা একবার মুছে নিয়ে, নতুন পঙ্‌ক্তি ধরলেন।

যদি কেহ শুধায় তোরে

ভোলানাথ তোর স্বামী

তুই গো তাদের (কালভৈরবের গাল চাটা)

তুই গো তাদের বলিস মাগো—

(কালভৈরবের গাল চাটা)

গিরি বাগ্‌দির (গাল চাটা)

গিরি বাগ্‌দির (গাল চাটা)

মেয়ে আমি।’—

কালভৈরব যেন ব্যাকুল সোহাগে বারে বারে করালীকাকার গাল মুখ চেটে দিতে লাগলো। করালীকাকা বললেন, ‘না, কালভৈরবটা গাইতে দেবে না।’

ঘরের মধ্যে তখন সমবেত চাপা খিলখিল হাসি শুনতে পাচ্ছি। তার জোয়ার লেগেছে রান্নাঘরের দিকেও। এমন কি দেখছি, পিসিমার মুখে থানের আঁচল চাপা, তাঁর শরীর কাঁপছে নিঃশব্দ হাসির বেগে। শঙ্কর বললো, ‘কালভৈরবকে একটু সরিয়ে দিলে হতো না ?’

হাসি একটা সংক্রামক রোগের মতন। আমার মধ্যেও সেটা তখন সংক্রামিত হয়েছে। উঠে পড়বো ভাবছি। করালীকাকা নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ও আমার সঙ্গ ছাড়বে না বাবা। আমার সাধন শোধন সিদ্ধিলাভ কিছুই নেই, কিন্তু কালভৈরব আমার সঙ্গে আছে। ওর জন্যেই লোকে

আমাকে বামাক্ষ্যাপা বলে ঠাট্টা করে, তবু ওকে আমিও ছাড়তে পারিনে। চলি শঙ্কর।'

'আজ্ঞে আসুন।' শঙ্কর একটু বেশি বিনীত হয়ে বললো।

'দিদি চলি।' করালীকাকা দাওয়া থেকে নিচে পা ঝুলিয়ে দিলেন।

পিসিমা কেবল শব্দ করলেন, 'হুঁ।'

'আজ চলি বাবা—কী যেন তোমার নাম। আবার কাল আসর করা যাবে।' আমার দিকে ফিরে বললেন।

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

করালীকাকা উঠোনে নেমে, রান্নাঘরের দিকে মুখ করে হাঁকলেন, 'নমি, মাতু, চলি গো মা।'

উভয়েরই জবাব এলো, 'এসো।'

'বাড়ি যাও এখন, আর কোথাও যেও না।' রাণীদির গলা শোনা গেল।

করালীকাকা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেল কালভৈরব আর গোবরা বাউরি। ঘরের ভিতরের হাসিটা দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়লো। আমার ভিতরের সংক্রামিত হাসির মধ্যেও কেন যেন, বাজে করুণ সুরে। সাঁইতিরিশ বিঘা থেকে সাত বিঘা, তাও বর্গাদার দিয়ে চাষ। কেরোসিন তেলের অভাবে ঘর অন্ধকার। করালী চাটুয্যে তারপরেও কিঞ্চিৎ দ্রব্য গিলেছেন। হা-হা করে হাসলেন। গান করলেন। কালভৈরব আর বাউরি সঙ্গীটিকে নিয়ে চলে গেলেন। এই প্রতিচ্ছবিটাই কি রাণীদির মুখের করুণ হাসির বৈরাগ্যের ছায়ায় ভরে থাকে? কিন্তু তিনি তো বিবাহিতা। কন্যাদের বিয়ে হয়ে গেলে, পিত্রালয়ের দুর্দশা তাদের কতোখানি স্পর্শ করে?

পবন তবলায় চাঁটি মেরে বোল তুলে বললো, 'শুনুন তা হলে লহরা।'··

•

রাত্রে শঙ্করের কাছ থেকে কিছু অজানা ঘটনা শুনলাম। তার সঙ্গে মিটলো কিছু কৌতূহল। আমরা দুজনে শুয়েছিলাম ঘরের খাটে। ঘরের গরমটি বেশ ওম দিচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল লেপ। মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে পঞ্চমী আর ষষ্ঠী। বাদবাকিরা সবাই চলে গিয়েছে পিসিমার বাড়ি। এক ঘরে সব রমণীকুল। সঙ্গে রাধা দুখুও। সেখানে যেমন বাইরের দাওয়ায় একজন তুলে পুরুষ শুয়ে আছে, এখানেও ঘরের বাইরে একজন মুনিষ কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

গ্রামের রাত্রের পক্ষে, রাত্রি এগারোটা অনেকখানি। ঝিঁঝির ডাকটা বোঝা যায় না, কারণ ওটা সময়ের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্ম হয়ে থাকে। তাকে আলাদা করা যায় না। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটু আগেই গল্প করতে করতে পঞ্চমী ঘুমিয়ে পড়েছে। ষষ্ঠীর অবিশ্যি লেপ মুড়ি দেবার অপেক্ষা ছিল। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। শঙ্করের মুখে প্রথম শুনলাম বড়দির কথা। এখানে না এলে হয়তো এসব কথা কখনো জানতে পারতাম না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, বড়দি পিত্রালয়ে বেড়াতে এসেছেন। এখন শুনলাম বেড়াতে না, বড়দি চিরদিনের জন্যই পিত্রালয়ে এসেছেন। যে নিষ্ঠুর কথাটা শঙ্করও স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করছিল, তা হলো, তিনি স্বামী পরিত্যক্তা। তাঁর স্বামী আবার বিয়ে করেছেন। ঘটনা অনেক আগের। যখন এদেশে হিন্দু পুরুষের বহু বিবাহে বাধা ছিল না তথাপি হয়তো বড়দি স্বামীর ঘরেই থাকতেন। কিন্তু অপমান আর পীড়নের একটা সীমা আছে। তা ছাড়া চাটুয্যেমশায়ের পক্ষে, কন্যার দুর্গতি সহ্য করাও সম্ভব ছিল না।

বড়দির তবু দুটি সন্তান আছে। পিত্রালয়ের অবস্থা এমন না যে, দুবেলা দু মুঠো জোটে না। দুধে ভাতে না থাকলেও বাঙালীর ডালে ভাতে আছেন। রাধার বিয়ে হয়তো আটকাবে না। দুখু একদিন বড় হবে, ভবিষ্যতের সে-আশাও তাঁর বুকে অনেকখানি বল।

কিন্তু রাণীদির সংবাদ অনেকটাই অস্পষ্ট, ঝাপসা, অথচ অনেক বেশি মর্মান্তিক। ওঁর বয়স মমতার থেকে কয়েক বছর বেশি, কিন্তু বড়দির থেকে অনেক ছোট। পবন মমতা এরা সমবয়সী। পবনের দিদি হিসাবেই রাণীও অতএব দিদি। কতো ওঁর বয়স হতে পারে? পঁচিশের বেশি না সম্ভব। বিয়ে হয়েছিল বছর আটেক আগে। কিংবা দশ। শঙ্করের পক্ষে যথাযথ বছরের হিসাব বলা সম্ভব না। বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে পুরো সাত রাত্রিও কাটেনি। করালীকাকার জমিই একমাত্র সম্বল। এমন লেখাপড়া করেননি, বাইরে চাকরি করবেন। মানুষ হিসাবেও তিনি পুরোপুরি গ্রাম্য। বাইরে কোথাও যাননি। হয়তো জীবনে দু-একবার কলকাতায় গিয়েছেন। অথচ কলকাতা এমন কিছু দূরে না। কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে তাঁকে জমি বাঁধা রাখতে হয়েছিল। বিক্রির থেকে বাঁধা রাখা কথাটার মধ্যে একটা ভবিষ্যতের আশা থাকে। করালীকাকার ক্ষেত্রে সেটা দুরাশা মাত্র।

আজ প্রথম রাত্রের আসরেই শুনেছি, করালীকাকার সাঁইত্রিশ বিঘার পৈতৃক জমি এখন সাত বিঘায় এসে ঠেকেছে। যা একবার যায়, তা আর ফিরে

আসে না। অভাব অনটনে অসুখে বিসুখে, টাকার প্রয়োজন হলেই জমির দিকে হাত বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। এক্ষেত্রে বন্ধকের আর এক নাম, চিরদিনের জন্য হাতছাড়া। কিস্তিবন্দী সুদ এক সময়ে আসলকে ছাড়িয়ে যায়। তার চেয়ে বিক্রি করা নিরাপদ। এটা হলো অভিজ্ঞতার কথা। গ্রামের এরকম অজস্র মধ্যস্বত্বভোগীদের—জমিই যাঁদের একমাত্র সম্বল, তাদের কোন শ্রেণীতে ফেলে বিচার করতে হবে, আমি জানি না। এই সব মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্রলোকদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা নেই। এরা কেন লেখাপড়া শেখেনি, কেন কলেকারখানায় কাজ করতে ছুটে যায়নি, কেন এদের উদ্যম উৎসাহ কিছু নেই, এরকম হাজারটা জিজ্ঞাসা তোলা যায়। যদিও জানি, আমাদের শহর আর শিল্পাঞ্চলগুলোতে কাজের অভাবে, বেকারবাহিনী একটা বিভীষিকাময় সমস্যা। এ দেশে কাজ করবো, কাজ চাই বললেই, কাজ জোটে না। তবু এই যুক্তিতে অনেকেই করালীকাকাকে ক্ষমা করতে চাইবে না।

করালীকাকাই কি ক্ষমার প্রত্যাশা করেন? তাঁকে অল্প সময়ের জন্য যেটুকু দেখেছি, যেটুকু কথা শুনেছি, মনে হয়েছে, এই ভয়ঙ্কর আর অসহায় সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি এক ঘরবিবাগী নির্বিকার মানুষ। ত্রিকালজ্ঞ হয়তো তিনি নন। কিন্তু তিনি অতীত দেখেছেন, বর্তমানকে দেখছেন, ভবিষ্যৎকেও হয় তো দেখতে পান। বিকার যদি তাঁকে স্পর্শ করে, তাহলে তাঁকে উন্মাদ হয়ে পথে পথে ফিরতে হয়। অতএব, বর্তমানের বর্গা দেওয়া সাত বিঘা, আর যৎসামান্য পুরোহিতবৃত্তি, এই তাঁর সম্বল।

কিন্তু রাণীদিকে নাকি তিনি বেশ কিছু জমি বাঁধা রেখে মোটামুটি ভালো ভাবেই বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বন্ধকী জমি কোনো কালেই আর তাঁর হাতে ফিরে আসেনি। বন্ধকী তমসুকের কাগজপত্র জমির মতনই অনেককাল আগে ছেঁড়া হয়ে গিয়েছে। অথচ, বিয়ের পরে পুরো সাত রাত্রিও স্বামীর ঘরে না কাটাতে পেরে মাত্র এক বস্ত্রে, নিরাভরণা রাণীদি পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিলেন। কেন? সে-কথা শঙ্কর যথাযথ বলতে পারলো না। কিন্তু তার সুরাহা আর বিচার? কে করবে? এ সংগ্রামের নাম তো টাকা উকীল কোর্ট কাছারি। এ রঙ্গ ভরা দেশে আমরা কতো রঙ্গের কথাই বলি। নিজের বয়সের সঙ্গে ধাপে ধাপে হিসাব মিলিয়ে মানুষের দুর্দশা ক্রমবর্ধমান ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পাইনি। অথচ সুদশার স্বপ্ন প্রতিদিন নানাভাবে ঘোষিত হচ্ছে। বোধহয় হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আশার কথা শুনে আসছে। আর কিছু আশা পোষণও করে। এই আশাটুকু না থাকলে জীবনে বোধহয় আর কিছুই থাকে

না। সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সকলে তো করালীকাকার মতন নির্বিকার থাকতে পারে না।

অবিশ্যি সহায় সম্বলহীন নির্বিকার মানুষ আমি আরও অনেক দেখেছি। অথচ সংগ্রামের অভাব কী? ক্লেদাক্ত জীবেরা অনেক জাদু জানে। এক বিঘাকে রাতারাতি দশ বিঘা করার অবাক খেলা অনায়াসে তারা খেলতে পারে। সেটাও একরকমের সংগ্রাম। তার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে, তারা আর যাই হোক, অনাহারী দরিদ্রেরা না। গভীর পরিখায় ডুবে থাকা চোখে, তারা কেবল অসহায় অবাক দৃষ্টিতে এই জগতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ঢাক অন্যদের কাঁধে, পেটাচ্ছে অন্যেরা।

কিন্তু এসব কথা আমার বলবার না। কারণ, আমি একান্ত নিঃসম্বল না হয়েও অসহায় অবাক চোখে এই জীবনের দিকে তাকিয়ে আছি। অন্তরের গভীর থেকে নির্বিকার থাকতে পারি না।' অথচ মুখ খুলতে গেলে দেখি, ভ্রূকুটি ক্রুদ্ধ চোখ রাঙানি। কারণ অপকার করার জন্য তো কেউ দেশের ধন নিয়ে বসে নেই। উপকারের জন্যই তাদের যতো উদ্ধত আস্ফালন। এখানে তুমি কে বটে? পথ দেখ হে, পথ দেখ। ওঁয়াদের কাজ ওঁয়াদের করতে দাও। সেই কাজের ঘরে তোমার যদি কিছু দান দেবার থাকে, দিয়ে যাও।

অতএব পথ দেখি। শঙ্করের মুখে রাণীদির কথা শুনে, তাঁর চেহারাটি বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। রাণী? কী আশ্চর্য নাম। হয়তো হৃদয়-রতন ধনে তিনি রাণী। তাঁর কাজল কালো চোখ, একদা স্বর্ণা, বিবর্ণ মুখের করুণ বৈরাগ্যের হাসিটিই যেন হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। বলতে ইচ্ছা করে অনেকটা সেই গানের মতন, 'জানিনে তোর ধন, রতন, আছে কী না রাণীর মতন, শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।' ...হ্যাঁ তাঁর নিরাভরণ, অতি আটপৌরে প্রায় মলিন বসনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধতা আছে। এখন মনে পড়ছে, তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, মেঘে ঢাকা রোদের মতন, তাঁর স্বাস্থ্যের লাবণ্য যেন চাপা পড়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, সিঁথের সিঁদুর হাতে শাঁখা নোয়া নিয়েও রাণীদি এক কুমারী কন্যা।

জানি না, কী কারণে বিয়ের মাত্র সাতদিনের মধ্যেই একটি নববিবাহিতা কন্যাকে এক বস্ত্রে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তখনও নিশ্চয় তাঁর অঙ্গে নববিবাহের গন্ধ লেগেছিল। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে, সেই স্মৃতির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর কি সাধ হয় না, জীবনকে নতুন প্রবাহে চালিত করেন? নিরালা বনে একাকী ফুটে থাকা এই পুষ্পটিকে ঘিরে কি কোনো

অলি গুনগুন করে ফেরে না? না কি সেখানেও এই গ্রাম-সমাজ ছায়ার মতন তাঁর পিছে পিছে ফিরছে?

জানি না, বুঝি না কিছুই। নানা চিন্তা আর অনুমান সকলই বৃথা। একটা অসহায় ব্যাকুল জিজ্ঞাসার মধ্যে, রাণীদির মুখটি চোখের সামনে মাঝে মাঝে ভেসে উঠবে। কিন্তু সেই রূপসী রমণীটি কে? যিনি শঙ্করকে, আমাকেও বাবা বাছা বলে সম্বোধন করছিলেন? পঞ্চমী প্রায় ধমকেই যাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল, যাঁকে, তারপরে আর একবারও দেখতে পাইনি? আমি শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর প্রথম কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেও, পরে বললো, 'উনি আমার শাশুড়ী।'

আমি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে ঝটিতি উঠে বসলাম। শঙ্করের এক এক সময়েব ঠাট্টার তুলনা থাকে না। কিন্তু এমন একটা বিষয় নিয়ে কি ও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবে? আমি অবাক সন্দিগ্ধ চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ঘরের এক কোণে হারিকেনের সলতে কমানো ছিল। সেই আলোয় আমি ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি ও চোখ তাকিয়ে রয়েছে। বললো, 'খুব অবাক হচ্ছিস তো? আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম। তার চেয়ে বেশি, মনটা বেশ বিগড়ে গেছল। শ্বশুরমশাই সম্পর্কে আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছল। ওরকম একজন ভদ্রলোকের, এ আবার কী কীর্তি?'...

জীবনের নানান ঘটনায় আমরা অবাক হই। কেন না, আমাদের চলতি ছকে মেলে না। কিন্তু আমাদের জীবনের চারপাশে, চলতি ছকের মধ্যেই কতো অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে আমরা নজর করে দেখি না। সম্ভবত এই কারণেই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটির উদ্ভব হয়েছিল, লাইফ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। আমার চোখের সামনে চ্যাটুয্যেমশায়ের চেহারাটা ভেসে উঠলো। সেই সঙ্গে তাঁর আচরণ কথাবার্তা যেন সর্বদাই মানুষটির কোথায় একটা উৎকণ্ঠা জেগে আছে। অথচ নিরীহ, অমায়িক, অকপট হৃদয়বান একটি ভদ্রলোক। যাঁর স্বাস্থ্য ও চেহারায় ইতিমধ্যে প্রৌঢ়ত্বের অধিক বার্ধক্যের ভার নেমে এসেছে, তাঁর চলাফেরার মধ্যেও যা স্পষ্টতর, যিনি নিজেও কথায় কথায় নিজের অশক্ত অক্ষমতার কথা বলে থাকেন, বিশেষ করে এখনো চারটি অবিবাহিতা কন্যা যাঁর গলায় ঝুলে রয়েছে, তাঁর এই বয়সের দ্বিতীয় পত্নী?

এ সংসারে নিবৃত্তি শব্দটির বহুতর ব্যাখ্যা আছে। দুরন্ত প্রবৃত্তিরও বহু বিচিত্র প্রকাশ দেখেছি। কিন্তু চাটুয্যেমশায়ের সঙ্গে সে-সব কোনো কিছুকেই যেন মেলাতে পারছি না। তাঁকে দেখে আমার কেবল মনে হয়েছে, কন্যাগতপ্রাণ অসহায় পিতা, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সর্বদাই উদ্বিগ্ন। তাঁর সেই মূর্তি আর চরিত্রকে আমি কোনোক্রমেই মুখোশ আঁটা বলে ভাবতে পারি না। তাঁর পাশে, সেই রমণীকেও একটা অতি অবাস্তবতার প্রতিমূর্তি ছাড়া কিছু ভাবা সম্ভব না বললাম, 'শঙ্কর, আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করার মতন কথা এটা নয়, তবু ঘটনাটা বাস্তব।' শঙ্করকেও বালিশের তলা থেকে নস্যির ডিবা বের করে উঠে বসে নাকে গুঁজতে হলো। তাকিয়ে দেখলো একবার ঘুমন্ত পঞ্চমী আর ষষ্ঠীর দিকে। তাবপরে বললো, 'আমার মতে, সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই শ্বশুরমশাইয়ের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল। পিসিমা বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ তাঁকে এই বিয়ের জন্য উসকোয়নি। মমতার মা মারা যাবার পরে পিসিমাই তাঁর ভাইঝিদের সব দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সে-কথা তুই অনেকবার শুনেছিস। হয় তো এ ঘটনার জন্য অপরকে দায়ী করার কোনো মানেই হয় না, লোকেও বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, এ প্রবাদটা বোধহয় একেবারে মিথ্যা নয়।'

আমি বললাম, 'আর একটু খুলে বল।'

'হ্যাঁ, বলবো বলেই তো উঠে বসলাম।' শঙ্কর বললো, 'তোকে না বলার কোনো কারণই নেই। আমি না বললেও, হয় তো আমার শ্বশুরমশাই তোকে নিজেই ভবিষ্যতে বলতেন। ঘটনাটা হলো, তিনি যে-অফিসে কাজ করেন, সেই অফিসের এক সহকর্মী, আমার এই শাশুড়ীর গ্রামের লোক। এই বর্ধমান জেলারই এক গ্রাম। সেই সহকর্মীটি প্রথম আমার শ্বশুরমশাইকে একটি পুত্র সন্তানের লোভ দেখান। আমার মনে হয়, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশতার মূলে ছিল একটি বংশধরের আকাঙ্ক্ষা। আর এ আকাঙ্ক্ষাটা আমার তোর মন দিয়ে বিচার করলে হবে না। শাস্ত্রবাক্যে বলেনি, কন্যার্থে ক্রিয়তে ভাযা। বলেছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। বুঝতেই পারিস, এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে আমাদের হাজার হাজার বছরের ধ্যান আর ধারণা। আসলে কিন্তু সহকর্মীটিব উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। আমার শাশুড়ীর কিছু জমিজমা আছে, যার ভাগীদার হতে চেয়েছিল সহকর্মীটি। আমি ভেতরের সব ব্যাপারটা না জানলেও এটা জানি, আমার শাশুড়ী তাঁর এই রূপ স্বাস্থ্য নিয়েও প্রায় অরক্ষণীয়াই ছিলেন। তাঁর এক সম্পর্কিত ভাই বা এরকম কেউ ছিল তাঁর রক্ষক। নিজের বাবা

থাকলে, কোনো বাবাই তাঁর মেয়ের এরকম একটা বিয়ে দেয় না। অন্তত লোভনীয় কোনো প্রাপ্তির ব্যাপার না থাকলে। আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে সেরকম লোভনীয় প্রাপ্তির ব্যাপারও কিছু ছিল না।' শঙ্কর কথা থামিয়ে আর এক দলা নস্যি নাকে গুঁজে নিল। বললো, 'কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই এসব জমিজমার কথাও কিছু জানতেন না। তাঁর বুদ্ধিভ্রংশতার পেছনে ছিল, এক আকাঙ্ক্ষা, আর একটি অর্থহীন করুণা। সহকর্মী লোকটি শ্বশুরমশাইয়ের সামনে একটি অরক্ষণীয়া মেয়েব করুণ ছবিও তুলে ধরেছিল। তারই পরিণতি, চাটুয্যেবাড়িতে আজ একটি চূড়ান্ত অশান্তি। বুঝতেই পারিস এ বাড়ির মেয়েদের পক্ষে এরকম একটা ব্যাপার মেনে নেওয়া কখনো সম্ভব নয়। কেউ মেনে নেয়ও নি। আর আমাব শ্বশুরমশাইয়ের বংশধরের যে আকাঙ্ক্ষা, তাও কোনোকালে আর পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কতো কাল আগে এই বিয়ে হয়েছে?'

'তা সাত আট বছর আগে তো বটেই।'

'তোর এই শাশুড়ীর বয়স এখন কতো হবে?'

'কতো আর। মমতার থেকে কিছু বড়।'

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার কথা আমার মনে এলো না। কিন্তু চাটুয্যেমশায়ের মতন বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও সন্তানের জনক হতে দেখেছি। ইতিমধ্যেই তিনি ছ'টি সন্তানের জনক। এক্ষেত্রে সৃষ্টির এমন বিরূপতা কেন? ষাটের উর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিও সন্তানের জনক হন, নিজেই দেখেছি। চাটুয্যেমশায়ের বয়সের হিসাবেও, সেই রকমই মনে হয়। বন্ধুর শাশুড়ীকে দেখে মনে হয়েছে, মাতৃত্বের সকল লক্ষণই তাঁর নারীত্বের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে রয়েছে। আমি প্রায় বিভ্রান্তের মতনই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এত বছরেও ওঁর একটি সন্তানও হলো না কেন?'

'সে কথার জবাব আমি কী করে দেবো।' শঙ্কর অবাক আর বিষণ্ণ হেসে বললো, 'হয়নি, এটাই তোর মত আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

আমার জিজ্ঞাসাটাই অর্থহীন। এ জিজ্ঞাসার জবাব হয় তো কোনোকালেই পাওয়া যাবে না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মানসিক অবস্থা এবং সঙ্গলাভের বিষয় হয় তো বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তার কতোটুকুই বা আমি জানি? জেনেই আমার কী লাভ। মন থেকে চাটুয্যেমশায়ের প্রতি কিছুতেই রুষ্ট হতে পারছি না, কারণ তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁকে একটু বুঝতেও পারি। তথাপি, বন্ধুর শাশুড়ীটির চেহারা মনে করে, যুগপৎ একটা ভয় ও ব্যথা যেন

আমার বুকে চেপে বসলো। যার কোনো ব্যাখ্যা করতে পারি না। কেবল শূন্যতা আর ব্যর্থতার একটা হাহাকার যেন আমার ভিতরে আবর্তিত হতে লাগল।

মানুষের জীবনের একজনের ব্যর্থতা শূন্যতা দিয়ে আর একজনের তুলনা চলে না। তবু আমার চোখের সামনে রাণীদি এবং বন্ধুর শাশুড়ীর মূর্তি ভেসে উঠলো। রাণীদির করুণ বৈরাগ্যের হাসিটি দেখে মনে হয় এই ব্যর্থতার মধ্যেও, জীবনকে যেন তিনি কোনো একরকমভাবে মেনে নিয়েছেন। যেমন মানুষকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব কিছু হারিয়ে, তারপরেও হৃতসর্বস্ব জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু যাঁকে আমি একজন রূপসী রমণী হিসাবে দেখেছিলাম, বন্ধুর সেই শাশুড়ীর মুখে একটা অন্যমনস্ক হতবাক বিস্ময়ের অভিব্যক্তি লক্ষ করেছি। যেন, তাঁর জীবনে কী ঘটে গিয়েছে, কী জীবন তিনি যাপন করছেন, তার কিছুই কখনো বুঝে উঠতে পারেন না। আগে তিনি কেমন ছিলেন, জানি না। আজ যা দেখেছি, তাঁর মতন একজন মহিলার পক্ষে তা কোনোদিক থেকেই স্বাভাবিক না। তা যেন এক নীরব উন্মাদনারই লক্ষণ।

এখন বুঝতে পারছি, পঞ্চমীর রুষ্ট বিরূপতা। পঞ্চমীর পক্ষে সেটা অনুচিত, একথা মুখে বলা যায়, জীবনের চেহারা বদলানো যায় না। গ্রামে বেড়াতে আসার সব আনন্দ যেন ঘুচে যেতে বসলো। আমি খাট থেকে নিচে নামলাম।

'কোথায় যাচ্ছিস?' শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'একটু বাইরে যাবো।'

'চল, আমিও যাই।' শঙ্করও নামলো, দরজার হুড়কো খুললো।

বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলাম। বাইরে শীতের রাত্রি হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠেছে। পূর্ণিমার ঔজ্জ্বল্য নেই, বরং এই শীতার্ত স্তব্ধ রাত্রি যেন কেমন একটা ম্লান আলোয় মাখামাখি করে, গাছপালা ঘর লাউমাচার ঘন ছায়ায় বিচিত্র হয়ে আছে। এখন কাঠ কেরোসিন বা রান্নার গন্ধ নেই। গ্রামের নিশীথে হিমেরও যেন একটা আলাদা গন্ধ আছে। আকাশের কোথায় চাঁদ, দেখতে পাচ্ছি না। মরাই দুটোর একদিকে জ্যোৎস্না, অন্যদিকে গাঢ় ছায়া, যেন অদ্ভুত অবয়ব দুটো মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা টুপটাপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঝিঁঝির ডাক মিশিয়ে রয়েছে রাত্রের, প্রকৃতির সঙ্গে। বললাম, 'শুতে যাবার আগে তো যেন অন্ধকারই দেখেছিলাম। চাঁদ উঠলো কখন?'

'আমাদের শুতে যাবার আগেই উঠেছিল, তখনো এতোটা ফোটেনি।'

শঙ্কর বললো, 'পূর্ণিমা হয়ে গেছে, তিন চারদিন হলো। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দেরিতেই ওঠে।'

আর সেই জন্যই বোধ হয় এ জ্যোৎস্নার আলো অনেকটা ম্লান। কবে পূর্ণিমা গিয়েছে, মনে নেই। শহরে ক-জনেই বা তা খেয়াল করে। বিশেষ করে যে সময়ের কথা বলছি, তখন লোডশেডিং নামক রাহু আমাদের জীবনকে গ্রাস করেনি। এখন অনিবার্যভাবেই, কখনো কখনো অন্ধকারে ডুবে থাকা ঘন ইমারতের ফাঁকে হঠাৎ চাঁদের দেখা পাওয়া যায়।

বন্ধুকে বললাম, 'এ গাঁয়ে আর থাকবো না, কালই চলে যাবো।'

'চলে যাবি?' শঙ্কর অবাক স্বরে বললো, 'হঠাৎ কালই চলে যাবার কথা ভাবছিস কেন?'

বললাম, 'ভালো লাগছে না।'

শঙ্কর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, হঠাৎ একটু হেসে বললো, 'তোর মুখে ওকথা মানায় না। তুই আমার থেকে অনেক বেশি ঘুরেছিস, দেখেছিস। যেখানেই গেছিস, কেবল কি সুখী মানুষের ভিড় দেখেছিস?'

কথাটার হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। হয় তো বিকালের, মাঠের আকাশে ওড়া পায়রাদের মতন, খুশির বেগে, পাখা ঝাপটায় উড়ে এসেছিলাম। এমন পরিস্থিতি ও চরিত্রদের মুখোমুখি হবার কথাটা মনে আসেনি। প্রস্তুতও ছিলাম না। সেই জন্যই এই বিমর্ষ বিরাগ। শঙ্কর আবার হেসে বললো, 'তেমন সুখী মানুষের গল্প তো তোর কাছে কখনো পাইনি। এর পরে, এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে, তখন হয় তো মনে করবি, টকের জ্বালায় পালিয়ে এলাম, তেঁতুল তলায় বাস।'

এমন একখানি বাস্তব বাখান শুনে মনের এমন অবস্থাতেও না হেসে পারলাম না। কথাটা যে মিথ্যা না, জীবনে সে অভিজ্ঞতা অনেকবারই হয়েছে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙবার আগেই, ঘরের মধ্যে নানা স্বরের গুনগুনানি বেজে উঠলো। পঞ্চমী আমার গায়ের লেপ টেনে ধরে বললো, 'চলুন, বাইরেব উঠোনে বিছানা পেতে দিচ্ছি, রোদে শুয়ে ঘুমোবেন।'

চোখ মেলে তাকিয়ে পঞ্চমীর মুখ খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। ঘরে যেন এখনো অন্ধকার রয়েছে। আমি লেপটা টেনে ধরে বললাম, 'দেখে তো মনে হচ্ছে এখনো ভোরই হয়নি!'

'মরে যাই আর কি।' পঞ্চমীর বচন। 'ভোর আবার কাল রাত পোয়ালে

হবে। বেলা ন'টা বেজে গেছে! উঠুন উঠুন!'

বেলা ন'টা! খাটের আর একপাশে তাকিয়ে দেখি, শঙ্কর নেই। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পঞ্চমী বললো, 'চা কি এখানেই এনে দেবো, নাকি বাইরে রোদে গিয়ে খাবেন?'

চোখ ঘষে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার জামাইবাবুটি কোথায়?'

'ওমা, জানেন না? জামাইবাবু তো কাল রাতেই এ ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেছল।' পঞ্চমীর মুখটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘরের অন্ধকারে অনেকখানি সরে গিয়েছে। ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায় হাসির ঝিলিক। বাসি জোড়া বিনুনি শিথিল।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। পরমুহূর্তেই ওর কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু পঞ্চমী যে ওর মেজদি জামাইবাবুকে নিয়ে আমার সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা করবে, ভাবতে পারিনি। তবে ও তো বচন বাচনে সব সময়েই বয়সের আগে যায়। আমি খাট থেকে নামতে নামতে বললাম, 'ভুলেই গেছলাম। শঙ্কর তো আমাকে বলেই গেছলো।'

'কী বলে গেছলো? কখন?' পঞ্চমীর হাসির ঝিলিকে অবাক ভ্রূকুটি।

আমি একটুও না হেসে বললাম, 'কাল রাত্রেই বলে গেছলো, ও অন্য ঘরে শুতে যাচ্ছে।'

কিশোরীটির চোখে মুখে ধন্দ আর সন্দর খেলাটা একবার দেখি। তারপরেই হাত তুলে মারবার ভঙ্গি করে বললো, 'আমাকে বাজে কথা বলা হচ্ছে?'

'আ হা হা, দেখিস পঞ্চী মারিসনে।' ঘরের এক কোণ থেকে শোনা গেল সুমতির স্বর। মুখ ফিরিয়ে দেখি, ঘরের এক আবছা কোণে, সুমতি কাপড় চোপড় গোছাচ্ছে। পঞ্চমী হাতটা নামিয়ে, ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললো, 'তোরা খালি দেখছিস আমি ওঁকে মেরেই ফেলছি। আর আমাকে যে ঠকাচ্ছিল, সেটা শুনলি না।'

কে কাকে ঠকাচ্ছিল, সুমতি সেটা ভালোই জানে। আমি উঁচু খাট থেকে মেঝেয় নামলাম।

সুমতি হেসে উঠলো। পঞ্চমীও না হেসে পারলো না। বললো, 'কোথায় খাপ খুলতে গেছি বাবা! ঘুঘুস্য? আমার ওপর দিয়ে যায়। এখন আসুন!' আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

যাবার আগে আমি একবার সুমতির দিকে তাকালাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। পঞ্চমীর চোপার কথা বলে কোনো লাভ নেই। বাইরে

এসে মনে হলো, যজ্ঞিবাড়ি। পশ্চিমের ছোট দরজা দিয়ে ঝি ধোয়া বাসনের পাঁজা নিয়ে ঢুকছে। রান্নাঘরে ইতিমধ্যে উনুন জ্বলেছে। কাঠের আগুনের গন্ধই আলাদা। বড়দি আর মমতাকে পুবের ঘরের নিচু দাওয়ায় দেখেই বুঝতে পারলাম, স্নান শেষে কাপড় বদলানো হয়ে গিয়েছে। মালতী একপাশে বঁটিতে কিছু কুটনো কুটছে। টিনের চালার পাকা দেওয়ালের নিচু ঘরের জানলায় দেখলাম সেই মুখ। শঙ্করের শাশুড়ীর। তিনি অন্যমনস্ক চোখে বাইরেই তাকিয়েছিলেন। দেখে মনে হলো, তাঁরও স্নান শেষ। বড়দি আর মমতার মতই, খোলা চুল ঘোমটার বাইরে, ঘাড়ে এলানো। কপালে সকলেরই ভোরের সূর্য যেন টকটক করছে। শঙ্কর ডাকলো, 'আয়।'

দাওয়ার পশ্চিম দিকে, শতরঞ্চির ওপর শঙ্করের সঙ্গে ইতিমধ্যে পবন এসে চা নিয়ে বসে গিয়েছে। উঠোনে গোবর জলের ছিটা দিয়ে ঝাঁটপাট নিকানো শেষ। একপাশে খেজুর পাতার মাদুরে ধান বিছিয়ে ঢেলে দিচ্ছে একজন মুনিষ। গোটা উঠোনটা রোদে ভরে গিয়েছে। পশ্চিমে আমগাছের ছায়া। পঞ্চমী আমাকে প্রায় ঠেলেই পশ্চিম দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললো, 'বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

'বাসি মুখটা একটু কুলকুচো করে নিই,' আমি বললাম।

পঞ্চমী বললো, 'আমি তো জানি শহরের লোকেরা বাসি মুখেই চা খায়। তাহলে দাঁড়ান, এই নিন, জল দিচ্ছি,' পঞ্চমী মাঝের চাতালের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। বালতি থেকে ঘটিতে জল তুলে আমার হাতে ঢেলে দিল।

বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি চোখে মুখে জল দিতে দিতেই, একটি কলাবউ বুক অবধি ঘোমটা টেনে, কাঁখে কলসী হাতে বালতি ভরে জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। পঞ্চমী বললো, 'দাঁড়াও গো, দাদাবাবুর মুখ ধোয়া হোক।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জলটা কোথাকার?'

'ভয় নেই মশাই।' পঞ্চমী যেন একেবারে ধমকিয়ে উঠলো, 'এঁদো ডোবার জল নয়, টিউবকলের জল।'

পঞ্চমী সব কথাটা বাঁকিয়ে নেয়। সৌভাগ্য, ওর মনটা আসলে বাঁকা না। বললাম, 'জলটা একটু গরম ভাব। টিউবওয়েলের জল বলেই।'

পঞ্চমী একটা গামছা এগিয়ে দিল। মুখ মুছে একটা তাজা ভাব অনুভব করছি। গায়ে মাত্র একটা পাঞ্জাবি থাকলেও, তেমন একটা শীত বোধ করছি না। আমি শঙ্করের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কটা বাজে বল তো?

ঘড়ি কোথায় রেখেছিস ?'

'এখানে এসেও ঘড়ির খোঁজ ?' পবন বললো, 'বসুন বসুন, চা খান। সকাল সাতটা সোয়া সাতটা হবে।'

আমি উঠোনের রোদের দিকে একবার দেখলাম। পবন বোধ হয় আমার মনের কথা আন্দাজ করেই বললো, 'গাঁয়ের রোদ দেখে আপনারা বেলা বুঝতে পারবেন না। রাত পোয়ালেই মনে হয় বেলা চড়ে গেছে।'

সেটা স্বাভাবিক। সূর্যোদয় মাত্রই রোদ এখানে অবাধ আর অকৃপণ। ইমারত অট্টালিকা কল-কারখানার আড়াল আবডাল নেই। পঞ্চমী তাহলে আমাকে নেহাতই, বেলা ন'টার কথা বলে বোকা বানিয়েছে। আমি বিশ্বাসও করেছিলাম। ভাবতে ভাবতেই পঞ্চমী এলো, এক হাতে গরম চায়ের কাপ, অন্য হাতে মুড়ি। যদিও এখন মুড়ির কোনো প্রয়োজন নেই। ও চা মুড়ির পাত্র সামনে রাখতেই আমি বললাম, 'পঞ্চমী বেলা এগারোটা বেজে গেছে, আর তুমি আমাকে বললে ন'টা ?

'বেলা এগারোটা বেজে গেছে ?' পঞ্চমী প্রায় বিষম খেল, 'কে বললে ?'

আমি বললাম, 'কে আবার, আমিই বলছি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রথমে পুবের দাওয়া থেকে সুমতি হেসে উঠলো। সেই হাসিই বাজলো পুবের নিচু দাওয়া থেকে অন্যদের গলায়। পঞ্চমী ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পুব দিকে দেখলো, তারপরেই সশব্দে হেসে উঠলো। হাত জোড় করে বলল, 'কালাচাঁদ, তোমার সঙ্গে আর চতুরালি করবো না হে !'

সকলের হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হলো। ব্যাপারটা বুঝতে কারো বাকি ছিল না। এই সময়েই পিসিমা ঢুকলেন, সঙ্গে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। মালকোঁচা ধুতি, গায়ে হাফ শার্টের ওপর হাতকাটা সোয়েটার। পায়ে বুট জুতো। হাতের কবজিতে ঘড়ি। এতো লম্বা লোক সচারাচর দেখা যায় না। করালীকাকার থেকেও লম্বা। দু-জনেই একেবারে পুবের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিসিমা বললেন, 'অ মাতু, গোপীকে তাহলে ও-কথাই বলে দিলাম।'

সামনে এসে দাঁড়ালেন বড়দি, বললেন, 'হ্যাঁ গোপীকাকা, আপনি গিয়েই আগে কথা বলবেন।'

যিনি গোপীকাকা, তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, পৌঁছেই সব কথা বলবো। তোরা তা হলে সময় মত বগিলায় গাড়ি পাঠিয়ে দিস। মনে হচ্ছে, খবর শুনেই শিবুদা রওনা দেবেন। সেই বুঝে গাড়ি পাঠাস। আমি চলি, নইলে ট্রেন

ধরতে পারবো না।'

পিসিমা ডেকে উঠলেন, 'শঙ্কর কোথা গেলে বাবা। তোমার গোপীকাকা এসেছে।'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে, গোপীকাকাকে প্রণাম করলো। পিসিমা বললেন, 'আমার লেখক বাবা কোথা গেল ?'

এসব ক্ষেত্রে পৃথক ফল হবার উপায় নেই। আমিও তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গোপীকাকাকে প্রণাম করলাম। ভদ্রলোক হাসলেন, তাকালেন মুখের দিকে। ইতিমধ্যেই পান চিবিয়েছেন। কালো মুখখানি তেল চকচকে। দেখেই বোঝা যায়, চান-খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় তাঁর নেই। পিসিমাকে বললেন, 'বেরিয়ে পড়ি।'

পিসিমা ঘাড় কাত করার আগেই অতি দীর্ঘ মানুষটি লম্বা পা ফেলে, জুতোর খটখট শব্দে নিমেষে বেরিয়ে গেলেন। শঙ্কর বললো, 'গোপীমোহন বাঁড়ুজ্জে, এ বাড়ির উত্তরের গায়েই লাগোয়া বাড়ি। এখান থেকে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে যান।'

'ইস্টিশনে যান কি গরুর গাড়ি চেপে, না সাইকেলে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর বললো, 'না, রোজ পায়ে হেঁটেই যান। মেমারি না, বগিলা দিয়ে যান।'

যে-ইস্টিশন দিয়েই যান, এতোটা পথ হেঁটে ? অবিশ্যি ও-রকম লম্বা পা থাকলে আলাদা কথা। আমাদের চার কদমে, ওঁর এক কদম। তবুও ঠেক লাগলো, জিজ্ঞেস করলাম, 'বর্ষাকালে কী করেন ?'

'ছাতা মাথায় দিয়ে, জুতো হাতে যান।' শঙ্কর বললো।

আমি অবাক চমৎকৃত মুখে শঙ্করের দিকে তাকালাম। পুবের দাওয়া থেকে মমতা বলে উঠলো, 'এর নাম পাড়াগাঁ, বুঝলেন ?' বলেই আড়ালে চলে গেল।

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাহাদুরিটা এখান থেকে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে যাওয়া। পিসিমা ফিসফিস করে বললেন, 'মানুষ চেনো তো বাবা। আমি সেই সাত সকালে গোপীকে ভজিয়ে ভাজিয়ে রাজী করিয়েছি, শিবুকে একটা টেলিফোন করে দিতে। তুমি তোমার বন্ধু এয়েছ, শিবু জানতে না পারলে একেবারে আপসে মরবে।'

বুঝলাম, চাটুয্যেমশয়ের কাছে খবর যাচ্ছে, বগিলায় গরুর গাড়ি যাচ্ছে,

অতএব তিনি এ বেলা না হলেও, ও বেলা নিশ্চয়ই এসে পৌঁছাচ্ছেন। কিন্তু মানুষ চেনার কথাটা এলো কেন? শঙ্করের সঙ্গে সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর বললো, 'এসব পাড়া ঘরের ঠাটের ব্যাপার। যে যার মেজাজে আছে। শ্বশুরমশাইকে খবর দিতে গেলে, গোপীকাকার মান যাবে কী না, সেটা ভেবে দেখতে হবে তো।'

হ্যাঁ, ইঞ্জিরি মিঞ্জিরিতে ইহাকেই বোধহয় 'কমপ্লেকস' বলে। পবন হাঁকলো, 'শঙ্করদা, সিগ্রেট নিয়ে চলুন, মাঠে ঘুরে আসি।'

আমি শঙ্করকে বললাম, 'এখন মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি? একটু বাথরুম যাওয়ার দরকার তো।'

'বাথরুম মানেই তো মাঠ।' শঙ্কর হেসে বললো, 'তুই কি পায়খানার কথা ভাবছিস?'

পিছনেই কে ফিক করে হেসে উঠলো। ফিরে দেখলাম। পঞ্চমীর মুখে হাত চাপা দেওয়া। মুখ থেকে হাত সরিয়ে পুবের ছোট দরজাটা দেখিয়ে বললো, 'দেখবেন, আবার নাচ দুয়ার দিয়ে যাবেন না যেন।'

নাচ দুয়ারটা আবার কী? খিড়কি দরজাই তো বরাবর শুনে এসেছি। বঙ্গআলোর ভাষায় যার নাম, পাছদুয়ার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'নাচ দুয়ার মানে?'

'নাচ দুয়ার মানে খিড়কি, বুঝলেন তো?' পঞ্চমী বললো, 'ওদিকে মেয়েরা বাঁদাড়ে যায়। পুরুষদের বাঁদাড় আলাদা।'

পুবে দাওয়ায় আবার মমতার আবির্ভাব, বললো, 'এর নাম পাড়াগাঁ, বুঝলেন?' বলেই আবার আড়ালে।

আমি শঙ্করের দিকে তাকালাম। ও যেন খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেল, 'খুব অসুবিধে হবে?'

'ভুলে যাস কেন, আমি বুড়ি গঙ্গার ধার থেকে এসেছি।' আমি বললাম, 'চল কোথায় যেতে হবে। আমাকে পাড়াগাঁ চেনাতে হবে না।' আড়াল থেকে মমতার আওয়াজ এলো, 'উদ্ধার হয়ে গেলাম।'

চোপায় সবাই সমান। পঞ্চমীর আর দোষ কী? শঙ্কর বললো, 'চলো পবন, সিগারেট আমার পকেটেই আছে। তুমি গোটা কয়েক নিম দাঁতনের ব্যবস্থা দেখ।'

'চলুন।' পবন দাওয়া থেকে নেমে এলো।

পিছন থেকে পঞ্চমী বললো, 'নতুন মানুষকে সাবধানে নিয়ে যাস রে পবনদা।'

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে রাস্তা পুবে। সামনেই বড় একটা পুকুর। রাস্তা বেঁকে গিয়েছে ডানদিকে। বাঁদিকে একটা পুরনো মন্দির। ডানদিকে বাঁশঝাড়। মন্দিরের চত্বরের ওপরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে।

শঙ্কর বললো, 'এটা ভবানীপুকুর। চাটুয্যে বাঁড়ুজ্জেদের শরিকানা।'

মন্দিরের ধার থেকে দেখতে পেলাম, একটি মেয়ে পুব পাড় থেকে, জলের বুকে সাঁতার কাটা একদল পাতিহাঁসকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢিল ছুঁড়ছে। মেয়েটির শাড়ি গাছকোমর বাঁধা। মাথার চুল খোলা। ঢিল মারছে আর চিৎকার করছে, 'এই হাঁসগুলোকে নিয়ে হয়েছে আমার মরণ। সেই দুলে পাড়ার দিকে যাবেই।'

মেয়েটিকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে, অথচ চিনে উঠতে পারছি না। শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বললাম, 'কোথায় যাবি বল।'

'বাঁদাড়ে যাবি, না নদীর ধারে যাবি?' শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, 'নদী? সে আবার কোথায়?'

শঙ্কর উত্তর দিকে হাত তুলে দেখালো, 'ওদিকে—এই দেখা যায়।'

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। না নদী, না খালবিল, কেবল ধুধু মাঠ ছাড়া। বললাম, 'বাঁদাড়ের থেকে নদীর ধারই ভালো।'

'একটু দাঁড়া, পবন দাঁতন নিয়ে আসুক।' শঙ্কর বললো।

শঙ্করের কথা শেষ হবার আগেই পবন দৌড়ে এলো পিছন থেকে। হাতে সদ্য ভাঙা নিম দাঁতন। সবাই একটা করে নিয়ে, পুকুরের পুব পাড়ের দিকে চললাম। মেয়েটি তখনো পুকুরপাড় থেকে মাটির ঢালা তুলে জলে ছুঁড়ছে। হাঁসগুলো তখন দক্ষিণ দিকে ফিরছে। পবন বললো, 'দিদি ওর হাঁস চরাচ্ছে।'

দিদি! মানে, রাণীদি? ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, মিথ্যা না। সেই জন্যই কি চেনা চেনা লাগছিল? অথচ গত রাত্রের, কালো চোখের গভীরে বিষাদ, করুণ বৈরাগ্যের হাসি মুখখানির সঙ্গে যেন এ মেয়েটির কতো তফাত। সেই রাণীদি যে এমন করে ঢিল ছুঁড়ে হাঁস তাড়াতে পারেন, এবং হাঁসদের বকতে পারেন, ভাবা যায় না। তখনো তিনি চিৎকার করে বলছিলেন,

'ও পাড়ার দিকে যাবি, তারপরে গলা টিপে তোদের একদিন রেখে দেবে, সবগুলো মরবি।'

আমরা তখন রাণীদির কাছাকাছি। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই যেন ভূত দেখলেন। তার পরেই লজ্জায় এতোটুকু হয়ে তাড়াতাড়ি কোমর থেকে আঁচল খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে বললেন, 'ই মা গো, ছি! একবারে দেখতে পাইনি।' বলতে বলতে খোলা চুল ঘাড়ে টেনে, সামান্য একটু ঘোমটাও টেনে দিলেন।

মুহূর্তেই হাঁস তাড়ানো মেয়েটির চেহারা বদলিয়ে গেল। ওঁর হাঁস শাসানো মুখে সেই হাসিটির সঙ্গে এখন লাজের ছটা। শঙ্কর বললো, 'দেখার কী আছে, আপনি তো আপনার কাজ করছিলেন।'

'না না, ছিঃ! রাণীদি চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নামালেন। এখনো লজ্জায় মরে যাচ্ছেন, বললেন, 'এই হাঁসগুলোকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। সকাল থেকে চরিয়ে, এদের পেছনেই আমার সময় বয়ে যায়। তা তুই একটু আওয়াজ দিবি তো?' পবনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

পবন বললো, 'আরে লে, লে, হয়েছে। হাঁস তাড়াচ্ছিলি তো কী হয়েছে?'

রাণীদির সঙ্গে আমার আবার চোখাচোখি হলো। আমি বললাম, 'আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগছিল।'

'ছি!' রাণীদির কালো চোখের দৃষ্টি লাজে লাজানো। আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে চললেন।

আমরা পুকুরের পাড় ছাড়িয়ে উত্তরের মাঠে গেলাম। আলের উঁচুনিচু ভেঙে কিছুটা যেতেই চোখে পড়লো একটি শান বাঁধানো সাঁকো, যার ওপর দিয়ে গরুর গাড়ি বা মামার মোটরগাড়ির মতন গাড়ি চলে যেতে পারে। নিচে সরু আঁকাবাঁকা জলে ক্ষীণ স্রোত। একটা খালের থেকেও সরু। হয়তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না। জলে বাঁশ ডুবিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে, অনায়াসে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। আমি হতাশ বিস্ময়ে বললাম, 'এ কি নদী, না খাল?'

পবন বললো, 'নদী।'

অবিশ্যি হতেও পারে। এই ছোট নদীই বর্ষাকালে হয়তো ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। জিজ্ঞেস করলাম, 'নদীর নাম কী?'

'তা হলেই তো বিপদে ফেললেন।' পবন বললো, 'জন্মে ইস্তক বাপ

ঠাকুর্দার মুখে শুনে আসছি নদী, আমরাও নদীই বলি। কোনো নাম তো কখনো শুনিনি।'

এমন অবাক কথা আমিও কখনো শুনিনি। নদী অথচ তার কোনো নাম নেই? বীরভূমের উঁচু জমির ঢালে কাঁদর দেখেছি। স্রোতস্বিনী ছোট নদীর মতন। অনায়াসে লাফিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়, নয় তো পা ডুবিয়ে পার। সেগুলোর কোনো নাম নেই, কাঁদর বললেই সবাই বোঝে। আর এই মৃদু স্রোতস্বিনী পশ্চিমের হা-হা দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে, এঁকেবেঁকে চলেছে পুবের দিকে। কিছুটা গিয়ে বাঁশঝাড আর গাছপালার নিবিড়ে হারিয়ে গিয়েছে। পারাপারের জন্য এমন একখানি শান-ঢালাই সাঁকো। এর কোনো নাম নেই? বললাম, 'তা হলে তো এর একটা নাম রাখতে হয়।'

'আপনি লেখক মানুষ, একটা নাম দিয়ে দিন।' পবন নিম দাঁতনের তেতো মুখেই একটা সিগারেট ধরালো।

শঙ্কর বললো, 'হ্যাঁ, একটা নাম দে তো। আমরা সেই নামই বলবো।'

আজগুবি না আজগুবি! ভাবনা শুরু হয়ে গেল। কী নাম দেওয়া যায়? চাটুয্যেবাড়ির মেয়েদের কারো নাম দিলেও হয়। কিন্তু সেটা একটু গোলমেলে ব্যাপার। গ্রামের নাম যখন শুঁড়াদুর্গাপুর, এই ছোট নদীটির নাম দুগি রাখলেই তো মানায়। বললাম, 'এর নাম থাক দুগি। দুর্গাপুরের দুগি নদী।'

'চমৎকার।' শঙ্কর বললো।

পবন বললো, 'আমার বাবার খুব ভালো লাগবে। দুর্গাপুরের দুগি —একেবারে মা দুর্গার ডাকনাম।'

অতঃপর আমরা ছাড়িয়ে গেলাম খালের ঢালু পাড়ের আশেপাশে। ফেরবার পথে পবন বললো, 'আজ দুপুরে খেয়ে নিয়ে, চলুন সবাই কুলীনগ্রামে যাবো। হরিদাসের মেলা এখনো জমজমাট আছে।

মেলার কথা শুনলেই, আমার প্রাণেও মেলা লেগে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'হরিদাসের মেলা মানে?

'যবন হরিদাসের নাম শোনেন নি? সেই হরিদাসের মেলা।' পবন বললো, 'কুলীনগ্রামে হরিদাসের পাটবাড়ি আছে।'

কেতাবী স্মৃতির একটি ক্ষীণ রেখা মনের দিগন্তে ভেসে উঠলো। কুলীনগ্রাম, বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচয়িতা মালাধর বসুর বাসস্থান। আসলে, কুলীন কায়স্থকুল বসুদের কারণেই, গ্রামের নাম কুলীনগ্রাম। আদি

পুরুষ দশরথ বসু, আদিশূর কর্তৃক আনীত হয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে থেকে মেলা শুরু হয়েছে ?'

'পূর্ণিমার আগের দিন থেকে। এখনো কয়েকদিন থাকবে।' পবন বললো।

আমি শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তা হলে যেতেই হয়।'

শঙ্কর বললো, 'তা তো যাবি। তুই আমি যাবো শুনলেই, আরো কেউ কেউ যেতে চাইবে। এদিকে মমতার বাবা কখন এসে পড়বেন। এসে দেখতে না পেলে ব্যস্ত হবেন। মানুষটিকে চিনিস তো ?'

সেটাও এক ব্যাপার বটে! মাথায় হাত দিয়ে বসবেন না, মন খারাপ করতে পারেন। পবন বলে উঠলো, 'রাখুন তো ওসব কথা। মাতুকে গিয়ে বলি, ও যা বলবে, তাই হবে।'

'সেই ভালো।' শঙ্কর বললো, 'তোমরা ভাই-বোনেরা মিলে যা ঠিক করবে, তাই হবে। কুলীনগ্রামের মেলার কথা আমিও কয়েকবার শুনেছি, কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি।'

কথা বলতে বলতে আমরা ভবানীপুকুরের মন্দির প্রায় ছাড়িয়ে এসেছি। এবার আর ভুল হলো না, দেখলাম, রাণীদি পঞ্চায়েতের পশ্চিমের পোড়োর ওপর দিয়ে গোটা কয়েক ছাগলকে গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে চলেছেন। উনি চলছেন না, বরং কয়েকটি ছাগল আর গোটা কয়েক ছানা, তাঁকেই টেনে নিয়ে চলেছে। এখন আবার তাঁর সেই মূর্তি। আঁচল টেনে গাছকোমর করে বাঁধা, চুল খোলা। পঞ্চায়েত ঘরের সামনেই, করালীকাকা একজন গ্রাম্য কৃষক গোছের লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিড়ি টানছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছাগল নিয়ে যাচ্ছেন, রাণীদি না ?'

'হ্যাঁ। দিদির সারাদিন হাঁস ছাগল চরিয়েই কাটে।' পবন বললো, 'দিদির আমদানি খারাপ নয়।'

আমার সঙ্গে চকিতেই একবার শঙ্করের চোখাচোখি হলো। পবনের কথা কয়টি ভালো লাগলো না। রাণীদির সব না জানি, তাঁর রমণী জীবনবৃত্তান্তের অতি নির্দয় সংবাদটি জেনেছি। দিদির আমদানি খারাপ নয় বলতে কী বলতে চায় সে ? কিন্তু পবনকে তো সে-ভাবে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'হাঁস ছাগল চরিয়ে রাণীদির আমদানি কী রকম ?'

'তা ধরুন গে—।' পবন লম্বা টান দিয়ে কিঞ্চিৎ ভেবে নিয়ে বললো, 'হাঁসের ডিমের দাম আজকাল কম নয়। আপনাদের শহরের কথা আলাদা,

এখানে পাইকেররাই কিনে নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রি করে। দিদির আছে গোটা বারো হাঁসি, হাঁস দুটো। তা গড়পড়তা দিনে গোটা ছয়েক ডিম হয়। ছাগলের দুধও ধরুন গড়পড়তা দেড় পো আধসেরটাক। পেটের অসুখ যাদের, তারা গরুর দুধের থেকে বেশি দামে ছাগল দুধ কেনে। মেমারির গয়লারা, যারা গরুর দুধ গাঁ থেকে নিতে আসে, দিদির ছাগলের দুধ তারাই নিয়ে যায়। ছাগল বাচ্চাকে খাসিও করে। তা বছরে নিদেন তিনটে চারটে খাসি বিক্রি করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসে কীরকম আয় হয় ?'

'তা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার কাছাকাছি।' পবন জবাব দিল।

আমি হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'রাণীদি সে-টাকা দিয়ে কী করেন ?'

'কী আর করবে ? সংসারের যা একখানি হাঁ তার খাঁই মেটাতেই যায়।' পবন খুব অনায়াসে বললো, 'বাবা তো শালা হাত পেতেই আছে। মাও বাদ যায় না। অবিশ্যি আমিও দিদির কাছে মাঝে-মধ্যে হাত পাতি।' পবন হাসলো।

হাসছি আমিও, কিন্তু বুকের কাছে কেন যেন বারে বারে মোচড় খেয়ে উঠছে। এমন রৌদ্র ঝলসানো, শ্যামে সোনায় মেশামিশি সকালটি যেন ভরে উঠছে বিষাদে। রাণীদি একটি ব্রাহ্মণকন্যা, সে-কথা বলার দরকারই নেই। বিবাহিতা অথচ বিবাহিত জীবনের কোনো স্বাদ যাঁর জানা হয়নি, কোনো সাধ মেটেনি, কেন যে তাঁর সারাটা দিন হাঁস ছাগল চরিয়ে কাটে, এর পরেও তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার থাকে না। যে-পরিবারের একমাত্র ভরসা বর্গা দেওয়া সাত বিঘে মাত্র জমি, সেখানে রাণীদি অন্তত আপন ভরণপোষণটি চালিয়ে যেতে পারেন। বাবা মা শুধু না, পবন নিজেই স্বীকার করছে, সেও মাঝে-মধ্যে দিদির কাছে হাত পাতে।

পবনের বোধহয় কিছু মনে হলো, হঠাৎ বললো, 'আর আমার অবস্থা তো দাদা বুঝতেই পারছেন। সাইকেল ঠেঙিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে ছাত্রদের তবলা বাজানো শেখাই। নগদ টাকা আর ক'টা পাই। কেউ শালা একটা কুমড়ো ঠেকিয়ে দিল, দু-এক সের বেগুন, নয় তো চাল। দে বাবা, যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। তবে দিদি আমাদের সত্যি লক্ষ্মী।'

আহ্, পবনের কথায় বুকের খাঁচায় যেন এক ঝলক বাতাস বহে গেল। ওর প্রথম কথায় মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। শেষের কথাটি শুনে, নিজেকেই ওর কাছে কৃতজ্ঞ মনে হলো। আমরা ঠাকুরদালানের চত্বরে আসতেই, দু-তিনটি নতুন মুখ আমাদের দিকে তাকালো। তার মধ্যে একজনের আবার

কোট পাতলুন পরা। হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছেন শঙ্করবাবু?

শঙ্কর বললো, 'ভালো। আপনি?'

'চলে যাচ্ছে।' লোকটি বললো।

আমার পাশ থেকে পবন নিচু স্বরে চিবিয়ে বললো, 'শালা, চলে যাচ্ছে। ব্যাটা ঘুষ নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে গাইয়ের পেট করছে, বলে সরকারের নিয়ম আমাকে কিছু দিতে হবে।'

আমি ব্যাপারটা কিছুই না বুঝে পবনের দিকে তাকালাম। পবন হেসে গলা তুলে আমাকে বললো, 'দাদা, উনি আমাদের গো-ডাক্তার।'

'এই, গো-ডাক্তার কী হে পবন, ভেটরনারি ডাক্তার বলতে পারো না?' লোকটি প্রায় ধমকের স্বরেই বললো।

ভেট্রিনারি, তার সঙ্গে আবার ডাক্তার? ভেট্রিনারি বললেই তো পশু রোগ বিশেষজ্ঞ বোঝায়। পবন বললো, 'অই হলো দাশ দাদা, অপনি হলেন গোবদ্যি।'

দাশ দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, উনি পবনের 'গোবদ্যি' কথায় আদৌ খুশি হলেন না। দুহাত তুলে নমস্কার করে আমাকে বললো, 'এদের কথা আর বলবেন না, যা মুখে আসে, তাই বলে। কাল রাত্রেই শুনেছি, আপনারা এসেছেন। আমি ওই বাড়িটায় থাকি।' হাত তুলে পিসিমার বাড়ির দক্ষিণে একটি বাঁধানো রকওয়ালা, টালির ঘর দেখালো।

প্রতিনমস্কার আমি আগেই জানিয়েছি। দাশদাদা আবার বললে, 'আপনার নাম তো আগেই শুনেছি। আসবেন একবার আমাদের বাড়ি—।'

'ওঁর মেয়ে খুব ভালো গান করে,' পবন মাঝপথেই ঠেক দিল, 'হারমোনিয়েম বাজিয়ে গায়। মেমারি থেকে গানের মাস্টার এসে গান শেখায়।'

দাশদাদা তুষ্ট-লজ্জিত হেসে বললো, 'ওই যৎসামান্য।'

কিন্তু পবনের কথায় আমি কেমন একটা বিদ্রূপের স্বর শুনতে পাচ্ছি দাশদাদা অবশ্যি তা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ইতিমধ্যে শঙ্কর কখন বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল, খেয়াল করিনি। পঞ্চমী এগিয়ে এসে বললো, 'এর পরে, সকালের জলখাবার খেতে কি বারোটা বাজবে? তাড়াতাড়ি আসুন।'

পঞ্চমীর ডাক পড়েছে, অতএব ত্বরা করো। আমি দাশদাদাকে আর একদফা নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'আবার দেখা হবে।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পঞ্চমী আমার হাত ধরে প্রায় হ্যাঁচকা টান মারলো। পিছন থেকে দাশদাদা বললো, 'পঞ্চী বুঝি জামাইবাবু আর তার বন্ধুকে খুব খাওয়াচ্ছো ?'

'বেশ করছি মড়া, তোর কী রে ?' পঞ্চমী বললো প্রায় ফিসফিস করে।

ব্যাপার কী ? পবন, পঞ্চমী, কেউই যেন গোবদ্যিমশাইয়ের প্রতি খুশি না ? পবন বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই বললো, 'শালা গরুর ডাক্তারটা রোজ বউকে কী পেটান পেটায় মাইরি ! আর নিজে এদিকে ওদিকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াবে।'

'সকালবেলাই পাপীটার মুখ দেখলেন ?' পঞ্চমী আপসোস করে বললো, 'চলুন, চাতালে গিয়ে আগে মুখ ধুয়ে নেবেন, মেজদি রাগারাগি করছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তো তোমার মুখই প্রথম দেখেছি। আমার দিন খারাপ গেলে, দোষ তোমারই হবে।'

'ইস ?' বলে এক ঠেলায় সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় তুলে দিল।

বড়দি পুবের দাওয়া থেকে শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখিস পঞ্চী, অমন ধাক্কা দিসনি।

'উহু, তোমাদের নিয়ে আর পারিনে বড়দি।' পঞ্চমী ঝঙ্কার দিল, 'ওকে আমি কেবল মারছি, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছি, না ? ওঁর ভাবনাটা তোমরা ছাড়ো না একটু।'

একে বলে পঞ্চমী বাত। বড়দি একবার আমার দিকে তাকিয়ে, মুখে আঁচল চেপে সরে গেলেন। শঙ্করের মুখ ধোয়া শেষ। আমি আর পবনও মুখ ধুয়ে নিলাম। এদিকে মালতী আর সুমতি দাওয়ায় আমাদের প্রাতরাশ পরিবেশনের আয়োজন করছে। পঞ্চমী সাবানটা বাড়িয়ে দিল, সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। প্রাতরাশ সেরে, দাড়ি কামাতে হবে। পবন হেঁকে বললো, 'মাতু, আমাকেও জলখাবারটা দিস ভাই।'

মাতুর জবাব এলো, 'বসে পড়।'

গন্ধেই টের পেয়েছিলাম। খেতে বসে দেখলাম লুচি আর আলু-কুমড়োর ছেঁচকি। গতকাল মেমারি থেকে আনা মাথা সন্দেশ। সুমতি বললো, 'চা হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তোফা !'

পবন খেতে খেতেই ডাকলো, 'মাতু শোন, এখানে দাওয়ার সামনে একবারটি আয়।'

'তুই ওখান থেকে বল্, আমি শুনতে পাচ্ছি।' রান্নাঘরের আড়াল থেকে মমতার স্বর কানে এলো, 'আমি ব্যস্ত রয়েছি।'

ব্যস্ত মানে, উনোনে তপ্ত খোলা। লুচি ভাজা চলছে। পবন কুলীনগ্রামে যাবার প্রস্তাব দিয়ে বললো, 'শিবুকাকা এসেই তো আজ রাতে চলে যাচ্ছেন না। আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবো। এখন তুই যা বলিস।'

মমতার সহসা কোনো জবাব পাওয়া গেল না। এদিকে পঞ্চমী সুমতি মালতীর চোখে মুখে খুশির হাসির ছটা। পঞ্চমী ফিসফিস করে বলেই উঠলো, 'পবনদা, খুব ভালো হবে। বল্ বল্, মেজদিকে আবার বল্।'

'মেজদিকে কোনো কথা দুবার বলতে হয় না।' একেবারে দাওয়ার সামনে স্বয়ং মমতার আবির্ভাব। মুখের হাসি চাপবার চেষ্টা পরিষ্কার, পবনকে বললো, "যাবি যা, তবে তোরা তাড়াতাড়ি চান খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়বি। নইলে মেলা দেখে বেড়িয়ে, ফিরতে সন্ধে উতরে যাবে। বাবাকে জানিস তো কীরকম অলবড়ে ব্যস্ত মানুষ?'

চাটুয্যেমশাই অল্পেতেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠেন, তা জানি। কিন্তু তিনি অলবড়ে বলে কখনো মনে হয়নি। যাকে বলে অবুঝ। পবন মুখে খাবার নিয়ে গাল ফুলিয়ে বললো, 'তুই কিছু ভাবিসনি মাতু। তুই যতো তাড়াতাড়ি এদের দুটো ফুটিয়ে খাইয়ে দিতে পারিস্, আমি ততো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বো।'

'কে কে যাচ্ছে এবার সেটা একটু শুনে নিই?' মমতা পঞ্চমী, সুমতি আর মালতীর দিকে ফিরে ফিরে তাকালো। তারপরে হেসে বললো, 'বুঝেছি, আমি আর বড়দি ছাড়া, মেয়েরা সবাই যাচ্ছে।'

রাধা আর দুখু কোথায় ছিল। দুজনেই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা, আমরাও যাবো।'

পুবের ঘরের দাওয়া থেকে বড়দি ধমকের সুরে বললেন, 'না, তোরা যাবিনে। তোরা তো এই সিদিনে ঘুরে এয়েছিস।'

তবু রাধা দুখু হাত পা ছুঁড়ে লাফালাফি শুরু করলো। মমতা চোখ পাকিয়ে ধমক দিল, 'আজ তোরা কেউ যাবিনে। এক মেলা দশবার দেখার কিছু নেই।'

রাধা আর দুখু রেগে ঝেঁজে লাফাতে লাফাতে বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু কারোকেই বিচলিত হতে দেখা গেল না। মমতা হেসে একবার শঙ্কর আর আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'তবে পবন, বুঝে শুনে নিয়ে

যাস্।' কুলীনগ্রাম অব্দি সবাই হেঁটে যেতে পারবে তো? নাকি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, ভেবে ছাখ্।' বলেই মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে পুবের ঘরে চলে গেল।

শঙ্কর তাকালো আমার দিকে, আমি ওর দিকে। শঙ্কর বললো, 'আমাকে না, তোকে বললো। হেঁটে যেতে পারবি তো?'

'কতো মাইল?' আমি আগে জেনে নিতে চাইলাম।

পঞ্চমী বললো, 'কতো আর, মাইল তিনেক। পারবেন না যেতে?'

পবন থেকে শুরু করে, সবাই আমার দিকে উৎসুক চোখে তাকালো। যেন আমার পারা না পারার ওপরই এমন একখানি খুশিয়ালি বেড়ানোটা নির্ভর করছে। আমি বললাম, 'ন' মাইল হলে একটু ভেবে দেখতে হতো। তিন মাইল আবার একটা রাস্তা নাকি?'

পঞ্চমী হাততালি দিয়ে প্রায় নেচেই উঠলো। পবন হাঁকলো, 'দাদাকে সবাই যেন একখানি মাটির পুতুল ভেবেছে।'

মালতী পঞ্চমীকে ধমক দিল, 'ওটা কী হচ্ছে পঞ্চী? যা, চুলটুল খুলে তাড়াতাড়ি নাইতে যা।'

'আমিও তাড়াতাড়ি সেরে নিইগে।' সুমতি ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ষষ্ঠী কোথায়, ওকে সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি নে?'

'ষষ্ঠী নাচদুয়ারের ঘাটে হাঁস চরাচ্ছে।' পঞ্চমী বললো, 'যাই, ছুঁড়িকে খবর দিই।' দাওয়া থেকে নেমে নাচদুয়ারের দিকে দৌড় দিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ষষ্ঠীও হাঁস চরায়?'

'ওর হাঁস চরানো মানে, দুটো হাঁসি, ডিম খাওয়ার জন্য।' পবন বললো, এবং শঙ্করের দিকে ফিরে বললো, 'তাহলে আমরা তেলের বাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রোদে বসে তেল মেখে, তেলিপুকুরে ডুবে আসা যাক?'

শঙ্কর বললো, 'নিশ্চয়।'

'তার আগে একটু হয়ে যাবে নাকি?' পবন ফিসফিস করে বললো, চোখে তার চোরা চাহনি। একবার এদিক ওদিক দেখে নিল, 'তা হলে ঝাঁ করে একবার দুলেপাড়া ঘুরে আসি।'

শঙ্কর যেন দোটানায় পড়ে গেল, 'ঠিক হবে কী? তোমাদের মাতু যদি একবার টের পায়, তা হলে তো কুলীনগ্রাম যাওয়াই ভেস্তে যাবে। ফিরে এসে হবে।'

'ফিরে এসে আজ আর হবে না।' পবন বললো, 'শিবুকাকা এসে যাবেন; তখন তাঁর কাছেই বলতে হবে।'

শঙ্কর বিমর্ষ হতাশায় বললো, 'তাও তো বটে।'

আমি শুনেই যাচ্ছি, উভয়ের কথার অন্তরহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না। দুজনের মুখের দিকেই কেবল তাকাচ্ছি। রান্নাঘরের দিকে মমতার স্বর ভেসে এল, 'সুমি, চা নিয়ে যা।'

শঙ্কর যেন শিউরে উঠে বললো, 'ওরে বাবা, গলা শুনেই বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছে। এ বেলাটা থাক পবন। ও বেলা তোমার শিবুকাকাকে ম্যানেজ করে, যা হয় একটু বেশি রাত্রের দিকে হবে।'

সুমতি কাঁসার বগি থালায় চায়ের ধূমায়িত কাপ সাজিয়ে নিয়ে এলো। আর সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, দাওয়ার সিঁড়ির কাছে একটা দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো। দেখলাম, শঙ্করের শাশুড়ী। আগেই রান্নাঘরের জানলায় তাঁর মুখ দেখেছিলাম। তখন কেবল তাঁর কালো ভুরু জোড়ার মাঝখানে সিঁদুরের টিপটাই চোখে পড়েছিল, আর তাঁর সেই বিশাল চোখ জোড়ায় সেই অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকালেন। অনেকটা অভিব্যক্তিহীন ভাবলেশ মুখ, বললেন, 'শঙ্কর, আমি কখনো কুলীনগাঁয়ের মেলায় যাইনি। আমাকে তোমরা নিয়ে যাবে?'

শঙ্কর অসহায় চোখে তাকালো, কোনো জবাবই দিতে পারলো না। দেখলাম, মুহূর্তেই সুমতি মালতীর মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্তেই স্তব্ধতায় গোটা বাড়িটার চেহারাই যেন বদলিয়ে গেল। পবন বলে উঠলো, 'কাকী তুমি কী করে যাবে? আজ কলকাতা থেকে কাকা আসছেন যে?'

রমণীর মুখে কোনো বিকারই দেখা গেল না। কেবল বললেন, 'অ! তাও তো বটে।' মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে আমগাছের আড়ালে, পুবের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রান্নাঘর থেকে মমতার গলা ভেসে এলো, 'পবন, দুপুরে তুইও এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে যাস্।'

মমতার এ নিমন্ত্রণ কি পবনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত? যেহেতু সে অনায়াসেই একটা সঙ্কটকে কাটিয়ে দিল? পবন উৎসাহিত হয়ে বললো, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

এটাই বোধহয় সংসারের নিয়ম। সে কখনো একটানা, এক সুরে বাজে না। থেকে থেকেই ভিন্নতর সুর বেজে ওঠে। আমাদের কানে সেটা বেসুরে বাজতে থাকে। আর দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে ওঠে বুক।

কুলীনগ্রামের মেঠো পথে, এই দুপুরে আমরাও এখন এক ঝাঁক পায়রা। আকাশেও রৌদ্রচকিত রঙ-পাখা মেলে চিত্রগ্রীবের দল উড়ে যাচ্ছে কখনো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, কখনো দূরের আকাশে। চড়ুইয়ের ঝাঁকের তো অন্ত নেই। এক এক সময় মনে হচ্ছে, চাক ভাঙা মৌমাছির মতন ওরা হাজারে হাজারে আকাশ ভুঁয়ের ধুলায় ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

গতকাল আসবার সময়, মাঠের যে-চেহারা দেখেছিলাম, এদিকে সেই তুলনায় সবুজের ছড়াছড়ি যেন বেশি, উত্তরে বাতাসে, আর মাঝে মাঝেই এক-একটা গরুর গাড়ির দৌড়, ধুলাও উড়ছে তেমনি। ছোলা মটর আর আলুর চাষ ছড়ানো এখানে ওখানে। কোথাও সর্ষের হলুদ ফুল, হলুদ গালিচা পেতে রেখেছে।

আমাদের দলটা ছোট না। পুরুষের মধ্যে শঙ্কর পবন আর আমি। পঞ্চমী ষষ্ঠী মালতী সুমতি যাবে, আগেই ঠিক ছিল। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ রাণীদিও থাকতে পারলেন না। তবে আমাদের সঙ্গে হুড়োতাড়া করে তাঁকে আসবার জন্য, ধীরাকে হাঁস ছাগলের দায়দায়িত্ব দিয়ে আসতে হয়েছে। শর্ত, ধীরার জন্য মেলা থেকে কিছু না কিছু নিয়ে আসবেনই। চুলের ফিতেই হোক, রিবন হোক, আর বেলোয়ারি চুড়িই হোক। নিদেন কিছু না হোক, হিমানী পাউডার, যা হোক কিছু আনবেনই। কিন্তু খবরদার, একটি হাঁস ছাগলেরও যেন ক্ষতি না হয়।

রাণীদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভবানীপুকুর পেরিয়ে, শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'আমি এলাম বলে, অসুবিধে হলো না তো?'

আমি মনে মনে খুশি হয়েছিলাম। ওঁর কথা শুনে অবাক চোখে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, ওঁর কাজল কালো চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। শঙ্কর বলেছিল, 'কী যে বলেন রাণীদি। আমার বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করুন না?'

আমি বলেছিলাম, 'অসুবিধের কথা বলছেন রাণীদি? নেহাত নতুন পরিচয়, তাই ডেকে আনতে পারিনি।'

'আর পুরনো চেনা হলে, তোমাকে বেঁধেই নিয়ে আসতো।' পঞ্চমী আওয়াজ।

পঞ্চমী অবশ্যি ওর অধিকারটা ছাড়েনি। আমার হাত ধরেই চলছিল, বা

আমি ওর হাত ধরা হয়ে। তবু মনে মনে না ভেবে পারিনি, শঙ্করের শাশুড়ীর সঙ্গে, রাণীদির তফাতটা কোথায়। একজন শ্বশুরালয়ের বধূ, যাঁর নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। আর একজন, শত দুঃখের মধ্যেও, পিত্রালয়ের কন্যা। কন্যার আর বধূর স্বাধীনতার ফারাকটা সেইখানে। সেইজন্যই বোধ হয় গত রাত্রে মনে হয়েছিল, রাণীদি একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব হারিয়েও, একজন যেমন বেঁচে থাকে, রাণীদি যেন সেই ভাবেই বেঁচে আছেন। সব হারিয়েও একটা মানুষ কিছু নিয়ে যেমন বেঁচে থাকে।

আমাদের চলার গতিটা কিছু কম ছিল না। বলতে গেলে ভর দুপুরেই আমরা পৌঁছে গেলাম। কুলীনগ্রামের যতো কাছে এসে পড়লাম, আমাদের মতন মেলার যাত্রীর দেখা আরও বেশি করে পেলাম। হয়তো তারা সবাই নিতান্ত মেলার যাত্রী না, তীর্থযাত্রীও বটে। বিশেষ করে ধর্মে যদি কেউ বৈষ্ণব হয়। কারণ, প্রাক্ চৈতন্য যুগে, কুলীনগ্রামের যে-পরিচয়ই থাক, এখন কুলীনগ্রাম মানেই বৈষ্ণব শ্রীপাট।

কুলীনগ্রামের প্রান্তে পা দিয়েই, পবন বললো, 'মেলায় যাবার আগে, শঙ্করদা আর লেখকদাকে নিয়ে, আমি আমার এক ছাত্তরের বাড়ি একটু ঘুরে আসবো। তোরা কেউ যাবি ?'

সবাই থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। রাণীদি বললেন, 'আমি তোর ছাত্রের বাড়ি যাবো না, সোজা মদনগোপালের মন্দিরে যাবো।'

'দ্যাখ্, পবনদা, আসল কথাটা তুই আগে খুলে বললেই পারতিস ?' পঞ্চমী ঝেঁজে বচন দিল, 'ছাত্তরের বাড়ি কত ঘুরে আসবি, তা ভগবানই জানে। তার চেয়ে বল্ না কেন, দুজনকে নিয়ে তুই দুর্গাকে দেখাতে যাচ্ছিস ?'

পবন যেন বড় লজ্জা পেয়ে হাসলো, 'কী যে বলিস পঞ্চী, তোর কথায় মাইরি কোনো ইয়ে নেই। তোরাও চল না, আমি কি বারণ করেছি ?'

'তোকে মুখ ফুটে বারণ করতে হবে না পবনদা।' মালতী বললো, 'তুই দুজনকে নিয়ে যা, তবে দোহাই, দেরি করিসনে। মনে রাখিস, সন্ধে উতরোবার আগেই আমাদের ফিরতে হবে।'

আমি শঙ্করের দিকে দেখছি, শঙ্কর আমার দিকে। পবন কেন এখন ছাত্রের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। আবার দুর্গাকে দেখাতে নিয়ে যাবার বিষয়টাই বা কী, তাও ধরতে পারছি না। পঞ্চমী বললো, 'সে পবনদা তুই না বললেও আমি এ দুজনকে ছাড়ছিনে। আমি তোদের সঙ্গেই যাবো।'

রাণীদি ভেবে বললেন, 'আয় মালু তুমি, আমরা মেলায় যাই। ষষ্ঠী কি করবি ?'

ষষ্ঠী বললো, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই যাবো।'

এক যাত্রায় পৃথক ফলটা ভালো লাগছে না। বললাম, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা হঠাৎ ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছি কেন ? যেখানে যাবার এক সঙ্গে গেলেই হতো না ?'

রাণীদি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর করুণ বৈরাগ্যের হাসি চোখে কিঞ্চিৎ রহস্যের ঝিলিক। বললেন, 'পবন নিয়ে যেতে চাইছে, একটু ঘুরেই আসুন। তবে ওই এক কথা, দেরি করবেন না।'

'আসুন আসুন।' পবন আমাদের ডাকলো, 'আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

রাণীদি তাঁর দল নিয়ে আগে হাঁটা দিলেন। পবন আমাদের নিয়ে গ্রামের অন্যদিকে চললো। চলেছি পাড়ার ভিতর দিয়ে। এ বাড়ির খিড়কি, ও বাড়ির সদর দিয়ে। পাড়ার পথেও পাটবাড়ির মেলার যাত্রীদের আনাগোনা চলছে। তবে কম। বোধহয় অন্য কোনো সদর সড়ক আছে যে পথে বাইরের লোকের যাতায়াতের ভিড়। আমি পঞ্চমীকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'দুর্গা কে ?'

'চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন।' পঞ্চমীও ওর চোখের তারায় রহস্যের ঝিলিক হানলো, 'কিছু কিছু জিনিস, শোনার চেয়ে চোখে দেখাই ভালো।'

পঞ্চমী বাত। লাল নীল ছাপা জামায়, দুই বিনুনিতে লাল ফিতে বেঁধে, চোখে কাজল টেনে, কিশোরী পঞ্চমী অনেকেরই নজর কেড়ে নিচ্ছিল। একটি লাল টিপও পরেছে। পবন হঠাৎ দাঁড়ালো এক বাড়ির খোলা দরজার সামনে, পিছন ফিরে আমাদের ডাকলো, 'আসুন।'

পবনের পিছনে পিছনে ঢুকেই, প্রথম অভ্যর্থনা করতে ঘেউঘেউ করে এগিয়ে এলো একটি কুকুর। পঞ্চমী আমার পিছনে এসে বললো, 'আ মরণ।'

ল্যাজ উচানো ছোটখাটো প্রাণীটির হাঁকডাক যতো বাড়ি মাথায় করছে, তার এগিয়ে তাড়া করার লক্ষণ তেমন দেখা যাচ্ছে না। পবন হাত তুলে ডাকলো, 'কী হলো রে কেলো ? চিনতে পারছিস না ?'

কেলো কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে চেনা ডাকে বার কয়েক ল্যাজ নাড়ালেও, তৎক্ষণাৎ চুপ করলো না। দেখলাম, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, কোণাকুণি দুখানি ঘর। ভাঙা দাওয়ায় ইটের উকিঝুঁকি দেখে বোঝা গেল, একদা

বাঁধানো ছিল। উঠোনের বাঁদিকে লাউ সীমের মাচা, তার পাশেই গাঁদা ফুলের ঝাড়। প্রায় মাঝখানে তুলসীতলা। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। মনে হলো, ভ্রুকুটি চোখে তাঁর সদ্য ঘুম ভাঙা আবেশ। পবনকে দেখেই বোধ হয় একটু হেসে, আমাদের দিকে তাকালেন। তারপরে তাড়াতাড়ি থানের ঘোমটা টানতে টানতে বললেন, 'পবন এয়েছো? এসো এসো? এ কে? তোমার সেই বোন ধীরা না?'

'না, এ আমার খুড়তুতো বোন পঞ্চী, দু-একবার দেখেছেন।' পবন বললো, 'এ হলো শিবুকাকার মেজোজামাই শঙ্করদা, আর এই শঙ্করদার বন্ধু। বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি?'

বিধবা মহিলা বললেন, 'দুর্গা সন্ধ্যা দুজনেই আছে। এসো, তোমরা বসবে এসো।' তিনি দক্ষিণমুখো ঘরের শিকল খুলে দিলেন।

'আসুন।' পবন আমাদের ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

আমরা এখন পবনের হাত ধরা। কুলীনগ্রামের মেলা দেখতে এসে, চুপচাপ শান্ত এক গৃহস্থ বাড়ির ঘুম ভাঙানো। ঘরটার সঙ্গে পঞ্চমীদের ঘরের কিঞ্চিৎ মিল আছে। তবে উত্তর দিকের জানলাটা বড়। খাটটা একটু ছোট। পবন নিজেই আতিথেয়তা শুরু করলো, 'বসুন, খাটের ওপর উঠে বসুন। পঞ্চী বোস, আমি আসছি।' বলেই দরজার দিকে পা বাড়ালো।

'দেখিস পবনদা, এখন যেন সাজতে গুজতে না বসে, দেরি হয়ে যাবে।' পঞ্চমী পিছন থেকে বললো।

পবন কী বললো, বোঝা গেল না। বেরিয়ে চলে গেল। শঙ্কর বললো, 'কুলীন গাঁয়ের দুর্গা নামটা যেন শোনা শোনা লাগছে? মনে হচ্ছে পবনের মুখেই শুনেছি?'

'শুনেছেন নাকি?' পঞ্চমী চোখের তারা ঘোরালো, 'আমি তো তাই অবাক হচ্ছিলাম, যেন কিছুই জানেন না?'

আমি শঙ্করের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। শঙ্কর অপ্রস্তুত হেসে বললো, 'আমি ভাবতেই পারিনি—।'

শঙ্করের কথার মাঝখানেই পবন এসে ঢুকলো, 'পাঁচ মিনিট। খুব তাড়া দিয়েছি।'

সেই বিধবা মহিলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'পবন তোমরা একটু চা খাবে তো?'

'না না না মাসীমা, এখন এসব কিছু করবেন না।' পঞ্চমী শশব্যস্ত হয়ে

বলে উঠলো, 'রাণীদি, আমার সেজদি, ন'দি, ছোট বোন, সবাই মেলায় আমাদের জন্য বসে আছে। আমরা এখুনি যাবো। দুর্গাদিকে আসতে বলুন।'

বিধবা মহিলা হেসে বললেন, 'তা হলে তুমি একবারটি ও-ঘরে এসো মা। দুগ্‌গা তোমাকে ডাকছে।'

পঞ্চমী জোড়া বিনুনিতে ঝাপটা দিয়ে একবার পবনের দিকে রোষ কষায়িত চোখে তাকালো। তারপরে মহিলার দিকে ফিরে নরম সুরে হেসে বললো, 'দুর্গাদি আবার আমাকে ডাকছে কেন? চলুন যাই।' বলে আর একবার আমার আর শঙ্করের দিকে চোখ পাকিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

'একটা সিগ্রেট ছাড়ুন শঙ্করদা।' পবন হাত বাড়ালো, আমার দিকে ফিরে বললো, 'একটু প্রাণ খুলে বলবেন দাদা।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলছেন?'

'আবার আমাকে আপনি বলছেন কেন?' পবন প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, 'আপনাকে শঙ্করদাকে দুজনকেই বলছি।' সে হাত বাড়িয়ে শঙ্করের কাছ থেকে সিগারেট নিল।

আমি আবার প্রাণ খুলে কী বলবো, কিছুই বুঝতে পারছি না। শঙ্করের দিকে তাকালাম। ও এখন নিজের আর পবনের সিগারেট জ্বালাতে ব্যস্ত। কিন্তু আমি শঙ্করের দিক থেকে চোখ সরালাম না। ও সিগারেট ধরিয়ে, ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ টিপে ইশারা করলো। ব্যাপারটার রহস্য আর কৌতূহল বাড়লো বই কমলো না। পবন ঘরের মেঝের ওপরেই সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললো, 'আসছে।'

দেখলাম, পঞ্চমীর সঙ্গে একটি মেয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথায় পঞ্চমীর মতনই প্রায়। মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রায় পঞ্চমীর বয়সীই মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে তাকালেই বোঝা যায়, ওর থেকে কিছু বেশি। বোধহয় সুমতির মতন বয়স হবে। পরনে একটি খয়েরি ডোরা লালপাড় শাড়ি, গায়ে লাল জামা। চোখে কি কাজল টেনেছে? বুঝতে পারলাম না। যেমন না লাগালেও রাণীদির চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না। ডাগর চোখ, টিকলো নাক, হাসি হাসি ঠোঁট দুটি দেখলে কালীঘাটের পটের মতন সুন্দরী মনে হয়। সুন্দরীর থেকেও বেশি বলা যায়, একটা কচি আর মিষ্টি চটকে, মুখখানি লক্ষ্মীর পটের মতন দেখাচ্ছে। পঞ্চমীর থেকেও

কিছু ক্ষীণকায়া, কিন্তু যৌবনের পূর্ণতা যেন নতুন বর্ষণের ঢলে নেমেছে।

'কী হলো গো দুগ্‌গাদি, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' পঞ্চমী প্রায় মেয়েটিকে ঠেলেই দিল, 'ভেতরে চলো।'

পবন ডাকলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেতরে এসো।'

দুর্গা ওর ডাগর চোখ তুলে ঘরের ভিতরে আমাদের দিকে তাকালো। মাজা মাজা রঙ মুখে, লজ্জা জড়ানো হাসিটিতে আরও খানিক রঙের ছটা লাগলো। ঘরে এসে ঢুকলো। পঞ্চমী ঘরে ঢুকে, আমার পাশে এসে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। নেমে দাঁড়াবো কী না, বুঝতে পারছি না। এখানে বোধহয় সেরকম বিলিতি কেতা নেই। পবন বললো, 'এই হলো আমাদের মাতুর বর শঙ্করদা, আর শঙ্করদার বন্ধু, সেই লেখক।'

হায় লেখক, তোমার আর কোনো পরিচয় নেই? দুর্গা বেশ সপ্রতিভভাবে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাদের নমস্কার জানালো। আমরাও জানালাম। পবন আমাদের বললো, 'দাদা, এই হলো দুর্গা। দেখুন তো একবারটি, একে দিয়ে আমার দুর্গতি নাশ হবে কী না?'

'যাহ্‌।' দুর্গা ঝটিতি একবার আমাদের দিকে দেখে, মুখে আঁচল চাপলো।

শঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চমৎকার, কী বলিস?'

দুর্গা ফিক করে হেসে, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। পবন ওর ডিগডিগে লম্বা শরীরে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'মাথার দিব্যি, যেও না। এ তো আমাদের নিজেদের ব্যাপার, সম্বন্ধ তো দেখা হচ্ছে না, কী বলেন দাদা, অ্যাঁ?'

দুর্গা এক মাথার দিব্যিতেই ঠেক খেয়ে গেল। ঘর ছেড়ে যেতে পারলো না। অতঃপরেও ব্যাপারটা বোধগম্য না হবার কোনো কারণ নেই। মেয়ে দেখা হচ্ছে না ঠিকই তবে এও একরকমের দেখানো বটে। পঞ্চী যে এ বাড়িতে এবং দুর্গার পরিচিত সেটাও পরিষ্কার। পবন তখন আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। আমি তাকালাম পঞ্চমীর দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেল। ও কনুই দিয়ে আমার হাঁটুতে মেরে বললো, 'আমার দিকে কী দেখছেন? ওদিকে দেখুন।'

বললাম, 'দেখেছি। দুর্গার থেকে লক্ষ্মী নাম হলেই যেন মানাতো বেশি। এক কথায়, সুন্দর।'

পঞ্চমী চোখের তারা ঘোরালো, 'নে পবনদা, কী বলবি বল।'

'জবাব নেই দাদার কথার।' পবন হঠাৎ আমার পায়ের দিকে হাত বাড়ালো।

আমি চমকিয়ে পা সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'এই, কী হচ্ছে?'

দুর্গা হেসে উঠলো এবং লাজুক হাসি মুখ তুলে বললো, 'একটু চা করে নিয়ে আসি।'

বাঙালীর চায়ের আতিথেয়তা গ্রামে অনেককাল আগেই পৌঁছেছে। শঙ্কর বললো, 'না, চা খাবো না। তুমি বরং আমাদের সঙ্গে মেলায় চলো। সেখানে গিয়ে চা খাবো।'

দুর্গা তাকালো পবনের দিকে। পবন যেন ভাবিত হয়ে পড়লো। আমি তাকালাম পঞ্চমীর দিকে। পঞ্চমী নিতান্তই নির্বিকার এবং মৌন। এ মৌনতা, আদৌ সম্মতির লক্ষণ না। দুর্গা নিজেই বললো, 'আমার না যাওয়াই ভালো।'

দুর্গা বুদ্ধিমতী, কোনো সন্দেহ নেই। অথচ বুঝতে পারছি, ওর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। নিজেদের গ্রামের মেলায় ও যখন খুশি যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার একটা আলাদা দিক আছে। পবন বললো, 'যাক। ননদিনী মানেই শালা রায়বাঘিনী। দরকার নেই গিয়ে।'

'এই ছাখ পবনদা বাজে বাজে কথা বলিস না।' পঞ্চমী চোখ পাকিয়ে বললো।

পবন তাড়াতাড়ি বললো, 'আরে কী বোকা! আমি কি তোকে বলেছি নাকি?'

দুর্গা বললো পঞ্চমীকে, 'তোমার সঙ্গে তো আমার আগেই ভাব হয়ে গেছে ভাই।'

'তা ছাড়া ননদিনী হলেই বুঝি রায়বাঘিনী হয়?' পঞ্চমী বললো, 'কতো বাড়িতে তো আজকাল ননদিনীদেরই বউয়েরা ঘরের বার করে দিচ্ছে।'

পবন হাত তুলে বললো, 'লে লে পঞ্চী, তুই আর এখন মুখ খুলিসনি বাবা। একটু জল খাওয়াও তো দুর্গা।'

দুর্গা ঘরের বাইরে চলে গেল। পবন আমাকে বললো, 'কথাটা প্রাণ খুলে বলেছেন তো দাদা? তা হলে শালা আর দেরি না, এই সামনের ফাল্গুনেই ঝুলে পড়বো, মাইরি।'

দুর্গা হাতে একটি পিতলের রেকাবে কিছু মণ্ডা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। পিছনে ওর মা এলেন এক হাতে জলের ঘটি, অন্য হাতে নাক দেওয়া কয়েকটা কাঁসার

গেলাস নিয়ে।

মেলার পথে যেতে যেতে পবনদের সংসারের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বর্গা দেওয়া সাত বিঘা ধান জমি সম্বল। হয়তো দোফসলী হলে আরও কিছু জন্মায়। ধীরা বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে না। মেয়েরা একবার বাড়তে আরম্ভ করলে, সে বর্ষার লতার মতন লকলকিয়ে বাড়ে। করালীকাকা তাঁর ছোট মেয়েটির বিয়ের জন্য দু-তিন বিঘা জমি বিক্রি করবেনই। বর্ধমানে ধানী জমির দাম ভালো। যে সময়ের কথা বলছি তখনো নিদেন হাজার তিনেক টাকা। তার পরেও সংসার থেমে থাকবে না। পবনের বিয়ে মানেই, সংসার বৃদ্ধি।

কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা ? জীবনের নানান দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও মানুষ দেখছি, তার মন প্রাণ নিয়ে অমর। একটু আগে পবন আর দুর্গাকে দেখে, সেই কথাটাই বেশি করে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে পবনের মুখেই শুনেছি, পিতৃহীন দুর্গাদের সংসারের অবস্থা কোনোদিক দিয়েই পবনদের থেকে ভালো না। দুই বোনের পরে, ছোট একটি ভাই আছে। পবনের তো উচিত ছিল, কোনো সচ্ছল পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করা। অন্তত ওর বাবা মায়ের সেটাই প্রত্যাশা। অভাবের সংসারে ঘরের বউটি যদি, হাতে গলায় দু-চার কুচি সোনাও বহন করে নিয়ে আসে, দুর্দিনের সেটাও বড় ভরসা। বিশেষ করে এখনো যে-সমাজে, সোনার আংটি বাঁকা হলেও ছেলের বাজার দর চড়া। সমাজপতি আর রাষ্ট্রনায়কদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, এখনো যে দেশে নগদা পণে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি।

এমন ক্ষেত্রে পাশের বাড়িতে তবলা বাজাতে শেখাতে এসে, পবন ধরা পড়েছে দুটি পটেশ্বরী চোখের তারায়। বরং বলা যায় ধরা দিয়েছে। কেউ কারো স্থূল ঐশ্বর্যের দিকে তাকায়নি। দুর্গার মাও কি জানেন না, কোন শ্রেণীর সংসারে তাঁর কন্যা ঘর করতে যেতে বসেছে ? তাঁরও হয়তো সাধ ছিল, জামাইটি হবে লেখাপড়ায় দড়, কোনো দপ্তরে কাজ করে মাস গেলে দু-চারশো টাকা বেতন পাবে, নয় তো সারা বছরের খোরাকি জোটে, এমন জমি-জমার মালিক হবে। কিন্তু তাঁর ভাবী জামাইটি স্বনামধন্য কেরামতুল্লা খানের বিনি মাইনের ছাত্র। চৈত্রখণ্ড থেকে মেমারি, কুলীনগ্রাম সাইকেল ঠেঙিয়ে কিছু ছাত্রকে তবলা বাজানো শেখায়।

আমার কাছে পবন আর দুর্গাই আসল। ব্যক্তি মানুষ কেউ এ জগতে অমর না। তার ধারাবাহিক নিরন্তরতাই তাকে অমর করেছে। সেই

নিরন্তরতার স্রোতে পবন আর দুর্গা অনায়াস, নির্ভীক। মানব মানবীর সহজ বেগে, এ সংসারে ওরা আমার চোখে অজয়।

মেলায় এসে প্রথমেই মদনগোপাল জীউর মন্দিরে এলাম। অন্যদিকে গোপীনাথের মন্দির। মন্দিরের চত্বরে আশেপাশে বিস্তর নরনারীর ভিড়। মেলাটা বাইরে বাইরে অনেকখানি বিস্তৃত। মদনগোপালের নাট-মন্দিরে কেউ কেউ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে শুয়ে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে, দূরের যাত্রী। একদিনের কয়েকজন তীর্থ সারতে এরা আসেনি। কিন্তু রাণীদি তাঁর দলবল নিয়ে কোথায় গেলেন?

পবন বললো, 'আসলে ভিড় হলো হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়িতে। দিদিরা বোধহয় সেখানেই গেছে।'

শঙ্কর বললো, 'চলো তবে সেখানেই যাই।'

আমার ক্ষীণ স্মৃতি কোথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো, কুলীনগ্রামের মাঘের উৎসব প্রধানত হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে। আমি ব্যস্ত হয়ে পা বাড়াতে পঞ্চমী আমাকে টেনে ধরলো। হাত ধরা হয়েই ছিলাম। ও বললো, 'অচেনা অজানা জায়গায় হুট করে চলে যাচ্ছেন, তারপরে হারিয়ে যান যদি?'

একে বলে পঞ্চমীর দায়িত্ববোধ! সত্যিই তো, এতো জায়গায় ঘুরে এসে, শেষটায় এই কুলীনগ্রামের মেলায় যদি হারিয়ে যাই? অচেনা অজানা জায়গা, কোনো সন্দেহ নেই। অতএব পঞ্চমীর শক্ত করে হাতের টানেই চললাম। মেলার বিবরণে যাওয়া বৃথা। নতুনত্ব তেমন কিছু নেই। রেশমী চুড়ি আলতা হিমানী পাউডার কপালের নানা রঙের টিপ, চোখ ঝলসানো পাথরের আংটি, নাকছাবি, কী না পাবে? ঝুমঝুমি বেলুন খেলনার কথা না বললেও চলে। সারি সারি ময়রার দোকানে, খাজা গজা পানতোয়া, বসে খাওয়ার খাদ্য। শালপাতার ঠোঙায় গরম গরম জিলিপি নিয়ে খেতে খেতে মেলায় বেড়ালে, মনের রঙ বদলিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, তালপাতার আর বাঁশের বাঁশীর আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার দাখিল। তার মধ্যেই নজর করে দেখি, হেথা হোথায় অনেকেই মাটি খুঁড়ে উনোন করে, ডালে চালে হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে আলু আর শীতের আনাজও কি নেই?

আছে যে, তা গন্ধেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এ গন্ধ তুমি বাড়ির তরিবত করে রান্না খিচুড়িতে পাবে না। মেলার ধুলা পথের গাছতলায় এ গন্ধের চমৎকারিত্ব আলাদা। ক্ষুধায় কাতর করে তোলে না, তবে আমার মতন লোভীর জিভে জল চুঁইয়ে ভিজিয়ে দেয়। এতে তোমার তেল মসলার মহিমা নেই,

আছে ঘর ছাড়া, ঠাকুরতলায় প্রাণের মহিমা। যারা এ সব নিয়ে ব্যস্ত, তাদের গায়ের ধুলামলিন জামা কাপড়ের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, এরা ধুলার ঘর ছেড়ে, ধুলার গাছতলায় এসেছে। এদের চাকচিক্য পোশাকে আশাকে নেই, আছে চোখের কূলে, মুখের হাসিতে। কারো বা কপালে আঁকা রসকলিতে। জীবন হেথায় বিঘায় মাপা হয় না, প্রাণের ওজনে মাপ হয়।

পাটবাড়ির মন্দিরে এসে, আগে দর্শন হরিদাস আর গৌরাঙ্গদেবের যুগল মূর্তি। দেখে মনে হচ্ছে, মৃন্ময় মূর্তি। কিন্তু একি প্রকৃত মূর্তি? সম্ভবত না। দীর্ঘকালের স্মৃতি শ্রুতির প্রতিমা। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা। মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ ছিলেন গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ সহচর। এই গ্রামের অধিবাসীদের একটি সংকীর্তনের দল ছিল। পুরীর রথের আগে আগে গৌরাঙ্গ যখন নাচতে নাচতে যেতেন, তখন এই গ্রামের দলটি তাঁর সঙ্গে নেচে গেয়ে চলতেন। একবার পুনর্যাত্রার সময় রথের একটি দড়ি ছিঁড়ে যায়। সেই ছেঁড়া দড়িটি নিয়ে, গৌরাঙ্গ দিয়েছিলেন রামানন্দকে, বলেছিলেন, 'এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।'

সেই থেকে নাকি কুলীনগ্রাম থেকে রজ্জু না পৌছানো পর্যন্ত পুরীর রথ টানা হয় না, কিন্তু এখনো কি সেই নিয়ম আছে? কাকে জিজ্ঞেস করবো? কে জবাব দেবেন।

'কী ব্যাপার? আপনার কি ভর হল নাকি?' পঞ্চমী আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

আমি সচকিত হয়ে হেসে বললাম, 'না, একটা কথা ভাবছিলাম।' বলে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সামনে মালতী, সুমতি, ষষ্ঠী। 'রাণীদি কোথায়?' জিজ্ঞেস করতে ওদেরও একই জিজ্ঞাসা, 'রাণীদি কোথায়? ওকে দেখতে পাচ্ছি না।'

পবন বললো, 'চেনাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও।'

পবনের নির্বিকার ভাবটা আমার পছন্দ হলো না। মালতীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের চোখের সামনে থেকে রাণীদি হারিয়ে গেলেন?'

'হারিয়ে যাবে না আর কিছু।' পঞ্চমী বললো, 'নিশ্চয় কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আমরা পাটবাড়ির মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, কোন দিকে যাবো ঠিক করবার আগেই সুমতি বলে উঠলো, 'একবার কদমতলা দেখে আসি চল্।'

কদমতলা? মনে পড়ে গেল কদমতলা না কেলিকদম্বতল। সেখানেই ঠাকুর হরিদাস উপবেশন করতেন। সেখানেই চৈতন্যদেব পদার্পণ করেছিলেন। সেদিকে যেতে গিয়ে, প্রথমে চোখে পড়ল একটি প্রাচীন বিশাল গাবগাছ। তারপরেই খানিকটা বাঁধানো উঁচু পোড়ো। যার চারপাশে গজিয়েছে নানা জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে বনবাদাড় বাড়ি, বনশিউলির শুকনো ঝাঁটি জঙ্গল। এদিকটায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। দেখা গেল একটি গাছতলায় রাণীদি চুপ করে বসে আছেন।

রাণীদির অন্য মনে চুপ করে বসে থাকাটা দেখবার অবকাশ মুহূর্তে মাত্র পাওয়া গেল। পিছন থেকে দেখলে মনে হয়, তেলহীন রুক্ষ চুলে কোনো রকমে বেণী পাকিয়ে, খোঁপা করে নিয়েছেন। বেগুনী রঙের পাড় সামান্য, শাড়িটির আঁচল লুটিয়ে আছে মাটিতে। মাথার ওপরে দু একটি শুকনো পাতার কুচি। ষষ্ঠীই প্রথম রাণীদির পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, 'তুমি কী গো রাণীদি? আমাদের না বলে কয়ে এখানে এসে বসে আছো?'

রাণীদি ফিরে তাকিয়ে আমাদের সবাইকে দেখে, লজ্জা পেয়ে হাসলেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ও মেলা তো জন্মেইস্তক কতবার দেখেছি। ভাবলাম, তোরা ঘুরে বেড়িয়ে ছাখ আমি এখানে এসে বসি। এখানে এসে বসতে আমার ভালো লাগে।'

কেন? রাণীদির ঠিক হরিদাসের উপবেশন স্থানটিতেই এসে বসতে ভালো লাগে কেন? জিজ্ঞেস করলাম, 'গৌরাঙ্গ এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে?'

'ও মা, তাই নাকি?' রাণীদি তাঁর কালো চোখে অবাকদৃষ্টিতে তাকালেন, 'এখানে এসে উনি দাঁড়িয়েছিলেন? আমি তো কখনো শুনিনি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তিনি এখানে এসেই দাঁড়িয়েছিলেন। সেই জন্যেই হরিদাসের কাছে এটি পরম পবিত্র স্থান।'

'আপনি সে খবর জানলেন কী করে?' পঞ্চমীর স্বরে যেন দ্বিধা ও সংশয়।

হেসে বললাম, 'কুলীনগ্রামেরও যে ইতিহাস আছে।'

'দাদার ব্যাপার আলাদা।' পবন বললো, 'তুই ওসব বুঝবি না পঞ্চী।'

পঞ্চমী বললো, 'ওরে পবনদা, সে কি জানিনে? ওর তল পাওয়া কঠিন।'

সেই পঞ্চমী বাত। এদিকে রাণীদি এক কাণ্ড করলেন। নিচু হয়ে, ধুলায় হাত ডুবিয়ে নিজের কপালে মাথায় মাখিয়ে, আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমার মাথাটা আপনিই নত হলো। তিনি বললেন, 'মুখ তুলুন, কপালে টিপ লাগিয়ে দেবো।'

মাথা তুললাম। রাণীদি আমার কপালে, কেলিকদম্বতলের ধুলার টিপ পরিয়ে দিলেন। না আছি ধর্মে, না কোনো মহৎ কর্মে। শ্রীগৌরাঙ্গীকে মনে মনে ডেকেছি কি কখনো? মনে করতে পারি না। তবু দেখ, এই মুহূর্তে, আমার ভিতরে কোথায় যেন একটা প্রাণ গলানো অনির্বচনীয় সুধা চুঁইয়ে ধারায় ধারায় বহে যায়। রাণীদির চোখে দেখছি একটি অন্যমনস্ক মুগ্ধতা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন বলতে চাইলেন, বললেন না। আবার নিচু হয়ে ধুলা তুলে আগে শঙ্করকে এবং সবাইকেই কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, কারো মুখেই কোনো কথা ফুটলো না। এমন কি পঞ্চমীরও না। এর নাম কি আত্মসম্মোহন, অথবা প্রাণেরই কোনো অজানা আবেগ? পবন প্রথম বললো, 'দিদি, চল কেনাকাটা যদি কিছু করিস, সেরে নিবি।'

'হ্যাঁ, তারপরে লেখককে নিয়ে শিবানীদেবীর মন্দিরে একবার যাবো। রাণীদি শিবানীদেবীর নাম শুনেছেন তো?'

বললাম, 'শুনেছি মানে জেনেছি, যেমন করে এই কেলিকদম্বতলের কথা জেনেছি।'

'সেখানে যাবেন তো?' রাণীদি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'আপনাদের সময় হলেই যাবো।'

'খুব সময় হবে, চলুন।' রাণীদি বললেন।

রাণীদি এখন আমার পাশে পাশে। আর দেখছি, পঞ্চমী শঙ্করের হাত ধরেছে। আড়ি নাকি? মনে মনে হাসলাম। সবার স্বধর্মী আছে। পঞ্চমীও কোথাও ব্যতিক্রম নেই। আমরা আবার এলাম মেলা প্রাঙ্গণে। কেনাকাটার মধ্যে, আমি ঘোষণা করলাম, 'মেয়েদের সবাইকেই চুড়ি পরতে হবে, এটা আমার ইচ্ছে।'

রাণীদি প্রথমে আপত্তি করলেও, পরে বললেন, 'কাঁচের চুড়ি পরা কতো বছর ভুলেই গেছি। আজ আপনার কথা রাখবো।'

চুড়িওয়ালা পাওয়া গেল না, সবাই চুড়িওয়ালা। এক চুড়িওয়ালার কাছে, সবাই যখন চুড়ি পরছে, পঞ্চমীকে তার মধ্যে দেখতে পেলাম না। শঙ্কর আর পবন অন্যদিকে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, পঞ্চমী খানিকটা দূরে, অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে তার হাত টেনে ধরে বললাম, 'তুমি এখানে কেন? চুড়ি পরবে চলো।'

'কেন, অনেককেই তো পরাচ্ছেন, আমাকে আর কেন?' পঞ্চমীর মুখে

ছায়া, চোখের তারায় বিষণ্ণ দৃষ্টি।

একে বলে স্বধর্ম। না, এর নাম হীনতা না, এর আর এক নাম মাধুর্য। আমি পঞ্চমীর হাত টেনে বললাম, 'ওরে বাবা, তুমি চুড়ি না পরলে, আমার চুড়ি পরানোই বৃথা। চলো চলো।'

পঞ্চমী আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার ঈষৎ চেষ্টা করলেও, সঙ্গে চলতে চলতে বললো, 'থাক আর মিছে কথা বলতে হবে না।'

এ তো আমার চিরকালের কলঙ্ক। মিছে কথার কারবারী, আমি মিথ্যুক। তা বলুক, তবু সত্যি পঞ্চমী চুড়ি না পরলে, আমার এ অনুষ্ঠানই বৃথা। ওকে চুড়িওয়ালার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভালো করে সাজিয়ে দাও ভাই।'

রাণীদি দাঁড়িয়ে দু হাত আমার সামনে তুললেন। এক হাতে রাঙা রেশমী, আর এক হাতে সবুজ। কিছু বললেন না, হাত দুটি দেখিয়ে নামিয়ে নিলেন। তারপরে হঠাৎ-ই যেন তাঁর কালো চোখে লজ্জা ফুটে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

পঞ্চমী আমার জামা টেনে ধরে বললো, 'আমার চুড়ি আপনি পছন্দ করে দিন।'

সে তো আর এক বিপদ! বেলোয়ারি চুড়ির কোন্ রঙে তাকে মানায় আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু পঞ্চমী যখন ধরেছে, আমাকে বলতেই হবে, কারণ সাজানোটা পরের রুচিতে মানায়। রঙ-বেরঙের চুড়ির দিকে তাকিয়ে যদিও চোখের দিশা হারিয়ে যায়, তবু বাসন্তী রঙের চুড়িতে যেন জাফরানের ছটা দেখছি। তার সঙ্গে চোখে লাগলো বেগুনি রঙের চুড়ি। চুড়িওয়ালাকে দেখিয়ে দিলাম, বললাম, 'এই দিদিকে ওই দুই রঙের চুড়ি পরিয়ে দাও ভাই।'

পঞ্চমীর চোখে একটু বোধহয় সংশয় ছিল, কিন্তু চুড়ি পরার পরে রাণীদি ঘোষণা করলেন, পঞ্চমীরই শ্রেষ্ঠ।

চুড়িপরা অনুষ্ঠানের শেষে দাম মিটিয়ে, এবার একটু চায়ের সন্ধান। চায়ের সঙ্গে খাবারও বটে। বেলা গড়িয়ে গিয়ে, অপরাহ্নের রোদে, ছায়া দীর্ঘতর হলো। অল্প-সল্প ভোজন আর চা পানের পরে,' আদ্যাশক্তি শিবানীদেবীর মন্দিরে গেলাম। দেবীর মূর্তি পাষাণময়ী। মন্দিরের পাশের খাতটি, লুপ্তস্রোতা কংস নদীর। দেবীকে একলা দেখলে হয় না, অতএব গোপাল দীঘির নৈঋত কোণে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটিও অবশ্য দর্শনীয়। সেখান থেকে ঘরের পথে ফেরা। সন্ধে উৎরে যাবার আগে ফেরার কথা।

ফেরার সময়ে উত্তর পশ্চিমের হাওয়ার গতি তার বেগ বাড়িয়েছে। এতোটা

ঠাণ্ডার জন্য কেউ জামাকাপড় নিয়ে তৈরি হয়ে আসেনি। ধুলা উড়ছে প্রচণ্ড, আর আমাদের যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে গন্তব্য গ্রামটির দিকে। কিন্তু পক্ষ্মী আর আমার পাশে নেই। ও শঙ্করের হাত ধরে চলেছে। আমার পাশে রাণীদি। সামনে মালতী সুমতি। সকলের আগে ষষ্ঠী।

'কেমন দেখলেন?' রাণীদি জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ধুলা আর বাতাসের জন্য যেন আঁচলটা টেনে বুকের কাছে আটকে ধরে আছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, কুলনীগ্রাম?'

'কুলীনগ্রামের মেয়ে।' রাণীদি হেসে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর কালো চোখের গভীরের বিষাদে এখন যেন কিঞ্চিৎ রহস্যের ঝিলিক।

আমি এক মুহূর্ত বিভ্রান্ত হলেও, পরমুহূর্তেই তাঁর জিজ্ঞাসার উপলক্ষটা বুঝে নিলাম। বললাম, 'দুর্গাকে তো আমার বেশ ভালো লাগলো। লাজুক মিষ্টি মেয়ে।'

আমার কথার মধ্যেই রাণীদির মুখে যেন আস্তে আস্তে ছায়া নেমে এলো। মুখে তাঁর সেই করুণ হাসি, বললেন, 'চোখে দেখিনি, শুনেছি ভালোই। কাজ-কর্মও নাকি জানে, কিন্তু বেচারির কপালে কী আছে, কে জানে?'

অনুমান করছি, রাণীদি নিশ্চয় তার বাবার সংসার, ভাইয়ের অবস্থার কথা ভেবেই কথাটা বললেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। পবন আর দুর্গাকে আমি মানব ধর্মের সহজ স্বরূপে দেখেছি। আর এই মুহূর্তে, সহসাই আমার মনে ব্যগ্র কৌতূহল জাগলো। যদিও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মুখ খুলতে ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু সহজ মানুষ আর সহজ ভাবের একটা অন্য ধর্ম আছে। বললাম, 'রাণীদি, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে হয়।'

'কী কথা?' রাণীদি আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁর চোখের দিকে দেখলাম, মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'রাগ করবেন না তো?'

'শুনি?' রাণীদিও মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকালেন, আবার পরমুহূর্তেই ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে দেখলেন।

আমি দ্বিধা কাটিয়ে বললাম, 'ইচ্ছে হলে জবাব দেবেন, নয় তো নয়। শঙ্করের মুখে গতকাল রাত্রে শুনলাম, বিয়ের সাত রাত্রি পুরতে না পুরতেই, আপনাকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল আর যাননি।'

'হুঁ, ঠিক।' রাণীদি ঢোক গিললেন, যেন কিছু চাপতে চেষ্টা করলেন।

হাত থেকে আঁচল খুলে গেল, উড়তে লাগলো, তারপরে হঠাৎ একটু হাসলেন, 'যেদিন গেছলাম, তার পরের দিনই ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষের মন তো আশা—' চুপ করে গেলেন। কথাটা শেষ করলেন না, বা পারলেন না।

আমার বুকের কাছে নিশ্বাস আটকানো। ভাবলাম বলি, কষ্ট হলে থাক রাণীদি, বলতে হবে না। সেই মুহূর্তেই রাণীদি বললেন, 'আমার সৎ শাশুড়ীর বয়স আমার থেকে কিছু বেশি। আমার স্বামী তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। ধর্মাধর্ম জানিনে, আমাকে বিয়ে না করলেই পারতো। শ্বশুরবাড়িতে ঢোকা মাত্রই আমাকে শুনতে হয়েছিল, জীবনে যেন কখনো স্বামী সঙ্গর কথা না ভাবি। বরণ কেমন হয়েছিল বুঝতেই পারছেন—।' রাণীদি আবার চুপ করলেন।

আমি যেন তাঁর কথার অতি দুঃখবহ ঘটনাবাহকে ধরতে পারছিলাম না, তবু নিশ্চিত রূপেই, ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক এবং নারীর জীবনের সব থেকে অপমানজনক কথাটি আমার মস্তিষ্কে বিঁধে গেল। রাণীদির চোখে জল নেই, সেই হাসিটি ছাড়া, বললেন, 'আমি তো কারো সুখ কেড়ে নিতে চাইনি। কিন্তু বড় অপমান, বড় কষ্ট—।'

আমার ইচ্ছা করলো হাত বাড়িয়ে রাণীদির একটি হাত ধরি। রাণীদি শেষ কথাটি বললেন, 'তবে, আমার বাবার দেওয়া গয়না সামগ্রী ওদের ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিল। আমার গরীব বাবার যে বড় কষ্ট—।' এবার রাণীদির গলা যেন হঠাৎ ডুবে গেল।

পশ্চিমের রাঙা আকাশে, ধুলা যেন নতুন এক রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছে।

বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই চাটুয্যেমশায় উঠোনে নেমে ছুটে এলেন। কোমরের লুঙ্গি থাকে কি যায়, তার ঠিক নেই। প্রণাম করবো কাকে ? তিনি একবার শঙ্করকে বুকে জড়ান, আর একবার আমাকে, 'কলকাতায় গোপীর টেলিফোন পেয়েই অফিস থেকে ধড়মড় করে হাওড়ায় ছুটেছি। আমার বাড়িতে মহাউৎসব, আমি ওখানে পড়ে থাকতে পারি ?'

বলতে বলতেই দেখ, চোখে জল। এ জল হলো হৃদয়ের অরূপ রসের গলন। সকালবেলা মনে হয়েছিল যজ্ঞি বাড়ি। আসল যজ্ঞি বাড়ির চেহারা খুলেছে এখন। চাটুয্যেমশাই নিজে মানুষটি হৈচৈ করেন না। সবাই হেসে খুশে হৈচৈ করবে, তাতেই তাঁর আনন্দ। খাও দাও গান কর, গল্প কর। বাড়িটি

যেন মেতে থাকে। প্রথমেই ঘোষণা করলেন, তিনি অফিস থেকে অনির্দিষ্ট-কালের ছুটি নিয়ে এসেছেন। অতএব আমাকে শঙ্করকে এখন কিছুদিন থাকতেই হবে। তবে ছেলেরা ছেলেদের মতনই থাকবে, তিনি কোনোরকম বাদ সাধবেন না। অর্থাৎ আমি, শঙ্কর যেমন খুশি বেড়াবো, তাঁর কাছে আমাদের বসে থাকতে হবে না।

এসে দেখলাম, আজ জ্যাঠামশায়ের ঘরও খোলা হয়েছে। সম্ভবত চাটুয্যেমশায়ের থাকবার জন্যই। যথাবিহিত তেলেভাজা মুড়ি আর চায়ের আসর বসে গেল। সেই সঙ্গে ফুলকপি ভাজা। পঞ্চমী বারে বারেই গানের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত হারমোনিয়ম নিয়ে বসলো। চাটুয্যেমশায় বললেন, 'অমা পঞ্চমী, একখানি রামপেসাদি ধর।'

পঞ্চমী একবার আকার দিকে তাকালো। কিন্তু ওর হারমোনিয়মের রিডের উচ্চগ্রামে বেজে উঠলো রবীন্দ্রনাথের একটা চেনা গানের সুর। আমি ভাবছি করালীকাকা কখন আসবেন, তাঁর কালভৈরবকে নিয়ে। এদিকে দেখছি, শঙ্কর আর পবন কেবলই চুপিচুপি কথা বলছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে দেখছি, মমতা পুবের দাওয়া থেকে, ওর ডাগর চোখে কঠোর কটাক্ষে শঙ্কর আর পবনের দিকে দেখছে। সেদিকে চোখ পড়লেই শঙ্কর ভালো মানুষের মতন মুখ করে অন্যদিকে তাকাচ্ছে। পঞ্চমীও সেদিকেই লক্ষ্য করছে, এবং গান শুরু করছে না।

পবন এক সময়ে বলেই বসলো, 'চলুন শঙ্করদা, একটু মাঠে ঘুরে আসবেন বললেন যে?'

মাঠে মানেই প্রাকৃতিক কর্মে যাওয়া। স্বয়ং চাটুয্যেমশায় শুনে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা ঘুরে এসো।'

শঙ্কর আমাকে বললো, 'চল্।'

'দাঁড়াও বাবু, টর্চ লাইট নিয়ে যাও।' চাটুয্যেমশাই মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'কে আছিস যা, আমার টর্চ লাইটটা শঙ্করকে দে।'

ইতিমধ্যেই পবনের হাত ধরা হয়ে আমি শঙ্করের সঙ্গে উঠোনে। পঞ্চমী হারমোনিয়াম বাজানো থামিয়ে দিয়েছিল। ও নিজেই টর্চ লাইট নিয়ে উঠোনে নেমে এসে, নিচু উত্তেজিত স্বরে বললো, 'জামাইবাবু, সত্যি করে বলুন তো কোথায় যাবেন?'

'কেন, মাঠে?' শঙ্কর ভালো মানুষের মতন জবাব দিল।

পঞ্চমী শঙ্করের হাতে টর্চ লাইটটা দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি

ভবানীপুকুরের মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।'

'বোকা মেয়ে বটে।' পবন বললো, 'অন্ধকারে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবি কেন? আমরা কি কেউ ছেলেমানুষ? আসুন শঙ্করদা।' সে আমার হাত টেনে ধরে এগিয়ে চললো।

শঙ্করও এগিয়ে এলো। পঞ্চমী বাড়ির বাইরে ঠাকুর দালানের চত্বরে এসে বললো, 'ত্যাখ্ পবনদা, বাবা বাড়ি, এটা মনে রাখিস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বাড়ি যা দিকিনি।' পবন প্রায় ধমক দিয়ে বললো।

পঞ্চমীও ঝেঁজে বললো, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি, তুইও সাবধান। সবাইকে তোর মত ভাবিস না।'

পবন তখন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। পাশে শঙ্কর। পবন অস্ফুটে বললো, 'বড় ডেঁপো মেয়ে।'

'কিন্তু তোমার বোন মাতুর হাত থেকে বাঁচবো তো?' শঙ্কর যেন ভয়ে ভয়ে বললো।

পবন হেসে বললো, 'মনে রাখবেন, আপনাদের ইজ্জৎ মাতুর হাতে, এটা ওর বাপের বাড়ি। ও কখনো হাঁক-ডাক করবে? সব চেপে যাবে। পরে অবিশ্যি আপনাদের দেখে নেবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'চলুন না।' পবন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। মাঝে মাঝে টর্চের আলো জ্বেলে নিয়ে পথ দেখে নিচ্ছে। ফোঁস শব্দে একটা কুকুর আমাদের গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রেগে না, আদর কাড়তে। আমি চমকিয়ে লাফ দিয়ে উঠলাম। পবন বললো, 'ভয় পাবেন না, কালভৈরব।'

পবনের কথা শেষ হবার আগেই কাছের অন্ধকার থেকেই করালীকাকার সেই মহানাদ ধ্বনি শোনা গেল 'কে, কারা যায়?'

'আমি পবন।'

'তোর সঙ্গে কে?'

'শঙ্করদা আর তার বন্ধু।'

করালীকাকা অন্ধকারে এগিয়ে এলেন। পবন টর্চ লাইট জ্বাললো। করালীকাকার রক্ত চক্ষু, বিষাদ হেসে বললেন, 'তোমরা চলে যাচ্ছো? আমি তো তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম। কোথায় যাচ্ছো?'

'সে শুনে তোমার দরকার নেই,' পবন বললো।

করালীকাকা বললেন, 'না তার দরকার নেই, তবে—বুঝলে বাবা শঙ্কর, তোমার বন্ধুকেও বলছি পো'টাক করে রোজই খাই। তোমরা আসায় একটু আনন্দ হয়েছে, আধসেরটাক হলে ভালো হতো। মনে হচ্ছে, তোমরা ডুলে পাড়ায় যাচ্ছো। আমিও কি যাবো বাবা?'

আমি তো গোড়া থেকেই অন্ধকারে। ডুলে পাড়ায় যাচ্ছি বা বাউরি পাড়ায় যাচ্ছি, কিছুই জানি না। করালীকাকার পো-টাক আধসের ব্যাপারটাও বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'পোয়া আধসের কী জিনিস কাকা?'

করালীকাকা দরাজ গলায় হেসে উঠলেন, কালভৈরবও উল্লাসে গুঙিয়ে উঠলো। একরকমেরই হাসি। করালী কাকা বললেন, 'কারণবারির কথা বলছিলাম বাবা। মায়ের পদোদক জ্ঞানেই খাই।'

কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই, প্রাণের কথা। যা বুঝে নেবার নাও। পবন বললো, 'তোমাকে আর আমাদের সঙ্গে ডুলে পাড়ায় যেতে হবে না। তুমি বরং বাউরিপাড়ায় যাও। শঙ্করদা, বাবাকে কিছু দিয়ে দিন তো।'

'কতো দেবো।' আমিই সেবা করতে চাইলাম।

করালীকাকা বললেন, 'দুটো টাকা দাও, তা হলেই হবে।'

'কেন, এত কেন? এক টাকাতেই তো হয়ে যাবে।' পবন ঝাঁকি দিয়ে বললো।

আমি পকেট থেকে টাকা বের করে, একটি নোট করালীকাকার হাতে ধরিয়ে দিলাম, 'নিন কাকা।'

'এ যে বড় নোট মনে হচ্ছে বাবা!' করালীকাকা বলে উঠলেন।

পবন টর্চ লাইট জেলে করালীকাকার হাতে আলো ফেললো, 'এ যে পাঁচ টাকার নোট!'

'তা হোক, আপনি নিয়ে যান কাকা।' শঙ্কর জবাব দিল।

'জয় মা সর্বজয়া, জগত্তারিণী!' করালীকাকা হাঁক দিলেন, 'কালভৈরব!'

'আঁ উ-উ-উ!' কালভৈরবের জবাব, আর ফোঁসফোঁস আওয়াজ।

করালীকাকা অন্ধকারে আমাদের বিপরীত পথে হাঁটলেন, 'চলি বাবারা!' তারপরে—'বাগ্‌দিনী সাজ সেজে, চল্ মা আমার সঙ্গে চল। হাতে সরা নে মা তারা, তাতে করে ছেচবি জল।' গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন।

'আসুন আসুন।' পবন হাত ধরে টানলো।

কোন্ পথে কোন্ দিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হলো

সামনের অন্ধকারে কয়েকটা ঘর। কোনো বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাঁকলো, 'হারু, এই হারু।'

ভিতরে থেকে স্ত্রী স্বরে জিজ্ঞাসা ভেসে এলো, 'কে ?'

'আমি চাটুয্যেবাড়ির পবন।'

একটি কম্পিত আলো মাটির দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে এলো। সামনে এলে দেখলাম, অনধিক বছর চল্লিশ বয়সের এক কৃষ্ণকালো রমণী। মাথায় ঘোমটা, বড় বড় চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পবনকে দেখে হেসে বললো, 'নতুন দাঠাকুর, ভেতরে এস। জামাই নিয়ে এসেছো ? এস এস।'

'ইস্, শালা মাথা কাটা গেল।' শঙ্কর ফিসফিস করে বললো।

পবনের সঙ্গে দেওয়ালের পাশ দিয়ে, লম্ফর আলোর পিছনে পিছনে গেলাম। সামনেই নিচু দাওয়া মাটির ঘর, খড়ের চাল অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। রমণী লম্ফটা বাড়িয়ে ধরে ডাকলো, 'এসো নতুন দাঠাকুর, মাথা বাঁচিয়ে।'

ভয় পাচ্ছি লম্ফর আগুন না খড়ের চালে লেগে যায়। পবনের পিছনে পিছনে মাথা নিচু করে দাওয়ায় উঠলাম। সামনে ঘরের দরজা খোলা, সেখানে আর একটি লম্ফ জ্বলছে। অপরূপ দৃশ্য! ঘরের মধ্যে মদ চোলাইয়ের জাওয়া বসেছে। হুগলি জেলার গ্রামে অনেক আগেই দেখেছি। চোলাইয়ের এ ব্যবস্থাটা কোন্ প্রাচীন আমলের জানি না। ব্যবস্থা সব জায়গায় এক। কয়লার উনোনের ওপর হাঁড়ি, মাটি দিয়ে আঁটা সব। তার সঙ্গে নল লাগানো, সেই নল ঢোকানো রয়েছে একটা কাঁচের বৈয়মের মধ্যে। টুপ্‌ টুপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা স্বচ্ছ পানীয় বৈয়মে পড়ছে, প্রায় আধাআধি ভরে উঠেছে।

বৈয়মের পাশে একটি মেয়ে, সেও কৃষ্ণকালো। গায়ে জামা নেই। ঘরে কি এতোই বোধহয় গরম ? বয়স আঠারো উনিশের বেশি না। সে বসেছে হাঁটু মুড়ে। কোমরের কাছ থেকে শিরদাঁড়াটা ধনুকের মতন বাঁকা, অধরা শরীরখানি যেন উদ্ধত। কালো চোখের উজ্জ্বল তারা মেলে আমাদের দিকে দেখলো। চুলের সিঁথেয় সিঁদুরের দাগ, কিন্তু কপালের টিপটি কালো তার চোখের তারার মতনই।

পবন বললো, 'এখন তোয়ের হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ গো!' রমণী আমাদের সামনে লম্ফটি রেখে বললো, 'তবে তোমাদের জন্ত মজুদ আছে।' বলে ভেতরে গেল।

তরুণীটি রমণীর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো, তখন তার নাকের

নাকছাবির ঝিলিক দেখতে পেলাম। রমণী হাতে একটি মাতুর এনে পেতে দিয়ে বললো, 'বস গো আপনারা।'

'তোর বাবা কোথায় গেলরে, বিনি ?' পবন ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

তরুণীটি জবাব দিল, 'বাপ গেছে এদিক ওদিক নজর রাখতে। আবগারির লোক কখন ঝপ্ করে আসবে বলা তো যায় না।'

'বসুন দাদা!' পবন মাতুরের ওপর বসলো।

উত্তর পশ্চিম, তুদিকেই ঢাকা। ঘরে কয়লার জলন্ত উনোন। চোলাইয়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে। এখন বুঝলাম, পবনের সকালের সাংকেতিক কথার অর্থ, 'চানের আগেই একটু হয়ে গেলে হতো না ?'

কিন্তু জায়গাটি অভিনব, সন্দেহ নেই। দৃশ্যত একদিক থেকে গোটা ছবিটা তুলনাহীন। বিশেষ করে বিনি যে-কোনো শিল্পীর তুলির সৃষ্টির আকর্ষণ। আবগারি নাম শুনলেই ভয় লাগে। তার থেকে বাইরে কোথাও গেলেই তো হতো।

রমণী ঘরের ভিতর থেকে একটি ভরা বোতল, তিনটি কাঁচের ছোট গেলাস সামনে এনে রাখলো। বললাম, 'অন্য কোথাও গিয়ে বসলে হতো না ?'

'এই শীতে ?' পবন বললো, 'আমাদের ঘরে গিয়ে বসা যায়। কিন্তু পক্ষী ষষ্ঠীরা এসে ঝামেলা করবে।

রমণী বললো, 'ভয় নেই গো জামাইবাবু, গেলাস টেলাস সব মেজে ধোয়া। নিশ্চিতে বসে খান।'

আমি জামাইবাবু নই, খাবোও না। অতএব জবাব দেবার কিছু নেই কিন্তু পবন তিনটি গেলাসে ঢেলে, আগে আমাকেই দিল। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'এ আমি পারবো না পবন।'

রমণীটি তৎক্ষণাৎ বোতল থেকে ডান হাতের তর্জনীতে কয়েক ফোঁটা ঢেলে, আগুনে বাড়িয়ে ধরলো। সরিয়ে আনলে দেখলাম, তার তর্জনীতে নীল আগুনের আভাস। বললো, 'এ ঘরের দ্রব্য দাদাবাবু খারাপ না দেখে নেন।'

দ্রব্যের এই মাহাত্ম্য দর্শনও আমার কাছে নতুন না। আমি তাকালাম শঙ্করের দিকে। শঙ্কর বললো, 'ভয় নেই, একটু চেখে ভাখ।'...

আরও তুদিন কাটিয়ে মমতাকে নিয়ে, চাটুযোমশায়ের সঙ্গে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম। শঙ্কর আসলে মমতাকে নিতেই এসেছিল, খবর না দিয়েই।

গরুর-গাড়িতে বাগিলা ইস্টিশনে গিয়ে ট্রেন ধরেছিলাম।

তারপরেও প্রায় বছর পাঁচ ছ ক্রমান্বয়ে এ গ্রামে অন্তত বছরে একবার এসেছি। ইতিমধ্যে মালতী সুমতির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে ধীরারও। দুর্গাকে পবন সেই ফাল্গুনেই বিয়ে করে এনেছিল। দুর্গার এই ক বছরেই তিনটি সন্তান জন্মেছে। তার মধ্যে মারা গিয়েছে একটি। রাণীদির কথাই মনে পড়ে, 'মেয়েটার কপালে কী আছে কে জানে?'

রাণীদি কি জানতেন, দুর্গার সেই ছোটখাট লাবণ্যময়ী মূর্তিটি কঙ্কালসার হয়ে যাবে? ক্ষুধার জ্বালায় তুলে বাড়ির ভাতও লুকিয়ে খেতে দ্বিধা করবে না? তবু, দেখা হলে দুর্গা সেই লাজুক মিষ্টি হেসেই অভ্যর্থনা করেছে। অথচ পবনের প্রেমের জোয়ারে অবশ্যম্ভাবীরূপেই ভাঁটা পড়ছিল। বেড়েছিল তিক্ততা আর অপমান। এও কি মানবধর্মেরই প্রতিপ্রকৃতির অন্তর্গত?

পিসিমা মারা গিয়েছেন কলকাতায়, তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে গিয়েছিলাম। এই শুঁড়াদুর্গাপুরে শেষ এসেছিলাম চাটুয্যেমশাইয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে।

আর যাইনি সেই গ্রামটিতে। চাটুয্যেমশায়ের মৃত্যুর বছর খানেক পরেই শঙ্করের শাশুড়ী প্রায় উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। ইতিমধ্যে শঙ্করের সংসার বেড়েছে। মমতা এখন জননী, গৃহিণী। এখন শুধু খবর পাই। মালতী একটি কন্যা কোলে বিধবা হয়েছে। পঞ্চমী ষষ্ঠীরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

পবন আজকাল কেমন করে যেন রাজনীতির গন্ধ শুঁকতে শিখেছে। তবলা বাজায়। আর সময় মতন দল বদলায়। তাতে নাকি ভালোই চলে। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে দুর্গা মারা গিয়েছে, আর পবন তিন মাস পরেই আর একটি বিয়ে করেছে।

চাটুয্যেমশায়ের ভিটায় এখন বড়দি আর দুখু থাকে। রাধারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পঞ্চমীর বিয়ে হয়েছে কলকাতার কাছেই। মাঝে মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, আর পঞ্চমী-বাত 'না দেখলে সইতে নারি। দেখলে কাটাকাটি' ···চোপাখানি সেই রকমই আছে, মনখানিও। ও এখন জননী গৃহিণী।

সুখ-দুঃখের সব সংবাদের মধ্যে একটি চিঠিই প্রাণকে উজ্জীবিত করেছে। রাণীদির চিঠি: '···আমার স্বামী আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন। বেঁচে থাকা সার্থক হল কী না জানি না, স্বামীর ঘর করছি, এটাই সান্ত্বনা।'···

চিঠিটা পড়তে পড়তে সেই গ্রামখানিই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। অথচ চোখ দুটো যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। শুঁড়া দুর্গাপুরের হাতছানি এখনো ডাক দেয়। চিরদিনই হয়তো দেবে।···

সব বার্তারই কচকচি আছে। আগে সেইটি সেরে নিই। বললাম অবিশ্যি "কচকচি", কিন্তু শব্দটি আবার সকলের মনে ধরে, তবেই দায়মুক্তি ঘটে। ধরবে কি? কারণ যাঁরা বিরাট ওজনে বলেন, তাঁরা লম্বা "ভূমিকা" করেন। এখন আমার মতন প্রাণী যদি ভূমিকাকে কচকচি বলে চালাতে যাই, তা হলে অনেক মানীর মন খচখচিয়ে উঠতে পারে।

তবে জোড় হাতে নিবেদন করতে পারি, আমাকে না হয় চলতি কথায় বলতে দিন। "ভূমিকা" বললে, শব্দটির কিছু কিঞ্চিৎ সাজগোজের দরকার হয়। হয় না কি? সাজগোজ বলতে আমি ব্যাখ্যা বন্ধন বোঝাতে চাই। ব্যাখ্যার থেকে "বন্ধন" শব্দটি যেন খাচ্ছে বেশি। কেবল তো "মুখবন্ধ" বললেই সব বোঝানো হয় না, "ভূমিকা" যার আর এক নাম। অবিশ্যি ইংরেজির "প্রিফেস"কে "মুখবন্ধ" বলা যাবে কী না, সে-বিষয়ে আমার ধ্যান ধারণা স্পষ্ট না, কথাটা আগেই কবুল করি। "ফোরওয়ার্ড" শব্দেরই বা মানে কী? ওই যে কী বলে "মুখবন্ধ" জাতীয় একটি শব্দ, ইংরেজি "ফোরওয়ার্ড" কি সেই শব্দে খাওয়ানো চলে? আহ্, সব কিছুর ভিতর বাহির না জানলে পরে, কত রকমে যে ঠেক খেতে হয়। কথা বলবো কি। বলতে গেলেই হিজি-বিজি। আসলে মনে মনে ভয়। এ ভয়টাকে যে ত্যাগ করতে পারে, তাকে বলি বন্ধনমুক্ত।

আমিও কেন না নিজেকে বন্ধনমুক্ত ভাবি? কেন না, আমার মনে হয়েছে, এক আধবার নয়, অনেক বার অনেক প্রকারে, বন্ধনমুক্ত হতে পারলে, সে ভাবের ভাবী হয়। আমি তো আসলে বেত্রদণ্ড নিয়ে পণ্ডিতি করতে বসিনি। আমার সাধনা একটি, হতে চাই "ভাবের ভাবী"। আর পণ্ডিতদের ব্যাপার স্যাপার যদি বলতে আরম্ভ করি, তবে, আমার এই নিয়ে বসা দু-চার প্রস্থ কাগজে আর এক কলমে "কুলাবেক" না। এই "কুলাবেক" শব্দটি দিয়ে তোমার / আপনার নজর কাড়তে চাই। আঙুলের ডগায় দুই চার চিমটি দিয়ে তুলে, দু একটি পুরনো বুলি ছাড়ি। আজ থেকে একশো ছ' বছর আগের কথা। "শ্রী" নাম ছদ্মবেশের অন্তরালে, এক পণ্ডিত "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় পত্রাঘাতে

"বঙ্কিমঘাতক"-এর ভূমিকা নিয়েছিলেন। অপরাধ? বিস্তর! সবিস্তরে কহনে না যায়। তাই আঙুলের ডগায় দুই চার চিমটির ডগায় দু একটি পুরনো বুলি উদ্ধারের বাসনা হলো। "শ্রী" কথিত উক্তি, "বঙ্কিমবাবু যেরূপ জঘন্য ভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থা বাঙালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটি বঙ্কিমবাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস গ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।"

"শ্রী" মহাশয়ের বক্তব্য "শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে।" এ সব হচ্ছে রুচিবিকার, জঘন্য ভাব সমূহের কথা। ভাবের ভাবী হতে গিয়ে আমার ঠেক লেগেছে অন্যত্র। উপন্যাস "চন্দ্রশেখর"-এর "শৈবলিনী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবক সমালোচক তুলে ধরেছেন, "পর্য্যন্ত বিশিষ্ট রূপে অনুধাবন করিলে বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটকের কীর্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

"শ্রী" মহাশয়ের মন্তব্য, "এরূপ অবিশদ বাঙ্গালা উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নহে। আজিও যদি রামমোহন রায়ের সমকালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।"..."অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটি উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটির জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়ুয়াগণ! (সর্বনাশ, সোমপ্রকাশের "শ্রী" মহাশয়ের উক্তি মতো, আমিও সাহিত্যসম্রাটের মতোই ভাষার "গুরু সাহেবী" দোষ করে ফেললাম যে! "গুরু সাহেবী" দোষের আর এক নাম কি "গুরু চণ্ডালী"? হবেও বা। তথাপি এ আমার মনের সাধ, পাঠকগণ সম্বোধন না করে পড়ুয়াগণ করি। কেন যেন মনে হয়, যে / যিনি পড়ে বা পড়েন, আর লেখে বা লেখেন, চলতি সম্বোধনে ভাবের ঘরে মাখামাখি কিঞ্চিৎ বেশি হয়। লেখার সময় আলাদা কথা। লিখিয়ে আর পড়িয়ে তখন থাকুক গিয়ে যে যার আপনার মনে। তখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অবিশ্যি "শ্রী" মহাশয় বঙ্কিমবাবুকে আরও বলেছেন, ভাষার ব্যাপারে নাকি তিনি "স্বীয় স্ত্রীবিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন"।)

অতঃপর আবার, পড়ুয়াগণ! সোমপ্রকাশের "শ্রী" নামক পণ্ডিতদের তোমরা / আপনারা আজিও দেখে থাকো ও থাকেন, চেনো ও চেনেন। শ'

বছর আগের সেই আত্মশ্রাদ্ধ আমার মনে পড়ছে, ভাষা বিষয়ে নিজের নানা ঠেক খাওয়াতে।

কথা যখন তোলা হয়েছে, তার একটা জবাব দরকার। "ফরওয়ার্ড" "শব্দ বিষয়বস্তু কথনের "অগ্রন্থ" শব্দে কি খাওয়ানো (সেই "গুরু সাহেবী" দোষ।) চলে? যাকে বলা যাবে "আগের কথা"। অথবা নাকি মূলের ধরতাই? কী বলবো? অব্যাপারীর ব্যাপারীসুলভ কাণ্ডকারখানার মতন লাগছে। কিন্তু কচকচি শব্দ দিয়ে কথাটা তুলেছি যখন, তখন নিজেকেই বেঁধেছি। এ বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, আমার নিজের খচখচানিও যে যায় না। তার আগেই অবিশ্যি "ভূমিকা" শব্দ দিয়ে কচকচির মুণ্ডু টানতে চেয়েছি। কারণ আর কিছু না। কচকচি শব্দকে "ভূমিকা" শব্দের দ্বারা মুণ্ড আকর্ষণ, অনেক মাননীয় রচয়িতার মন খচখচিয়ে উঠতে পারে। আমি ভাবের ভাবী হতে চাইতে পারি, কিন্তু একেবারে চোখ বুজে গায়ের জোরে না। "মুখবন্ধ" আর "ভূমিকা" শব্দে তফাত নিশ্চয় আছে। "ভূমিকা"কে শুরুর শুরু বলা যায়? গানের আলাপের মতন?

এতেও আবার গোড়ায় গলদের লক্ষণ। গানের আলাপ বিষয়টির শুরু আর শেষ করার মাপজোঁকের কাঁটা যে কোন্ চালে চলে, অনেক সময় তা ধরা বিলক্ষণ মুশকিল। "ভূমিকা" শব্দের সঙ্গে কি তার তুলনা চলে? চলে না একেবারে বলা যায় না। না হলে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির কথা বলা হয়েছে কেন? আভিধানিক অর্থে "প্রিফেস" যদি "প্রারম্ভিক মন্তব্য" বোঝায়, সে-মন্তব্যের সাজগোজ অনেক সময়েই তেরো হাত দেখিয়ে ছাড়ে।

এবার তো নিজের বেলাতেই বলতে ইচ্ছা করছে, এক কচকচির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, নিজেই তেরো হাত দেখিয়ে ছাড়লাম! তবু তো এখনও আসল কচকচিতেই আসিনি। তবে, শুরুর মুখে সাবেকি নিবেদনটাই রাখলাম, ভূমিকা না, বার্তা কহনের আগে কচকচিটা সেরে নিই।

গোলমাল। গোলমাল। আবার গোলমাল! ভাগ্যের কী গুনাহ্,[১] যে সোমপ্রকাশের বঙ্গদর্শনের "অপদার্থতা" বিষয় গোড়া থেকেই মনে পড়ে যাচ্ছিল, তা আমি জানতাম। আসলে সকলের কাছে ক্ষমা ঘেন্না চেয়ে, আমার ভাবের ভাবী হওনের বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ সহজ সরল করে নেওয়া। ভাষার দোষ বৈলক্ষণ্যে কেউ না আবার আমার একান্ত "গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ"-এর সন্ধানে লিপ্ত হন। গোলমালের ঠেক লাগলো "বার্তা" শব্দে। সোম-

প্রকাশের শ্রী নামক ভূতেরা নানা ভাবে বেঁচে আছেন। এমনিতেই তাঁদের মতে সমাজে প্রচলিত শব্দের দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি অতিশয় অপরাধ, বাঙলা সাহিত্যেরও মুণ্ডপাত। "বার্তা" কহন বহন সবই করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা তো বার্তাবাহী হতে পারে না। প্রচলিত অর্থেও, বার্তা হলো খবর বা সংবাদ। কখনো বা জনশ্রুতি। এই তো আমার টেবিলের পাশেই একটি পত্রিকা রয়েছে, "অমুকবার্তা"। কথার সঙ্গে বার্তার একটা পিঠোপিঠি সম্পর্ক আছে। ঠিক তেমন করে কথা কইবো বলেও, কচকচি করতে বসিনি। কেন না, সেই পিঠোপিঠির মধ্যে দেওয়া নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। অবিশ্যি আমার ধারণা। লিখিয়ে আর পড়িয়েদের মধ্যে, একটা অন্তর্নিহিত কথাবার্তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু লিখিয়েদের লেখার সময়টাতে সে অতি নির্মমরূপেই একাকী। অন্যথায় যোগসূত্রটাও ঘটে না।

যাই হোক "বার্তা" নিয়ে আর কচকচি না। যদিও "বার্তাবহ পাখী"র সঙ্গে দূতেরও একটি ভূমিকা যুক্ত। সেই অর্থে, যদি হতে পারতেম সেইরকম এক দূত, "যাও পাখী বলো তারে / সে যেন ভোলে না মোরে" তবে "বার্তা" শব্দই বজায় রাখা যেতো। কেন না, এই রকম দৌত্যের মধ্যে বার্তাবহের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে, বিরহী বা বিরহিণীর আলিঙ্গন চুম্বনও দূতের কপালে জুটে যেতে পারে। দানপানির তো কথাই নেই। কিন্তু এ জন্মে আর সে আশা নেই।

কচকচিটা আর কিছু না, ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা নতুন কৈফিয়তের অবতারণা। এই "অবতারণা" শব্দটিকে নিয়ে অনেক কথার সূচনা। আসলে, সেই কবে এক আদ্যিকালে "মন চলো যাই" -এর ফেরে ফিরেছি, এবার আর তেমন ফেরে ফিরবো না। "কৃষ্ণ অনুরাগ"-এর প্রতীকটা প্রাণ থেকে হটানো দুষ্কর, কারণ "কৃষ্ণ" নামটি কেমন যেন চুম্বকের মতো ধ্যানে ঠাঁই নিয়ে আছে। অথচ যথার্থ "কৃষ্ণ" দর্শনে কদাপি কখনো যাইনি। কবে এক "ভোলার মন" প্রেমিকের ডাকে, কথাটা আমার প্রাণে গছে গিয়েছে, আজ তক তার "ন্যাওটো" ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না!

তবে, এবার কাটাতে চাই। "কৃষ্ণ অনুরাগী বাগানে" যাবারও আগে, সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়ায়, জীবনের একটা পর্বে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন "কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান" থেকেও, কাঁধে কাঁথা ঝুলি নিয়ে "ভারত"কে এক বাগানের নানা ফুলে ফলে দেখবো বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। "ভারত উদ্ধারের" সীমানায় দাঁড়িয়ে তখন একটা কথাই ধিক্কারে আর আবেগে মনে

এসেছিল, "ভারত" না দেখেই উদ্ধার ? দেখা যায় বা কেমন করে ?

না, না, সে হাটের কেনা বেচায় আছে বা মাঠের হালে বলদে আছে, কিংবা আছে সবাইকে নিয়ে ঘরকন্নায়, সেই দেখা না। চিত্তে ফাটল ধরে না, ভেঙে ব্যাখ্যাও করতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝি, সব নিয়ে থুয়েও তার আর একটা রূপ আছে। সেইখানেই যেন সে নিজের অজান্তে আসল রূপ নিয়ে আপনার মতন করে আছে। সেখানে সে ঘরসংসারের কল্যাণের জন্য ছুটে গিয়েও, সেই কথাটাই ভুলে যায়। কল্যাণের অন্য এক ধ্যানে সে ডুবে যায়, নিজেও জানতে পারে না। সেখানে সে নিজের কাছে অচেনা।

হ্যাঁ, জানি, সকলের কথায় সকলের সায় থাকে না। আমার কথায় সকলের থাকবে, এমন আশা করি না। মানুষকে তো দূরের কথা, মানুষ নিজেকে সকলের সঙ্গে কোনোদিন এক করে মিলিয়ে দেখতে চায়নি। মানুষের কি এটা অহংকার ? নাকি সে অসহায় ?

তাই সে যাই হোক গিয়ে, আমি কোনো কূটকচালে নেই। আমি কোনো-দিন সাব্যস্ত করে দিতে পারবো না, কে কী নিয়ে অহংকারী।, কে কী নিয়ে অসহায়। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, যার মনে যতো কূটক-চালির গরলে উথালি পাথালি, সে যেন ততো অহংকারী, ততোই অসহায়। আসলে সেকি বড় কষ্টের কথা ? জবাব আমার জানা নেই। তবে, রে রে ক্যাপা হা হা দুঃখী, দপদপিয়ে চলেছে এই সংসারের বুকে দাপিয়ে, অথচ "আমি নিরেট ভদ্দরলোক গ" বললে বড় কেতা, মুখে অমায়িক হাসি, এমনটি অনেক দেখেছি, দেখছি। কিন্তু সে-কথা আমি বলতে বসিনি।

কচকচির কথায় ফেরা যাক। সেই "ভারত" দেখার কথায়। "ভারত" তার যে-জনপদ থেকে আপন ঘর সংসারের মঙ্গল শংখ বাজাতে বাজাতেও এক জায়গায় এসে, সে জগত সংসারের আর এক আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে, নিজের নিয়ে আসা রূপটাকেই চিনতে পারে না। সে আঙিনাটা আবার কোথায় ?

কথা অনেক সময় বড় খিটকেল হয়ে ওঠে। জানবোই যদি, তবে তো ব্যাখ্যা করেই দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, আঙিনাটা ঘরকন্নার প্রত্যহের উঠোনে না। অন্য এক উঠোনে। যেখানে সে ঘর করার অনেক বেশ ছেড়ে একমাত্র বেশে দাঁড়িয়ে। সেখানে তার ধরাচুড়া বসন ভূষণ কিছু নেই। হয়তো সেখানে সে নগ্ন, কিন্তু দীন না, কেঁদে হাত বাড়িয়ে তোমার দয়া চায় না। তবু চোখে তার জল দেখতে পেতে পারো। তোমার বচনবিন্যাসে ভুলাবে না, এমন মোহন হাসিও দেখতে পাবো। আমার হিসাব জানা নেই, এমন উঠোন

জগতের আর কোথায় কোথায় আছে।

ভ্রূকুটি করছেন? করছো? বলেছি তো, তর্কে নেই। যুক্তি দিয়ে কতো গূঢ় গূঢ়াস্তরকে বাঁধবে? তবে হ্যাঁ, কচকচির পর্বটা সেরে নিতে গিয়ে এটুকু আগে বলে নিই, তেমন কোনো আঙিনায় যাবো না। অমৃত খুঁজতে গিয়ে নাম একটি নিয়ে ফিরেছি। জীবনে বুঝেছি, ওইটি সার।। কিন্তু পষ্টাপষ্টি কথা, গোড়া বেঁধেও না। শেষ যাত্রার বিন্দুবিসর্গও না। কেন? না, আমার মন ভালো না। আমি এবার যেখানে যেমন খুশি যাবো, যেমন খুশি বেড়াবো। আমার ঢাক ঢোল পেটাবার কিছু নেই।

সেই কবে প্রয়াগে যাত্রা করলাম, তারপরে আর আমার একটু নীল আকাশের খোঁজে যেতে, ঘাটের ধারে, হাটের সীমানায়। পুকুর পাড়ের পৈঠায় কেউ বসতে দিলে না। দিলে না বললে পরের দোষ গাওয়া হয়, নিজের মনকেই পাচনতাড়ি দিয়ে হৈ হৈ করে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। কবেই— সেই প্রথম থেকেই বলে দিয়েছি, আমি না কৌপীন আঁটা ঘর ছাড়া না বিবাগী বৈরাগী। এমন কি, আজ আরও দুটো কথা হলফনামা দিতে হবে আমাকে। দেবার আগে জোড় হস্তে নিবেদন, আমার অযোগ্যতাকে নিয়ে কেউ যেন না ফুট কাটেন। আমি কারোকে নিয়ে যেতে পারবো না পর্বতের সেই আশ্চর্য মহিমময় লালাখচিত প্রাঙ্গণে। পারবো না অজানা দেশের দেবদেউলের সন্ধান দিতে। আর ডাইরি বা গাইড, ভ্রমণ-বিলাসীদের হাতে তেমন মন-মনোহর কিছু তুলে দিতেও পারবো না। কারণ ভূগোল ইতিহাস পুরাতত্ত্বের জ্ঞান দেবার দম আমার নেই।

তবে কী দিতে পারবো?

কিছু না। কেবল আপন চলন বলন বিবরণ। তারপরে তোমার মনে তুমি, আমার মনে আমি। দেনা পাওনা নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ পেতে বসতে পারবো না। ওটা যার যার, তার তার। দেনেওয়ালার আর লেনেওয়ালার। দেনেওয়ালার দিয়ে কি মন ভরে? লেনেওয়ালার নিয়ে কি মন ভরে? লেনেওয়ালার নিয়ে কি সাধ মেটে? যত্তো ব্যাজের কথা। এর আবার কোনো জবাব আছে নাকি? বলাই তো হয়েছে, ওটা যার যার, তার তার। এসব বেশি ভেঙে বলা চলে না।

অতএব, তাই সই। কিন্তু কোথায়? কতো দূরে? এ কথা বললেই তো সেই আবার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা আসে। ও সবের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কেন না, আগেই বলা হয়ে গিয়েছে, এবার গোড়া বেঁধেও না, শেষ যাত্রার

বিন্দুবিসর্গও নেই। তবে যাত্রাটা কেমন? এলেবেলে। যেমন খুশি। একে কি মনবিলাসী বলা যায়? অথবা না হয়, আমার সেই আগের কথাটাই থাকলো, ভাবের ভাবী। কিন্তু ভাবেতে কি সংসারে হাঁড়ি চড়ে? কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? সেই কথাটাও মনে রাখতে হবে। মনবিলাসী ভাবের ভাবী, যা-ই বলা যাক, জীবের কর্তব্য থেকে মুক্তি নিয়ে আসিনি। বন্ধনমুক্ত বটে, আসলে বৃহৎ বন্ধনেই নাড়ি জোড়া আছে। কেননা, একটা কথা বুঝেছি। মুক্তি এই সংসার থেকে। আবার মুক্তি এই সংসারেই? মুক্তি মানুষের কাছ থেকে, আবার মানুষের সঙ্গেই। যা ছাড়িয়ে গিয়েছি, তা ছাড়িয়ে যাইনি।

কথার একটা নিজের দৌড় আছে। একবার ছুটলে রক্ষা নেই। তাকে না থামালে মোদ্দা কথায় আসা যায় না। কচকচি কনেক হয়েছে, এবার শুরু করা যাক।

যেথাকার নাম বাঁশবেড়ে, তারই পোশাকি নাম বংশবাটি। জায়গার নাম করলেই লোকে আগে রাজবাড়ি আর মন্দিরের কথা ভাবে। আমি আসলে, বাঁশবেড়ের চটকল পেরিয়ে সেই ত্রিবেণীর হাতায়। যেখান থেকে বাস আর এগোয় না, পেছোয়। হালের হালচাল চেহারা পথঘাট কেমন দেখতে হয়েছে, জানি না। অনেক দিনের সাধ, একদিন চলে যাবো চুঁচুড়োর ভিতর দিয়ে, গঙ্গার ধার ঘেঁষে, শাগঞ্জের সীমানা পেরিয়ে। গন্তব্য কোথায়? না, ত্রিবেণীর ঘাট।

এ আবার কেমন ভ্রমণ? রাত-ভিখিরির মতন, মন-ভিখিরির পথ চলা। কেননা, অনেকদিন যাবৎ মনটা ওই পথটাকে ভিড় করছে। সেই যেখানে, চটকলের শেষে, চারপাশের খোলা জায়গায় কনডাকটর যাত্রীদের হাট হাট করে নামিয়ে দেয়, সেই ত্রিবেণীর ছাতায়। আসলে সেটা ত্রিবেণী না। পথ কিছু ভাঙতে হবে। মাঠের পথ। ডান পাশে ঢেউতোলা টিনের বড় বড় শেড, গঙ্গাকে আড়াল করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি অনেক শেড। রাস্তা থেকেই শোনা যায়, শেডের মধ্যে, বয়সের হিসাব ছাড়া যতেক বামাস্বরের হাঁকডাক গুলতানি। কান পেতে শুনলে বচনের সবটাই পুবদেশী। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, গোঁ গোঁ করে খালি মোটরবাসটা ঘুরে আসতে বড় মুখ করে কনডাকটরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কিসের শেড, কারা থাকে?'

কনডাকটরের জবাব শুনে কান দুটো ঝাঁঝিয়ে উঠলো। লিখে বলি,

কলমের এমন অসহবত বুকের পাটা নেই। অথচ কনডাকটর সহিসের সঙ্গে ড্রাইভার হা হা হেসে, ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে বাস চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। যেন কী মজাই করে গেল। আজকের কথা না, অনেক দিনের। তা পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ের তো বটেই। হালফিল যেমন মোটরবাসের বা লরি-ট্রাকের কানের পর্দা-ফাটানো যন্ত্রের ভেঁপু বাজে, তখনও তেমনটা বাজারে আমদানি হয়নি। অন্যায়টা আমারই হয়েছে। আমি তো আর একটা যাত্রী নামিনি। চটকল পেরিয়ে, শেষ স্টপেজে, আরও দু-চার যাত্রী নেমেছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলেই পারতাম। কৌতূহল যখন মনে জেগেই ছিল।

তবে অন্যায়ই বা বলবো কি। কারখানা আর কুঠির সীমানা ছাড়িয়ে, চারপাশে ছড়ানো পোড়ো জমি মাঠ কাঁচা-পাকা ভাঙা রাস্তা, দু-চার যাত্রীরা যে কোথায় কেমনে এদিকে-ওদিকে চলে গেল, দিশা পেলাম না। একদল মোটরবাস হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার আগে, কানঝাঁঝানো খেউড় শুনিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তারপরেই তো আবার শুনি খিলখিল হাসি। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, টিনের শেডের গায়ে যেন কেউ খামচা দিয়ে সুড়ং খুলে দিয়েছে। সেই সুড়ংয়ের ফাঁকে দুটি ন'বউয়ের মুখ। মানে নতুন নতুন লাগলো, বোধহয় বয়সের জন্য, আর হাসির চালে। সিঁথির সিঁদুর যতো চওড়া না, কপালের ফোঁটা তার থেকে মস্ত। যেন অশোক গাছের ওপারে এইমাত্র সূর্যোদয় হলো।

না, আমার দিকে তাদের নজর নেই। হাসিতে আওয়াজ থাকলেও, দুজনের মুখ প্রায় মুখে মুখে ঠেকানো। কথাবার্তা চুপিচুপি। তাদের রূপ দেখবার সময় আমার ছিল না। আটপৌরে শাড়ির ঘোমটায় কেউ অপ্সরী কিন্নরী না হোক, চোখের কালো তারায় বিস্তর রঙ্গরসের ঝিলিক। তাতেই তারা রূপসী। ওরকম মালগুদামের মতন টিনের শেডের ভিতরে কেন তারা। করছেই বা কী?

পথ চলতে পথের সব বৃত্তান্ত যদি জানতে হয়, তবে আর গন্তব্যে পৌঁছুবার সময়ের ঠিকঠিকানা রাখা চলে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনতে পেলাম না, সময়কে কেউ নিজের হাতে করে নিয়ে এসেছে। সময় সকলের রাজা হয়ে জগৎটাকেই চাপিয়ে নিয়ে চলেছে নিজের রথে। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। বাঁ দিকের দূরের গাছপালার মাথার ওপরে, রবিখন্দের ঋতুর সূর্যের আকার যতো বড় হয়েছে, রঙে তার থেকে বেশি রাঙা। ছায়া এখন পুবে শয়ন নিচ্ছে। আমি হাঁটা ধরলাম।

এমনটা হবার কথা ছিল না। বেরিয়েছিলাম তো গতকাল। তখন মনের কথা, যাই একবার ত্রিবেণী ঘুরে আসি। কিন্তু অনেকদিন ধরেই, ওপারে হালিশহর আর এপারে বাঁশবেড়ের গঙ্গার মাঝখানের সবুজ লম্বা চরটা হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করেছে। চোখে দেখেছি, কানেও শুনেছি। ওপার থেকে, এপার থেকে, দুপার থেকেই। কতোদিনই তো দুপারে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওপারের লোক নৌকায় ভেসে চরে। চর পেরিয়ে আবার নৌকায় ভেসে ক্যাওট শাগঞ্জে আর বাঁশবেড়েতে। আবার এপার থেকে ওপারে, চরের ওপর বিহার করে, হালিশহরে।

ব্যাপার তো এমন কিছু না, যে বোঁচকাবুচকি বাঁধতে হবে, ঝোলাঝুলি নিতে হবে। পাড়ি দিতে হবে দূরের পথে। ভেসে গেলেই তো হয়।

আহ্, ওইখানেই তো যতো মন্তরতন্তর। যোজন পথ পাড়ি দিয়ে এলে, ঘরের পিছনের দরজা খুলে তাকাবার একদিন সময় হলো না। যেন ও-পথে কেউ মন্ত্র পড়ে রেখে দিয়েছে। খবরদার, যেও না।

গতকাল ত্রিবেণী যাবার পথেই সব তালগোল পাকিয়ে গেল। শাগঞ্জের ভিতরের রাস্তা দিয়ে, বাসে করে, সকালের ঝলকানো রোদ গায়ে নিয়ে বেরিয়ে-ছিলাম। বাসের জানালার ধার ঘেঁষে বসেছিলাম, ডান দিকে। চলেছিলাম আপন মনে, গঙ্গা দেখতে দেখতে। ওপারে হাজিনগরের কলকারখানার চিমনি ইমারত কুঠি। আর এপারের সরু রাস্তায়, প্রায় এ-দেওয়ালে ও-দেওয়ালে ধাক্কা মারতে মারতে বাস ছুটে চলেছে। হঠাৎ গঙ্গার মাঝখানে সেই সবুজ চর!

সবুজ চর। দু-একটা মানুষের অস্পষ্ট মূর্তি। বেশ ফারাকে ফারাকে এক-আধটা চালা ঘর। ঘরই তো? সন্দেহ হয়। এ-পাশে জল, ও-পাশে জল, মধ্যখানে চর। তীর থেকে যেন ঠিক কিছু বোঝা যায় না। ঘর না হয়ে, খড়ের গাদা হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তাতেই বা আমার কী? আমি তো ঘরে গিয়ে ঠাঁই নেবো না। ঠং করে বাসের ঘন্টি বেজে উঠলো। কারা যেন নামলো। আমিও জায়গা ছেড়ে বাসের দরজার দিকে। সেইবেলায় কনডাকটরের নজর কর্তব্য বোধশোধ ভালোই, 'ও মশাই, আপনি নামছেন কোথায়? ত্রিবেণীর স্টপেজ চটকল ছাড়িয়ে, এখনও বাঁশবেড়েই আসেনি। যান, জায়গায় বসুনগে।'

শাস্ত্রে অনেক কথা বলেছে বটে। গৃহের চৌকাঠের ওপার থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখিস বউ। অমঙ্গল মনোহর বেশ ধরে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে

ধারে। আঁচল উড়িয়ে চলে যাবি, দরজায় কাঁটা পড়বে। এ-জীবনে আর ফেরা হবে না। সবুজ চরের অনেক দিনের হাতছানিটা আমার প্রতি সেরকম কী না, জানা ছিল না। গতকাল আর থাকতে পারিনি। কনডাকটরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে, নেমে পড়েছিলাম। বেশি পয়সা দিয়ে আরও দূরের পথের টিকেট কেটে, মাঝপথে নেমে পড়ে যে-যাত্রী, সে 'শালা' যে 'বুদ্ধু' বাসের কনডাকটর আর সহিস ছাড়া সে-কথা কে বুঝবে? মরুক গে! নামছে, নামতে দাও।

হ্যাঁ, দেখাই যাক না। এতদিনের এতো হাতছানি, সবুজ একখানি চরের ফুঁসলানি কিসের? দেখে আসতে দোষ কী? চরকে ঘিরে, স্রোতের জলের বাঁকের রেখা এক-একখানে এক-একরকম। সে সব বুঝবে মাঝি। ঘাট কোথায়? একবার ভেসে যাবো, চরের বুকে একবার নামবো। মন চাইলে পায়ে হেঁটে একটু ঘুরে দেখবো, আবার তীরে ফিরে এসে, ত্রিবেণী গেলেই হবে। কেউ তো মাথার দিব্যি দিয়ে দেয়নি, ত্রিবেণীর ঘাটে যেতে হলে, দু দণ্ড যাত্রা ভঙ্গ করা চলবে না।

আশেপাশে খান কয়েক বাড়ি। কয়েক পা এগিয়ে, গঙ্গার উঁচু পাড়ের ওপরে এক পাশে একটি চালাঘর। তার পাশে রাজ্যের লোহা আর টিনের ভাঙাচোরা টুকরোর স্তূপ। আর এক পাশে ছেঁড়া পচা চটের থলি ডাঁই করা। চালাঘরের দরজার সামনে খাটিয়ার ওপর খালি গায়ে বসে একজন বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঘষছে। বলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয় না, নেশার মৌতাত তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ খৈনি। মাঝবয়সী লোকটি, গায়েগতরে শক্তপোক্ত, ছাই রঙের একজোড়া গোঁফ। মাথায় কদম ছাঁটের থেকেও যদি কিছু কম হয়, সেই রকম চুল। একেবারে কামিয়ে নিলেই বা দোষ কী ছিল? জল আটকাবার তো উপায় নেই। উনিশ আর বিশ। তবে হ্যাঁ, গোঁফের রঙ ছাই হোক, মাথায় মোটা টিকির গোছটি বেশ কালো। পরনের খাটো ধুতিখানি হাঁটুর ওপরে তোলা।

আমার দিকে লোকটা ফিরে তাকালো না, ভাঙাচোরা লোহা টিনের টুকরোর স্তূপের দিকে যেন বড় স্নেহের চোখে তাকিয়ে দেখছে, আর খৈনি ডলছে। আমার নজর তার দিকে পড়ার কারণ, আওয়াজ দেয় কী না। কারণ, আমি দেখছি, মাথায় চটের একটা বস্তা নিয়ে এক বুড়ি ঘরের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে এগিয়ে চলেছে। আগেই আমার চোখে পড়েছে, ছই ছাড়া কিছু নেই, এমন কি পাটাতনের বালাইও নেই, নীচে জলের ধারে

ছোট একটা নৌকা পাড়ে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। নৌকার সামনের গলুইটা ভাসছে উত্তর দিকে। তার মানে নদীতে জোয়ার।

আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্য আর অনুমান, সব মিলেমিশে একটাই। মনের জিজ্ঞাসাও। ওরকম একটা আনকা ঘাটে নৌকাটা কী কাজে লাগে? বুড়িটাই বা কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘাট আঘাটা যাই বলা যাক, ওদিকেই নেমে যাচ্ছে কেন? বুড়িটা এলোই বা কোথা থেকে, খেয়াল করিনি। প্রথমে লক্ষ্য পড়েছিল নৌকাটার দিকেই। তারপরে বুড়ির দিকে। কিন্তু লোহা-লক্কড় আর ছেঁড়া পচা চটের ডাঁইয়ের এলাকার ধারে বাঁধা নৌকাটা দেখে একটাই অনুমান করা যায়। নদীর মাঝখানে চরের সঙ্গে কেমন যেন একটা যোগাযোগ আছে। আজ পর্যন্ত, গঙ্গার এপারে ওপারে যাবার পথে, সবুজ চরে যাবার জন্য কোনো নিয়মিত খেয়া পারাপারের নৌকা দেখিনি। আর খেয়া পারাপার করতে হলে যেমন নির্দিষ্ট একটা ঘাট থাকে, তাও কখনো দেখিনি। কথাটা নিয়ে অনেকদিন ভেবেছি। কাদের নৌকা, কোথায় থাকে, কারা কখন যাতায়াত করে? অথচ পারাপার করতে দেখেছি। তবে ঘাটের কোনো ঠেক দেখিনি।

সবুজ চরটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, গঙ্গার মাঝখানের নিরিবিলিতে, দু পাশের স্রোতে ভেসে সে বেশ সুখেই আছে। মজা আর বর্ষা ঋতুতে সে তার শরীরের কাঠামো বদলায়। কখনো একদিকে বাড়ে তো, আর একদিকে কমে। কখনো বুক উঁচু, তো পায়ের দিকটা বাঁক নিয়ে চলে যায় উত্তরে, সেই ত্রিবেণীর দিকে, যেখানে দক্ষিণগামিনী গঙ্গা এমনিতেই বাঁক নিয়েছে, আর হালিশহর বাঁশবেড়ের কাছে এপারে ওপারে অনেকখানি চওড়ায় শরীর ছড়িয়েছে। এই কি নদীর নিয়ম নাকি কে জানে, বাঁকের মুখে সে যেন দু কূলে দূরে ছাড়াছাড়ি। ক্ষীণ কটির পরেই হা হা বহর বুক। কখনো নদী চরের মাঝখানের সমতলকে গর্ভিণীর মতন বিশাল করে তোলে। দক্ষিণে মাথাটা শণ নুড়ি চুলের মতন, বড় বড় মাটির ফাটলে এঁকেবেঁকে জলে ডুবেছে। আবার তো কোনো কোনো শরতের মাঝামাঝি সময়ে দেখেছি, নদীর মাঝখানে যেন একটি সবুজ রেখা জেগে আছে। নজর করে না দেখলে মনে হয়, একটা লম্বা সবুজ ফালি ডুবু ডুবু হয়ে ভেসে যাচ্ছে। দূরের স্থল থেকে দেখা। তার একরকম রূপ। আসলে কোনো কোনো বছরে, ভাদ্র আশ্বিনের মধ্য ঋতুতে, গঙ্গার তখন বাড়াবাড়ি অবস্থা। সে তখন অলক্ষ্যে চরটিকে তার নিজের মতন ভেঙে গড়তে থাকে।

তা থাক, যে-কথা বলছিলাম, সবুজ চরটি গঙ্গার মাঝখানের নিরিবিলিতে, তার ভাঙা-গড়া যেমনই হোক, সে যেন বেশ নিশ্চিন্তে আছে। তার দুপাশের দুই মূলের স্থলে, এতো যে কলকারখানা, ইঁটের ভাটি, বিশাল জনপদ, দিনে রাত্রে ধাবমান যানবাহন, বিজলিবাতির রোশনাই, কলকুঠির রাজকীয় প্রাসাদ আর তার জীবন নিয়ে অনিত্যের কোলাহল, কোনো কিছুর দিকেই তার নজর নেই। অথচ দেখলে এমন মনে হয় না, সে অহঙ্কারে গা ভাসিয়ে আছে, বা গোঁ ধরে আছে, দুই তীরের কোনোদিকেই সে তাকাবে না, কান পেতে কিছু শুনবে না। আসলে সে নিজের রঙ্গেই আছে। যাকে বলে, আপনাতে আপনি মজেছে। মনে হয়, কাছেই। প্রকৃতপক্ষে চেহারার চরিত্রে আর স্থান মাহাত্ম্যে আছে সে অনেক দূরে।

দুই তীরের সময় কোথায়, দরিয়ার মাঝখানে এক অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখবে। তীরের অনেক দায়দায়িত্ব ব্যস্ততা। তবু নদীর বুক থেকে, হাতছানি দেয় কমন করে? কেবল কি হাতছানি? ঠোঁটের কোণে আঙুল রেখে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা এক অপার রহস্যের ছোঁয়াও যেন রয়েছে সেই হাতছানিতে। এখন কথা উঠতে পারে, হাতছানিটা দেখা যায় কেমন করে।

আজ পর্যন্ত এ কথাটার জবাব কোনো "ঠাকুর" মশাইও দিতে পেরেছেন কী না জানি না। শুনিও নি। তবে আমার মতে সোজা কথা, জাত পাত্র বলে কিছু নেই। হাতছানিটা আছে, বলতে গেলে সর্বব্যাপী, সকলের প্রতি। কারোর চোখে পড়ে, কারোর পড়ে না। যার পড়ে, সে পা না বাড়িয়ে পারে না। যার পড়ে না, সে অন্য পথে পা বাড়িয়ে আছে। এই রকমফের নিয়ে আমরা রকমারি।

লোহা আর টিনের টুকরো স্তূপ আর ছেঁড়া পচা চটের ডাঁই দেখে, জায়গাটাকে অনেকটা ইঁট চুন শুরকির গোলার মতন দেখাচ্ছিল। চালাঘরের দরজার সামনে, খালি গা, হাতের চেটোয় খৈনিমর্দনকারী, কালো তৈলাক্ত মোটা গোছার টিকিধারীর আওয়াজ নিয়ে, ভয়টা সেই কারণেই ছিল। জায়গাটা নিশ্চয়ই লোক চলাচলের সদর রাস্তা না। ঘাটে একটা নৌকা জোয়ারের টানে ভাসলেই সেটা খেয়াঘাট হয়ে যায় না। লেখা না থাকলেও প্রবেশ নিষেধ-এর সীমানা চেনা যায় পাঁচিল ঘেরা না থাকলেও, গৃহস্থের খোলা সীমানার এলাকায় নিষেধের নোটিশ ঝুলিয়ে রাখে না। চলতে গিয়ে পা আপনা থেকেই এড়িয়ে চলে। খৈনিমর্দনকারী হঠাৎ মুখ তুলে আওয়াজ

দিলেই, বেকায়দায় পড়ে যাবার ভয় ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, আমার দিকে সে ফিরেও তাকালো না। গভীর মনোযোগ আর মমতায় ভাঙা-চোরা পুরনো লোহা টিনের স্তূপের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছে, কোনো দিকেই তাকাবার অবকাশ নেই।

ভূতের সামনে দিয়ে রামনাম জপের মতন আমি চটের বস্তা মাথায় বুড়ির পিছনে পিছনে একেবারে উঁচু পাড়ের ধারে চলে গেলাম। চালার দরজা তখন আমার পিছনে। দেখলাম, বুড়ির নজর কোনোদিকে নেই। শক্ত পাড়ের ঢালুতে সাবধানে পা ফেলে নেমে দাঁড়ালো গিয়ে একেবারে নৌকাটার কাছে। অনায়াসেই মাথার বোঝাটা নামিয়ে ধূলি ধোকড়া কাপড়ের ঘোমটা নামিয়ে, আগে খস খস করে, জট বাঁধা রুক্ষু পাটের ফেঁসোর মতন চুলে দু হাতে চুলকে নিল। আমি তার পিছনটা দেখতে পেলেও কাপড় পরার ধরন দেখেই অবাঙালী পরিচয়টা চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি। ওপরের চালাঘরের দরজার সামনের লোকটিও যে অবাঙালী, তাও এক নজরেই চিনে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে কোনো দূরদৃষ্টির পরিচয় নেই, আমার মতন যে-কোনো বঙ্গ সন্তানই তার সীমান্তপ্রদেশের লোককে চিনতে পারে। বিশেষ, কলকাতা আর তার পঁচিশ পঞ্চাশ মাইলের উত্তরে দক্ষিণে যারা বিচরণ করে।

আমার লক্ষ্য বুড়ির দিকে। মাথা চুলকানোর বহর দেখলেই বোঝা যায়, কেবল জটার ময়লার দোষ না। চুলের গোড়ায় গোড়ায় উকুনের নির্ঘাৎ উৎপাত। নিশ্চয় অনেকক্ষণ থেকেই উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। মাথার বোঝা বাদ সেধেছিল। আমার নজর তখন সবুজ চরে নেই, নদীতে নেই, একমাত্র কাজ বুড়ির মাথা চুলকানো দেখা, কারণ বুড়ির পরবর্তী কর্মসূচীর ওপরেই আমার সব কিছু নির্ভর করছে। যদিও মন বলছে বুড়ি বোঝাটা পাড়ে রেখে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য নামেনি। তার লক্ষ্য নিশ্চয়ই নৌকা।

আমার এই ভাবনার ফাঁকেই বুড়ি তার ধূলি ধোকড়া কাপড়ের ঘোমটা তুলে কয়েক দফা ঝাপটা মারলো মাথায়। সকালের রোদে স্পষ্ট ধুলা উড়ছে দেখলাম। তারপরে গায়ের ঢলঢলে জামাটার ডান দিক দিয়ে আঁচল টেনে মাথায় আবার ঘোমটা টেনে দিল। রূপেই বা কী করে, বয়সেই বা কী যায় আসে। অঙ্গের বস্ত্র? হয়তো শাড়ি ধুতি থান বলে বোঝার উপায় নেই। ধুলা ঝুলা ন্যাকড়া, তালি তাপপি সেলাই বিস্তর থাকতে পারে। কিন্তু হাটে ঘাটে মাল মাথায় করে ঘুরে বেড়ালেই যে সহবত থাকবে না, এমন কথা কে বলেছে? ঘোমটা হলো সহবত। তারপর?

তারপর বুড়ি যেমন অনায়াসে মাথার চটের বস্তাটা নামিয়েছিল, তেমনি অনায়াসেই দু হাতে তুলে প্রায় ছুঁড়েই ফেললো নৌকার খোলে। নৌকার খোলের মাঝখানে অল্প স্বল্প জল, মাঝে দু এক ঘটি হতে পারে। কিন্তু বুড়ির হাতের নিশানা অব্যর্থ। বস্তাটি জল বাঁচিয়ে গলুইয়ের ধার ঘেঁষে পড়লো। এবার কি বুড়ি নৌকায় চাপবে নাকি? নৌকা বাঁধা খুঁটিটা যে লগি, তা বোঝা যায়। একটি বৈঠাও গলুইয়ের পাশেই খোলের ভিতর দিকে কাত করে রাখা। বুড়ি কি নিজেই নৌকা বাইবে নাকি?

অবাক মানবার কিছু নেই। পুব দেশে আমার ঘর। অমন অনেক বৃদ্ধা পাটনী দেখেছি।

আমি নীচের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করে থমকে গেলাম। বুড়ি মুখ ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে পুরো দেহাতী ভাষায় যা বলে উঠলো, তার মানে হলো, "কী হে মরদ, গা ঝাড়া দেবে না কী?"

থমকানোর থেকে চমকে গেলাম বেশি। পা বাড়ালে শক্ত ডাঙাতেই হড়কে পড়তে হতো। নৌকা আর বুড়ি ছাড়া সবাই আমার অলক্ষ্যে ছিল। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, জোয়ারের জল ছুঁই ছুঁই, পাড়ের ওপর এক গাছ। গাছের গোড়া শান বাঁধানো না বটে, তবে ইঁট দিয়ে সাজানো। অনেকটা বাঁধানোর মতনই। গায়ে গতরে শক্তপোক্ত হলে ওই সাজানো ইঁটের পাঁজার ওপরেই দিব্বি শোয়া বসা যায়। আধশোয়া অবস্থায় পা ছড়িয়ে, কাত হয়ে, হাতের ওপর গাল রেখে প্রকৃতই এক মর্দ বিড়ি টানছিল। কিন্তু সে না দেখছিল আমার দিকে, না বুড়ির দিকে। চরের দিকে মুখ করে আপন মনে বিড়ি টেনেই চলেছে।

আমি বুড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, ভুরু কুঁচকে বুড়ি আমাকেই দেখছে। দৃষ্টিবিনিময় হলো, কিন্তু শুভদৃষ্টি কী না তা বুঝতে পারলাম না। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গাছতলার মরদের দিকে এগিয়ে চললো। তবে বুড়ি বুড়ি করে যতোটা বুড়ি ভেবেছিলাম, ততোটা বুড়ি সে না। বয়সের লেখাজোখায় যতোটা লোলরেখায় আঁকা মুখ ভেবেছিলাম গোটা মুখখানির চামড়া সেরকম নয়। পাটের ফেঁসোর মতন চুল বটে, সেটা তেলজলের অভাবে হতে পারে। রোদে পোড়া মুখের চামড়ায় কিছু ভাঙা-চোরা ভাঁজের দাগ। আমার দিকে তাকাবার সময় আপনা থেকেই তার সামনের পাটির দাঁত দেখতে পেয়েছি। ঝলসানো ভুট্টার দানার মতন কালচে পোড়া পোড়া রঙের দাঁত। অবিশ্যিই হেসে দাঁত দেখায়নি, ওটা নিশ্চয় স্বভাবে

বিকশিত। শরীরটি পুষ্ট না, তবে শক্ত আর খাড়া। ভুরু কুঁচকে তাকানোর মধ্যে বিরক্তি না মেজাজ খারাপের অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিংবা হতে পারে, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, চোখে কালো কাঁচের চশমা পরা বাঙালীটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেহাতই একটু কৌতূহলের ভ্রূকুটি মাত্র। আর কিছু না। না হলে অমন মুখ ফিরিয়ে উদাস নির্বিকার ভাবে চলে যাবারই বা কারণ কী? এখন পর্যন্ত তো আমার মনের গতিবিধি তার জানবার কথা না।

অতএব, আমাকে আমার জায়গাতেই আবার দাঁড়াতে হলো। বুড়ি গিয়ে দাঁড়ালো গাছতলায় ইঁটের পাঁজা সাজানো রকের ওপরে আধশোয়া মরদের সামনে। আমার না হয় এতক্ষণ মরদের ওপর নজর পড়েনি। সে কি একবারও আমাকে দেখেনি? সে কি মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর নিঃসঙ্গ পুরুষটির মতন চিরকাল ধরে দূরের দিকে ওইরকম করে তাকিয়ে বসে আছে? আর বিড়ি ফুঁকে যাচ্ছে?

অবিশ্যি মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর পুরুষটির চেহারার সঙ্গে গাছতলার মরদের চেহারার অনেক ফারাক। পঁচিশ তিরিশ আন্দাজ বয়সের মরদের গায়ের রঙ ভেজা গঙ্গা মাটির মতন। লম্বা হিলহিলে রোগা শরীরে এখন পেশিগুলো এলানো সাপের মতন দেখাচ্ছে। মাথার ছোট চুল উস্কোখুস্কো এবং কালো গোঁফ-জোড়া লম্বায় চওড়ায় তার কিছুটা লম্বা মুখের তুলনায় চোখে পড়ার মতন বড়। তবে বুড়ির 'মরদ' সম্বোধনটি একশো এক ভাগ খাঁটি কারণ হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত এক খণ্ড বস্ত্র ব্যতিরেকে গায়ে কিছুই নেই। ধন্য নেতার পুণ্য দেশ কী না জানি না, মাঘের শেষের আকাশের গোটাটাই নীল। আকাশের উত্তর পশ্চিম থেকে মাঝে মধ্যে দু এক টুকরো শাদা মেঘের গড়িমসি চালের চলনে বর্ষণের কিছুমাত্র ইঙ্গিত নেই। অবিশ্যি উত্তরে হাওয়ার প্রাবল্য নেই বরং রোদে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে গায়ের জামা খুলে ফেলতে ইচ্ছা করে। অথচ চিরকাল শুনে এলাম মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে। তা বলে, জোয়ারের জল ছুঁই ছুঁই গাছের ছায়ায় একেবারে খালি গায়ে মরদের কি একটুও শীত করছে না? আর একটুকরো বস্ত্র তার মাথার কাছে এলোমেলো ছড়ানো পড়ে আছে। কম করে একশো হাত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি, তার পায়ে হাঁটুতেই কেবল নয়, গায়ের দু এক জায়গায়ও গঙ্গার কাদামাটির শুকনো দাগ।

বুড়ি গাছতলায় সাজানো ইঁটের পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে, কোমরের কাপড়ের কাছ থেকে কী একটা বের করলো, স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। মরদকে কিছু বললো। মরদ মুখ না ফিরিয়েই বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাঁ

হাত বাড়িয়ে সেটা এগিয়ে দিল বুড়ির দিকে। বুড়ি জলন্ত বিড়িটি ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে একটি বিড়ি নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলে, আর জলন্ত বিড়িটি ঠেকিয়ে, গাল চুপষে টেনে টেনে মুহূর্তেই ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই আবার ডান হাতে কোমরের কাপড়ের কষিতে কিছু গুঁজলো। বোধহয় বিড়ির কৌটো।

আমি নিজের অজান্তেই ঢোক গিললাম। কেবল চুল চুলকানি নয়, বুড়ির নেশাও পেয়েছিল। তার বিড়ি টানা দেখে আমার নেশাও যেন রক্তে খুঁচিয়ে দিল। কিন্তু ধূমপানের আগে আমি বুড়ি আর মরদের ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি। দেখছি, বুড়ি মরদকে তার বিড়িটি ফিরিয়ে দিল। ব্যাপার কী? মরদের কি ঘাড়ে ব্যথা? একবারও যে ফিরে তাকায় না। মুখ না ফিরিয়েই বিড়িটি নিল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল। ধোঁয়া তেমন বেরুলো না। বুড়ি আবার কিছু বললো। মরদের ঠোঁট নড়তে দেখলাম না। বিড়িটা নিশ্চয় নিভে গিয়েছিল। সেটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে বসলো। মাথার কাছে রাখা বস্ত্র খণ্ডটি টেনে দু হাতে মেলে ধরতে বোঝা গেল, ওটি একটি চাদর বিশেষ। মরদের তা হলে শীত লাগছে, এবার গায়ে দেবে?

না, আমার অনুমান আর মরদের কর্ম, পরস্পরে অমিল। চাদরের মতন গেরিমাটি রঙের বস্ত্রটি একবার ঝাড়া দিয়ে কয়েকটা লম্বা ভাঁজ করে, মাথায় জড়িয়ে নিল। নেমে এলো ইটের পাঁজার ওপর থেকে। বুড়ি তার আপন মনে কিছু বলেই চলেছে আর বিড়ি টানতে টানতে মরদের পিছন ধরে নৌকার দিকে এগিয়ে চললো। মরদ না তাকালেও আমার উপায় নেই। আমিও ঢালুতে পা বাড়িয়ে একেবারে নৌকার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

মরদ এবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। বুড়িও এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো। দয়ার পাত্র আর কাকে বলে। চোখ থেকে কালো কাঁচের ঠুলিটা খুলে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মরদের দিকে তাকিয়ে বাঙলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি চরে যাবে ভাই?'

'হুঁ'। মরদ বেশ সহজভাবেই জবাব দিয়ে প্রায় পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনে কি হালিশহর যাইবেন, না হাজিনগর?'

বুড়ির কালচে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কপালে জলের ঢেউ লাগা পাড়ের বাঁকা রেখা ফুটলো।

নাসারন্ধ্রে নির্গত ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। মরদের মুখের ভাব, গলার স্বর, আশাতীত প্রসন্ন। অন্তত এই মুহূর্তে আমার কাছে সেইরকমই মনে হলো।

কারণ আমার আশঙ্কা ছিল কিছু জিজ্ঞাসা করা ভুল করেছি। মুখে হয়তো হাসি নেই, অচেনা লোককে অভ্যর্থনায়ও গদগদ নয়। তবে তার জিজ্ঞাসার মধ্যে অবাস্তবতা নেই। আমার জিজ্ঞাসার একটাই মানে তার কাছে, তার নৌকার যাত্রী হওয়ার একটা কারণই থাকতে পারে, আমি হালিশহর যাবো অথবা হাজিনগর। কাজের মানুষ কাজের কথা ভেবেই আওয়াজ দেয়। আমিই বরং একটু অপ্রস্তুত হেসে বললাম, 'না, ভাবছিলাম, তোমাদের সঙ্গে একটু চরে যাবো। খেয়া নৌকো তো ওখানে যায় না। দেখে মনে হলো তোমরা চরেই যাবে, তাই—।' কথাটা শেষ না করে আমি মরদের মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম।

মরদ যেন আরও সহজতর। এবার প্রায় অভ্যর্থনাই বলতে হবে, 'হুঁ হুঁ, হামিনলোগ তো চরেই যাইবেন। আপনে উঠিয়ে পড়েন না।'

আহা, বেঁচে থাকুক এমন বাঙলা ভাষা। এখন তো সাদর অভ্যর্থনাই বলতে হয়। মরদ খুঁটিতে বাঁধা দড়িটা ধরে নৌকা টেনে নিয়ে এলো। গলুই একেবারে ডাঙার ওপরে। পাটাতন নেই, পড়ে যাবার ভয়। ছোট নৌকা। যে দিকে একটু ভার পড়বে সেদিকেই কাত হবে, তারপরে গঙ্গাস্নানটা অনায়াসেই ঘটে যেতে পারে। অতএব, গলার চাদর মুঠি পাকিয়ে ধরে সাবধানে গলুই বাঁচিয়ে প্রথম পা দিলাম খোলের ভিতরেই। আর এক পা বাড়াতে গিয়েই বুঝলাম, সমূহ বিপদ! মরদ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'বসিয়ে পড়েন, বসিয়ে বসিয়ে উঠেন।'

যথা সময়ে যথার্থ নির্দেশ। বাহাদুরি করে লাভ নেই। নীচু হয়ে নৌকার গলুই এক হাতে চেপে ধরে আর এক পা টেনে নিলাম। বসে পড়লাম খোলের মধ্যেই। ইতিমধ্যে বুড়ির মনে লেগে গিয়েছে ধন্দ। তার হিন্দি বুলি শোনাচ্ছে প্রায় বিদ্যাপতির ব্রজবুলির মতন। মরদকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু কহাঁ যাওত হো?'

মরদ বাঁশের লগি টেনে তুলতে তুলতে দ্রুত কিছু বললো, বুঝতে পারলাম না। পিছন ফিরে দেখলাম, বুড়ি তার বিড়িতে শেষ টান দিয়ে শেষাংশ ছুঁড়ে ফেলে নীচু হয়ে দু হাত দিয়ে গলুই চেপে ধরলো। হামাগুড়ি দিয়ে নৌকায় উঠলো। তাকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে খানিকটা সরে যেতে হলো। মরদ লগি টেনে তুলে গলুইয়ের পাশ দিয়ে নৌকার খোলে ঢুকিয়ে দিল। বাঁ হাতে নৌকার দড়ি ধরা। উত্তরে ঘোরানো নৌকার মুখ, গলুই ঠেলে সোজা পুব মুখী করলো। তারপরে গলুইয়ে নীচু হয়ে নৌকা ঠেলে দিল

জলে। নিজে বসে গেল গলুইয়ের ছ ধারে ছ পা ঝুলিয়ে। বাঁ দিক থেকে হাতে তুলে নিল বৈঠা। তারপরেই ধোয়া পা তুলে নিয়ে বৈঠার চাড়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল দক্ষিণ-পুব কোণে।

ব্যাপারটা ঘটলো যেন সহজেই। কিন্তু মরদের সারা শরীরে, পা, তলপেট, বুক আর ছ হাতের পেশিগুলো যে-রকম সাপের মতন কিলবিলিয়ে উঠলো, দেখে বোঝা গেল, সহজের মূলে শক্তি। কথায় বলে ভাঁটার টান, কিন্তু জোয়ারের উজানের টানও কম না। উত্তরের টানকে পিছনে রেখে দক্ষিণ পুবের মুখে বৈঠা চালানো সহজ না। তবু জলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে নৌকা যেন চলছে না। ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার দিকে তাকালে বোঝা যায়, নৌকা চরের দিকে একটু একটু এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যেই মরদ বললো, 'হাই বাবু, উধার গলুই পরে বসিয়ে যান না, আরাম হবে।'

আরামের চিন্তাটা মাথায় আসেনি, কিন্তু ছোট নৌকার ছোট খোলে উটকো হয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল বিলক্ষণ। বুড়িও তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'হঁ বাবু, যা যা।'

মানুষ চিনি ? কোনোদিন বলবো না। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে যাদের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না, এখন এই মাঝ দরিয়ায় কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না। বোঝাবার অবশ্য দরকার নেই। মানুষ না চিনলেও এখন বুঝতে পারছি, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশা এরা করে না। বুড়ির বস্তা ডিঙিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিপরীত গলুইয়ে পৌঁছে সত্যি সত্যি পা ছড়িয়ে বসা গেল। তারপরেই প্রথম যে-কথাটা মনে পড়লো, সেটা হলো পারানির দক্ষিণা। তখন খেয়া নৌকার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু চরে পৌঁছুবার দক্ষিণাটা কতো সেটা জিজ্ঞেস করিনি। দরকারও নেই। বরং গায়ের পশমী চাদরটা কোলের ওপর রেখে চোখে ঠুলি আঁটলাম। পকেট থেকে বের করলাম সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজতে গিয়ে নজর পড়ে গেল মরদের দিকে। মরদের নজর দক্ষিণে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চলবে নাকি ভাই ?'

হ্যাঁ, এখন ভাই বেরাদার অনেক কিছুই মুখে ফুটছে। অন্য সময় হলে, তুমি কার, কে তোমার। সংসারের নিয়ম ওটা। মরদ আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত গোঁফে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, বললো, 'হঁ হঁ চলবে বাবু, আগে চরে চলেন।'

তা বটে। বেশি আত্মভোলা হয়ো না মন। বুঝে চলো। জোয়ারের

স্রোত ঠেলে, যে-মাঝি দু হাতে বৈঠা টেনে চলেছে, তার পক্ষে এখন আর কিছুই চলে না। কিন্তু বুড়ি আমার দিকে ফিরে তাকালো। দেখলাম, ভাঙাচোরা ভাঁজ মুখে, ঝলসানো ভুট্টা দানার দাঁতের হাসি। অনায়াসেই একটি হাত বাড়িয়ে বললো, 'হামে দে বাবা।'

আমি তাকালাম মরদের দিকে। মরদের মুখে হাসি, বললো, 'হুঁ নানীকে দেন বাবু।'

বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আমার সামনে এলো। আমি তার ময়লা খড়িওঠা হাতে সিগারেট দিলাম। সে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলো, বললো, 'বাবু মসশাই চিজ।'

আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। সে তাড়াতাড়ি মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে বললো, 'অবহি নহি, বাদ মে পিওব। তু আপনা দম লাগা বাবা।'

তাই ভালো। বুঝতে পারিনি, পাবার ব্যস্ততা আসলে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। আমি আবার মরদের দিকে তাকালাম। না, তার নজর আর এদিকে নেই। লক্ষ্য দক্ষিণ পুবে, নৌকা ক্রমেই চরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি সিগারেট ধরালাম। বাতাস আটকে ধরাতে গিয়ে মুখ ফেরালাম। চোখে পড়লো হুগলি রেলপুলের অনেকখানি। নৌকায় উঠতে পারা আর চলে যাবার সংকট কেটে যাবার পরে নদীর বুকে সিগারেটের টানটা নতুন খুশির আমেজ এনে দিল। দক্ষিণ দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চরের দিকে তাকালাম।

'তু তু একেলা কাহেঁ যাওত বাবা? দোস্ত সাথী জরু লড়কা লেড়কি লে নহি আওত ক্যায়া?' বুড়ি জিজ্ঞেস করলো।

আমি বুড়ির দিকে তাকালাম। তার মর্মার্থ ধরতে পারলাম না। বন্ধুবান্ধব বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কেন আসিনি? একলা কেন? এতখানি আপ্যায়ন তো আশা করা যায় না। আমি অবাক হয়ে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তাদের নিয়ে আসবো কেন?'

'উ ত তুলোগ জানত হো বাবু।' বুড়ির ঝলসানো ভুট্টা দানা দাঁতের হাসির সঙ্গে চোখের চারপাশে এবার অনেকগুলি ভাঁজ পড়লো, 'বাবুলোগ আপনা নাও পর ঐসান আওত, চৌরে পরে খানা পাকারি খাওত, পিওত, দিনভর কতনি নাচা গানা করতহি—।'

বুড়ির কথার মর্মার্থ বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই মরদ ওদিকের গলুই থেকে বলে উঠলো, 'ফিক্টি বাবু, ফিক্টি করেন না

আপনেরা ? চড়াইহিভাতি। নানী হোই কথা বলছে।'

সংবাদটা আমার কাছে নতুন। এতকাল ধরে কেবল হাতছানিটাই দেখে এসেছি আর মনে মনে ভেবেছি একদিন নদীর মাঝখানে সবুজ রেখাটিতে যাবো। তখন একবারের জন্যও এই চিন্তাটা মাথায় আসেনি আমার আগে, আমার মতন অনেক মানুষ হাতছানির সাড়া দিয়ে গিয়েছে একেবারে চর মাথায় করে। আমি খালি ভাবছি নিরিবিলি চরটি অনেক দূরে আপনাতে আপনি আছে অন্যদের চোখে তখন তার আর একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে, 'পিকনিক স্পট'। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কখনো কখনো লোক পারাপার করতে দেখেছি। চর ডিঙিয়ে এপার ওপার। কিন্তু চড়ুইভাতির কথা কেউ কখনো বলেনি, তেমন কোনো দলকে নিজের চোখে ডাঙা থেকে ভেসে আসতেও দেখিনি। আমি মরদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চরে লোকেরা ওসব করতে আসে নাকি ?'

'হঁ বাবু, কখুন কখুন আসে। এই জারা ঠাণ্ডার টাইমে ছুটটির দিনে বাবুলোগ চড়াইভাতি করতে আসে।' মরদ বৈঠা টানতে টানতে বললো, 'তবে এই চরে কমতি আসে, তিরবেনীর চরে জায়দা যায়।'

ত্রিবেণীর চর আরও উত্তরে, সেটা এদিক থেকে বিশেষ চোখে পড়ে না। আমার চলাচলের পথে এই হালিশহরের চরটাই এতকাল চোখে পড়ে এসেছে। এখানে কম লোকে চড়ুইভাতি করতে আসে, এ সংবাদেও মনে কোনো সান্ত্বনা পেলাম না। লোকেরা এ চরে চড়ুইভাতি করতে আসে, খবরটা আগে জানা থাকলে বোধহয় মনটা এমন বিমর্ষ হয়ে যেতো না। বিমর্ষ ? একেই বলে মন গুণে ধন। রীতিমতো ঈর্ষাবোধ করছি। হিংসে যাকে বলে। যেন একান্ত আমারই ভোগের জন্য জেনে এক জায়গায় গিয়ে শুনি, সেখানে বহুভোজের মহোৎসব অনেক আগেই ঘটে গিয়েছে। নিজেকে কেমন বঞ্চিত মনে হতে লাগলো। তবে, দু পাড়ের মূল স্থলে এতকালের যাওয়া আসার সময়ে, জলে ভেসে থাকা সবুজ রেখাটির এত হাতছানি কিসের ? ছলনা ?

মুখ ফিরিয়ে চরের দিকে তাকালাম। এখনো অনেকটাই যেতে হবে। গাছ বলতে একটিই বেঁটে ঝাড়ালো গাছ দেখতে পাচ্ছি উত্তর দিক ঘেঁষে। তার পাশেই গায়ে গায়ে লাগানো দুটো খড়ের দোচালা চালা ঘরের চাল মাটি ছুঁয়েছে। বাকিটা সবই সবুজ, আর কোনো রঙ চোখে পড়ে না। হাতে একটি সরু লম্বা কঞ্চি নিয়ে চরের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে চলেছে যে, তার দুটো ছোট হাত আর একটি ছোট মাথা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আরও দু একটি

মূর্তি দূরের উত্তরে চোখে পড়ছে।

আশ্চর্য! এ আমার চোখের ধন্দ নাকি? এখনো সেই একই হাতছানি দেখতে পাচ্ছি। এখনো তেমনি নিরালা আর রহস্য দিয়ে ঘেরা চর, মনটাকে যেন আগের মতনই টানছে। এও কি ছলনা? আমি মুখ ফিরিয়ে মরদের দিকে তাকালাম। সে চরের দিকে তাকিয়ে উজানের স্রোত ঠেলছে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই সব লোকজন এলে তোমাদের বেশ ভালো লাগে, না?'

বুড়ি আমার কথাটা তেমন বুঝে উঠতে পারলো না। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কা কহল বানি বাবা?'

জবাব দিল মরদ, 'না না বাবু, হামিনলোগের আচ্ছা লাগে না। বাবুলোগ জেনানা উনানা বালবাচ্ছা সব লিয়ে আসে, ক্ষেতি উতি পর লড় দৌড় করে। আমরা এই লায়ে পর শহর থেকে আলিফ করে কলের পানি লিয়ে আসি, লকরি লিয়ে আসি, উসব মাংগে। ও কি বলব বাবু, না দিলে উনলোগ গোসা করে, আর হামিনলোগকে খানা বাঁচলে খেতে বোলায়।' কথাটা বলে সে হাসলো আর মুখ ফিরিয়ে নিল।

তার হাসি আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা যেন বিশেষ অর্থবহ। অবিশ্যি তার থেকে অনেক বেশি অর্থবহ তার কথাগুলো। কেমন একটা অসম্মানবোধ আর ক্ষোভের সুর যেন বাজলো তার কথায়। আমাদের বাঙালী 'বাবুলোগ'দের মনোভাবটা আমার না জানার কথা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে চেহারা, জীবনযাপনের ছবির সঙ্গে আমাদের চোখে যারা 'গরীব' তাদের কতোটুকুই বা আমরা চিনি। মরদের অসম্মানবোধটা স্পষ্ট···'বাবুদের বনভোজনের খাবার বাঁচলে আমাদের খেতে ডাকে।' দ্বীপের মরদরা যে তা খেতে যায় না, তার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু 'বাবুলোগ'-দের খেতে ডাকাটা যে তাদের কতোখানি অসম্মানিত করে, বাবুদের সে-ধারণাটাও নেই। তা ছাড়া চাষ-আবাদের জমিতে দৌড়া-দৌড়ি ছুটাছুটি ক্ষতির কারণ। বেচারিরা নৌকায় করে শহরের জলকল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্নার আগুনের জন্য কাঠকুটো নিয়ে আসে। বাবুবনভোজন-ওয়ালারা তা অনায়াসেই দাবি করে। ক্ষোভের কারণ সে-গুলোই। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে মুখ ফেরানোর কারণটা কী?

কথাটা জিজ্ঞেস করার বিষয় না। অনুমান করে নিতে পারি। হাসিটা তার সংকোচ আর লজ্জার। কথাগুলো শোনাচ্ছে সে 'বাবুলোগ'দেরই একজনকে। বাবু আবার কী ভেবে বসেন, কে জানে? ভাবলেও হয়তো তার

কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এটা হলো মরদের নিজস্ব ভদ্রতা। এ মানুষ-গুলোর মানসিকতা এমন জটিল না, যা বুঝতে হলে 'ভদ্রলোক'-দের বিস্তর প্যাঁচপয়জার জানা থাকা দরকার। এখন আমার মনেই কেমন একটা খচখচানি। মরদ যেমন অনায়াসেই তার নৌকায় আমাকে সওয়ার করে নিল, তারপরে আমার সিগারেট দিতে চাওয়ার ব্যাপারে সে মনে মনে হাসেনি তো?

তাই যদি হবে, তবে বুড়ি অমন হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল কেন? বড় বেশি ব্যস্ততাই তো দেখেছিলাম। ভিখিরিপনা না থাকলেও, লোভ দেখেছিলাম। আসলে বুড়ির পক্ষে ওটাই সহজ। ওটা ভীমরতি না, মৌতাতের টান। খাবার আর নেশার বস্তুতে তফাত আছে। একটা নিতান্ত স্থূল, আর একটা রসের ব্যাপার। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় না বুড়ির আত্মসম্মানবোধ নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে মরদ আমার মনে খটকা ধরিয়ে দিল। খটকা না বলে অবাক করা বলা চলে। গঙ্গা মায়ীর বুকে বাস করে শহরের জলকলের পানী কেন নৌকায় করে বহে নিয়ে আসতে হয়? অনেক বাঙালী মাঝির কথা জানি, যারা গঙ্গার বুকে মাসের পর মাস বাস করে, তারাও অনেকেই গঙ্গার পুণ্য সলিল পানেই তৃষ্ণা মিটিয়ে থাকে। মাঝি তো অনেক দূরের কথা, আমার বিধবা মা থেকে বর্ষীয়সী বিধবা আত্মীয়রা অনেকেই এখনো গঙ্গাজল পেলে কলের জল স্পর্শ করতে চান না। গঙ্গার পুণ্য সলিল যে আর পবিত্র নেই, দুপাশের কলকারখানার বিষাক্ত তরল কেমিক্যাল, শহরের খালের মতন বিরাট নর্দমার মুখ দিয়ে যতো রকমের নোংরা আর ময়লা বারো মাস এসে মিশছে, যা অনেক সময় স্রোতেব জলে চাক্ষুষ ভাসতে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে, গা ডুবিয়ে স্নান করতেও প্রবৃত্তি হয় না, সে-কথা বলেও তাঁদের নিবৃত্ত করা যায় না। অথচ নদীর বুকে চরায় যারা বাস করে, চাষ করে, তাদের গঙ্গামায়ীর পবিত্র পানিতে এহেন বিরাগ কেন? মরদের মতন মানুষের কাছে গঙ্গার জল সম্পর্কে এতোটা স্বাস্থ্যকর 'দৃষ্টিভঙ্গি' আশা করিনি। না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'তোমরা গঙ্গার পানি খাও না?'

মরদ বৈঠা টানতে টানতে জবাব দিল 'হুঁ বাবু, হামিনলোক সবহিরকম পানি পীওতবানী, কিন্তু আদমীলোগ কুছু মানে না। গঙ্গাপানি বিলকুল গন্ধা করিয়ে দিচ্ছে। ই দেখেন না, উজানিয়া টাইমে হাজিনগরের কাগজ কলের বহুত গর্দা ভাসাইছে। কিতনা ইটের ভাটা আছে কিনা বাবু, সব গঙ্গা কিনার কিনার বিশ পঁচিশ টাটিখানা বানাইছে। কততো মুর্দা জলে ভাসিয়ে যায়।

বিমার উমার হলে ভকদরবাবুর কাছে যাই, ত ভগদরবাবু বলেন কি গঙ্গাপানি পীনা বিলকুল বন্ধ না করলে বিমার খোবে না। ত হুঁ থানাউনা সবহি গঙ্গাপানিতে পাকাই, আর হর টাইম কলের পানী থাকে না, তখুন ত গঙ্গাপানি পীয়ে যাই।'

আমরা জলও খাই, মরদরা পীয়ে। যাই হোক, আসল কথাটা বোঝা গেল। চরে বাস বলেই গঙ্গার জলের নোংরা ময়লা, মৃতদেহও মরদেরা সব সময়েই চোখে দেখতে পায়। বিরাগটা সেই কারণেই। তা ছাড়া ভগদরবাবুর মানা আছে, বিমার সারবে না। তবুও এমন নয় যে গঙ্গার পানি পান একেবারেই চলে না। কলের জল সবসময়ে মজুদ থাকে না। রাখাও বোধহয় সম্ভব না। মোদ্দা কথা কলের জল না হলেও চলে যায়। তবে রাখতে পারলে ভালো।

খুবই ভালো। চরে গিয়ে তেষ্টা পেলে তাহলে আমাকে পুণ্য সলিলে তা মেটাতে হবে না। আমি তো আর বনভোজনের দল নিয়ে আসিনি। কাঁধে করে নিয়ে আসিনি জলের পাত্রও। একলা মানুষ, একটু জল চাইলে মরদ বা তার পরিবারের লোকেরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে না।

'বাবু, হুঁশিয়ার।' মরদ আওয়াজ দিল, 'লাও ঘাটেপর লাগছে।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি উঁচু পাড় সামনে। হুসিয়ার না করলে ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা ছিল। গলুইটা দু হাতে জোরে চেপে ধরলাম। নৌকার গলুই ঠেকলো চরের ডাঙায়। ভেবেছিলাম, কিছুটা সমতল বালুচরে নৌকা লাগবে। ভুলে গিয়েছিলাম, এখন জোয়ারের ভরা ভরতি। তবে মরদ ঘাটেই নৌকা লাগিয়েছে। দেখা গেল, শক্ত মাটির উঁচু পাড়ে সিঁড়ির মতন কয়েকটি ধাপ কাটা। এক ধরনের বুনো গুল্ম লতা মাটির বুকে ছড়িয়ে আছে।

ধাক্কাটা লাগলো মোটামুটি জোরেই। কিংকর্তব্য ভেবে কিছু করবার আগেই মরদ বিপরীত দিকের গলুই থেকে লহমায় এগিয়ে এসে লাফ দিয়ে নামলো ডাঙায়। হাতে সেই বাঁশের লগি। এদিকের গলুইয়েও একটি লোহার আংটায় দড়ি ছিল। ' সেই দড়িটা টেনে ধরে বললো, 'নামিয়ে পড়েন বাবু।'

এর থেকে সুবিধা আর হয় না। জল কাদা কিছু নেই। স্যাণ্ডেল পায়ে দিব্বি ডাঙায় নেমে পড়লাম। বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে তার বস্তাটা টেনে নিয়ে এলো গলুইয়ের কাছে। অনায়াসেই সেটা মাথায় তুলে পাড়ে নামলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেল ওপরে। মরদ তখন লগির গায়ে দড়ি বেঁধে সেটাকে মাটিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেকখানি গভীরে ঢুকিয়ে

দিল। নাড়াচাড়া করে দেখলো, লগি বেশ শক্তভাবেই গেঁথে বসেছে। তারপরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো, 'উঠিয়ে যান বাবু, ঘুম উনকে দেখেন।'

মরদ কথাগুলো বলে আমার আগেই ধাপের পাশ দিয়ে এক দৌড়ে লাফিয়ে উঠে গেল। আমি মাটি কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবলাম, এখন জলের বুকে কুমিরের পিঠে আছি। মরবার ভয় নেই বটে, ইচ্ছা মতো যখন খুশি পশ্চিমের মূল ডাঙায় ফিরে যেতে পারবো না। সেই আবার মরদকেই হয়তো বলতে হবে। অথবা তারা যখন কেউ যাবে, তখন নৌকায় ঠাঁই নিতে হবে। ওপরে উঠে দেখছি, মরদ চলেছে চালাঘরের দিকে, বুড়ি বস্তা মাথায় চলেছে তার আগে আগে। আমি ডাক দিলাম, 'এই যে ভাই শুনছো?'

মরদ দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো, 'হুঁ।' আমি সঙ্কোচে হেসে বললাম, 'তোমার নৌকায় নিয়ে এলে পারানির পয়সাটা নেবে না?' কথাটা যেন বুঝতে পারেনি এমন অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর চর কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললো, 'হায় রাম। আমি কি বাবু ঘাটমাঝি আছি? আমার লাওয়ে পর আপনাকে লিয়ে আসলাম, এতে পারহানি কী দিবেন? আপনে চর দেখতে আসিয়েছেন, দেখেন না।'

মরদের হাসি আর কথায় একটু যেন নিভেই গেলাম। কিন্তু মনটা কেমন ঝরঝরিয়ে গেল। সহজ ভাবের ব্যাপারটা সহজে কোনোদিন বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের কাজ গোছাবার জন্য প্রথম থেকেই ভাব জমাবার চেষ্টা করে আসছি। মরদ সেরকম কোনো চেষ্টা না করেই, নিতান্ত মামুলিভাবে আমাকে তার নৌকায় নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, 'এবার তা হলে সিগারেটটা নাও।'

মরদ কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললো, 'দেন।'

আমি পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তাকে দিলাম। সে সিগারেটটা কপালে ঠেকিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলো। আমি দেশলাই দিলাম। সে কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটে ছোঁয়ালো। টান দিল একটা লম্বা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফিরিয়ে দিল দেশলাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নামটা কী ভাই?'

'ভরত।' মরদ জবাব দিল, সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো।

এখন দেখছি ভরত নামে মরদের অবয়বটা যেন পালটে গিয়েছে। তার লম্বা ছিপছিপে শরীরটা জুড়ে যেন সাপ জড়ানো। আসলে বৈঠা টেনে তার

পেশিগুলো এখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সারা গা ঘামে ভেজা, যেন তেল চকচক করছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই বুড়ি তোমার কে হয়?'

'নানী।' ভরতের নাসারন্ধ্র দিয়ে লম্বা চওড়া গোঁফ জোড়ায় যেন সিগারেটের ধোঁয়া ঢুকে গেল, 'সমঝলেন কি বাবু? ঠাকরান নাই, নানী মায়ের মা যে আছে, ওহিকে নানী বোলে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ঠাকরান?'

'বাবার মা।' ভরত আবার সিগেরেটে টান দিয়ে বললো, 'ত আপনে চরে ঘুমেন বাবু, আমি ঘরে যাই।'

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও।'

ভরত ফিরে চললো চালার দিকে। তার নানীকে আর দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় চালায় ঢুকে পড়েছে। দূরের থেকে এতোদিন দেখে এসেছি একটা কিংবা দুটো চালা ঘর। এমন কি একটু আগে নৌকায় বসেও গায়ে গায়ে লাগালাগি দোচালা ধারের দুটো চালাঘর যেন দেখেছিলাম। এখন সামনে থেকে দেখছি, ভুল দেখেছি। দুই না, চার পাঁচটি ঘরের কম না। মুখোমুখি আর গায়ে গায়ে ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে যেন একটি সরু রাস্তাও দেখছি। প্রায় একটি পাড়া। কতো লোক থাকে?

যে গাছটাকে ভেবেছিলাম ঝাড়ালো বেঁটে, সেটি ঝাড়ালোও বটে, বেঁটেও বটে, তবে আসল গাছটি আদৌ প্রাচীন না। অথচ। অথচ কেন যেন মনে হয়েছিল ঝাড়ালো বেঁটে হলেও গাছটি বট অশথ জাতীয় কিছু হবে। এখন দেখছি গাম্বিল বা সেই জাতীয় কোনো গাছ। বোঝা উচিত ছিল, এই চরে এখনো কোনো বৃক্ষেরই প্রবীণ হয়ে ওঠা সম্ভব না। দূর থেকে এতদিন দেখে এসেছি, চালাঘর চরের উত্তর সীমায়। আসলে উত্তর ঘেঁষে কিন্তু চালা ঘরগুলো ছাড়িয়েও চরের সীমানা উত্তরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। সেই দিকেও শস্যের সবুজ আভা।

আমি মুখ তুলে হালিশহরের দিকে দেখলাম। বালির ঢিবি, প্রায় সারবন্দী ঘর, কোথাও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাকা বাড়ি, দু একটা মন্দির, সেই বিখ্যাত পার্ক যার উলটো দিকেই হালিশহর পৌরগৃহ, উঁকি দিচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। দেখতে না পেলেও, বহুবার যাতায়াতের, রামপ্রসাদের ভিটার, পূর্বগামী পথটা চোখের সামনে ভাসছে। পশ্চিম পারে চোখ ফেরালেই, এক দিকে ডানলপ কারখানার কুঠি, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ঘেঁষে। দক্ষিণে অনেকটাই হালিশহরের মতনই। গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদীর ধারে ধারে ইট কাঠ চুন

সুরকির গোলা। সব থেকে উঁচুতে মাথা তুলে আছে বাঁশবেড়ে হংসেশ্বরীর মন্দিরের চূড়া। তবে হালিশহরে কখনো পুরনো জোহানকড়ের স্তূপ দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। চোখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। চোখে কালো ঠুলি না থাকলে, রোদ ঝলকানো মাঘের নীল আকাশে চোখ রাখা সম্ভব ছিল না। বাঁ হাতের পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে দেখলাম, ঘড়ির কাঁটা একটা বেজে এগিয়ে গিয়েছে কয়েক মিনিট।

অবশেষে সেই চরে, হাতছানির সাড়া দিয়ে, ঘর আছে, মানুষ আছে দেখতে পাচ্ছি, কিছুটা দূরেই মেয়ে পুরুষ কয়েকজন চরের মাঠে কাজ করছে অথচ যেমনটি দূর থেকে ভেবেছিলাম, অবিকল সেইরকম মিলে যাচ্ছে। স্থির বটে তথাপি যেন স্রোতের দিকে চোখ রেখে মনে হয় সবুজ দীর্ঘ একটি ভূমিরেখা নিরিবিলি মনের সুখে ভেসে যাচ্ছে। এই ভেসে যাওয়াটা দূর থেকে তেমন বোঝা যায় না। জোয়ারের উজান টান দেখলে, মনে হয়, চর এখন ভেসে চলেছে বিপরীতে, সমুদ্রের দিকে। ভাটার সময় নিশ্চয় চরকে উত্তরগামী ভেসে যেতে দেখা যাবে। মাঝে মাঝে চড়াইয়ের ঝাঁক উড়ে চলেছে। চরের কোনো জায়গায় দল বেঁধে বসছে, আবার উড়ছে। আর কোনো পাখি চোখে পড়ছে না।

আমার চোখের সামনেই, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছোলার চাষ হয়েছে। সবুজের ঝাড়ে ফসল এখনো অঙ্কুরের দশায়। ছোলা চাষের সীমানা পেরিয়ে, কিছুটা উত্তরের মাঝিমাঝি এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, দুজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষ কাজে ব্যস্ত। চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকবো ভেবেও, পারলাম না। ছোলা খেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম দক্ষিণে। কয়েক পা এগোতেই, কে যেন আমার পাশ কাটিয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেল। দেখলাম, ছোটখাটো, নেংটি পরা চার পাঁচ বছরের এক বালক। হাতে একখানি লম্বা কঞ্চি। এ মূর্তির মাথা আর লম্বা কঞ্চি নৌকো থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। জানি না, বালকটির হাতে বাঁশের কঞ্চি কোথা থেকে এলো। এ চরে বাঁশের ঝাড় কবে জন্মাবে, সে-কথা একমাত্র চরের সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে।

বালকটি ছুটে গিয়ে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকালো। নেংটিটা নিতান্ত নেংটিই। কোমরে এক প্রস্থ মোটা সুতো জড়ানো। তার সামনে পিছনে এক ফালি কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে সভ্যতা রক্ষা করা হয়েছে।

কী দরকার ছিল জানি না। শহরের পথে ঘাটে ওর মতন ছেলেরা অসংকোচে দিগম্বর হয়ে ঘোরে। আর ও তো শহর থেকে অনেক দূরে। তবে এই শিশুর নেংটি বোধহয় শহরে সভ্যতার থেকে মানুষের সহবতের কারণেই। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সারা গায়ে ধুলো কাদার দাগ। গলায় একটা কালো সুতোয় মাদুলি ঝুলছে। মাথায় খোঁচা খোঁচা কদম ছাঁট চুল। ওর অপলক অবাক কৌতূহলিত চোখে যদি কাজল না মাখানো থাকে, তাহলে বলতে হবে, ওর কাজল-কালো চোখ দুটি ডাগর। নাকটি টিকলো। ঠোঁট দুটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দুধের দাঁত দেখা যাচ্ছে।

শিশু দাঁড়িয়ে দেখছিল চরের বুকে নয়া আদমিকে। কিন্তু নয়া আদমি দাঁড়ায়নি। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি, আর শিশু আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, মুখ না ফিরিয়েই পিছু হটছে। পলিতে বালিতে মেশামিশি এ মাটি এখন শক্ত হলেও, আছাড় খেলে চোট লাগার সম্ভাবনা তেমন নেই। চোখের কালো ঠুলি মানেই মুখোশ। শিশু আমার আপাদমস্তকের থেকে, চোখের দিকেই দেখছে বেশি। একবার ভাবলাম, ওকে ছুটে গিয়ে ধরি। কথাটা ভাবতেই মনে মনে হাসি পেয়ে গেল। অকারণ বেচারিকে নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দেওয়া হবে। তবে ওকে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে কিছু ভুল করি নি। কৃষ্ণ তো ও বটেই আর দ্বীপের অধিবাসীকেই দ্বৈপায়ন বলে। স্বয়ং ব্যাসদেবকে নিয়ে অনেককাল একটা ভুল ধারণা ছিল, দ্বীপে যার জন্ম হয়, তাকেই দ্বৈপায়ন বলা হয়। প্রকৃত কথাটা জানলাম এই সেদিনে, স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের এক রচনায়।

গোলে হরিবোলে জানা একরকম, অনুশীলিত জ্ঞানের বচন আলাদা। অতএব শিশুটিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলা বোধহয় অসঙ্গত হলো না। আমি ওকে তাড়া না করে, যাকে বলে 'বাজারি' হিন্দি, সেই ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমকো নাম ক্যায়া হ্যায় বেটা?'

আর যাবে কোথায়! যেন তীরবিদ্ধ হরিণ বাচ্চার মতন একটা লাফ দিয়ে, কঞ্চিটাকে উঁচুতে তুলে, দৌড়ে একেবারে সেই দুই স্ত্রীলোক ও এক পুরুষের কাছে, কিছুটা উত্তরের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালো। কিছু একটা বললো নিশ্চয়। কারণ কর্মরত স্ত্রী পুরুষ তিন জনেই মুখ তুলে একবার আমার দিকে দেখলো। কিন্তু তাদের অন্যদিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ যেন নেই। আবার মুখ নামিয়ে নিজেদের কাজ করতে করতে, যেন কিছু বলাবলি করতে লাগলো।

আমি ছোলার সীমানা পেরিয়ে, এগিয়ে গেলাম তাদের দিকেই। সাবধানে যেতে হচ্ছে। আমার আশেপাশে, এখনো দেখছি বেশ বিলিতি বেগুনের গাছে, লাল বিলিতি বেগুন ঝুলছে। যতোটা বালি আশা করেছিলাম, মাঝখানের ভূমিতে ততোটা নেই। এবড়ো-খেবড়ো মাটি আরও এগিয়ে গিয়ে, কাজের মানুষদের সামনে দাঁড়াতেই, কঞ্চি হাতে শিশু একটি স্ত্রীলোকের পিছনে আড়াল করে দাঁড়ালো। ও বোধহয় ভেবেছে, আমার লক্ষ্য ওর দিকেই। আমি ওর কাছে ভিনদেশী তো বটেই। অচেনা আর নয়াও বটে, পোশাকে-আশাকে, সবদিক থেকেই।

স্ত্রীলোকটি একবার আমাব দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার ঠোঁটের কোণে হাসি। নিতান্ত স্ত্রীলোক বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? ছিপছিপে গড়ন, বলিষ্ঠ শরীরের যোবতী বহুড়ি বললেই যথার্থ বোঝায়। এর চোখ জোড়াও দেখছি, প্রায় কাজল মাখানো কালো, যদিও কাজল লাগায়নি। নাকটিও টিকলো। গায়ের রঙ দেখে, ঘন সবুজ কাঁটাল পাতার ছবি ভেসে উঠছে। অথচ কালো বলতে ইচ্ছা করে না। আর প্রায় সেইরকম রঙেরই একটি শাড়ির আঁচল ডান কাঁধ ঘিরে মাথার অংশত ঢেকে, কোমরে জড়ানো। আঁচলের ডাইনে বাঁয়েই বাঙালী অবাঙালীর পরিচয়ের চিহ্ন। অথচ দু হাতে দেখছি, বাঙালী সধবাদের মতন দুগাছি শাঁখা আর নোয়া, যা টেনে খানিক ওপরে তোলা। গলায় চিকচিক করছে বোধহয় রুপোর একটি সরু হার। অলংকারের মধ্যে আর কিছু নেই। মাথার ঘোমটা সরানো বলেই, সিঁথির সিঁদুরের রেখা চোখে পড়ছে। কপালে টিপ ছাপ কিছু নেই। হাতে পায়ে ধুলা, মুখে ভুরুতে চোখের পাতায় আর মাথার চুলেও ধুলো রেণু। তিন জনেই আলু তুলছে।

পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স, খালি গা চওড়া শক্ত পোক্ত গঠন পুরুষটির কাঁচা পাকা গোঁফ জোড়ায় ধুলা লেগেছে। হাঁটুর ওপরে তোলা, গঙ্গার জলে ধোয়া কিছুটা গেরিমাটি রঙের ছোট ধুতি। তার মাথার কদম ছাঁট চুলে আর বুকের মাঝখানে গুচ্ছের লোমেও ধুলা লেগেছে। মাথার টিকি গাছা তেমন বড় না। সারবন্দী আলুগাছের গোড়ায় কোদালের কোপ বসাচ্ছে, আর বাজিয়ে চাড় দিয়ে শিকড়ে ঝোলানো ছোট বড় আলুর গোছা তুলে দিচ্ছে। এই পর্যন্ত তার কাজ। বাকি কাজ যোবতী বহুড়ি আর প্রায় মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটির। মাঝবয়সী বলছি বটে, কিন্তু অনেক দিনের পুরনো রঙ উঠে যাওয়া আবছা লাল ডুরে শাড়িটি যোবতী বহুড়ির মতনই পরা। চুল একটিও পাকেনি, সিঁথির মাঝখানে সিঁদুর। শরীরের দিক থেকে তাকেও বলিষ্ঠ

বলতে হবে। কিন্তু শাঁখার বদলে দেখছি তার দু হাতে কাঁসার মোটা বালা। কানে মাকড়ি ছুটোও রুপোরই মনে হচ্ছে। দুই রমণীর কাজ হচ্ছে, হাতের ছুরি দিয়ে, গাছের গোড়া কেটে, মাটি ঝেড়ে আলু বস্তায় ঢোকানো। তার মধ্যেই দ্রুত হাতে, আলু গাছের ডগার কয়েকটি কচি পাতা যা পাওয়া যাচ্ছে, কেটে ছেঁটে আলাদা করে রাখা। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কোদালির কোপে ধুলা উড়ছে, ছোট ছোট গাছগুলোর গোড়া ধরে মাটি ঝাড়তে ধুলা উড়ছে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে প্রথমে যৌবতী বহুড়ির পিছনে আত্মগোপন, আর বহুড়ির মুখ তুলে তাকানো, ঠোঁটের কোণে হাসি। তারপরে বাকি দুজনেও আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকালো। পুরুষটি আমাকে অবাক করে দিয়ে, হঠাৎ ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলো, 'রাম রাম বাবু।'

বলেই যে-ভাবে আবার নিজের কাছে লেগে গেল, মনে লাগিয়ে দিল খটকা। তার নিজস্ব নমস্কারের অভিবাদন কি আমাকেই? বুঝতে সময় গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে আমি প্রায় হকচকিয়ে জবাব দিলাম, 'রাম রাম।'

কিন্তু তখন আর পুরুষটির তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। বা নতুন করে আর আমার প্রতি নমস্কারের জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। সে তার স্বভাবসুলভ অনাড়ম্বর নমস্কারটি জানিয়ে দিয়েছে, চরে আসা আগন্তুক 'বাবুটিকে'। বাবুই বরং অপ্রত্যাশিত নমস্কারে বিভ্রান্ত আর অপ্রস্তুত। কিন্তু বিস্ময়ের গুঞ্জনটা এখনো আমার মস্তিষ্কে পাক খাচ্ছে। কাজের মানুষ কাজ ভোলে না। সহজ মানুষ সহজে চলে অনায়াসে। অথচ যেন ফল্গুধারার মতন। বাইরে দেখছো শুষ্কং কাষ্ঠং, অন্তঃস্রোতে বইছে আপন বেগে। ভরতের ক্ষেত্রেও এমনটিই দেখেছি।

এরকম অবস্থায় কথাবার্তা চালানো যায় না। বাক্যালাপের ব্যগ্রতা আমারও নেই। এই চরে আমি কথা বলতে আসি নি। এসেছি অনেক-দিনের হাতছানির সাড়া দিতে, নিরালা চরের সঙ্গে নিরিবিলি হতে। মানুষ যে আছে, তা আগেই দূর থেকে দেখেছি। নিরালা চরেরই অংশ তারা। তাদের আলাদা করে দেখা যায় না।

অনেকদিন মনে মনে ভেবেছি, গঙ্গার মাঝখানের চরে কী ফসল ফলে? আজ চোখে দেখতে পেলাম ছোলার চাষ। আনাজের মধ্যে দেখছি, লাল টলটলে বিলিতি বেগুন, বাজারে যার চলতি নাম টম্যাটো। অথবা বলো, টমাটার। চরের এই মানুষরাও বোধহয় বিলিতি বেগুনকে বিলাইতি বাইগন

বলতে ভুলে গিয়েছে। ছোলা টম্যাটোতে অবাক হই নি। কিন্তু এ চরের মাটি আলু প্রসব করে, চোখে দেখেও যেন অবাক লাগছে।

অবশ্য বাজারের নৈনিতাল আলুর মতন এর চেহারা না। অথচ, যাকে বলে ঠিকরে আলু, ঠিক যেন তেমনও না। জাতের দিক থেকে নৈনিতালের কাছাকাছি, আকৃতি কিছু ছোট, রঙটাও বর্ষায় ভেসে আসা লাল পলির ছোপ। আরও উত্তরের আশেপাশে দেখছি, এখনও ফুল আর বাঁধাকপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে, অনেক ফাঁকা। ফুলকপিগুলো বিশেষ করে তার সময়কালের রূপ হারিয়েছে। পাতার বাহার যদি বা আছে, ফুলের বাহার মোটেই নেই। সেই তুলনায় বাঁধাগুলো এখনও যেন বেশ আঁটসাট বড়সড় শরীরে রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। দেখে বুঝতে পারছি, ফুল আর বাঁধার ফাঁকে ফাঁকে জমিতে, ছোট ছোট সবুজের চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই কোনো শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর নাম জমি। তাও আবার অকূলের ভাসমান জমি। এক চিলতে পতিত রাখলে, জীবনও পতিত, না হলে আর মূল ছেড়ে নদীর বুকে?

কিন্তু চাষ যার জমি তার, এমন ঢক্কানিনাদ শুনে শুনে কানের পর্দা ফেটেছে অনেককাল, কাজে কখনো কিছু হতে দেখি নি। 'নেপো' বলে এক শ্রেণী বরাবর দই মারে বলে জানি। এই জমির খাজনা নজরানার দাবিদার কে?

জানতে ইচ্ছা করলেও, এই কাজের মানুষদের এখন সেই কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ঠেক লাগছে। দেখছি, শিশুটি এখনও যোবতী বহুড়ির পিছন থেকে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আমার দিকে দেখছে। চোখাচোখি হলেই ঝপ করে মুখ আড়াল করছে। ভয় কেটেছে, এখন এটা লুকোচুরি খেলা চলছে। ইতিমধ্যে ফুল, বাঁধা, ছোট ছোট সবুজ চারার সীমানা ছাড়িয়ে, আমার নজর এগিয়ে গিয়েছে আরও উত্তরে। সেখানে আরও দুটি মূর্তি কোনো কাজে ব্যস্ত। দূরত্বটা কম, অতএব, ফারাকে ফারাকে মূর্তি দুটি দেখে বুঝতে পারছি, দুজনেই কিশোর কিশোরী। আরও উত্তরে, চরের উত্তর প্রান্তের শেষ সীমানায়, একটি চালা ঘর দেখতে পাচ্ছি। একটি কালো মূর্তিকে দেখছি, পুবের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এসেছি যখন, কোনো সীমানাই বাদ দেবো না তবু আগে উত্তরে পা বাড়ালাম। আমার পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিও ঘুরে যোবতী বহুড়ির কোমর জড়িয়ে তার সামনে গা ঢাকা দিল। কেন না, আমি যে এখন পিছনে। আমার কানে বামা স্বর এলো, 'বাবু তুহকে খা লেব ক্যায়?'

মাঝবয়সী না যৌবতী, কোন্ বহুড়ি বললো, বুঝতে পারলাম না, কিন্তু দোতারার নীচু পর্দায় ঝংকারের মতন রমণী স্বরের হাসি শুনতে পেলাম, তারপরেই, 'হট, হাত ছোড়।'

আমি পিছন ফিরে একবার দেখলাম। যৌবতী বহুড়ি শিশুটির হাত ধরে কোলের কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। নেংটি পরা নেংটিটার কালো ডাগর চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। এদের কার কী সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু যৌবতী বহুড়ি আর নেংটিটাকে মা ব্যাটা বলে মনে হচ্ছে।

আমি এবার কিছুটা ডান দিকে গিয়ে, উত্তরমুখী হলাম। তার আগেই নজরে পড়ল, জোয়ার থাকা সত্ত্বেও, চরের এদিকে ঢালুর নীচে খানিকটা বালুচর জেগে রয়েছে। জোয়ারের জল নিশ্চয়ই এদিকে নিজের মতলবে উজানের টানে জল কম ভাসায়নি। আসলে, এদিকে চর বোধহয় আরও বাড়তির দিকে। কিছুটা উত্তরে গিয়ে দেখি, মটরশুটি এখনও চর থেকে বিদায় নেয়নি। অনেক-খানি জায়গা জুড়ে তার সীমানা। পশ্চিমের ধার ঘেঁষে, খালি গা, হাঁটুর ওপর ধুতি পরে ষোল বছরের একটি ছেলে, আর বছর দশেকের একটি মেয়ে, মাঝা-মাঝি জায়গায় নীচু হয়ে, ছোট ঝুড়িতে মটরশুটি তুলছে। মেয়ে বলছি বটে। কিন্তু আর দুই বহুড়ির মতনই ওর গায়ে একখানি লাল শাড়ি। এমন কি মাথায় অল্প ঘোমটাও আছে। ঠিক নজরে আসছে না, ওর সিঁথিতে সিঁদুর আছে কী না। কিন্তু দু হাতেই রং-বেরংয়ের কাঁচের চুড়ি। ওর গায়ের রঙটাও গঙ্গার গৈরিক জলের মতন। গায়ের রং এমন হয় কী না জানি না। আমার চোখে সেইরকমই লাগছে। আসলে গায়ের এমন রঙকেই বোধহয় মাজা মাজা ফরসা বলে। পশ্চিমাংশের ছেলেটির রঙ অবিশ্যি কালো।

দশ বছর বয়সটা অনুমানে বললাম। মেয়েটির বয়স দু এক বছর বেশি হতে পারে। ও বসে বসেই শুটি ছিঁড়ছে আর এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে নড়াচড়া করছে। তার মধ্যেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল। একবার না, কয়েকবারই দেখলো। কিন্তু হাতের কাজে কামাই নেই। আমি আমার মনে, ও ওর মনে। তবু কয়েকবার মুখ ফিরিয়ে দেখার মধ্যে, ওর কালো চোখের কৌতূহল স্পষ্ট। বোধহয় ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসাও চোখের কালো তারা যুগলে। বিরক্ত হচ্ছে নাকি?

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। পশ্চিমাংশের ছেলেটি একবার মাত্র চোখ তুলে দেখেছে, সেটা খেয়াল করেছি। তাকে কিশোর বলবো না নওজোয়ান বলবো বুঝতে পারছি না। সে তার নিজের কাজে ব্যস্ত। সবাই

কাজের মানুষ, কাজ করছে, আমিই কেবল অ-কাজের মানুষ, চরে চরে বেড়াচ্ছি। খানিকটা এগিয়ে যেতেই, মটরশুটির ক্ষেতের মাঝখান থেকে বালিকার স্বর শোনা গেল, 'তু কহাঁ যাওতানি?'

আমাকে নাকি? পিছন ফিরে তাকালাম। কঞ্চি হাতে সেই নেংটিটা, প্রায় হাত দশেক ফারাক রেখে আমার পিছনে। সাহস বেড়েছে, না কি কৌতূহল মেটেনি? আমি পিছন ফিরে তাকাতেই, কঞ্চি হাতে ও ঢুকে পড়লো মটরের ক্ষেতে। আমি আবার বালিকার দিকে তাকালাম। দেখলাম যৌবতী বহুড়ির কৌতুকের হাসিটা ওর ঠোঁটে চোখেও ঝিলিক দিচ্ছে। তাকিয়েছিল আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই, চোখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল। আসলে ওর কৌতূহলটাও প্রায় শিশুর তুল্যই। বয়স হিসাবে তা-ই হওয়া উচিত। ও এখন লাল শাড়ির ঘোমটা টেনে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মটরশুটি তুলছে। শহরে ওর বয়সী মেয়েরা এখন ফ্রক পরে ইস্কুলের ক্লাসে পড়া করছে।

বয়সটা বড় কথা, না জীবনধারণ? বোধহয় জীবনধারণই। না হলে একই বয়সের মেয়ে, জীবনধারণে দুরকম চরিত্র আর চেহারা। তার সঙ্গে আরও যেটা মনে আসছে, তা নিজেকে নিয়েই। বয়স আর জীবনধারণের বাধা না থাকলে, আমিও তো পাখির মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম মটরের ক্ষেতে। দু-চার গোছা তুলে নিয়ে, দিব্বি খোলস ছাড়িয়ে দানা চিবোতে পারতাম। বয়সের বাধাটাকে যদি বা ডিঙোনো যায়, জীবনধারণের ছাপ ছোপে বাবু মনিষ্যিটি হয়ে, কেমন করেই বা ফসলে হাত দিই? একমাত্র উপায় হলো, বালিকাটির কাছে গিয়ে হাত পাতা। কিন্তু, হাত পেতে হয় তো বিমুখ হবো না, বালিকাটিকে বিব্রত করা হবে। দরকার কী? লোভ সম্বরণ করাই ভালো।

আমি পা বাড়াবার আগে, নেংটিটার দিকে ফিরে আবার আমার যোগ্য হিন্দিতে বললাম, 'ক্যায়া, তুম নাম নেই বাতায়েগা?'

আবার সেই তীরবিদ্ধ হরিণের লাফ, এবং এবার ছুট দিল বালিকার দিকে। বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসিটা আমার ভিতরেও সংক্রামিত হলো, কিন্তু আওয়াজ দিতে পারলাম না। পশ্চিমাংশের ছেলেটি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো। আমি পা বাড়ালাম। মটরশুটির সীমানা পেরিয়ে, প্রথমে চোখে পড়লো ভুঁয়ের বুকে লতায় পাতায় জড়ানো, উচ্ছে কিংবা করলা। মাঝে মাঝে লতাপাতা বাঁশের খুঁটিতে এমন উঁচু করে তুলে দিয়েছে, যেন তাঁবু খাটানো হয়েছে। নজর করে দেখলে দু একটি পাকা ফলও চোখে পড়ে, যাদের গায়ে নিশ্চিত পাখির ঠোঁটের খোঁচা লেগেছে। কেন না, লাল বীচি

উঁকি মারছে, খোঁচা খাওয়া ফাটলে। অথবা পাকা কয়লা আপনিই ফেটে গিয়েছে।

অনেককাল থেকে দেখা, চরের ঐশ্বর্য দেখছি কম না। আরও কয়েক পা এগোতেই, প্রথমেই চোখে পড়লো, হলুদ আর সবুজে মেশানো বড় বড় একটি কুমড়ো। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়েই কুমড়োর ক্ষেত। হলুদ ফুল ফুটে আছে এদিকে ওদিকে। কুমড়ো যদিও আর দেখতে পাচ্ছি না। ফুলে ফুলে মৌমাছির ভিড়। আর এই প্রথম চোখে পড়লো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। সবুজে হলুদে মেশানো মাঝারি মাপের প্রজাপতিগুলোও কুমড়ো ফুলের আশেপাশে উড়ছে। ওরাও কি এই নিরালা চরের বাসিন্দা? নাকি আমার মতনই হাতছানির সাড়া দিয়ে এসেছে?

তারপরেই বেশ খানিকটা লম্বা জমি কোদালের ঘায়ে ফালা ফালা হয়ে পড়ে আছে। সম্ভবতঃ নতুন কোনো বীজ বপনের প্রস্তুতি পর্বের পর, প্রতীক্ষায় আছে। এখন আমার সামনে উত্তরের প্রায় শেষ সীমানায় সেই একটি চালাঘর, সামনে দাঁড়িয়ে এক রোগা লম্বা কালো পুরুষ। আগেই যাকে দূর থেকে চোখে পড়েছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, খাটো ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা, গায়ে শুকনো গামছা জড়ানো লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাল বুনছে। মাথার চুল উস্কো খুস্কো, কিন্তু চরের বাকি পুরুষদের সঙ্গে একেবারে মিল নেই। চুলের মাপ বেশ বড়, আর তেলতেলে কালো কুচকুচে। গোঁফ নেই, তবে বেশ কয়েকদিন ক্ষৌরকারের কাছে গিয়ে বসা হয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছে, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি দেখে। গলায় দু-ভাঁজ কন্ঠির মালা।

আমার খেয়া পারানিয়া ভরত থেকে, এ পর্যন্ত যে-কজন পুরুষকে দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে এ মূর্তির অমিল স্পষ্ট। তবু ভালো করে দেখে নিলাম, লোকটির মাথার পিছনে টিকি আছে কী না। নেই। চালা ঘরের ছোট ঝাঁপ খোলা। ভিতরে কী আছে, কিছু দেখা যায় না, কাঁচা মাটির মেঝে ছাড়া। দোতলা খড়ের চালের মাথার ওপরে ধুঁধুলের লতাপাতা ছড়ানো। লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে দু তিনটি ধুঁধুলও চোখে পড়ছে।

মূর্তি জাল বুনতে বুনতে আমার দিকে তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলো, তারপরেই জিজ্ঞাসা, 'ওপারে যাবেন, না বেড়াইতে আসছেন?'

যা ভেবেছিলাম। এ মূর্তির সঙ্গে অন্য পুরুষদের অমিল। বচনেই জানা গেল, এ মূর্তি বঙ্গ সন্তান। শুধু বঙ্গ সন্তান না, বঙ্গ-আলের সন্তান, তবু এ

বঙ্গের বচন আরওতর চেষ্টা স্পষ্ট। এতক্ষণ দেখে শুনে একবারও মনে হয়নি, এ চরে বাঙালীর দেখা পাওয়া যাবে। জাল বোনার সঙ্গে চেহারা দেখে, সম্পর্কটা কেবল জালের সঙ্গে, না কি এ চরের ভূমির সঙ্গেও বুঝতে পারছি না। বাঁশের খুঁটিতে একটি নৌকা বাঁধা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। জবাব দিলাম, 'বেড়াতেই এসেছি। তোমরাও কি এ চরে থাকো নাকি?'

জাল বুননকারি জবাব দেবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে পুরুষের স্বর ভেসে এলো, 'কার লগে কথা কও কুতুদা?'

ঘরের ভিতরে মানুষ আছে, এবং তার আওয়াজে বঙ্গ-আলের বচন আরও স্পষ্ট। কিন্তু কুতুও কি নাম হয়? অবিশ্যি এ সব নামের হদিস খুঁজতে গেলে, থই পাওয়া যাবে না। কুতু জবাব দিল, 'এক বাবু বেড়াইতে আসছে, হুগলির থেক্যা।'

তা হলে, কুতু কেবল জাল বুনছিল না, বা পুবদিকেই মুখ করেছিল না। আমি যে পশ্চিম কূল থেকে চরে এসেছি, সেটি ঠিক লক্ষ্য রেখেছে। ঘরের ভিতরের লোকের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে কুতু আমার দিকে ফিরে বললো, 'না বাবু, আমরা চরে থাকি না, ওই মাউড়ারাই থাকে।'

আপত্তির শব্দটা কানে খট করে লাগলো। যদিও জানি, আমার এক কথাতেই, বাঙালটি ভিন প্রদেশের মানুষ সম্পর্কে, 'মাউড়া' শব্দটি ত্যাগ করবে না। বিশেষ করে, দেশ বিভাগের পরে যারা এ-বঙ্গে আগমন করেছে, আমাদের পাশের প্রদেশের প্রতিবেশীদের তারা উক্ত বিশেষণেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তবে, কেবলমাত্র পুব দেশের লোকদের দোষ দিয়েই বা কী হবে। এখনও তো, খাস এ-বঙ্গের সাধারণের মুখে, কথায় কথায় 'মেড়ো' বিশেষণটি শুনতে পাই। আর এ বিশেষণের মধ্যে যে কেবল তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই আছে, তা না। আমার কানে, বরাবরই ওই সব আখ্যার মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের সুর বাজে। তবে ন্যাকা বোকার শত্রু কম। আমি অনায়াসেই ন্যাকা হয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'মাউড়া মানে? তারা আবার কারা?'

কুতুর হাতের কাঠি দ্রুত জাল বুনে চলেছে। তার মধ্যেই, সে আমার অজ্ঞতায় হাস্য সম্বরণ করতে পারলো না, বললো, 'মাউড়া আবার করে কয় বাবু, জানেন না? ওই যে দেখতেছেন, সব চাষ আবাদ করতেছে, অদেরই মাউড়া কয়। আমরা কই মাউড়া, আপনেরা কন ম্যাড়ো।'

ম্যাড়ো মানে মেড়ো, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। কুতু আমাকে সহজেই পশ্চিমবঙ্গবাসী ধরে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী তো বটেই, তবু আমিও

পুব দেশ থেকেই এ বঙ্গে এসেছি। তবু আমি না বলে পারলাম না, 'আমার ধারণা ওরা বিহারের লোক, বিহারী।'

'হ, বাবু যারে কয় কদু, তার নামই লাউ বোঝলেন না?' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ত মূর্তি দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, 'আমরা কই মাউড়া, ঘটিরা কয় ম্যাড়ো, আবার খোট্টাও কয় অনেক লোকে। আপনে কী য্যান কইলেন কথাটা?'

বললাম, 'বিহারী।'

'ওর বোঝেন, যাই কন, সবই এক।' ঘরের থেকে বেরিয়ে আসা লোকটি বললো।

বুঝলাম, এখানে আমার জ্ঞানবাবু হয়ে কোনো লাভ নেই। কদু আর লাউয়ে যখন তফাত নেই, তখন ওই সব বিশেষণ বা আখ্যায় বা কী দোষ? প্রাদেশিকতার দোষ বিদ্বেষ? বলতে গেলে, কোন্ কথা কোন্ দিকে গড়াবে, কে জানে। দেখলাম, ঘর থেকে যে বেরিয়ে এলো, কুতুদার থেকে বয়স তার নিশ্চয়ই কিছু কম। গায়ে কিছু নেই। পরনের খাটো ধুতিটি হাঁটুর ওপর তোলা। বেঁটে কালো গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। এর মাথার টেরিটি স্পষ্ট। কুতুর মতনই তুভাঁজ কণ্ঠির মালা, মোটা গলায় যেন চেপে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা চরে থাকো না তো, এ ঘরটা কাদের?'

'ঘর আমাদেরই।' কুতু জবাব দিল, 'বোঝলেন না, একটা ঘর-টর না থাকলে চলে না। দখল রাখতে হইলে, একটা ঘর থাকা দরকার।'

কথাগুলো কেমন যেন বাঁকাচোরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের দখল?'

'ক্যান, এই চরের?' কালো গাঁট্টাগোঁট্টা অল্পবয়সী জবাব দিল। হাত তুলে দক্ষিণে দেখিয়ে বললো, 'ওই ছাখেন, অরাও কেমন ঘর দরজা কইরা জুতজাত কইরা বসছে। থাকি না থাকি, ঘর একটা রাখতেই হয়।'

কুতু বললো, 'দাওয়া বোঝেন ও বাবু, বিষ্টি বাদলার কথাই কই। তখন মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই না থাকলে চলে না। তারপরে বোঝেন, গরমের সময় রোদে থাকাও যায় না। গাছপালাও নাই।'

দখল রাখার কথার থেকে, কুতুর কথায় যুক্তি বেশি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে তোমরা থাকো কোথায়?'

'ওই-ওইখানে।' কুতু হালিশহরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে হাত তুলে দেখালো, 'হালিশহরের শ্মশানখোলা, তারপরে আশ্রম, তারপরে তেঁতুলতলার লোক

থেইক্যা উত্তরে গেলে, বাঁয়ে একেবারে গঙ্গার পাড়ে, আমরা কয়েক ঘর পাকিস্তানের লোক থাকি।'

কুতুর জায়গার বর্ণনা কিছুই আমার অচেনা না। কিন্তু সে যেভাবে আঙুল তুলে দেখালো, যেন ঘরই দেখাচ্ছে। আমি কোন-ছার, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁরা দিনের বেলাও আকাশের তারা দেখতে পায়, তাদের পক্ষেও কুতুর অঙ্গুলি সংকেতের পক্ষে, তাদের কয়েক ঘর চিনে ওঠা সম্ভব না। হালিশহরের সদর রাস্তা বাঁক নিয়ে, তেঁতুলতলার মোড় চলে গিয়েছে অনেকখানি পুবে। সেখান থেকে আরও উত্তরে গিয়ে বাঁদিকে গঙ্গার ধারে যেতে গেলে, বেশ খানিকটা পথ যেতে হয়। যতোদূর মনে পড়ে, বাঁদিকে পূর্ববঙ্গবাসীদের অনেক কাঁচা পাকা ঘর উঠছে রাস্তার বাঁ ধারেই। যাকে বলে কলোনি, সেইরকম আবাসস্থল, বোধহয় সেই কলোনির কিছু নামও আছে। আমি বললাম, 'ওদিকে তো বাগের মোড়।'

'হ হ, ঠিক কইছেন বাঘের মোড়ের কাছেই।' অল্পবয়সী গাঁট্টাগোঁট্টা বলে উঠল, 'বাবু তো দেখি সবই জানেন। আপনাদের বাড়ি কোনখানে? কাঁচরাপাড়া না কল্যাণী নাকি?'

বাগের মোড় কেমন করে বাঘের মোড় হয়, তা আমার জানা নেই, তবে অল্পবয়সী জোয়ানের জিজ্ঞাসায় ত্রুটি হয়নি। এক কথায় যদি বাগের মোড়ের কথা বলতে পারি, তা হলে, তার কাছেপিঠের বাসিন্দা হওয়া বিচিত্র কী? বাগের মোড় হলো এমন একটি জায়গা, যার পুব দিকের রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে কাঁচরাপাড়া ইস্টিশনের দিকে। আর সোজা রাস্তাটা কয়েকশো গজ গেলেই, পুল পেরিয়ে নদীয়া জেলার কল্যাণী নগর। গাড়ি চলাচলের মতন পাকা সেতুর নীচে প্রায় শুকনো খাত। শুনেছি ওইটি ছিল একদা যমুনা নদী। বর্ষাকালে শুকনো খাতে জল দেখা যায় বটে, এই সময়ে লক্ষ্য করলে ক্ষীণ একটি জলের ধারা চোখে পড়ে। তবে সহজে না। বিস্তর গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবডালে ভাঙাচোরা নানা মাপের আয়নার মতন।

পুবে গেলে, কাঁচরাপাড়া ইস্টিশন অবিশ্যি যমুনার এপারেই। ইস্টিশন ছাড়িয়ে গেলে যমুনার খাতের ওপর রেল লাইনের সাঁকো। অথচ, আদি কাঁচরাপাড়া নদীয়া জেলার মধ্যে। বাগের মোড় ছাড়িয়ে গাড়ি চলাচলের পাকা সাঁকো পেরিয়ে কয়েক পা গেলে, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, আসল কাঁচরা-পাড়া গ্রামের রাস্তা চলে গিয়েছে। আসল নাম কাঞ্চনপল্লী, এটি কেতাবী জ্ঞান। কাঞ্চনপল্লী বলেই কি অনেকে 'কাঁচরাপাড়া' উচ্চারণ করে? জানি

না, কিন্তু অনেকের মুখেই নামটি উচ্চারিত হতে শুনেছি।

কাঁচরাপাড়া গ্রামের রাস্তাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এটা কোনো কেতাবী ব্যাপার না, নিজের চোখেই দেখা। কল্যাণী যেতে গিয়ে, পশ্চিমের রাস্তায় খানিকটা গেলেই, ডান দিকে চোখে পড়ে সেই বিশাল বিখ্যাত মন্দির। বিখ্যাত বলছি বটে, হয় তো অনেকে জানে না, চোখেও দেখেনি। গ্রামের লোকেরা বলে কেষ্টরায়ের মন্দির। এ হলো ভাব ভালবাসার সম্বোধন, 'কেষ্টরায়'। আসলে কৃষ্ণরায়। মন্দিরটি আটচাল, উঠোনটা আগাছায় ভরতি। মন্দিরের সংস্কার বলতে কিছু চোখে পড়ে নি। শ্যাওলা ধরা গোটা দেহে, কোথাও কোথাও পলেস্তারাও খসেছে। বিগ্রহের নামেই মন্দিরের নাম। এতো উঁচু মন্দির আর কোথাও দেখেছি, সহজে মনে করতে পারি না। ভিতের বেদীটিও তেমনি উঁচু। মন্দিরের সন তারিখ মনে করতে পারি না। সিংহদরজা, নহবতখানা, চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

আমাকে সেই রাস্তাটি টেনে নিয়ে গিয়েছিল কাঁচরাপাড়ার গ্রামের আরও ভিতরে, যেখানে দেখেছিলাম কবি ঈশ্বর গুপ্তের একটি ছোটখাটো স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি সেই গ্রামের লোক ছিলেন। কবি তো বটেই, তাঁর সংবাদ প্রভাকরের খ্যাতি বোধহয় আরও বেশি ছিল। কবির আকর্ষণই বেশি ছিল, কৃষ্ণরায়ের মন্দিরটা ফাউ হিসাবে দর্শন হয়ে গিয়েছিল। আসলে ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলাম। নিরালা নিঝুম গ্রাম। এখন কেমন চেহারা দাঁড়িয়েছে জানি না। সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের নাম জানার কথা না। মাঠে ঘাটে কাজ করে, এমন কারোকে জিজ্ঞেস করেও কবির জন্মভিটে খুঁজে পাইনি। অবশেষে ধুতিপরা গায়ে গেঞ্জি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি একটা ঝোপঝাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওখানে একটা মন্দির মতন আছে, দেখুন। আর কিছু আছে বলে তো জানিনে।'

হয়তো ছুটি-ছাটার দিনে গেলে গ্রামের উৎসাহী তরুণদের দেখা পেতাম। তারাই সব দেখিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আমার হাতছানির রকম সকম আলাদা। কখন কোথায় ডাক পড়ে, নিজেও জানতে পারি না। অমনি ঘরের আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। সংসারে এমন অকাজের লোক সহজে জোটে না। আজ যেমন ত্রিবেণীর ডাকে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ চরের হাতছানি নিশি পাওয়ার মতন নামিয়ে নিয়ে এলো বাস থেকে। কিসের ডাকে ঘুরি ফিরি, কেন, কিংবা কার খোঁজে, নিজেও সব সময়ে জানতে পারি না। যদিও নারী নই, তবু ছেলেবেলায় শোনা সেই গানটার মতন মনে হয়, 'আমি নারী

শুয়ে কত পারি লইতে / আর বাঁশী বাজাইস না কালা রাতে / শুনিয়া বাঁশীর স্থান মন করে আনচান / গৃহকার্য রয় না আমার স্মৃতিতে।'...

সে তো না হয় রাধা নামের সাধা বাঁশীর ডাক। অভিসারের হাতছানি। কিন্তু আমার সময় নেই, অসময় নেই, বুকের ভিতরেই যেন কে বাঁশী বাজিয়ে ওঠে। তখন রইলো তোমার চার দেওয়াল। সে তো আমাকে বেঁধে নিয়ে যায় না, পাখির মতন ডানায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, সীমাহীন আকাশের নীচে কোথায় কী মহোৎসব চলেছে, সেখান থেকে কে আমাকে ডাক দিচ্ছে। আমি তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। অথচ সেই ছেলাবেলা থেকে এতো ঘুরেও ওকে খুঁজে পেলাম না।

দেখেছিলাম, বনশিউলির ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ডালে ডালে পাতায় পাতায় শুঁয়ো পোকার ভিড়। বড় ভয়! সাহেবদের সমাধির মতন চৌকো ভিত্তি বেদী থেকে সূচালো গম্বুজ উঠেছে। গম্বুজ বললেও অন্য একটা ছবি ভেসে ওঠে। অনেকটা গীর্জার মাথার মতন। ভিত্তি বেদীর গায়ে, শ্বেতপাথরে কিছু লেখা ছিল, এখন আর মনে করতে পারছি না। লোকের কাছে বলতে লজ্জা করে। সরস্বতী ঠাকরুণ আমাকে নিয়ে খেলা করিয়ে বেড়ালেন, কাজে লাগালেন না। তবে এইটুকু স্মরণ করতে পারি, দৈনিক কাগজের পাতায় লিখেছিলাম, ছাপাও হয়েছিল। আজ আর কে তা মনে করে রেখেছে।

কিন্তু একটি কথা মনে এসেছিল। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতাটি ছাপিয়েছিলেন তাঁর কাগজে। নৈহাটি আর কাঁচরাপাড়া বেশি দূরেও না। তবে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎটা বোধহয় কলকাতাতেই হয়েছিল।

চরে দাঁড়িয়ে মূলের কূলের ভাবনা। এখন আমার এসব আর চিন্তার দরকার কী? অল্প বয়সী গাঁট্টাগোঁট্টা, কুতুর সঙ্গীকে বললাম, 'না, আমি কল্যাণী কাঁচরাপাড়া কোথাও থাকি না। তবে ওসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করা আছে। কিন্তু তোমাদের ঘর যেখানে দেখাচ্ছ, সেখানে গঙ্গার ধারে তো বিরাট ইটের ভাটা।'

'শোনছস নি রে বটা, বাবুর সব নখদপ্পনে।' কুতু জাল বোনা থামিয়ে হেসে বললো, তাকালো আমার দিকে, 'ঠিক কইছেন বাবু। তয় বাবু, ইটের ভাটি হইল উত্তরে। দক্ষিণে যে সোঁতভাসি খাড়ি আছে, আমাদের ঘর তার এই পারে। ওই যে ছাখেন আশ্রম, তার কাছাকাছি। ওই যে, ওই ছাখেন আমাদের পাড়া।'

হালিশহরের সবটাই ঘোরা আছে, আশ্রমের মন্দিরের চূড়াটাও দূর থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু কুতুদের পাড়াটা আমার পক্ষে চোখে দেখে ঠাহর করা মুশকিল। তবে জায়গার অবস্থানটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, এবার বটা নামে বটের শুঁড়ির মতোই গাঁট্টাগোঁট্টা যুবক হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবু কী করেন?'

তা হলেই তো মুশকিল! কী করি? বলতে পারি, তোমাদেরই আশেপাশে ঘুরিফিরি। কেন? না, খুঁজে ফিরি। কী খুঁজে ফেরেন? ওখানেই ঠেক। কারণ, এই জবাবটাই জানা নেই। বললাম, 'কিছুই করি না।'

আমার জবাব শুনে কুতু আর বটা নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসল। দেখলেই বোঝা যায়, ওদের হাসিতে যেমন কৌতুক তেমনি অবিশ্বাস। কুতু বললো, 'আরে বটা, সব কথা কি সব সময়ে কওয়া যায়? কাজের মানুষ দেখলে চিনা যায়।'

আমাকে দেখে তা হলে কাজের মানুষ বলে চেনা যায়? কুতু এমন নজর কোথায় পেলো? হেসে বললাম, 'কাজের মানুষ হলে কি এ সময়ে চরে বেড়াতে আসি?

'সেই কথা কি বাবু কওন যায়?' কুতু বললো, 'কে যে কোন কাজে কোনখানে ঘুরে বেড়াইতেছে, কে কইতে পারে। সংসারে এমুন মানুষ তো দেখি না, কিছু করে না।'

মনে মনে ভাবলাম, বেকাররা তা হলে কী করে? কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা খুব বিবেচনার কাজ হবে না। কারণ তারাও কাজের কাজ কিছু না করুক, কিছু যে করে, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাই। আসলে কুতু তো সংসারের আসল কথায় কিছু ভুল করে নি। কিছু না করার মতন নিপাট মানুষ কেউ নেই। বোধহয় শিশু বা পাগলও নেই।

'বাবুরে একটা কথা জিগাই।' বটা যেন তার কালো কুচকুচে চোখের তারায় কেমন একটু রহস্যের ঝিলিক এনে, হেসে বললো, 'আপনে কি পট কমিশনে চাকরি করেন?'

পট কমিশন? সেটি আবার কোন সংস্থা? মনে মনে বার কয়েক কথাটা আউড়ে, অন্ধকার মস্তিষ্কে বিজলি হানা আলোর ঝিলিক দিল। পট কমিশন কি পোর্ট কমিশনার্সের কথা সে জিজ্ঞেস করছে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কোন অফিসের কথা বলছো?'

'হ বাবু, কইলকাতায় বন্দরের আপিস আছে না? পট কমিশন যার নাম?

তাঁর কথাই কই।' বটার চোখের রহস্যের ঝিলিকে এখন ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

হঠাৎ পোর্ট কমিশনার্সে চাকরির কথা কেন বটার মনে এলো? গঙ্গার দু পাশে এতো কলকারখানা। সেসব ছেড়ে একেবারে 'কইলকাতায় বন্দরের আপিস'-এর কথা কেন? তার মুখ থেকেই এই অপার রহস্যের সন্ধান নেবার জন্ত জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, সেই অফিসের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

বটা আর কুতু আবার নিজেদের দিকে চোখাচোখি করলো। কুতু যেন একটু বেশি মাত্রায় বিনীত হেসে বললো, 'কথাটা হইল বাবু, শুনছি এই চরের মালিক নাকি পট কমিশন। হ্যাটকোট পরা এক বাবু দুই একবার এই চরে ঘুইরা গেছে। চরের নাকি মাপ জোক হবে, খাজনা বসাইবে। তাই ভাবলাম, আপনে বুঝি সেই আপিস থেকেই আসছেন।'

যে-যার চিন্তায়। দোষ দেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে, আমার থেকে, এরাই খোঁজ খবর বেশি রাখে। সংসারের কাজে লাগে, এমন চিন্তা তো সহজে মনে আসে না। গঙ্গার বুকে জেগে ওঠা, প্রকৃতির আপন হাতের দানও যে অন্যের মালিকানা আর খবরদারিতে থাকতে পারে, মনে আসেনি। সংসারের এক কূল থেকে আর এক কূলে ঘুরে বেড়ালেও, বাস্তবকে এড়িয়ে কবে জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। জীবন তো দুই কূলের টানাটানিতে চলেছে। হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি তো হ্যাট কোট পরে আসিনি।'

'তবু আপনের বাবুদের কথা আলাদা।' বটা বললো।

তা অবিশ্যি ঠিক। বাবুরা বড় সহজ প্রাণী নন। হ্যাট কোটই চাপান, আর ধুতি পাঞ্জাবিই পরুন, জাতে গোত্রে এক। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা টুপি মাথায় বাবু আর কী বলেছেন শুনি?'

বটা আর কুতু পরস্পরের দিকে এবার অবাক চোখে তাকালো। বটা বললো, 'সেই বাবুর মাথায় তো টুপি ছিল না বাবু!'

কী ব্যাজের কথা! হ্যাট কোট বললেই কি হ্যাট বুঝতে হবে নাকি? ওটা হলো একটা কথার কথা, হ্যাট কোট পরা। হ্যাট বললেই যদি টুপি বুঝতে হয়, তবে তো বাবু আপনি খুবই বুঝেছেন। ধরে নিন পট কমিশনের সেই বাবু আপনাদের কথায় স্যুট বুট পরে এসেছিলেন। এক কথায় সাহেব সেজে। আমি ভুল শুধরে নিয়ে বললাম, 'ও! তা বাবু আর কী বলেছেন?'

'আর কিছু না।' কুতু বললো, 'শোনলাম, চর জরিপ হবে, খাজনা বসবে। তখনই আবাদ বিলি-বাটা হবে।'

কুতু আর বটার চিন্তা অনেক গভীরে। পট কমিশন, হ্যাটকোট পরা বাবু,

চরের জমি জরিপ, বিলিবাটা, খাজনা, তাদের মাথায় সেই চিন্তা। আমাকে দেখে তাদের ধন্দ আর সন্দটা সেখানেই লেগেছে। অন্য কথা জিজ্ঞেস করবার আগে আমি তাদের ধন্দ ঘোচাবার জন্য বললাম, 'না, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি কোনো আপিস টাপিসে চাকরি করি না। এমনি মন করলো, তাই চরে একবার বেড়াতে এলাম। তা, এখন তোমাদের বিলিবাটা কী রকম?'

'এখন তো বাবু বিলিবাটার নামে কিছু নাই।' বটা জবাব দিল, 'আমরা এই ত্যাশে যখন আসছি, তখন থেক্যেই দেখি, ওই মাউড়ারাই চর দখল কইরা রইছে।'

আবার সেই মাউড়া। আমারই বা আবার ন্যাকা হতে দোষ কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'মাউড়া মানে?'

'মাউড়া মানে মাউড়া, আপনেরা যারে ম্যাড়ো কন।' বটা তার বত্রিশ পাটি শাদা দাঁত দেখিয়ে বললো।

আমি হেসেই বললাম, 'কেন, ওদের তো হিন্দুস্থানীও বলা যায়।'

'হ, এইটা ঠিক কইছেন বাবু।' কুতু বললো, 'হিন্দুস্থানীও কওয়া যায়।'

আমি আবার বললাম, 'তোমরাও তো হিন্দুস্থানী। না কি, পাকিস্তানী?'

কুতু আর বটা দুজনেই পরিহাস ভেবে হাস্য করলো। বটা বললো, 'কথাটা বাবু ঠিক কইছেন। আপনেগো এই ত্যাশের লোকেরা আমাগো পাকিস্থানি কয়।'

হ্যাঁ, এখনো এ পাপটা সমাজের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। এই পঞ্চাশ দশক থেকে ষাটের বা সত্তরের দশকে কী দাঁড়াবে জানি না। বললাম, 'ও কথা বোকারা কয়। আসলে তো তোমরা পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে এসেছো। তোমরাও হিন্দুস্থানী।'

'এইটা আবার কী কন বাবু?' কুতুর মুখে পরিহাসেরই হাসি, বললো, 'পাকিস্তান ছাইড়া হিন্দুস্থানে আসছি, কিন্তু আমরা তো বাঙালী।'

কুতু আমাকে ধরতাইটা নিজেই ধরিয়ে দিল। হেসে বললাম, 'তোমরা যদি বাঙালী হতে পারো, তবে চরের ওই লোকগুলোকে বিহারী বলবে না কেন?'

কুতু আর বটা দুজনেরই হাসি মুখে এবার অপ্রস্তুত ভাব দেখা দিল। আমি সময় না দিয়ে আবার বললাম, 'ঘটিরা যখন তোমাদের বাঙাল বলে, তোমাদের কি শুনতে ভালো লাগে?'

'তা তো লাগে না বাবু।' কুতু জবাব দিল।

বটা বলে উঠলো, 'আমার তো হালার রগে রক্ত উইঠ্যা যায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলেই ভেবে দেখ, তোমরা যদি ওদের মাউড়া বল, আর এদেশী বাঙালীরা যদি মেড়ো খোট্টা বলে, তাহলে ওদেরও রগে রক্ত উঠে যেতে পারে।'

জোঁকের মুখে নুন, এমন বলবো না, কিন্তু বঙ্গালের সন্তান দুটিই হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পেলো না। বটার 'রগে রক্ত ওঠা' কথাটা আমার নতুন লেগেছে। মাথার বদলে রগ। কিন্তু এ বিষয়টা নিয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় উচিত না। কুতু বটারা যদি মন থেকে মেনে নিতে পারে, আমি এতেই সার্থক মনে করবো। আর বেশি জ্ঞানবাবুর ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা গোড়া থেকেই যদি দেখে থাকো, বিহারীরা এই চরের দখল নিয়েছে, তবে তোমরা এখানে কী কর?'

'আমরা বাবু দ্যাশে থাকতে মাছ ধরতাম, গঙ্গায়ও মাছ ধরি।' কুতু বললো, 'তারপরে কিছু লোক আমাগো সলা পরামর্শ দিল, এই চরে আমরাই বা দখল নিমু না ক্যান। ভাবলাম, হ কথাটা অন্যায্য তো কিছু কয় নাই। আমরা দ্যাশের ঘর দরজা সব ছাইড়া আসছি, আর এই চরে মাউড়ারা।' কথাটা শেষ না করে কুতু অস্বস্তিতে হেসে উঠলো, 'ওই হিন্দুস্থানীগো কথা কই, অরা ক্যান চর দখল কইরা থাকব? আমরাও আইসা ভাগ চাইলাম।'

কাজটা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, সেই বিচার আমার কর্ম না। দখল দাখিল শব্দগুলোর মধ্যেই যেন জীবনের একটা অন্যদিকের অন্য জাতের চিত্র চরিত্র বর্তমান। অথচ আর কূটকচালি বলে, সব ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলে, সারা পৃথিবীর সিংহাসনে আজ যারা রং-বেরংয়ের রাজ্য চালাচ্ছে, তারা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। গঙ্গার বুকে এই এক ফালি চড়া তো সামান্য কথা। পৃথিবীর যাবৎ চর নিয়ে কতো যুদ্ধবিগ্রহ, খুনোখুনি আর কূটকচালি চলছে। এই গ্রহের মহাদেশগুলোও তো এক রকমের চর। সেখানেও দখল নিয়ে, এ ওকে কতোরকমের সলা পরামর্শ দিচ্ছে, তার বয়ানের যতো চাতুরি, সব সংবাদপত্রের পাতায়। অতএব এ চর নিয়ে সবাই নির্বিকার সদানন্দ হয়ে থাকবে, তা কেমন করে হয়।

মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। এই নিরিবিলি চরটা ভেবেছিলাম, ভাঁটায় উজানে ভাসে, জোয়ারে সমুদ্রগামী হয়। আপনাতে আপনি, নদীর মাঝখানে সুখে আছে। এখন দেখছি, দখলের লড়াইয়ে সে নিরিবিলির সুখে নেই।

আমি সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তা ভাগ পেয়ে গেলে ?'

'সহজে কি আর ভাগ পাওয়া যায় বাবু ?' বটা বললো, 'জোর কইরা আদায় করতে হয় ।'

কুতু বললো, 'সে বাবু অনেক ব্যাপার। লাঠিসোটা লইয়া মারামারি হওনের যোগাড়। হিন্দুস্থানীরা দিব না, আমরাও ছাড়ুম না। তারপরে এই পার ওই পারের হিন্দুস্থানী বাঙালীরা এই চরে বইসা ঠিক করল, আপোসে মামলা মিটাইল। আমাগো চার ঘর জাইলাগো এই জমিটা দিছে।' বলে সে লম্বা কোদালে কোপানো ফালা ফালা জমিটা হাত তুলে দেখিয়ে দিল। আবার বললো, 'তবু তো কিছুটা পাইছি।'

দখলের লড়াইটা ধর্মের কী না, বুঝতে পারছি না। চার ঘর বাস্তুহারার পক্ষে এই এক ফালি এমন কিছু না। সিংহভাগটা এখনও ভরতদেরই হাতে। তবে কুতুরা বাঙালী আর বাস্তুহারা বলেই তাদের দাবী গ্রাহ্য হবে কী না, সেই জিজ্ঞাসার জবাবটা ভরতরাই দিতে পারে। জীবনধারণের উপায় থাকলে, ওরাও কি এই চরের বুকে এসে বসতো ? দেশ ভাগাভাগির জন্য না হতে পারে, ওরাও হয় তো বাস্তুহারা। কুরু-পাণ্ডবের লড়াই এটা না। তবু মানতে হবে, ভরতরাই বোধহয় প্রথম চরে এসে উঠেছিল। তাদের দাবীটাই আগে মানতে হয়।

'তিরবেণীর চরেও বাবু আমরা কিছু দখল লইছি।' বটা বললো।

কুতু শুধরে দিয়ে বললো, 'আমরা না আমাগো স্থাশের লোকেরা নিছে।'

দখল হোক, আর জবরদস্তি হোক, মিথ্যা কথার বালাই নেই। সহজ স্বীকারোক্তি। দূর থেকে নদীর বুকে ভাসমান সবুজ রেখা দেখে হাতছানি পাই, অথচ তার বুকের খবর আলাদা। আমি যখন মন নিয়েই ঘুরে বেড়াই, মেদিনীর মূল প্রাণের অধিক। সেই জন্যই আদি থেকে শুনতে হয়, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা জমিটা এমন কোদাল কুপিয়ে ফেলে রেখেছো কেন ? চাষ করবে না কিছু ?'

'আর কইয়েন না বাবু।' কুতু হতাশায় হেসে বললো, 'বোঝেন তো, এই চর অখনো ধান চাষের মতন হয় নাই। বর্ষাকালে জলে অখনো অনেকখানি ডুইবা যায়। সোঁতের টানেই সব ভাসাইয়া লইয়া যাইব। রবি চাষের মাডঘোত আমরা কম বুঝি। গরমের সময় ভুট্টা কিছু করছিলাম, ত সত্য কথা বাবু, আগে হিন্দুস্থানীদের মতন পারি নাই। এইবারেও নানান ঝামেলায়

দেরি হইয়া গেছে। মুহুরির বীজ দিছি, সামনে গেলে ছাখবেন এ্যাতটু এ্যাতটু চারা গজাইছে। কপাল মন্দ, বোঝলেন না? অগো ছোলার চারা ছাখেন, খুটি দেখা দিচ্ছে।'

কুতুর মুখে হতাশা, গলায় স্বরে আক্ষেপ। বটা বললো, 'একটু বিষ্টি হইলে ভাল, তার তো কোন লক্ষণ দেখি না।'

একটা জায়গায় বোধহয় সবাই সমান। রাজ্য জুড়ে ভূমি পেলেই হয় না, তার দান চাই। কুতু বললো, 'তয় হ, একটা কথা কি বাবু আমরা মাছ ধরি। ওই যে ছাখেন, বান্ধাছান্দি জাল ফালাইছি। জাল টান দিয়া এই চরেই তুলি।'

পুব দিকে নদীর বুকে তাকিয়ে দেখি, পুবে পশ্চিমে, সারি সারি খান কয়েক মাঝারি মাপের লোহার ড্রাম ভাসছে। দু জায়গায় দুটো বাঁশের ডগা দক্ষিণ মুখ করে এমনভাবে ভেসে আছে আর কাঁপছে, যেন দুটো সাপেব ফণা মাথা তুলে রয়েছে।

'তুমি আর কইয়ো না কুতুদা।' বটা বলে উঠলো, 'উজানের টান শেষ হইয়া আসল, তারপরে জাল বান্ধলা। এই উজানে কি আর জাল গুটাইতে পারবা?'

কুতু হাতের আধবোনা ঝাঁকি জালে একটা ঝাঁকুনি দিল। মুখে তার অপ্রস্তুতের হাসি। বললো, 'ইচ্ছা কইরা কি আর দেরি করছিরে বটা? দেখলি তো, পরতাপবাবু ঘরের রোয়াক ছাইড়া লামতে চায় না।'

কথা কোন দিকে বইছে, ঠিক ধরতে পারলাম না। আমার ধববার কথাও না, অতএব কিছু জিজ্ঞাসা করা চলে না। কিন্তু আমার চোখ যেহেতু কুতুর দিকে ছিল, সে কেমন অস্বস্তি হাসলো, নিজের থেকেই বললো, 'পরতাপ সা, বোঝলেন নি বাবু কাঁচরাপাড়া নৈহাটিতে ব্যবসা করে। মাছের জন্য আমাগো আগাম টাকা দেয়। মহাজন যারে কয় আর কি। উজানের গোন যায়গা, এই কথাটা সে না বুঝলে, তারে তো আর খ্যাদাইয়া দিতে পারি না। শত হইলেও খাতক তো।'

মাউড়া বলুক, সলাপরামর্শে চরের জমির দখলই নিক, তবু খাতক তো! এরপরে আর ভেঙে বলতে হয় না, আগামের আর এক নাম দাদন। চরের এই জমিটুকুর চার ঘরের সম্বলে কিছুই না। নির্ভর এই গঙ্গার ওপর। আগাম পেটে চলে যায়, মহাজন রোয়াক ছেড়ে নামতে চায় না। কুতুর মুখের হাসিটুকু গরমভাজার জলের ফোঁটার মতন শুষে নিয়েছে।

জমি দখলের লড়াইয়ের কথা শুনে মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। এখন এই

শুকনো মুখ, অসহায় চোখ খাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখে বাক্যি সরছে না। জলে এখনও উজানের টান। চর ভাসে বিপরীতে। মূলে আর অকূলে এবার নিরিবিলি সুখের চর তুমিই বলো কোথাই যাই?

'কুতুদা, এই গোনে জাল টানা হইবু না, বাড়ি চল।' বটা বললো।

কুতু বললো, 'হ চল। বেলাও হইল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আবার কখন আসবে?'

'তা বাবু, রাত্রে একেবারে খাইয়া লইয়া আমুম।' কুতু বললো, 'আইজ-খ্যাষ রাত্রের আগে আর জাল টানা হইব না।' সে কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত জাল গুটিয়ে নিতে লাগলো।

আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'তা, ওদের সঙ্গে এখন আর ঝগড়াঝাটি নেই তো?'

দুজনেই কেউ প্রথমে আমার কথাটা ধরতে পারেনি। কুতু জিজ্ঞেস করলো, 'কাদের কথা কন বাবু?'

আমি মুখ ফিরিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখালাম। বটা হেসে জবাব দিল, 'না বাবু, ঝগড়াঝাটি নাই, তবে বোঝেন তো ভাগ লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঠ্যাঁই ঠ্যাঁই হয়। কথাবাত্তা আছে, তবে মনে সুখ নাই। আমাগো না, অগোও না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের মনে সুখ নেই কেন?'

'ভগমানে যদি ডুবায়, তাইলে এই চরের গতর আরও বাড়ব।' বটা বললো, 'আমরা আর খানিক জমি চাই।'

কুতু বলে উঠলো, 'আমার বাবু মত নাই। লোকেরা আমাগো সলাপরামর্শ দিতেছে, আমার মন লয় না। অগোও তো বাবু অনেক গুলাইন প্যাট, খ্যাট কই? জোর কবরদস্তি করলেই তো হইল না।'

ভাবি, সলাপরামর্শ দেবার লোকগুলো কারা? তারা করে কি, সংসারকে দেখেই বা কোন নজরে? অবিশ্যি জানি, ভেবে লাভ নেই। সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, পরোপকার তাদের পেশা। তুমি কি ভাবো, তুমি কি চাও, সেটা কোনো কথার কথা না। আমরা তোমাদের উপকার করবো, সেবা করবো। লড়াই করবো, তোমাদের জীবনের দায় দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এই আমাদের কাজ, সংসারকে এই চোখে আমরা দেখি। তোমরা কুতু বটারা কেউ না, আমরা তোমাদের মা বাপ। আমরা যা বলবো, তোমরা তাই করবে। তা না হলেই অশান্তি। ভেবে ত্যাদের চিনতে হয় না, সমাজের বুকে তারা লাঠি ঘুরিয়ে বেড়ায়। সবাইকেই ত্যাদের চিনতে হয়। পরোপকার

যে তাদের পেশা অর্থাৎ নিজেদের ভরণপোষণ। তোমাদের জন্ত লড়ি, তোমাদের স্বার্থের জন্ত সলাপরামর্শ দিই, অতএব তোমাদের শ্রমে আর ধনে আমাদের দাবি। আমাদের সঙ্গে থাকো ভালো। না হলে শত্রু।

কিন্তু খেটে খাওয়া কুতু অন্ত মনের মানুষ। সে নিজের 'প্যাট খ্যাট' বোঝে, পরেরটাও বোঝে। তাই সে জোর জবরদস্তি চায় না। বটার চিন্তা একটু অন্তরকম। তার অনুমান চরের গতর আরও বাড়বে, তাই তার আরও খানিক জমি চাই। সে অন্তের প্যাট খ্যাটের কথা ভাবতে চায় না। কুতু দক্ষিণ দিকে মুখ তুলে দেখিয়ে বললো, 'অরা আমাগো ডরায়। ডরে ডরে থাকে, কী জানি আবার কোন দিন আমরা আরো বেশি দখল লমু।' বলে হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবুর ঘড়িতে কয়টা বাজে?'

আমি কবজি তুলে দেখে বললাম, 'দুটো বেজে গেছে।'

'এখন তা হইলে যাইতে হয়।' কুতুই বললো, 'এই উজানে গেলে তাড়াতাড়ি যাইতে পারুম। বাবুর লগে দেখা হইয়া ভাল লাগল। বেড়াইতে আসছেন, আর বোধহয় দেখা হইব না। কতক্ষণ থাকবেন?'

আমি বললাম, 'কতক্ষণ আর? যতক্ষণ ভালো লাগে, থাকবো, তারপরে চলে যাবো। আমারও তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো।'

কুতু আর বটা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কুতু দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'যাই বাবু।'

'হ্যাঁ, এসো।' আমিও কপালে হাত ঠেকালাম।

বটাও কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে, নীচের দিকে নেমে গেল। তার পিছনে পিছনে কুতু। কিন্তু নৌকায় আগে উঠলো কুতু। তারপরে নৌকার দড়ি খুঁটি থেকে খুলে, বটা উঠলো। উজানের টানে তাদের নৌকা উত্তর পুব কোণ দিয়ে ভেসে চললো তরতরিয়ে। বটা তার ওপরে বৈঠার চাড দিল। এ গতির সঙ্গে দৌড়েও পাল্লা দেওয়া যাবে না।

আমি পিছন ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য, সব হাওয়া। কেউ নেই। যোবতী আর প্রৌঢ়া বহুড়ি, সঙ্গের পুরুষটি আর আলু তুলছে না। কিশোরীটি আর তরুণ, অথবা হয়তো কিশোরই, আর সেই কঞ্চি হাতে নেংটিটা, কেউ নেই। নিশ্চয় এ বেলার মতন কাজ শেষ করে সবাই দক্ষিণের চালা ঘরে ফিরে গিয়েছে। উত্তরায়ণের বেলা বেশ কিছুটা পশ্চিমে ঢলেছে। কাজের লোকেরা কাজ শেষে নাওয়া খাওয়া সারতে গিয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই মনটা কেমন খচ করে উঠলো। যেন একটা সন্দেহের

কাটা ফুটে গেল। আমি কুতু আর বটার সঙ্গে কথা বলছিলাম বলে, ওরা আবার কিছু ভেবে বসে নি তো? মন গুণেই তো ধন। ভাবতে অসুবিধা কী, বাঙালী বাবু বাঙালীদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তা হলে আমি নাচার। ওদের চুপচাপ কাজের ব্যস্ততা দেখে কোনো কথা পাড়তেই অস্বস্তি হচ্ছিল।

কিন্তু এখন এই চরের বুকে দাঁড়িয়ে মনের এই খচখচানি ঝেড়ে ফেলাই ভালো। অনেক দিনের হাতছানিটা আজ দৈবে ঘটে গেল। পরের কি কথা, নিজের মনের অন্ধি-সন্ধি কজনে জানতে পারে? নিজেও জানতাম না, ত্রিবেণীর পথে যাত্রা করে, চর দেখতে দেখতে ছুটে চলে আসবো। তখন জানতামও না, কেমন করে আসবো, আর ভরত নামে মরদ বলতে গেলে আঘাটায় নৌকা নিয়ে বসে থাকবে। তবে নৌকাটা চোখে পড়ে, মনে কেমন একটা আশা জেগেছিল। তার আগে গড় করি নানীর গোড়ে, তাকে দেখেই কেমন একটা ভরসা হয়েছিল, নৌকা আসবে এই চরে।

দৈবে যখন চরে আসা ঘটেই গেল, তার ভুঁয়ে একটু শরীর ঠেকিয়ে বসি। বাবুর মন এখন একটু চা চা করছে। সে আশায় ছাই। এই চরে আমার জন্য কেউ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে নেই। আমি আরও উত্তরে পা বাড়ালাম। শেষ সীমাটুকু দেখি।

বেশি দূর যেতে হলো না। উত্তরের শেষ সীমানাটা, কুতুদের খালি ঘরটা থেকে হাত দশেক দূরেই শেষ। পাড়টা বেশ খাড়াই। জোয়ারের জল নেমে গেলে, চরের ভূমির আদল কেমন দেখাবে, কে জানে? রোদটা বেশ কড়াই লাগছে। দেখছি উত্তরের এই শেষ সীমায়, কয়েক হাত লম্বা আর, তার থেকে কিছু বেশি চওড়া জায়গায়, কুমড়ো ধুঁধুল জড়াজড়ি করে পাতায় লতায় ছড়িয়ে আছে। ধুঁধুল চোখে পড়লেও কুমড়ো একটাও দেখলাম না। তবে কুমড়ো ফুল আছে।

যার যেমন নজর। কুমড়ো ফুল দেখলেই ফুলের বড়া ভাজার কথা মনে পড়ে যায়। পড়ে গেলে, ঢোক গিলেই সাধ মেটাতে হয়। একেবারে শেষ সীমানায় উঁচু পাড়ের মাটি শক্ত, লম্বা লম্বা চাবড়া আর মুতো ঘাস জমেছে গোছা গোছা। জাতে এরা দূর্বা না, তার থেকে চওড়া আর লম্বা। কিন্তু রোদে না বসে, আমি কুতুদের ঘরের পিছনে, বেড়ার বাইরে ফুট খানেক উঁচু ভিতের মাটিতে বসলাম। কারণ এখানে ছায়া আছে। চোখের কালো ঠুলিটা খুলে আগে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একটি সিগারেট ধরালাম।

দেখছি, নদী কিছুটা পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। দূরের উত্তরের ত্রিবেণীর চড়ার অংশবিশেষ নজরে আসছে। কুতুদের নৌকাটা ডানলপ ফ্যাকটরির খেয়াঘাটের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুব পার ঘেঁষে চলেছে। আকারে এখন অনেক ছোট দেখাচ্ছে। খেয়াঘাট, শ্মশান, আশ্রম সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপরে লোকালয় একটু এগিয়ে এসেছে। বাঁকের মুখে যেমনটি হয়। আরও দূরে, পুবের ডাঙায়, ইট খোলাটা দেখলেই চেনা যায়। ইট পোড়াবার কলের চিমনিতে ধোঁয়া উড়ছে। ধোঁয়া উড়ছে বাঁশবেড়ের চটকলের উঁচু চিমনি থেকেই। ধোঁয়া উড়ে চলেছে দক্ষিণ পুব কোণে। হাওয়ার আগমন উত্তর পশ্চিম থেকে। সেই দিকেরই আড়াল থেকে এক একটা শাদা মেঘের টুকরো, মাঝে মাঝে উঠে আসছে। যেন দূরের আড়ালে, আকাশের কোথাও তারা জমায়েত হয়েছে। যখন যার সময় হচ্ছে, সে নিজের নানা রকমের আকার নিয়ে ভেসে আসছে। আসতে আসতে আবার আকার বদলাচ্ছে, আর যেন ঘুম ঘুম গড়িমসি চালে উড়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে? পুব-দক্ষিণের সাগর কূলে নাকি?

শরৎকালের মতন, এই শাদা মেঘে স্বপ্ন আছে। যদিও মাঘের আকাশের নীল আর শরতের নীলে তফাত আছে। আর সেই আকাশের মেঘের চালচলন সব সময় এমন গদাইলস্করি না, আকারেও এতো ছোট না। তবে ঠিকানাহীন অচেনা কাকে যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, মনে যদি ওড়বার ডানা দিয়েছিলে, তবে অমন শাদা মেঘের সওয়ার হবার মতন ডানায় জোর দিলে না কেন?

এতক্ষণে লক্ষ্য পড়লো, গঙ্গার এপারে ওপারে কাক যাতাযাত করছে। নিতান্ত প্যাট খ্যাট, নাকি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে যাতায়াত? সীমানা নিয়ে লড়াই নেই তো? উত্তরের পশ্চিম কূলে হংসেশ্বরীর মন্দিরের চূড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনেক গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। কাঁচরাপাড়ার কেষ্ট রায়ের মন্দিরের মতনই। হংসেশ্বরীর মতন মন্দির আমি পশ্চিমবঙ্গে আর দেখতে পাইনি। বলতে গেলে, গড়বেষ্টিত রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরেই সেই মন্দির।

হ্যাঁ, রাজবাড়ি। বিরাট সিংহ দরজার মাথার ওপরে, সিংহের অঙ্গের অনেকটাই কালে খেয়েছে। রাজবাড়িটা দেখলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। উঠোনের তারে ঝোলে ধুতি শাড়ি, রোয়াকের ওপর সামান্য জামা কাপড় গামছা। প্রাসাদটি দেখলে বোঝা যায়,

এক সময়ে নিশ্চয়ই তার রমরমা ছিল। পিছনে ইতিহাস অবিশ্যিই আছে। তবে সে-খোঁজে এখন আর কী দরকার। বাঙালীর কাছে নতুন কিছু না। অবাক কথা যেটা, সেটা হলো এই বংশের আদি পুরুষ রামেশ্বর রায়চৌধুরীকে বাদশা ঔরংজেব রাজা মহাশয় উপাধি দিয়েছিলেন। বাদশা যে বড় হিন্দু-বিদ্বেষী বলে জানি? তবে হিন্দুকে এত তোয়াজ কেন?

এ সব হলো কেতাবী কথা, কেতাবী জিজ্ঞাসা। তবে, আমি দেখেছি গড়ের পরিখায় ক্ষীণ জলের ধারা। বনশিউলি আর আশশ্যাওড়ার ঝাড়। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে, সড়সড়িয়ে গোসাপের ছুটোছুটি।

চারদিক চুপচাপ নিঝুম। হংসেশ্বরীর মন্দিরের চারপাশেও বিস্তর আগাছার ভিড়। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। শুঁয়ো পোকা যত্রতত্র। সাপের ভয়টা থেকে থেকেই গায়ে শিরশিরিয়ে উঠেছিল। তবু মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ছ'তলার ওপরে উঠেছিলাম। তলাগুলো নিশ্চয়ই তেমন উঁচু না। তবু মাথার ওপরে ছয়টি চূড়াসহ, মন্দিরের উচ্চতা সত্তর ফুট। এটি আমার কেতাবী জ্ঞান। নিজের হাতে মাপিনি, সম্ভবও ছিল না। যখন কেতাবী মানে আরও জেনেছি; ষটচক্র ভেদের পাঁচটি নাড়ি; ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রাক্ষ আর চিত্রাণীর প্রতীক মন্দিরের পাঁচটি সোপান। হংসেশ্বরী তার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী রূপে বিরাজ করছেন।

কেতাবের কথা থাক। বাড়ির উঠোনের সীমানায়, পুবে বাসুদেবের মন্দিরটি আমার নজর কেড়েছিল বেশি। বিবর্ণ আর ক্ষয়ের মুখে বটে, কিন্তু মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজের তুলনা নেই। বিষ্ণুপুরের মন্দির ছাড়া, আর কোথাও কোনো মন্দিরের সারা গায়ে এতো টেরাকোটা দেখিনি।

দেখিনি কি? একটু বোধহয় ভুল হলো। আরও কোথাও কোথাও দেখেছি। পুবপারে কালিশহরেই দেখেছি। এখান থেকে ঠিক চোখে পড়ছে না। গঙ্গার ধারেই যেখানে এখন বালির ঢিবি সেখানে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার অনেক কাজ দেখেছি। দেখেছি শিবের গলির মন্দিরও। সদর রাস্তার ওপরে, গঙ্গার ধারেও মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা কেবল কালের গ্রাসেই যায়নি। শুনেছি, মানুষের গ্রাসেও গিয়েছে। শিবের গলির মন্দিরের পোড়া ইটের কারুকার্যের খণ্ডগুলো একেবারে নিঃশেষ হতে পারেনি। বোধহয় গলির মধ্যে বলেই। তা ছাড়া, মন্দির সংলগ্ন গৃহের এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেছি, কড়া নজর রাখতে। মন্দিরটি সম্ভবত তাঁরই মালিকানা স্বত্বের মধ্যে। লোকজন কেউ এসেছে, টের পেলেই তিনি বেরিয়ে আসেন। থমথমো টমটমো

সবগুলো খেয়েছে। আগাছাগুলো মন্দিরের ইট খুলে নিয়ে যায়। তা কাঁহাতক আর চোখে চোখে রাখা যায়?'

বৃদ্ধা মহিলাকে বলতে শুনেছি। তাঁর ভাষা কর্কশ, চোখে সন্দেহ কিন্তু তার জন্ত তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। চোখে চোখে রেখেও যে তিনি হাড় হারামজাদাদের হাত থেকে মন্দিরের পোড়া ইটের পটগুলো বাঁচাতে পারছেন না। নানা ভাবে টেরাকোটার টুকরো খুলে নেবার চেষ্টা, অর্ধেক ভাঙা অর্ধেক উধাও মানুষের হাতের কীর্তির ছাপ স্পষ্ট। অথচ এমন না, যে মন্দিরটা লোকালয়ের বাইরে জঙ্গলে পড়ে আছে। পাড়ার মধ্যে। শিবলিঙ্গের নিত্য পুজা এখনও হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এক শ্রেণীর শিল্পরসিকদের টাকার লোভে, এক শ্রেণীর উঞ্ছেরা মন্দিরের শরীরকে বিকৃত করে। প্রাচীন শিল্প-সম্ভারকে ঘরজাত করতে না পারলে, সেইসব শিল্পরসিকদের শিল্পের ক্ষুধা মেটে না। ভেঙে পড়া অযত্নে পড়ে থাকা প্রাচীন নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করা এক কথা। আর ভেঙে চুরে চোরাইমাল ঘরজাত করা আর এক কথা।

কিন্তু আমার এ অলস আক্ষেপের কী দাম আছে? সবাই জানে, ভারতের প্রাচীন যে কোনো শিল্প নিদর্শন এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার ধন। বড় বড় বিগ্রহই চালান হয়ে যাচ্ছে। পোড়া ইটের ছোট ছোট শিল্প খণ্ড তো কিছুই না। একে বলে মূল্যবোধের পরিবর্তন। একদা যে মন্দিরকে মানুষ ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক দেবালয়ের চোখে দেখতো এখন তার গায়ের আবরণ খুলে নেবার জন্য, ছেনি হাতুড়ি সাবল খোঁচাতেও দ্বিধা নেই। কালই শুধু অগ্রাসী না, মানুষকেও সে তার সঙ্গী করে নিয়েছে। এটাও বোধহয় কালের ধর্ম কিন্তু কালের ধর্মে একদা কুমারহট্ট হালিশহর হয়ে যায় কেমন করে? যখন, / 'গঙ্গার পশ্চিমকূল / বারাণসী সমতুল' ছিল, সম্ভবত তখন সরস্বতী নদীর কূলে সপ্তগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এ সব হলো ইতিহাসের কেতাবী সংবাদ। তখন উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমান্তের পুব কূলের হালিশহর নাম কেউ জানতো না। জানি না, আদৌ চব্বিশ পরগণা নামটাই তখন ছিল কী না। কুমারহট্ট যে সেকালে শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতদের বিশেষ গৌরবস্থল ছিল, ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু সেই কুমারহট্ট নামটা গ্রাস করলো কালের কোন্ নির্দিষ্ট সময়টিতে? অনেক ঘোরাঘুরি করেও, কুমারহট্ট নামে কোনো গ্রামও খুঁজে পাইনি। একদা ঐতিহাসিক গ্রাম, নামে ধামে যার বেজায় রমরমা ছিল, অনেক সময় দেখা গিয়েছে, সেই গ্রাম বাঁশ ঝাড় আর ডোবায় ছড়াছড়ি এক জরাজীর্ণ কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে।

কুমারহট্টের সেই রকম কোনো চিহ্নও খুঁজে পাইনি। অতএব পূবের হালিশহরই সেই কুমারহট্ট, এখন ধরে নিতে হয়। শ্রীচৈতন্যের সময় কি কুমারহট্ট নাম ছিল? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বর্ণনায় তো দেখছি 'বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী / যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।'...তার মানে, হালিশহর নামও নতুন না। মুকুন্দরামও কুমারহট্ট বলেননি। তবে ভাবতে গিয়ে একটা দূরকালের ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি এখন গঙ্গার মাঝখানে চড়ায় বসে আছি, হয় তো এর ওপর দিয়েই কবিকঙ্কণের নৌকা দক্ষিণে ভেসেছিল। কেমন ছিল সেই নৌকা দেখতে? কতো মাঝি মাল্লা ছিল?

কল্পনায় একটা ছবি ভেসে ওঠে। যদিও সেই ছবিটার আসল বর্ণনাও রয়েছে কাব্যের মধ্যেই। আধুনিক মুকুন্দরামদের চোখে গঙ্গার ছবিটা আর তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এ নদীর নাম এখন সাহেবদের ভাষায় হুগলি নদী। দুই তীরে কলকারখানার ভিড়। বন্দর সরে গিয়েছে অনেক দক্ষিণে, কলকাতা শহরে। মুকুন্দরাম বন্দর দেখেছিলেন ত্রিবেণীতেই। সেই জন্যই বোধ হয় যাত্রীদের কোলাহলে তাঁর কান পাতা দায় হয়েছিল। হালের কথা বলতে গেলে, দুই তীরকে বোধহয় শিল্পনগরী বলতে হবে। কোলাহল কি আদৌ কিছু কমেছে?

তবে হালিশহর? যে একদা শহরতুল্য ছিল, এই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি তার ধ্বংসস্তূপের ছবি দেখলে সেই কথাই মনে হয়। বাদশাহী জরিপে, হাবেলী পরগণার মধ্যে হালিশহরের নামোল্লেখ আছে। হাবেলী পরগণার সীমানাও কম না। এখন বোধহয় তার সীমানা শহরদের দলিল দস্তাবেজ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েসানের মহাফেজখানায় পাওয়া যাবে। কাঁর আমলে হাবেলী পরগণা নামে একটি পরগণা তৈরি হয়েছিল? মুঘল আমলের কোনো স্থানীয় শাসনকর্তার আমলে কী?

মাঝ গঙ্গার চরের কূলে বসে মনে মনে ইতিহাসের পাতা উলটে লাভ কি। তবে বিদ্যাসাগরের যুগে 'কোন কুলীন ব্রাহ্মণ কতো ব্রাহ্মণী বিয়ে করেছিলেন, তার একটা গণনার হিসাবে দেখেছিলাম হালিশহরের নাম ছিল অনেক ওপরে। এই কেতাবী কথাটার সঙ্গে আর একটা পুরনো কিংবদন্তী মনে পড়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তীটি কি নদীয়ারাজের সময়ে কারোর মস্তিষ্ক প্রসূত? কিংবদন্তীটা ছিল খ্যাতি অখ্যাতি যাই বলো, 'গুপ্তিপাড়ার বাঁদর / হালিশহরের ত্যাঁদড়।'

ত্যাঁদড়র চেনা দায়, বাঁদর চেনা যায়। গুপ্তিপাড়ায় ঘুরতে গিয়ে অনেক

কিছু দেখেছি, বাঁদর চোখে পড়েছে বলে মনে করতে পারি না। হতে পারে, নদের রাজা কেষ্টচন্দ্রের সময়ে গুপ্তিপাড়ায় বাঁদরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। আর সম্ভবত গোপাল ভাঁড়ের পরামর্শেই তিনি বহু হাজার টাকা খরচ করে গুপ্তি-পাড়ার বাঁদর বাঁদরির বিয়ে দিয়েছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের নামটা মনে এলো এই কারণে, মহাশয় সেই গ্রামের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের শ্বশুরবাড়ি বলেই, গুপ্তিপাড়ার আর একটি কিংবদন্তী মনে পড়ে যাচ্ছে। 'নদের মেয়ের খোঁপো / গুপ্তিপাড়ার চোপা।' চোপা বলতে ঝগড়া বোঝায়। এটাই আমরা জানি। তার সঙ্গে কি রসিকতার কোনো সম্পর্ক আছে? থাকলে বলতে হয়, গোপাল ভঁড়ের রসিকতা হয়তো বউয়ের চোপা থেকেই পাওয়া।

উত্তরায়ণের বেলাটা কখন পশ্চিমে ঢালু বেয়ে তরতরিয়ে নেমে গিয়েছে, খেয়াল করিনি। জলের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, চড়া উজানে ছুটছে। জলের স্রোতের ঢল নেমে চলেছে দক্ষিণে। কখন জোয়ার শেষ হয়ে ভাঁটা পড়েছে লক্ষ্য করিনি। আর টের পাওয়া গেল, কলকল ছলছল শব্দে। জোয়ারের ভরায় নদী শব্দহীন থাকে। ভাঁটার টানে একটা নাচের ছন্দ আছে। কূলে কূলে ছলছলিয়ে সে জানান দিয়ে যায়। সে আসে নিঃশব্দে, ভরে গেলে একেবারে চুপচাপ। নামার সময়ে নদী যেন সমুদ্রের ডাকে কলকলিয়ে ওঠে।

বেশ কয়েকটি সিগারেটের মুণ্ডু চিবানো গিয়েছে। পশ্চিমের আকাশেব দিকে তাকিয়ে দেখি চোখে যায়, এমন একটি লাল থালা দূরের গাছপালার মাথায়। মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই হঠাৎ প্রায় পিছনেই গরগর চাপা গর্জন শোনা গেল। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি চালা ঘরের কোণেই শাদায় কালোয় মেশামেশি এক সারমেয়। চরের বুকে কুকুর? এতক্ষণের মধ্যে একবারও তো আওয়াজ দেয়নি?

আমি ফিরে তাকাতেই শুরু হয়ে গেল ঘেউ ঘেউ ধমক। যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রথমে চাপা গর্জন। তারপরেই হম্বি তম্বি। তাড়া দিয়ে এগিয়ে আসার লক্ষণ না দেখা গেলেও, ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার মনে হলো না। তাড়া করলে যাবো কোথায়? যাদের সাহায্য পেতে পারি, তারা তো এখন আমার আড়ালে, দক্ষিণের সীমানায়। কে জানতো চরে এমন একটি চৌকিদার আছে। আর পকেটেও এমন কোনো দ্রব্য নেই যা দিয়ে চৌকিদারকে ঘুষ দেওয়া যায়। সিগারেট বা পয়সার ঘুষে নিশ্চয়ই সে বাগ

মানবে না। খাদ্য বস্তুর কণামাত্র আমার পকেটে নেই।

বিপদ আর কাকে বলে। আমরা মাতাল দাঁতালের ভয়ের কথা বলি বটে। সময় বিশেষে সামান্য একটি পশুও অঘটন ঘটাতে পারে। বড়ো দূর জানি, পোষা জীব হলেও পশুকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এটাও জানি, ভয় পেলে, আরোই গোলমাল। অতএব আমি প্রথমে নিরীহ ভাবে আওয়াজ দিলাম, 'কী হয়েছে রে ?'

জবাবে ঘেউ ঘেউ গর্জন বাড়লো। অচেনাকে কেয়ার করবে, চরের তেমন চৌকিদার সে না। আমি জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করে ডাকলাম। উদ্দেশ্য শান্ত করা। অথবা বিশ্বাস উৎপাদন করা। কাজে লাগলো না। জানি না, বাবুরা যখন দল বেঁধে জরু বালবাচ্চা নিয়ে বনভোজন করতে আসে, তখন চৌকিদারটি কী ভূমিকা নেয়। অগত্যা আমাকে উঠে দাঁড়াতে হলো।

দাঁড়ানো মাত্রই চৌকিদার ঝটিতি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চরের আকাশ ঝালাপালা করে তুললো। জানি, হাতের কাছে মাটির ঢ্যালার অভাব নেই। সে রকম বুঝলে ওর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই হবে। কিন্তু চৌকিদার চিৎকার করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ এক আধবার পিছনে দেখে নিচ্ছে। আমি কয়েক পা পশ্চিমে যেতেই চৌকিদার দৌড়ে কয়েক পা পিছনে হটে হাঁক পাডতে আরম্ভ করলো আর আমি দেখলাম, কল্কি হাতে সেই নেংটিটা হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে অবিশ্যি এখন কল্কিটা নেই। ওর কাছ থেকে আরও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, মটরশুটি ক্ষেতের সেই কিশোরী। মাথায় এখন ওর ঘোমটা নেই। এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে এক পা এক পা করে দক্ষিণে চলতে লাগলো।

আমি ভরসা পেলাম দুটো কারণে, নেংটিটা আর কিশোরী এসে গিয়েছে। আর একটা লক্ষণীয়, আমি নড়াচড়া করলেই চৌকিদার পিছনে হটে। কিন্তু নেংটিটার সাহস কি বেড়ে গেল নাকি ? দেখছি, আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।, অনুমান করলাম, ওর পিছনে পিছনেই চৌকিদারের আগমন। তারপরে হঠাৎ ভিনদেশীকে দেখেই তৎপর হয়ে উঠেছে। আমি নেংটিটাকে আমার নিজের মতন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কিসকো কুকুর হ্যায় ?'

আবার কথা ? আমার জিজ্ঞাসা শুনেই নেংটিটা পিছন ফিরে কয়েক হাত দৌড়ে চলে গেল ? গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকালো। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে চৌকিদারও নেংটিটার কাছে ছুটে গিয়ে, সেখান থেকে

বাঁয়ের খাঁদ্য কাটিয়ে চৌকিদারি করতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপার দেখে আমার ভরসা বাড়লো। চোখ তুলে আরও একটু ঘুরে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখলাম। কিশোরী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তবে মুখ ফেরানো পশ্চিমে। ওর ঘোমটা খোলা মুখে এখন মাঘের শেষ বেলার রাঙা রোদ। রঙ তেমন গাঢ় না, এখন লাল শাড়ি আর মাজা মাজা মুখে হাতে গলায়, হাতের কাঁচের চুড়িতে, বেলা যাবার আগের রক্তাভ একটা চোখ ভরিয়ে দেবার মতন রূপ নিয়েছে। গঙ্গার মাঝখানে সবুজ চরের সঙ্গে কিশোরীটি যেন মিলেমিশে প্রকৃতিকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। কী দেখছে ও তন্ময় হয়ে?

কিন্তু আমার হাতে আর সময় নেই। ভরত পাটনীর খোঁজ করতে হয়। দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা নামবে এবং অন্ধকারও। এতক্ষণে জলের তৃষ্ণাও বোধ করছি। দক্ষিণের সীমানায় ঝাড়ি ঝোপড়ি চালাঘর যাই বলা যাক, একবার সেখানে যেতেই হবে। হয় তো কলের জল এক পাত্র পাবো। তারপরে মূলের কূলে। আমি পা বাড়ালাম। কিশোরীটির যেন তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো। ও আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। আর নেংটিটাও এবার দৌড় দিল না, কিন্তু পিছন ফিরে ছোট ছোট পায়ের গতি বেশ দ্রুত। চৌকিদারও ওর পিছু পিছু চলেছে। তবে চিৎকারের হাঁক ডাকটা যেন একটু কম। এখন আর একটানা না, ক্ষণে চুপ, ক্ষণে হাঁক। দৃষ্টিতে অবিশ্যি তার অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

জলের দিকে তাকিয়ে দেখছি, টানে বেশ জোর। চর অনেকখানি জেগে উঠেছে। বালির ওপরে পলিমাটির কালো ছোপ, আস্তে আস্তে জলে গিয়ে নেমেছে। সীমানা খুব ছোট না। পশ্চিমের অংশটা দেখতে পাচ্ছি না। সেদিকে যতোটা খাড়াই দেখেছিলাম, এদিকে চর ততোটা খাড়াই না। ঢালু হয়ে, নীচের দিকে খানিকটা সমতলের মতোই জলে গিয়ে ডুব দিয়েছে। তবে সবখানে এক রকম না। কোথাও কোথাও বেশ খাড়াই।

চরের ধার দিয়ে পায়ে চলা সরু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মটর, অবশিষ্ট ফুল আর বাঁধা কপি, আলু, ছোলার সীমানা পেরিয়ে প্রায় চালা ঘরগুলোর কাছে। আমিই যেন কিশোরী, নেংটি আর চৌকিদারকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছি। ওরা চলেছে আমার আগে আগে। বাঁয়ে দূরের দক্ষিণপারে হাজিনগর মিলের কুঠি, চিমনি আর ধারে ধারে বিস্তর ঘর। আরও এগিয়ে সারি সারি কলকারখানা। পশ্চিমে ডানলপের কুঠির সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণের গোটা ধার জুড়ে গৃহস্থের ঘর আর ঘাট। ব্যাণ্ডেল গির্জার ক্রুশ, আরও কিছু দূরের

আকাশে ইমামবাড়ার দুই চূড়া দেখতে পাচ্ছি। রেল সেতুর পুরোটা চোখে পড়ছে না। নদী ওখানেও কিছুটা বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে।

নেংটিটা দৌড়ে কোথায় কোন ঘরের আড়ালে চলে গেল। কিশোরীটি দাঁড়ানো এমন জায়গায় দোতলার চালে ওর শরীরের অর্ধেক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বোধহয় সেখানে চালায় ঢোকার দরজা। চৌকিদারের চিৎকার নতুন করে শুরু হলো। ও বোধহয় আমার এতোটা এগিয়ে আসা পছন্দ করছে না। বলতে গেলে, ভুড়ুক ভুড়ুক টানে, সামনের চালার ডান দিকে দেখতে পেলাম, নানী একটা চটের ওপর বসে হুঁকো টানছে। তার বাঁ পাশে মাঝবয়সী বহুড়ি।

কিশোরীটিই বোধহয় কুকুরটিকে আওয়াজ দিয়ে তাড়া করলো। মাঝবয়সী বহুড়িটি কিছু বললো। নানী হুঁকা টানা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো। ভুরুতে চুল নেই। দুচোখ ভরা বিস্ময়, কপালে পলিচরের রেখা। বলে উঠলো, 'এ রউয়া, ইত্‌তি ভের তক তু কহাঁ রহলে? চৌবে পর?'

নানী ভাবতেই পারেনি, আমি এতক্ষণ চরে রয়েছি। হাত তুলে উত্তরে দেখিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ওদিকে বসেছিলাম।'

কুকুরটা চুপ করেছে। নানী আমার বাংলা বুলি বোধহয় ঠিক ধরতে পারলো না। সে তার বাঁ পাশে মাঝবয়সী বহুড়িকে জিজ্ঞেস করলো, 'কা কইলান?'

মাঝবয়সী বহুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, বুড়িকে বললো, 'রউয়া কইলান কি, উধার বাঙালীকো জমিন পর বৈঠ রহলে?'

অথচ মাঝবয়সী বহুড়িটি যখন আলু তুলছিল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবাই যায়নি, সে এমন হাসতেও পারে। বাংলা বুলিও যে সে বুঝতে পারে বোঝা গেল। আর 'রউয়া' শব্দটা এই প্রথম এদের মুখে শুনছি। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে কোনো কোনো অবাঙালীর মুখে কথাটা আগেও শুনেছি। মানে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সম্মানীয় ব্যক্তিকে ওই শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়। এখন 'বাবু' সম্বোধনের বদলে 'রউয়া, শুনছি। যদিও ধারণা নেই, বিহারের কোন্ জেলার লোকেরা শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু বুড়ি নানীর 'বাবা' সম্বোধনটাই আমার ভালো লেগেছিল।

মাঝবয়সী বহুড়ির জবাব শুনে নানী বলে উঠলো, 'হাম রাম! তু সলই হামে কইলান, বাবু বাঙালীকো নায়ে পর চল্ গেইলান।'

'হয় না কহলে'। মনে হলো চালার আড়ালে শরীরের অর্ধেক ঢাকা পড়া

কিশোরী আওয়াজ দিল, 'হম দেখলছি গো বাঙালী নায়ে' পর চল গয়লান, ইয়োকো না দেখলবা।'

কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি, এরা সকলেই ভেবেছে, আমি কুতু আর ঘটার সঙ্গে নৌকায় করে চলে গিয়েছি। নানীকে সবাই তাই বলেছে। একমাত্র কিশোরী ছাড়া। কারণ সে দুই বাঙালীকে নৌকায় করে চলে যেতে দেখেছে, আমাকে দেখতে পায়নি। এ কোন্ দেশী হিন্দি বাত হচ্ছে, তাও যথেষ্ট ধরতে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। সকলের কেন এমন ধারণা হলো, আমি বাঙালীদের সঙ্গে নৌকায় চলে গিয়েছি? বাঙালী বলেই কি? অথচ কিশোরীর নজরে পড়েছিল, দুই বাঙালীকে সে নৌকায় করে যেতে দেখেছে, আমাকে দেখেনি। দেখেনি যদি তবে কী ভেবেছিল? আমি চর থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছি। দোতালার চালে ঢাকা কিশোরীর অর্ধাঙ্গ লক্ষ্য করলাম। নিজেকে ওর এমন আড়াল করার কারণ কী? বিদেশী পুরুষের সামনে লজ্জা? না সহবত?

'এ হুরি, তু কাহে না কহলে কি বাবা চৌরে পর রহল?' নানী ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

হুরি! সে আবার কেমন নাম? কিশোরীর শরীর কিঞ্চিৎ চালাব বাইরে আত্মপ্রকাশ করলো, কিন্তু মুখ দেখা গেল না, বললো, 'হম কা কইলান? ইয়োকো হম না দেখল বা।'

মাঝবয়সী বহুড়ি আবার হেসে উঠলো। এখন তার কপালে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা। ঘোমটা কপাল অবধি ঢাকা। একটি সবুজ রঙের কালো পাড় শাড়ি তার গায়ে। বোধ হয় কাজের শেষে, স্নান করে বসন পরিবর্তন হয়েছে। দু হাতের কাঁসার বালা জোড়া ঝকঝক করছে। নিশ্চয়ই মাজা হয়েছে।

এবার মাঝবয়সী বহুড়ির পিছন থেকে আগমন ঘটলো সেই যৌবতী বহুড়ির। নীল কালোয় ডোরা, লাল পাড়ের শাড়ি তার অঙ্গে। কালো একটি জামাও তার গায়ে। জামা দেখেছি কিশোরী হুরির গায়েও। যৌবতী বহুড়ির কপালেও সিঁদুরের ফোঁটা, কিন্তু মেটে সিঁদুরের না, বাঙালী বধূদের মতন লাল সিঁদুর তার কপালে। মুখটি তেলতেলে দেখাচ্ছে। এ চরের চালার বধূ কি কোল্ডক্রীম মেখেছে? বোধহয় না। তেল মেখেই চামড়ার কোমলতা রক্ষার চেষ্টা। তার মুখেও দেখছি হাসি। তার আঁচল ধরে গা ঘেঁষে রয়েছে নেংটিটা। আর একটু পিছনে শাদা কালো পাহারাদার লাজ নাড়ছে।

যোবতী বহুড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হলো মাঝবয়সীর। তাদের সম্পর্কটা কী কে জানে। দু জনেই প্রায় বালিকার মতন খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসির অস্ফুট আওয়াজ যেন চালার অন্য পাশ থেকেও শোনা গেল। নিশ্চয় কিশোরী হুরির। হুরি! কী তার মানে? নিশ্চয়ই বাঙলা শব্দের হুড়ি না। হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু আমি তো দেখছি, নানা বয়সের রমণীদের হাসির পাত্র হয়ে উঠলাম। নানীও দেখছি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর হাসতে হাসতেই বললো, 'ই লোগন কা কওত, সমঝমে না আইলেবানি হো রউয়া। তু কহাঁ রহলে ইনত্তিভেরতক? কোই না দেখলেবারে?'

আমি এবার নানীকে বোঝাবার জন্য, উত্তরে হাত তুলে দেখিয়ে, আমার মতন হিন্দিতে বললাম, 'উধার বাঙালীকে ঘরকে পিছে।'

আমার কথা শেষ হলো না। কিশোরীসহ তিন রমণী তিন স্বরে হেসে উঠলো। নেংটিটাও দেখি, আমাব দিকে তাকিয়ে পোকায় খাওয়া দুধের দাঁত দেখিয়ে হাসছে। নানী বললো, 'হায় রাম! এ হুরি, ছোটা খটিয়া কাঁহে না নিকল লে আয়ি? বাবুকো বৈঠনে দে।'

এখন আবার বসা? পশ্চিমের লাল থালাটা গাছপালার আড়ালে ডুবুডুবু। সময় কোথায়? কিন্তু এই প্রথম আমার মনে একটা খটকা লাগলো। ভরত কোথায়? তার বা অন্য কোনো পুরুষেরই দর্শন শব্দ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভরত কহাঁ? উসকো নৌকামে হম আভি যানে মাংতা।'

এবার আবার দুই বহুড়ির হাসি। কাজের সময় যারা আমাকে দেখে একটি কথা বলে নি, বরং গম্ভীর মুখে নির্বিকার ছিল এখন তাদের মুখে এত হাসির ঝরঝরানিটি কেন? নানী ডান হাতের হুকা বাঁ হাতে নিয়ে বলল, 'হায় রাম, ভরত ওহার বাপ চাচা, ঘণ্টাভর আগেহি নাহে পর চল গেইলান।'

নায়ে পর চল গেইলান? সর্বনাশ! মুখ দিয়ে আমার বাঙলা বুলি বেরিয়ে পড়লো, 'কোথায়?

এবার মাঝবয়সী বহুড়ি কৌতুক হেসে জবাব দিল, 'উ লোগন শবজি উবজি লেয়ি শাগঞ্জ বাজার গেইলান।'

শবজি উবজি নিয়ে শাগঞ্জের বাজারে চলে গিয়েছে? চরে এসে জলে পড়লাম? হাতছানির এ কি রহস্য! এখন মূলের কূলে যাবো কী করে? সন্ধ্যা যে নেমে এলো? আমি একবার দেখলাম যোবতী বহুড়ির দিকে। তার মুখে

হাসি, চোখে কৌতুকের ছটা। তাকিয়েছিল আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে তাকালো মাঝবয়সীর দিকে। জবাব দিল নানী, 'উ কে বাতাইবে হো রউয়া? সবলোগ বাজার গেইলান, আপনা মাল বিকাইবে, অরেকে মাল খরিদবে। মরদলোগন কো কা কুচ্ছ ঠিক বা? সিনিমা উনিমা চল যা সকত।'

আমি অসহায় চোখে একবার উত্তরে তাকালাম, আবার দক্ষিণে। ভরতরা যে কেবল মাল বেচাকেনা করে ফিরে আসবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার 'সিনেমা উনিমা'-ও দেখতে যেতে পারে। এক ঘণ্টা আগেই তারা নৌকা নিয়ে চলে গিয়েছে। আর আমি তখন, চর, নদী, মূলের কূলের ভাবনায় বিভোর। ধরেই নিয়েছি, আমার তো ভরত আছে, মূলের কূলে যাবার ভাবনা নেই। আসলে, নিশির ডাকে চলে এসেছি, চরের জীবনযাপনের ধারাটা জানতাম না। জানলে কখনো এমন ফাঁদে পড়তে হতো না। ভরতই বা ভেবে নিল কেমন করে, আমি বাঙালীদের নৌকায় চলে গিয়েছি?

দোষটা বোধহয় ভরতদের কারো না। যতেক খোয়াড় করেছে, আমার কুতুদের চালাঘরের আড়ালে বসা। দেখতে পেলে নিশ্চয়ই তারা আমাকে ফেলে রেখে যেতো না। আমার এই অগাধ জলে পড়া দুশ্চিন্তার ফাঁকে হুরি একটি ছোটখাটো খাটিয়া এনে আমার সামনে রাখলো। ওকে দেখেই আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগলো, ও যদি আমাকে বাঙালীদের নৌকায় যেতে না দেখে থাকে, সে কথাটা ভরতকে বলবে তো?

খাটিয়াটা রাখবার ফাঁকেই আমি দেখলাম, মটর ক্ষেতের লাল শাড়ি আর এ লাল শাড়ি আলাদা। নীল রঙের একটি জামা ওর কিশোরী গায়ে। চোখে পড়লো, ওর কপালেও লাল সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতেও তাই। তার মানে, বয়স দশ বারো যাই হোক, ও বিবাহিতা। কে ওর বর, ভরত নাকি? আমি বাঙলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি দেখতে পাওনি, আমি ওর ঘরের পেছনে বসেছিলাম?'

হুরি আমার দিকে না তাকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে, ফিরে তাকালো। ওর মুখও তেলতেলে। মাথায় আবার একটা এবড়ো খেবড়ো খোঁপাও বেঁধেছে। খোঁপার বিনুনির বুনট বড় শিথিল। কাঁটাগুলো ভালো করে গোঁজা হয়নি। হয়তো কেশ সজ্জায় তেমন নিপুণ না। ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে, বয়সটা নির্ঘাৎ অনুমান করতে না পারলেও, দেখতে পাচ্ছি ও যেন চৈত্র ফাল্গুনের গঙ্গা। শরীরের কূলে কূলে আষাঢ় শাওনের অপেক্ষা, কিন্তু লক্ষণ এখনও অস্পষ্ট।

ও ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকালো, তারপরে দুই বহুড়ির দিকে। তাকাতেই ওর লাল রুক্ষকলি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। নিঃশব্দে কেবল মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে কয়েক পা সরে গেল। তারপরেই এক দৌড়ে, দক্ষিণের চালাগুলোর আড়ালে।

আমি হতাশ অসহায় চোখে আবার মাঝবয়সী বহুড়ির দিকে তাকালাম। সে তখন যৌবতী বহুড়ির দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। জানি না, ইশারায় কোনো কথা হচ্ছিল কী না। যৌবতী বহুড়ির শরীরে যেন আচমকা মাঝ গঙ্গার ঘূর্ণী লেগে গেল। খিলখিল হেসে পিছন ফিরে চলে গেল আড়ালে। সঙ্গে নেংটিটাও। ইতিমধ্যে কখন পাহারাদার সারমেয় আমার কাছে এসে গা শুঁকতে আরম্ভ করেছে।

নানী বললো, 'বৈঠ হো রউয়া।'

বসা আমার মাথায় উঠেছে। এদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে মনে বুঝতে পারছি, ভরতরা না ফিরে এলে, পুব পশ্চিম কোনো কূলেই আপাতত যাওয়া সম্ভব না। কুতু বটাবা আসবে রাত্রের খাওয়া সেরে। সে আগমন কখন ঘটবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় জানি না। সন্ধের পরে এক ঘুম দিয়েও আসতে পারে। কারণ এই ভাঁটা যাবে, তারপরে জোয়ার। জোয়ার শেষ হবে মাঝ রাত্রি ছাড়িয়ে। শেষ রাত্রে জাল টানা। এসব তাদের নিজেদের মুখের কথা।

বুঝতে পারছি, ছটফটিয়ে লাভ নেই। অতএব খাটিয়ায় বসে নানীকে বললাম, 'থোড়া পানি পিয়েগা।'

'হঁ হঁ, কাহে না পিবে বাবা।' নানী বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে মাঝবয়সীকে বললো, 'যা বেটি বাবাকে তানি পানি পিয়ে দে।'

মাঝবয়সী তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেল। মাঝবয়সী বলছি বটে, কেন না তার মুখে কিছুটা বয়সের ছাপ পড়েছে। কিন্তু গোটা শরীরে একটুও টোল টাল খায়নি। ছিপছিপে না, গড়নটাই তার চওড়া। মেদের চিহ্ন নেই। আমি আমার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বেটি তুমকো কৌন লাগতা?

নানী হুঁকা টানবার উদ্যোগ করছিল। মুখের কাছে হুঁকাটা তুলেও সরিয়ে নিয়ে হেসে বললো, 'বেটি না জানত কা বাবা? ও হমারি আপন বেটি ভইলি, ভরত কো মা। ভরত কো বাপুকো দেখল বা কি?

আমার হিন্দি জাবাবের অর্থ করলে দাঁড়ায়, "চরে যখন এলাম, তখন তোমার বেটি একজনের সঙ্গে আলু তুলছিল।'

'ই ই, ও হমারি দামাদ ভইল।' নানী বললো, 'ভরতকে বাপু। ওর ভরতকে জরু দেখলবানি কি বাবা?'

আমি বললাম, 'ভরতের জরু কি হুরি নাকি?'

'হায় রাম।' নানী কেসো গলায় খক খক করে হেসে উঠলো, 'হুরি ভারতকে ছোটা বহিন ভইলি। ছোটা এক লোক্কা না দেখল বা কি লাবা, অবহি তো ইহ পর আপন মায়ীকে খাড়া রহল বা। ওহি হনো ভরতকে জরু বেটা।'

নানীর কথা শেষ হবার আগেই ভরতের মা চালার পিছন থেকে সামনে এলো। ডান হাতে একটি ঝকঝকে পিতলের ঘটি, বাম হাতে এনামেলের একটি গেলাস। তার ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। আগেই তার খিলখিল হাসি শুনে বুঝেছি, ঠোঁটের হাসিটি কৌতুকের। একটু যদি বা লজ্জার লেশ থেকেও থাকে, চলায় কাজে সহজ আর অনায়াস। আমার দিকে বাঁ হাত বাড়িয়ে গেলাসটা এগিয়ে দিল। আমি হাতে গেলাস নেবার পরে, সে যখন ঘটি থেকে জল ঢাললো আমার নজর চোখা হলো। কিন্তু তার দরকার ছিল না। ঘটির জল যে কলের পানি, দেখেই বোঝা গেল। চুমুক দিয়ে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পর পর দু-গেলাস জল পানের পরে আর একটু জল নিয়ে মুখে বুলিয়ে নিলাম।

জলের ছোঁয়ায় আরাম লাগলো কিন্তু ঠাণ্ডাও লাগলো। সূর্য ডুবে গিয়েছে, এখন প্রাক সন্ধ্যার ধূসর আলো। মাঘের রোদে তাত ছিল বটে। মাঝ গঙ্গার চরে এখন ঠাণ্ডায় যেন গা শিরশির করছে। ভরতের মা আমার হাত থেকে গেলাস নিয়ে চলে গেল। নানী হুঁকা টানছে ভুড়ুক ভুড়ুক। কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। আগুন নিভেছে, অথবা তামাক খতম হয়েছে। আমি চাদরটার ভাঁজ খুলে গলায় বুকে জড়ালাম। কাকের দল এপার ওপার করছে। নিশ্চয় যে যার বাড়ি ফিরছে। দূরের উত্তরে ডানলপের খেয়াঘাটের নৌকা পারাপার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জানি, উত্তরের সীমানায় গিয়ে ডাকলেও তারা শুনতে পাবে না। হাতের ইশারা যদি বা দেখতে পায়, চড়ায় আসবে কী না সন্দেহ। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। মনে পড়লো, নৌকায় সিগারেট দেখে, নানীর ব্যগ্র ব্যাকুল হাত বাড়ানো। এখনো কয়েকটি প্যাকেট পকেটে আছে। নেশার ভাণ্ডার পূর্ণ রাখাটাও আমার একটা নেশা। এটা আমার অভিজ্ঞতার ফল। সময়ে অসময়ে বড় বেকায়দায় পড়ে যেতে হয়। অতএব এখনো নানীকে দু-একটা সিগারেট দান করতে আমার কৃপণ হওয়ার

দরকার নেই। বললাম, 'নানী, সিগারেট চলবে?'

নানী বাঁ হাতে ডান হাতের হুঁকা মুখ থেকে সরিয়ে বাঁ হাতে নিল। মুখে অনেকগুলো ভাঁজ ফুটিয়ে দুটো দানা ঝলসানো দাঁত দেখিয়ে হাত বাড়ালো, 'হঁদা দে রউয়া। দুপহর যে ভাত খায়ি তুমুকে সিগ্রেট পিলেবানি। দুলারি পি লেলি।'

আমার খাটিয়া থেকে নানীর দূরত্ব কয়েক হাত। অতএব আমিই উঠে এগিয়ে গিয়ে নানীকে সিগারেট দিলাম, আর তখনই চোখে পড়ে গেল পিছনের চালার আড়ালে দুরি এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষিণে পা বাড়ালো। ওর সঙ্গে নেংটিটাও ছিল। সেও দৌড় দিল। এই প্রথম দেখলাম নেংটিটার গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে গলার পিছনে আলগা গিঁঠ দিয়ে দিয়েছে। তলার নেংটিটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আমি নানীর কাছে গিয়ে তার হাতে সিগারেট দিলাম। তার মুখের হাসিটি আরও বিস্তৃত হলো। নৌকার মতনই সিগারেটটা নাকের কাছে ধরে নিশ্বাস টেনে বললো, 'বাবু, বাস্ বহুত আচ্ছা ভইল বা।'

আমি নিজের সিগারেট ধরিয়ে কাঠির আগুন নানীর মুখের কাছে ধরলাম। নানীর সেই একই রা, 'রহে দে বাবা, বাদমে পিওব। রাতে দো খানা খায়ি পর ই চিস পিওব।'

আমি আর একটা সিগারেট বের করে নানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তা হলে আর একটা রেখে দাও, ওটা এখন পিয়ে নাও।'

স্মর্তব্য, আমি আমার শিল্পাঞ্চলের বাজারি হিন্দিই চালিয়ে যাচ্ছি। নানী একেবারে বিগলিত, তবু বললো, 'এ রউয়া, তোহার কমতি হো যাইব।'

বললাম, 'আমার এখনও বহুত আছে। কমতি হলে তোমার হুঁকো টানবো।'

নানী এবার কেসো গলায় খলখলিয়ে হেসে উঠলো। 'হায় রাম, তু চিলম পিবে বাবা?'

নানীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই, ঠিনঠিনে হাসির শব্দে মুখ তুলে দেখলাম, চালার পশ্চিম গায়ে দাঁড়িয়ে ভরতের বউ হাসছে। তার শাশুড়ী দুলারিও দক্ষিণের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো। চোখে তার জিজ্ঞাসা। নানী তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'বাবা কহতানি কি চিলম পিবে। দো সিগ্রেট হাম দেওবানি।' সে ডান হাতে একটি সিগারেট তুলে দেখালো। তারপরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আর একটা সিগারেটও নিল। হুঁকাটা বাড়িয়ে দিল

ভরতের বউয়ের দিকে। বাঁ হাতে একটা সিগারেট নিয়ে তার হাতে আর একটা ঠোঁটের কাছে ধরে, আমাকে বললো, 'দে বাবা, সলাই জ্বালা দে।'

আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, এগিয়ে ধরলাম। নানী ঠোঁট ছুঁচলো করে সিগারেট ধরালো, জোরে টান দিল। কাসতে আরম্ভ করলো খক খক করে। তার মধ্যে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'জেরা কড়া বা।'

কথার মধ্যেই ঠোঁটের কষে লাল গড়িয়ে এলো, সিগারেটের গোড়া ভিজে জবজবে হয়ে গেল। দুলারি বলে উঠলো, 'কড়া বা তো কাহে পিইতানি ?'

'চিজ বহুত বড়িয়া বা।' নানী বললো দুলারির দিকে হাত বাড়িয়ে, 'লে, তু পি।'

দুলারি হেসে উঠে লজ্জায় চালার আড়ালে চলে গেল। ভরতের বউও হাসতে হাসতে হুঁকা নিয়ে শাশুড়ীর অনুসরণ করলো। নানী হেসে বললো, 'সরম ভইল।'

আমি ফিরে আবার খাটিয়ায় বসতে গেলাম। দেখলাম, হুরি চালা ঘরের পুব দিকে দাঁড়িয়ে আছে। পুব দিকেও একটি চালা ঘর। দু পাশে দুই চালা, মাঝখানে চলাকেরা, ঘরকন্নার কাজের জায়গা। নৌকো থেকে প্রথম নেমে মনে হয়েছিল এক আধটি চালা না, দক্ষিণের সীমানায় যেন অনেকগুলো ঘর নিয়ে একটি পাড়া। আসলে সাকুল্যে খড়ের দোচালায় চাল জুড়ে তিনটি ঘর। ঘর কয়টির পিছনে সেই ঝাড়ালো গাছটি।

আমি সিগারেট ধরালাম। হুরি এবার আমাকে দেখা মাত্রই চলে গেল না। নীচু চালার ওপর দিয়ে, ও পুব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। নেংটিটা ওর গায়ের কাছে। হুরির নিশ্চলতাই বোধহয় ওকে সাহস জুগিয়েছে। কালো চোখে প্যাট প্যাট করে আমাকে দেখছে। চোখাচোখি হলেই, চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যার ধূসরতায় দ্রুত রাত্রের অন্ধকার নামছে। আমি সিগারেট ধরিয়ে টান দিলাম। এত দিনের হাতছানি, আর এতদিনের চরে আসার সাধ, সবই এখন আমাকে অন্ধ পাখি করে তুলছে। এপারে ওপারে জ্বলে উঠেছে বিজলি বাতি। এতক্ষণ মূলের কূলের যে শব্দগুলো পাইনি, সেই ভারি যানবাহনের শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে চরের বুকে। এখন এক চিন্তা, ভরত কখন আসবে।

এই উদ্বিগ্ন চিন্তার মধ্যেও, একটা জিনিসের অভাবে গোটা শরীর মনটাই যেন আনচান করছে। জিনিসটির নাম চা। সেই দ্বিপ্রহরেই একবার চা চা-প্রাণ চাগিয়ে উঠেছিল। কিন্তু চরে আসার নতুন স্বাদটা প্রাণটাকে আচ্ছন্ন

ব্যথে আকুল করেনি। এখন চায়ের কথা মনে হতেই, মুলের কুলের টানটা যেন শতেক গুণে বেড়ে গেল। এরা কি চা খায় না? শহরের সঙ্গে যাদের রোজ পেট খ্যাটের লেনাদেনা, চায়ে কি তাদের বিরাগ থাকতে পারে? শহরের বাজারে গঞ্জে বেচা কেনা করতে যায়, আবার সিনিমা টিনিমাও দেখতে যায়, চা কেন খাবে না?

এ হলো আমার যুক্তি। এ চরের সংসারের পান ভোজনের হালচাল আমার জানা নেই। তা না হয় না-ই বা হলো। শহরে ভদ্রলোকের আস্তানায় বসে নেই তো। বসে আছি চরে, চারদিকে জল। একটা যাত্রা ভঙ্গ করে হাজির হয়েছি। আমার ভরত পাটনী এলেই আবার চলে যাবো। জিজ্ঞেস করতে আপত্তি কি, চায়ের ব্যবস্থা আছে কী না? আমি একবার দেখলাম মুন্নির দিকে। এখন ওকে ঈষৎ আবছা দেখাচ্ছে। নানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নানী তোমরা চা খাও না?'

'কাঁহে না পিওব হো বউয়া?' সঙ্গে সঙ্গে নানীর পালটা জবাব, 'বোলত কাঁহে না বাবা?' বলেই সে এক হাঁক দিল, 'এ ভরতকে মায়ী, এ দুলারি।'

নানীর ডাকের মধ্যেই দেখলাম, মুন্নি দুই চালার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণে চলে গেল। নেংটিটাও সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে নানীর চেহারা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার পাশ থেকেই স্বর শোনা গেল, 'কা কহতানি?'

'কে বা? মনিয়া?' নানী জিজ্ঞেস করলো।

রমণী স্বরের জবাব শোনা গেল, 'হুঁ।'

'বাবা হমলোগনকে মেহমান বা। তানি চায়ে পিলাই দে।' নানী বললো।

স্বর শোনা গেল, 'বনাইল যাই। মাতারি কহেলে কি বহারে ঠাণ্ডা হাওয়া দেতানি। বাবুকো ঘরে কাঁহে না লেয়ি যাতানি?'

'হঁ, সচ কহলে তু, হমে ভি জারা লাগতানি।' নানীর আবছা মূর্তির মুখ আমার দিকে ফিরলো, বললো, 'এ বউয়া ঘরে পর চল বাবা।'

এ বড় ব্যাজ। ঘরে কেন? খোলা আকাশের নীচে চরের বুকে, এই তো বেশ ভালো বসেছি, এমন বসা আর কোনোদিন হবে কী না কে জানে? আকাশে একটি করে তারা ফুটছে। কোন পক্ষ চলছে জানি না। নীল আকাশ ক্রমে এখন কৃষ্ণকালো। তারাগুলো ফুটছে যেন হলুদ কৃষ্ণকলির [illegible] ফুলের মতন। পুব দিগন্তের কোথাও আলোর ইশারা নেই। দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে, কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আমি নানীকে বললাম, 'তুমি যাও, আমি একটু বাইরেই বসি।'

নারীর কাছাকাছি থেকেই রমণী স্বরে ঈষৎ হাস্য শোনা গেল, তারপরে বাত, 'শহর মোকম্মবালা বাবু, কেইসান ই ঝোপড়ি পরে বৈঠলবে হুই নানী?'

এবার বোঝা গেল, বাত দিচ্ছে ভরতের বউ, নাম তার মনিয়া। মায়ের নাম দুলারি, মেয়ের নাম সুরি। পুত্রবধূর নাম মনিয়া। যতোদূর জানি, মনিয়া বাঙলা ভাষায় ময়না দুলারি কি দুলালী? সুরি নাম জীবনে কখনো শুনিনি। নানী বললো, 'হঁ, তু সচ কহলবাড়ি, মগর এ জারা যে কৈসান বৈঠল যাওত? এ রউয়া, তানি তথলিয় লে বাবা, ঘরে 'পর চল।'

'কমসে কম, উ বগলে পর চুলাহ নজদিক আওত কাঁহে না?' এবার সামনের দুই চালার মাঝখান থেকে নতুন স্বরে শোনা গেল। এ স্বর নিশ্চয়ই সুরির, এবং এই ওর প্রথম বাণী।

নানী বলে উঠলো, 'হ হ, চুলহাকে আগমে জারা কমতি লাগতেনি। চল বাবা ঘরকে পিছে চল।'

নানীর ছায়া মূর্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম। আমি তাকেই অনুসরণ করতে যাচ্ছিলাম। সুরি বলে উঠলো, 'ই বগলমে কাঁহে না আওত?'

অন্ধকারে এখন আর স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, সুরির মুখ কোন দিকে। কাকে বলছে? আমি নানীর দিকে দেখলাম। সে পশ্চিমের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই চোখে পড়লো, দুই চালার মাঝখানের বাঁ দিকে আগুনের শিখার আলো কাঁপছে। দুই চালার মাঝখানে, কাছাকাছি সুরির অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এমন কি, ও যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, সেটাও এখন স্পষ্ট। এবার ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাকে বললে?'

'না তো কেকারে?' সুরিও যেন এবার কৌতুকে ঈষৎ হেসে বাজলো।

এদের কথার সবই স্পষ্ট, কেবল, সব কথাতেই জিজ্ঞাসার সুর। আমি খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের এদিকটায় এমন কিছু এবড়ো খেবড়ো না। আমি পা বাড়াতেই সুরি এগিয়ে গেল। আমি ওকে অনুসরণ করে, ঘরের পিছনে, প্রায় সেই ঝাড়ালো গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পশ্চিমের চালা ঘরটা লম্বা। পুবের দিকে পাশাপাশি ঘর দুটো, মাপে পশ্চিমের ঘরের সমান। আসলে, ইতিমধ্যে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস কিঞ্চিৎ বইতে আরম্ভ করেছিল। দক্ষিণে, ঘরের আড়ালে এসেই সেটা টের পাওয়া গেল। ঝাড়ালো গাছটা যে কী গাছ, এখনও বুঝতে পারিনি। তার ওপর ডালের পাতায় হালকা বাতাসের কাঁপন। কিন্তু আমাদের গায়ে লাগছে না।

দেখলাম, চালা ঘর আর গাছের মাঝামাঝি জায়গায়, মাটির গড়া কাঠের

উনোন। তুলারি ইতিমধ্যেই কাঠের আগুন উসকে তুলেছে। নানী গিয়ে বসেছে উনোনের ধার ঘেঁষে। তার পাশে ডরতের নেংটিটা, গোটা গায়ে কাপড় জড়ানো একটা পুতুলের মতন। চালা ঘরের দক্ষিণের দরজা দিয়ে, মনিয়া যাতায়াত করছে, আর শাশুড়ীকে নানান কিছু যোগান দিচ্ছে। হুরি একটা চটের বস্তা, আসন হিসাবে পেতে দিল নানীর পাশে। তারপরে আমার দিকে তাকালো।

তাকানোর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। আমি নানীর পাশে গিয়ে চটের বস্তায় বসলাম। তুলারি বোধহয় খেয়াল করেনি। তার মুখে তখনও শাশুড়ীর প্রসাদ সিগারেটের শেষাংশ ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই, ঝটিতি শেষ টান দিয়ে, ফেলে দিল উনোনের মধ্যে। আর আমিও খেয়াল করিনি, প্রায় আমার গায়ের কাছেই, গুটিশুটি হয়ে অত্যন্ত নিরীহভাবে চৌকিদার শুয়ে আছে।

চরের বুকে এমন একটি অসময়ের কথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তাও আবার অনেক দিনের অনেক বারের দেখা চর, যেন এক নতুন সময় আর ছবিকে হাজির করে দিল! মূলের কূলে যাবার উদ্বেগটা সাময়িক ভাবে ভুলেই গেলাম। আমাদের সকলের গায়েই লাল আগুনের শিখা কাঁপছে। তুলারি উনোনের চাওড়া হা মুখে দুটো লোহার শিক বসিয়ে, তার ওপর চাপিয়েছে একটা এলুমিনিয়ামের ছোটখাটো হাঁড়ি। মনিয়া একটা টিনের গোল চাকতি এনে তার ওপরে ঢাকা দিয়ে দিল।

শাশুড়ী বউ কাজে ব্যস্ত। হুরি পুব দিকের ঘরের দক্ষিণ মুখো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। চালা ঘরের উত্তরে কোনো দরজা নেই। দক্ষিণ মুখো যে দরজা আছে, উত্তর থেকে তা দেখা যায় না। আশেপাশের খানিকটা সীমানা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রীতিমতো লেপামোছা। তার মানে, এই দ্বৈপায়নদের ঘরকন্নাটা এদিকেই। উনোন একটা জ্বলছে বটে। দু হাত ফারাকে আর একটা উনোনও রয়েছে।

কিন্তু আমার আন্দাজে বিস্তর ভুল। ভেবেছিলাম, চালাঘরগুলো চরের একেবারে দক্ষিণ সীমানায়। তারপরেই বালুর নীচে জলের স্রোত। আসলে ঝাড়ালো গাছটা ছাড়িয়েও, প্রায় পনর বিশ হাত জায়গা। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, উনোনের আগুনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, ওদিকের জমিও খালি নেই। কোনো কিছুর চাষ করা হয়েছে।

'এ বুড়ীয়া তোহার ঘর কাঁহা বা?' নানী চুপ করে থাকতে পারে না।

বললাম, 'কাছেই।'

বলে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। স্বাভাবিক, দৃষ্টিতে তাদের কৌতূহল। কিন্তু আমার হিন্দি ভাষার 'নজদিক মে' মানে কী? কাছে বলতে তো অনেক জায়গাই বোঝায়। দুলারি অনায়াসেই উনোনের ওপর থেকে এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটা নামিয়ে, মুখ ফিরিয়ে তাকালো মনিয়ার দিকে। শাশুড়ী বউ দুজনেই হাসলো। ঝুরির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ও ঠোঁট টিপে রয়েছে। নানী বললো, 'নজদিক ন সমঝাইলে বাবা, পূরব না পশ্চিম? শাগঞ্জ না হালিশহর?'

বললাম, 'আরও দক্ষিণে।'

এবার মনিয়া হেসে উঠে চালার মধ্যে চলে গেল। ঝুরি পুবের ঘরের দরজা ছেড়ে পশ্চিমের ঘরে মনিয়ার কাছে চলে গেল। দুলারি হাঁড়ির টিনের চাকতির ঢাকনা খুলে, একটা কৌটা খুলে, আগে গুঁড়ো চা ছুঁড়ে দিল। আর এক কৌটা খুলে, ভিতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনলো, চিনি না, বড় এক টুকরো ভেলি গুড়। ছোট একটি এনামেলের বাটি থেকে অল্প কিছু দুধ। সবই করলো চোখের পলকে, এবং আবার ঢাকা দিল টিনের চাকতি দিয়ে। তারপরে একবার আমার দিকে দেখে নানীকে বললো, 'তোহার বাবা আপন ঘরেকো ঠিকানা বোলত না চাহে হাই মাতারি।'

নানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আগুনের লাল আলোয়, বুড়ির মুখের ভাঁজগুলো গাঢ় দেখাচ্ছে। যেন মুখটাই বদলে গিয়েছে। বললো, 'কাঁহে, হো রউয়া, তোহার মোকাম হম ছিন লিইব কি?'

আমি হাসলাম, বললাম, 'ছিনিয়ে নেবার মতন আমার মোকাম নেই নানী।'

'সাদী উদি করলেবানি না কা? নানী আবার জিজ্ঞেস করলো।

দুলারি তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। পশ্চিমের ঘরের দরজায় মনিয়া আর ঝুরির মুখ এক সঙ্গে উঁকি দিল। এ জবাবটা শোনবার কৌতূহলের মাত্রা কিছু বেশি। আমি বললাম, 'সাদী তো সব পুরুষই করে নানী, সেটা এমন আর কী কথা?'

দুলারি একেবারে বালিকার মতন হেসে উঠলো। মাঝ গঙ্গার চরের বুকে, কাঠের আগুনের লাল আলোয়, ভরভেন্ন মাঝে যেন এক আশ্চর্য অলৌকিক নারী মূর্তি বলে মনে হলো। এখনো তার কালো চোখে মেঘ বিজলীর খেলা আছে। সে হাসতে হাসতেই একবার আমাকে দেখে নিয়ে, একটা এলুমিনিয়ামের

গেলাস কাছে টেনে নিল। গেলাসের মুখে প্রায় একটি খয়েরি রঙের কাপড়ের টুকরো চাপা দিল। বোধহয় চা ছেঁকেই ছেঁকে কাপড়ের টুকরোর রঙ ঐরকম দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া চায়ের সঙ্গে ভেলি গুড়ের ছোপ লেগে, রঙ গাঢ়তর হয়েছে।

ভেলি গুড় কেন, চিনি নেই কেন, এসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এমন নয় যে জীবনে এই প্রথম গুড়ের চা হতে দেখছি, বা এই প্রথম খেতে চলেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণার দায় কোনোকালে সাধের ইচ্ছা পূরণের মুখ চায় না। এতাবতকাল দেখে এলাম পান ভোজন, যখন যেমন, তখন তেমন। কিন্তু আপাতত ব্যাপার ভিন্ন। নানী আমার বাজারি হিন্দি বাত শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তু কা কহলেবাড়ে, হমে সমঝসে না আইলান হো বাবা। মরদকে সাদী কা কুছ ছোটা বাত বা ?'

দুলারি মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো মনিয়া আর মুরির দিকে। মনিয়া হেসে উঠলো। মুরির কিশোরী মুখে বিভ্রান্ত কৌতূহল। হাসতে গিয়ে ওর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। দুলারি বললো, 'এ মাতারি, বাঙালী বাবুকে বদন না দেখল ? বাবু মরদ লোগনকে সাদী জায়দা উমরসে হোতানি। বাতেসে না সমঝাইলে কি ?' দুলারি একবার আমার মুখের দিকে দেখে, আবার অনায়াসেই গরম এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটি তুলে, গেলাসের মুখে কাপড়ের টুকরোয় চা ছেঁকে ঢাললো।

দুলারি তার নিজের মতন একটা সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছে। নানী আমার মুখের দিকে তাকালো। যেন দুলারির কথা যাচাই করার জন্যই উনোনের আগুনের আলোয় আমার বদনটি দেখে নিচ্ছে। তার মুখেও আগুনের আলো কাঁপছে। লোমহীন ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। মনিয়ার তেলতেলে মুখে হাসি, চোখে যেন সন্দিগ্ধ কৌতূহল। মুরি মা ভউজীর মতন সাত সতরো ভাবতে শেখেনি। সে অবাক স্বরে বলে উঠলো, 'এততি উমরমে ইয়কো সাদী না ভইল ?'

'না ভইল তো কা ? তুহকে দিল চাহতানি, কা ?' মানিয়া হেসে বেজে উঠলো।

মুরি হাত তুলে মনিয়াকে গুপ গুপ কিলিয়ে দিল পিঠে। ওর হাতের কাঁচের চুড়ি বেজে উঠলো ঠিনঠনিয়ে। মনিয়া হাসতে হাসতে ছুটে চলে এলো দরজার বাইরে। মুরি চোখ ঘুরিয়ে এক পলক আমাকে দেখে, ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। নানীও ক্ষেত্রো গলায় খুক খুক করে হাসছে। দুলারি এখন ঠোঁট টিপে হাসছে।

গেলাসের মুখে চা-ঢাকার কাপড়টি নিংড়ে মনিয়াকে বললো, 'যা, বাবুকে চা দে।'

প্রায় যেন বাঙলা বুলি। মনিয়া ধূমায়িত এলুমিনিয়মের গেলাসটি তুলে আমার সামনে এনে বসিয়ে দিল। আমি তার মুখের দিকে দেখছি, সে দেখছে না। কিন্তু চোখে ঠোঁটে হাসি। কিশোরী ননদটির পিছনে লাগা কেন? বুঝতে পারি, সুরি ওর বয়সোচিত সারল্যে, অবাক প্রশ্নটি করেছে। আমার মতন বয়সের পুরুষের বিয়ে হয়নি, একথাটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। ঠেকবারই কথা। ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। হয় তো ওর পাঁচ সাত বছরেই বিয়ের পাট চুকেছে। কেবল ওদের সমাজে না, বাঙলার তালুক মুলুকের খবর যারা রাখে, তারাও জানে, আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে এখনও সাত আট বছরের মেয়ে কপালে সিঁথি সিঁদুর পরে ঘরের আঙিনায় এক্কা দোক্কা খেলছে। স্বামীটি তার কোথায় তখন মাঠে ঘাটে গরু চরাচ্ছে কি হাল বলদ নিয়ে চাষে নেমেছে, সে খবর কে রাখে? বে' হয়েছে তো হয়েছে, আমি আছি আমার মনে, তুমি থাকোগে তোমার মনে। সময় হলে, বাপ মায়ের মাথাব্যথা আগে। তখন নিজেরাই জামাইকে ডেকে মেয়েকে ঘাড়ে তুলে দেবে। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের কি কথা, খোদ কলকাতায়ও সুরির মতন কিশোরীকে আখছার দেখা যায়। সত্যি মিথ্যা আলাদা, আমার বয়সী পুরুষকে যদি অবিবাহিত ভাবতে হয়, তা হলে সুরির মনে ধন্ধ লাগাটা অবাক হবার কিছু না।

ঘর গেরস্তি নিয়ে আমার জীব-করণ করম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে, মাঝ গঙ্গার এই চরে এখন আমার ভিন্ন পরিচয়। লম্বা চওড়া বাত দেবো না, যে 'আত্মানুসন্ধানে' বেরিয়েছি। কিন্তু ঘর ছাড়া এই 'আমি' আপনাতে আপনি আছি। একে যদি কেউ সুখ বলে, সেটা তার নিজের কথা। বিবাগী বললেও তাই। জীবনের নানা টানা-পোড়েনে, দুঃখ দৈন্যে বলতে পারো, এর নাম 'মনভাসির টান'। অনেকটা বানভাসির মতনই। দিনের পরে দিনে, শুকনো খাতের হাহাকারে প্লাবনের টানে ভেসে যাওয়া। বলতে পারো, 'বাঁচতে চাওয়া'। স্বস্তি হলো, ক্ষতি কারোর নেই।

আপাতত মন বিচারের হাকিমকে সেলাম। হাত বাড়ালাম ধূমায়িত এলুমিনিয়ামের গেলাসে। বাড়িয়েই যেন সাপের ছোবল খেলাম। এলুমিনিয়ামের গেলাস না, কাঠের আগুনের আংড়া যেন। মনিয়া তখন নানা আকারের পাত্র দুলারির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। আমার দুরবস্থা দেখেও তার হাসির ঝংকার শোনা গেল। দুলারির মুখেও হাসি। ...তবু যেন একটু,

গম্ভীর চালেই বললো, 'পাত্তিয়া উড়িয়া কাঁহে না কুছ লেইলে?'

পাত্তিয়া উড়িয়াটা কি বুঝতে পারলাম না। নানী তার গায়ের ময়লা চাদরের অংশবিশেষ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তোহার বাবু হাত হো রউয়া, এততি গরম পকাড়ে না সাকতবে। ইয়ে লে।'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে বললাম, 'এইটাতে কাজ হবে। কিন্তু পাত্তিয়া উড়িয়াটা কী?'

দুলারি তখন পাত্রে পাত্রে চা ঢালছে। হাসি মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'প্যাড়কে পাত্তিয়া হো জী।'

তার মানে গাছের পাতা? এটা একটা নতুন শিক্ষা। গরম পাত্র ধরতে হলে, কিছু না পাও, গাছের পাতা জড়িয়ে ধরো। মনিয়া নানীর সামনে একটা ধূমায়িত চায়ের কলাইয়ের বাটি এগিয়ে দিল। নানী বললো, 'হঁ, প্যাড়কে পাত্তিয়া হো বাবা। তু শহরকে বাবুলোগ ক্যায়সে জানলবে?' বলেও সে কিন্তু অনায়াসেই কলাইয়ের বাটি তুলে, ছুঁচলো ঠোঁট কানায় ছুঁইয়ে সুড়ুত করে চুমুক দিল।

কেন, ওদের হাত কি লোহায় গড়া। লোহাও তো তাতে। এদের হাত কি চরের মাটি দিয়ে গড়া? নানীকে বাটিতে চুমুক দিতে দেখে নেংটিটা তার গায়ের কাছে আরও ঘনিয়ে বসলো। নিজের গোটা গা ঢাকা কাপড়ের ভিতর থেকে একটা হাত বের করে নানীর কোলে রাখলো। নানী বললো, 'সবুর বা বেটা, দেতানি!'

মনিয়া চালার দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'এ মুরি, চা পিয়ে বা।'

চালার ভিতর থেকে কোনো জবাব এলো না। দুলারি জলন্ত কাঠ উনোনের ভিতর থেকে খানিকটা বাইরে টেনে নিয়ে এলো। তারপরে নিজের চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। মনিয়া দুটো বাটি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল। শীতে আমি তেমন কাবু না। কিন্তু ভেলিগুড়ের স্বাদ গন্ধ যাই থাকুক, আর দুধের স্বাদ বলতে প্রায় কিছুই না থাক, এ গরম পানীয় এখন অমৃততুল্য। একা আমার না। নানী দুলারি, দুজনেরই দেখছি, মৌতাত জমেছে। জমেছে নেংটিটারও। সে মাঝে মাঝেই নানীর বাটিটা নিজের হাতে ধরে মুখের কাছে নামিয়ে চুমুক দিচ্ছে।

চালার ভিতর থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। সঙ্গে হাসিরও। তারপরেই দেখি দুজনে দুজনের চায়ের বাটি হাতে নিয়ে চালার বাইরে এলো। মনিয়া একবার দেখলো আমার দিকে। তার চোখের তারায় ঠোঁটের কোণে

হাসি। সুরিও মুখ ভার করে নেই। বরং কিশোরীর ঠোঁটে ঈষৎ লজ্জার হাসির রেখা। দুজনেই দুলারির কাছাকাছি বসলো।

জলন্ত কাঠের আগুনের শিখা একটু কমে গিয়েছে। আলোও কিছু কম। তবু প্রায় সকলের মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'সুরির স্বামীও (মরদ শব্দ ব্যবহার করেছি) কি বাজারে গেছে ?'

কথাটা সভার মাঝে পড়তেই, হঠাৎ যেন কেমন একটা স্তব্ধতা নেমে এলো। সকলের হাত মুখ নিশ্চল, চা পানেও ঠেক। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। হয় তো অনুচিত কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কিন্তু অন্যায় কিছু ভেবে বলিনি। মনে এলো, জিজ্ঞেস করলাম।

প্রথমেই হেসে উঠলো মনিয়া। তারপরেই সুরি উঠে পড়বার উদ্যোগ করলো। মনিয়া ঝটিতি ওর হাত টেনে ধরলো। দুলারি বললো, 'ইয়ো মে সরম কা বাত কা বা ? বৈঠ যা।'

নানী বললো, 'হ, সরম কা বাত কা বা ? বাবা পুছলবানি তোকার আদমি কহাঁ বা ?'

'সুরিকে আদমি ইটাগড় 'পর আপন বাপ মাতারিকে সাথই রহতানি. দুলারি বলল, 'ওহি 'পর চটকলমে কাম করতানি। আগাইলা ফাগুয়া বাদ গাওনা হওলবে, বাদে সুরি শ্বশুরাল ঘর চল যাইব।'

তথাপিও দেখছি সুরি মনিয়ার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কিশোরী লজ্জা পেয়েছে। জানি না, আমার ওপর বিরক্তও হয়েছে কী না। দুলারি মনিয়াকে বললো, 'ছোড়ে দে বহু।'

মনিয়া ছেড়ে দিতেই সুরি এক ছুটে আবার ঘরের মধ্যে। নানী সস্নেহে হেসে বললো, 'সরম লাগল বা।'

সুরির মতন বয়সী মেয়ের স্বামীর প্রসঙ্গে বোধহয় লজ্জা পাবারই কথা। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা অনেকখানি আঁকাবাঁকা। সুরি চরের মেয়ে। ওর শ্বশুড় শাশুড়ী স্বামী থাকে ইটাগড়ে। অর্থাৎ টিটাগড়ে। আজ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু ছাড়া, কোনো হিন্দিভাষীর মুখে, টিটাগড়কে টিটাগড় বলতে শুনিনি। শুধু এইটুকু জানি টিটাগড় আসল নামের মধ্যে নাকি একটা অশ্লীল শব্দ রয়েছে, যা মুখ ফুটে উচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু চরের সঙ্গে মূলে কূলের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটলো কেমন করে ?

এ আবার জিজ্ঞাসার কী আছে ? অনুমান করেই নেওয়া যায়, দেশ ঘর ছেড়েও প্রবাসে নিজেদের সমাজ সভা থাকে। সামাজিকতার অসুবিধা কী ?

মেলাতে পারছি না যেটা, তা হলো, চরের মেয়ের বর কারখানার কর্মী। সেটাও আমার ভেবে লাভ নেই। মূলকি যোগাযোগের সূত্র একটা নিশ্চয় আছে। মনিয়া চায়ের বাটি রেখে উঠে দাঁড়ালো, দুলারির দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাওনাকে মতলব বাবু সমঝাইলেন কি ?'

কথাটা বলেই সে একবার আমার দিকে দেখে, নিজেও আবার চালার মধ্যে ঢুকে গেল। আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম দুলারির দিকে। দুলারি আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। চোখে তার জিজ্ঞাসা। আমি বললাম, 'শুনেছি সাদীর পরে গাওনা হয়।'

দুলারি আর নানী এক সঙ্গে হেসে উঠলো। দুজনের দুই রকমের স্বর। দুলারি বললো, 'হ, ঠিক কহলেবারে বাবু, মগর সাদী হওত বচপনেমে, গাওনা হৎত লেড়কি যবে জোয়ান হোতি।'

'গাওনাকে আগে আদমিকে সাথ লেড়কিকে সুরত দেখ না পায়ে।' নানী আরও একটু ব্যাখ্যা করে বললো, 'তু বাঙালীকে এইসান বলতহি কি ?'

জবাবটা কী দেবো, হঠাৎ ভেবে পেলাম না। গাওনার ব্যাখ্যাটা আমার একেবারেই যে অজানা, তা না। শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে বাস, বিহারের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা নেই, এমন না। সাদীর পরে গাওনা, আর সেটা যে গ্রাম বাঙলারও একরকমের সাবেকি প্রথা, তাও জানি। বিবাহিতা বালিকাতে যখন রমণী লক্ষণ দেখা দেয়, তখন স্বামীর ডাক পড়ে। শাস্ত্রীয় ভাষায়, এর নাম দ্বিতীয় বিবাহ।

আমি নানীকে জবাব দিলাম, 'চলে, গাঁয়ে ঘরে, যেখানে বাচ্ছা মেয়েদের বিয়ে হয়।'

'হঁ, গাঁওয়ে পর হওত, শহরবাবুকে ঘর না হওত।' দুলারি বললো।

তার কথা শেষ না হতেই, চালার ভিতর থেকে রমণী স্বরের গানের গুনগুনানি ভেসে এলো। গানের কথা একান্তই অস্পষ্ট, আমার পক্ষে বোঝাও মুশকিল। কেবল টুকরো কয়েকটি কথা কানে এলো, 'হোই সারে......নাচে বিচে......করত সিংহার......' এ গানের সুর আলাদা, গায়কি আলাদা। বিহার অঞ্চলের বাঙলা প্রবাসীদের বিয়ের সময়, মেয়েদের গানের সুর অনেকটা এই রকম শুনেছি। তবে, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, গান গাইছে মনিয়া। তাকে বাধা দিচ্ছে দুরি। বোধহয় দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তিও চলছে, তার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল হাসির টুকরো। ননদ ভাজের রঙ্গ জমেছে ভালো।

এদিকে দেখছি, দুলারি আর নানীও নিজেদের মনেই হাসছে। গান শুনছে।

তাদাও আর আমার থেকে বেশি উপভোগ করছে নিশ্চয়ই। কারণ তারা গানের ভাষা অনুসরণ করতে পারছে। নেংটিটা চৌকিদারের মতনই নানীর কোলের কাছে গুটিশুটি হয়ে পড়েছে।

চরের হাতছানিটাই দেখেছি এতোকাল। কোনো এক তারা ভরা মাঘের শেষের রাত্রে কলকল ছলছল জলের শব্দে, চরের এমন একটি অঙ্গনে এসে বসবো এমন কি আজ সকালেও ভাবিনি। কেউ বলেন, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। আমি ভাবি ধনাগারের অন্ধি-সন্ধি বেবাক ভিন চালে চলে। ছকের ঘরে তার গতাগতি মেলে না। যদি বেরিয়ে থাকি মনভাসির টানে, তবে মানতে হবে, জীবনের অলক্ষ্যেও এক দুরন্ত মাঝি বৈঠা রেখেছে তার হাতে। না হলে, চরের বুকে এ আসরে, কে আমাকে টেনে আনলো।······

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, আগে একটি নানীর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। নানী দেখে নিয়ে এই প্রথম আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'তুমি বাবা, হমে তানি চিলিম পিবে।'

দুলারি উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'বানাকে লিতানি হোই মাতারি।'

দুলারি ঢুকলো ঘরের মধ্যে। কাঠের আগুন অনেকটাই ঝিমিয়ে গিয়েছে। তবু মনিয়া আর দুরিকে চালার বাইরে আসতে দেখলাম। ওরা দুজনেই এসে বসলো উনোনের কাছে, পাশাপাশি। মনিয়া কাঠটাকে ভিতরে খুঁচিয়ে, নেড়ে চেড়ে, আগুনের শিখা উসকে তুললো।

আমি সিগারেট ধরিয়ে, পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে কবজির ঘড়ি দেখলাম। মাত্র সাতটা বেজে পাঁচ। মূলের দুই কূলে আলো। এখানে তার রেখা এসে পড়েনি। এ চরে মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই রাত গভীর। কথা না বললে, স্তব্ধ নিঝুম, কেবল ভাঁটার জলের ঢেউয়ের পাড়ের গায়ে ছলছলানি। শুনলে মনে হয়, বহুকালের যুগ যুগান্তের কতো কথা যেন বলে চলেছে।

'ঘড়িয়া কাঁহে দেখলবানি ছোট ভউজী।' দুরি বলে উঠলো মনিয়ার গায়ে খোঁচা দিয়ে। তার মধ্যেই একবার দেখে নিল আমার দিকে।

মনিয়া চোখ তুলে আমাকে একবার দেখলো, তারপর দুরির দিকে তাকিয়ে স্বরে ঢেউ দিয়ে বললো, 'হমে কাঁহে পুছতানি? হমারি হাতে পর কি ঘড়িয়া বা? হমে দেখতবানি কি?'

ননদ ভাজের তেলতেলে মুখে, আগুনের শিখার আলোয় চকচক করছে। সারা গায়ে কাঁপছে আগুনের শিখা। তাদের দুজনের কথাই বুঝতে পারছি।

বুঝতে পারছি, ননদ ভাজের খুনসুটি ঝগড়ায় একটা আপোস বোধহয় হয়েছে। কিন্তু সুরির ভাষা ভাবভাচ্যো কেন? খাটিয়া থেকে এখানে ডেকে এনে আলাপের সময় তো সরাসরি কথাই হয়েছিল। হঠাৎ বিগড়ে গেল নাকি?

মনিয়াকে রীতিমতো দুষ্টু বলতে হয়। ঠোঁটের কোণের হাসিটি তার এমন স্থায়ী হয়েছে, কখন কোন কথায় খিলখিলিয়ে উঠবে, বোঝার উপায় নেই। চোখের উজ্জ্বল তারা দুটিতেও ঝিলিক লেগেই আছে। কিশোরী সুরির পাশে তাকে সব দিক থেকেই আলাদা দেখাচ্ছে। সুরির চোখে মুখে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে ছায়া, ক্ষণে আবার আরও অবাক ভ্রূকুটি। এটি তার সারল্যেরই প্রমাণ। তুলনায় মনিয়ার কথায় চাতুরি, হাসিতে রহস্যের ছলনা। এসব হলো যৌবতী বহুড়ির জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু তার মানে এই না, সে কুটিলা। নির্দোষ কপটতা আছে, কিন্তু তার নিজের মতন সব নিয়ে, সেও সরল। শরীরে তার যৌবনের উদ্ধত উচ্ছ্বাস। চলার ছন্দে কাব্যের ভাষায় বোধহয় মনিয়ার চলার দাপে 'দামিনী কাঁপে'। শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলু তোলার সময় একবারও তার চলন বলন চাউনি টের পাওয়া যায় নি।

সেই তুলনায় সুরি যেন সত্যি অবলা কিশোরী, কেবল দু চোখে অগাধ কৌতূহল। সেটাই স্বাভাবিক। ওর শরীরে মনে জোয়ারের প্রতীক্ষা। দেখলে মনে হয়, ওর মনে ও ধমনীতে সেই প্রতীক্ষা সুদূর সংকেত দিয়েছে। সেইজন্যই সহজে ও মুখ ফুটতে চায় না, অথচ ভাবে ভঙ্গিতে ও বড় হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু অনভিজ্ঞা কুমারীটি জীবনের বোধ থেকে বঞ্চিত না। অতএব ভউজীর ইশারা ইঙ্গিতে লজ্জা পায়, আর অনায়াসেই চিনিয়ে দেয়। অবিশ্যি জানি না, মনিয়া ননদিনীটিকে কিলিয়ে পাকাচ্ছে কীনা। কেন না, একটু আগেই চালার মধ্যে মনিয়ার গানের ভাষায় একটি কথা কানে ঠেকে আছে, 'করত সিংহার'। সেই সিংহার মানে কি শৃঙ্গার? তবে তো বিপদের কথা! কিংবা এমনও হতে পারে, 'শৃঙ্গার' শব্দটি আমাদের ভাবনায় যতোটা সংকোচের ওদের ততোটা না।

এমন দাবী আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি ওদের কথিত ভাষাকে যথাযথ রূপ দিতে পারছি। শিল্পাঞ্চলে আরও অনেক অবাঙালীর মুখেই এমন ভাষা শুনে থাকি আমার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ব্রজবুলি নিশ্চয়ই আলাদা ভাষা, বিহারের কোনো আঞ্চলিক ভাষা হওয়া সম্ভব না। তথাপি, ওদের কথাবার্তা যেন আমার কানে অনেকটা সেই জাতের। অতএব ওদের গানে শৃঙ্গার কথাটা হয়তো আকছার ব্যবহৃত হয়। দেশ, সমাজ, পরিবেশে, যে যার নিজের মতন।

চিন্তা ভাবনা রুচি, কারো সঙ্গে কারো ছকে বাঁধা নেই।

"দরিয়াকে পানীয়ে 'পর তো গিরল না গেইলান।' মুরি কথাটা বলে একবার আমার দিকে দেখলো, তারপরে আবার মনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঘড়িয়া দেখনে কা জরুরত কা বা ?'

মুরির ভাববাচ্য ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ওর উদ্দিষ্ট লোকটি আমি, সন্দেহ নেই। আমি তো নদীর জলে পড়ে নেই, তবে ঘড়ি দেখবার দরকার কী ? মুরির এটাই প্রশ্ন। মনিয়ার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে তার উচ্ছ্বসিত হাসি চাপবার চেষ্টা করে, চোখের দৃষ্টি মুরির দিকে ফিরিয়ে বললো, 'যে ঘড়িয়া দখল তুমি, উহুকে কাঁহে না পুছত ? হমে কা হাতে পর ঘড়িয়া বানলে বানি ?'

মুরি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো। কালো চোখে জিজ্ঞাসা। দেখে আমার হাসি পেলো। কিন্তু মুখে সিগারেট দিয়ে প্রায় হাত চাপা দিয়ে টান দিলাম, আর ঠোঁট ছুঁচলো করে ধোঁয়া ছাড়লাম, কে জানে, হাসলে আবার কিশোরীটি কী বলে উঠবে, আমি তো দেখছি, যতো দোষ মনিয়ার। কৌতুকের ঝিলিক তার চোখে। হাসি চেপে মুরিকে উসকে দেবার চেষ্টা। তা ছাড়া, মুরিই বা আমার ঘড়ি দেখার ব্যাপারে এতোটা উত্ত্যক্ত কেন ?

নানী আমার পাশ থেকে বলে উঠলো, 'মুরি সচ্ কহ্‌লবানি। ততো দরিয়াকে পানীয়ে পর না গরল গেইলান হো বাবা ? ইহ পর আদমিলোগন রহে না কি ?'

সে-কথা কী করে অস্বীকার করি, এখানে মানুষ থাকে না ? নদীর জলেও পড়িনি। বরং জীবনের এক অবিশ্বাস্য আসরে বসে আছি। ফেরার সময় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে, চরের এই রঙ্গ কৌতুকের আসরকে প্রাণ ভরে ভোগ করতে পারতাম। যাদের সঙ্গে অমিলের কথাই ভেবেছি, এখন দেখছি, তারা নিজে থেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, তবু মন-ভাসির টানে ভেসেও, নিজেকে ভুলতে পারছি না। ভেসে যাবার টানের মধ্যেও, সংসারের নিয়ন্ত্রণটাকে একেবারে গোল্লায় পাঠানো যায় না। চেনা পরিচয়ের সময় সূত্র আর কতোটুকু ?

তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, চরের মরদ পুরুষরা ফিরে এলে, আমার উপস্থিতিটা তাদের চোখে কেমন ঠেকবে সেটাও মনের মধ্যে খচখচিয়ে উঠছে। রমণীর মন পাওয়া নাকি হাজার বছরের সাধনার ধন। এ ক্ষেত্রে মন না পেয়ে থাকি, আতিথ্য পেয়েছি। হয়তো অনাড়ম্বর, কিন্তু আন্তরিক অবিমিশ্রই,

যে-চর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে, এ আতিথ্য যেন তার আপন প্রকৃতিরই হাত দিয়ে এসেছে। কিন্তু দ্বৈপায়ন পুরুষরাও কি এই অচেনাকে তেমন হাত বাড়িয়ে দেবে? অবহেলা সইতে পারি, অসম্মানকে ভয়।

আমি নানীকে আমার মতন হিন্দিতে বাতলালাম, 'কিন্তু ফিরতে তো হবে নানী, কতো রাত হবে, তাই ভাবছি।'

'পলট কাঁহে চল যাওবেনি হোই নানী?' সুরি বলে উঠলো। নানীর দিকে তাকিয়ে, 'এক রাত চরে পর রহল তো, শিব গোসসা হো যাওবে কি?'

এতো দূর? আমি এক রাত চরে থাকলে কি শিব ঠাকুর গোসা করবেন? সুরি মনে মনে এতোটা এগিয়ে আছে, মূলে ভাবতে পারিনি। আর আমার মনে কথারই প্রতিধ্বনি করে যেন মনিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। সুরি মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে মনিয়ার দিকে দেখলো, তারপরেই কাঁচের চুড়িতে আওয়াজ তুলে মারবার জন্য হাত তুললো।

মনিয়া তৎক্ষণাৎ পিছন দিকে খানিকটা এগিয়ে পড়ে হাত তুলে মার বাঁচালো, বললো, 'হমে কুছ না কহলবানি, হমে পর কাঁহে গোসসা ভইল?'

নানী বললো, 'বাবা কয়সে হমলোগনকে সাথে ইহ পর রহবে? শহরকে বাবু ভইল।'

সুরি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখে ওর ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। মনে কোনো জট জটিলতা নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না। মনিয়া এক হাত দূরে সরে বসেছে। তার ঠোঁটের কোণে হাসির উচ্ছলতার রাশ টেনে ধরা। এই বোধহয় সে প্রথম সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হ, কাঁহে না রহল, যাই হো রউয়া? শহরেকে বাবুলোগ, আওত, যাওত দিন ভর বহত খানাপিনা করত, তু কাঁহে না এহেবানি?'

মনিয়া বাবুলোকদের বনভোজনের কথা বলছে। অথবা চরভোজনের। কিন্তু সেটা হলো দিনের বেলার ঘটনা। আমার মতন একলা শহরবাসী কি কখনো এই চরে রাত কাটিয়েছে? আসলে মনিয়ার সবটাই ঠাট্টা। আমাকে না, সুরিকেই। কথার মধ্যে তার চোখের তারা ঘুরে ঘুরে সুরির দিকে দেখছিল। সুরিও বারেবারেই মনিয়ার মুখের দিকে দেখছে এবং ওর তেলতেলে মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠছে। মনিয়ার ঠাট্টার মধ্যে ছলনা কতোটা আমিও অনুমানে অক্ষম। তার বুলিতে সুরি খুশি এটা স্পষ্ট।

আমি মনিয়ার দিকে তাকালাম। তার ভুরু কাঁপলো, না কপালের রগ টিপ কাঁপলো বুঝতে পারলাম না। অথবা চোখের কালো তারা দুটি। কিন্তু

আমার জবাবের প্রত্যাশা তার চোখে। আমি বললাম, 'আমিও তো দিনভর রইলাম। রাতে কি করে থাকবো? বাবুলোক যারা আসে তারা কি রাতেও থাকে?'

'উলোগনকে সাথে ইয়কে কা বাত বা?' ঝুরি মনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমার সঙ্গে সেই বাবুলোকদের কী কথা? তা বটে। কিন্তু ঝুরি আমাকে এমন আলাদা করে দেখছে কেন? আমার বিপর্যয় দেখে? কিন্তু এমন বিপর্যয় তো ঘটে নি নিরুপায় হয়ে রাত্রিবাস করতেই হবে? নানী যেন ছেলেমানুষের কথায় হেসে উঠে আবার বলল, 'শহরকে বাবু ভইল না? তোকার এ ঝোপড়িয়ে পর কয়সে রহেবানি?'

ঝুরি আমার দিকে তাকালো। চোখে ওর জিজ্ঞাসা। অর্থও স্পষ্ট। কেন হে বাবু তুমি কি আমাদের এঘরে থাকতে পারবে না? জবাব তো আমার মুখের ডগায় আছে। চালা ঝোপড়ি কেন, খোলা আকাশের তলেও অনেক জায়গায় অনেক রাত কেটেছে। সেই তুলনায় এই চরের ঘর তো স্বর্গ। কিন্তু এতোটা জবাব দিতে আমি সক্ষম না। মনিয়ার অপলক বিজলি হানা চোখের দিকে একবার দেখে আমি মুখ তুলে পশ্চিমের কূলে তাকালাম। এবং এই প্রথম আমার ঘ্রাণে তামাকের গন্ধ স্পষ্ট হলো।

অনুমানের প্রয়োজন নেই, দুলারি শাশুড়ীর জন্য তামাক সেজে আগে নিজের মৌতাতটি সেরে নিচ্ছে। হয় তো বাইরে এসে উনোনের ধারে বসেই হুঁকা টানতে পারতো। কিন্তু বয়সটা এখনও বোধহয় সে পর্যায়ে পৌঁছয়নি, বাইরের অচেনা বাবুর সামনে বসে হুঁকা টানবে। এটা সহবত বা লজ্জা বুঝতে পারছি না। আমি না থাকলে যে শাশুড়ী বউ এক সঙ্গেই হুঁকা হাতাহাতি করতো তা দুলারিকে সিগারেট টানতে দেখেই টের পেয়েছিলাম।

শিল্পাঞ্চলে এটা একটা স্বাভাবিক দৃশ্য। নানী বা দুলারির মতন স্ত্রীলোকেরা ঘরের উঠোনে দরজায় বসে হুঁকা টানছে। এ বঙ্গে অল্প বিস্তর চোখে পড়েছে। কিন্তু ছেলেবেলায়, পূর্ববঙ্গে পাড়াগাঁয়ে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী বয়স্কা স্ত্রীলোকদের হুঁকা টানতে দেখেছি। ধাবমান কাল ভারতীয় জীবনের কতোটা লুটেপুটে, কতোটা নতুন দান দিয়েছে, হিসাবে আমার মন নেই। কেন না, ওসব তর্ক বড় খিটকেল ব্যাপার। কিন্তু নানী বা দুলারির কাছে [illegible]তর হুঁকা একেবারে লুটে নেয়নি। [illegible] পথে চলতে বিড়ি [illegible]। [illegible] তো [illegible] চরে আসবার আগে নানীকেই দেখেছি [illegible]

তামাকের গন্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হুঁকা হাতে দুলারি বেরিয়ে এলো। নানীর কাছে এগিয়ে এসে হুঁকা বাড়িয়ে দিল। জানি না, মনিয়ারও এই নেশাটা আছে কী-না। আমার অনুমান তার বয়স কুড়ি বাইশের বেশি না। বিহার বা উত্তরপ্রদেশে তার বয়সী মেয়ে বহুড়িকেও যে ধূমপান করতে দেখি নি, এমন না। কেবল বাবুদিগের বাড়ির বিবিদিগের সিগারেট পান দেখলেই, বাঙালী ভদ্রলোকদিগের সমাজ সংস্কৃতিতে নাভিশ্বাস ওঠে। ঘুরে ফিরে সেই সমাজ পরিবেশ রুচির কথা।

নানী ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকা টানছে। দুলারি ঘরের দিকে যেতে যেতে, মনিয়ার দিকে ফিরে বললো, 'কা ভইল বহু, আজ রাতমে খানা না পাকাওবে কি ?'

মনিয়া তাড়াতাড়ি উঠে, আঁচল দিয়ে কোমরের পিছনে ধুলা ঝাড়া দিল। দেখলো একবার নুরির দিকে, ঘরের দিকে যেতে যেতে আমাকে। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই, নুরির সঙ্গে চোখাচোখি। এখনও যেন ওর চোখে সেই একই জিজ্ঞাসা, কিন্তু ও আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, 'কেকার বাতে পর তু রহলে সকত ? ভউজী ?'

প্রথমটা নুরির বাতপুছটা ধরতে পারিনি। পর মুহূর্তেই বুঝতে পেরে, হেসে উঠতে গেলাম। কিন্তু নিজেকে দমন করতে হলো। নুরির সরল জিজ্ঞাসার মধ্যে, একটা গুরুতর ইঙ্গিত আছে। এখন আর ভাববাচ্যে না, প্রশ্ন সরাসরি, 'কার কথায় তুমি থাকতে পারো, বউদির ?'

সারল্যের গুণ বলো, দোষ বলো, প্যাচ পয়জার নেই। বুকের কথা, অনায়াসেই মুখে ফোটে, কোথায় গিয়ে লাগবে, সে-খোঁজ সে করে না। নুরি কি মনিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবছে নাকি ? আমি হেসে বললাম, 'না, আমি কারো কথায় আসিনি, কারো কথায় থাকবো কেন ? তোমার বাবা দাদারা এলেই আমি চলে যাবো।'

নুরি মুখ ফিরিয়ে তাকালো উনোনের দিকে। তারপরে হঠাৎ উঠে পড়ে চলে গেল পশ্চিমের চালার আড়ালে। ভেবেছিলাম, নানী ছিলম টানতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে হঠাৎ হেসে বলে উঠলো, 'অবতক ছোটি বালি বা।'

ছোটি বুঝলাম, বালি কী ? মনের জিজ্ঞাসা মনের অতলে ডুবে গেল। নুরি পশ্চিমের বেড়ার পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'ছোটি বালি কি বুড়ি মাতারি ভইলি, কেকার কি বা ?'

নুরির অস্পষ্ট মুখ মুহূর্তেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। নানী আমার দিকে

তাকিয়ে চোখ টিপে হাসলো। কোনো কথা না বলে আবার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে হুঁকা টানতে লাগলো। ছুরির রাগটা কার ওপরে? কিশোরীরা চিরদিনই অবুঝ। নাকি রমণী মাত্রেই? এতোটা বলার দায়িত্ব নেবো না। ঝুঁকি আছে। কিন্তু ছুরির রাগটা বোধহয় ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর মতনই। অবুঝ কিশোরীটিকে আমার অবস্থা বোঝাবো কেমন করে?

চালা থেকে বেরিয়ে এলো দুলারি। হাতে তার একটা মাঝারি মাপের চ্যাঙাড়ি। পিছনে এলো মনিয়া। তার দু হাতে ধরা কানা উঁচু বেশ বড়সড় একখানি কাঠের পাত্র। কাছে আসতে দেখতে পেলাম, আটার পরিমাণ আমার চোখে পর্বত প্রমাণ। দুলারি উনোনের কাছাকাছি চ্যাঙাড়ি নিয়ে বসলো। দেখলাম, তাতে রয়েছে সবজী। আলু পেঁয়াজ ফুটে যাওয়া ফুলকপির ফাঁকে দু-একটা বেগুন আর বিলিতি বেগুনও যেন চোখে পড়লো। মনিয়া আটার পাত্র রেখে আবার চালার ভিতরে গেল। বেরিয়ে এলো একটি জলভরা বালতি আর পিতলের ঘটি নিয়ে। আটার পাত্রের সামনে বসে ঘটিতে জল তুলে, আটায় ঢাললো। দুলারি চ্যাঙাড়ির এক পাশ থেকে তুলে নিল, বেশ বড় একখানি হাতদায়ের মতন ছুরি। নেই কেবল কাঠের বাটালি।

এইখানে বঙ্গে বিহারে তফাৎ, বঁটির বদলে ছুরি। বঙ্গ রমণী হলে, একখানি বঁটি পেতে বসত, কেবল এই শিল্পাঞ্চলে না শিল্পাঞ্চলের বাজারে অবাঙালী মৎস্য বিক্রয়কারিণী ব্যতিরেকে। ওটা বোধহয় বাংলার বাজারি চল।

দুলারি আশেপাশে দেখে, মনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ছুরি কহাঁ গেলি?'

মনিয়া দু হাতে আটা মাখতে মাখতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা। যেন আমিই জানি, ছুরি কোথায় গিয়েছে। নানী মুখের কাছ থেকে হুঁকা সরিয়ে জবাব দিল, 'ওকার গোসসা ভইল। ইধর উধর কোই বগলে পরে গেলবানি।'

দুলারী হাতে তুলে নিল ছুরি, আলুর খোসা না ছাড়িয়ে ঝটিতি টুকরো করতে করতে আমার দিকে ফিরে একবার দেখলো। তারপরে মনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আবার আমার দিকে ফিরে বললো, 'কমসে কম গরীব ঘরকে রোটি তরকারি খা লেই যাওবেনি।'

আমি কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না। মনিয়া বললো, 'কাঁহে না? সুন্দর পলটি আগে খানা বন খাইব।'

'সচ কহলেবানি।' নানী মুখের কাছ থেকে হুঁকা সরিয়ে বললো। আবার ভুড়ুক ভুড়ুক চললো।

কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু মনিয়ার কথা শুনে আমার উদ্বেগ বেড়ে গেল। তার শ্বশুর ফিরে আসার আগে রান্না হয়ে যাবে। তার মানে কী? ভরতদের ফিরে আসতে কতো দেরি হবে? আমি হেসে বললাম, 'কবে কোথায় কার ভাগ্যে খাবার তোলা থাকে, সেকথা কেউ বলতে পারে না। তোমাদের রোটি তরকারি আমি খেতে পেলে খুশি হবো। কিন্তু ফিরবো কখন? কত রাত হবে ভরতদের ফিরে আসতে?'

'কুছ না কহলে সকত বাবু।' দুলারি জবাব দিল আমার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ছুরি দিয়ে সব্‌জী কেটে চলেছে অনায়াসে। ওটা অভ্যাসের ফল। সে আবার বললো, 'তুরন্তে পলট আ সকত, দের ভি হো সকত। আদমিলোগন যবে বাজার যাতানি, কোই কুছ না কহ সকত। কলকে কাম তো না বা না?'

আদমিলোগন অর্থে পুরুষদের কথা বোঝাচ্ছে। তারা বাজারে গেলে কখন ফিরবে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। কল-কারখানার কাজ তো না? তার মানে, কল-কারখানার কাজে আদমিদের আসা-যাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে। এ কথাটা দুলারি ভালোই জানে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি, তুরন্তেই যেন তারা ফিরে আসে।

নানী আমাকে আবার বোঝালো, চিন্তার কিছু নেই, আমি তো দরিয়ার জলে পড়ে নেই? কথাটা কি সত্যি? হাতছানির ডাকে সাড়া দিয়ে এসে, এখন তো যেন মনে হচ্ছে, আমি অগাধ জলেই পড়েছি। নানীর সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল, এরা দ্বারভাঙা জেলার অধিবাসী। ভরতের বাবার নাম সিবন। অর্থাৎ শিব, ভরতের ছোট ভাইয়ের নাম গোবিন। কিন্তু চাচার কথা সে বললো না। আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হলো, 'আর চাচার কথা যে শুনছিলাম, তার নাম কী?'

নানী সহসা জবাব দিল না। আমি দুলারি আর মনিয়ার দিকে তাকালাম। শাশুড়ী বউ পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করলো, কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না। আমি আবার নানীর দিকে ফিরে তাকালাম। নানী হুঁকাটা কোলের ওপর রেখে জবাব দিল। 'তু চাচাকে বাত শুনলেবানি, ওকার নাম রামাবতার। সিবনকে ভাই নহি, দোস্ত বা। আগে দুনো বাঁশবেড়িয়া চটকলেমে কাম করতানি। সিবন ছাঁটাই হো গেইলবানি। রামাবতারকে নোকরি আচ্ছা বা মগর উ ঠিক তরিকা পর কাম নহি কইলেবানি। সবহি

দিল চাহতানি, এ চৌরে পর রহল যাওত। তো, কা বাবা, আপনে খুশি পর কি কুম্পানিকে নোকরি জীয়েতক রহবে?'

নানীর স্বরে এই প্রথম যেন কিঞ্চিৎ অশান্তির সুর শোনা গেল। সত্যি একভাবে সারা জীবন কোম্পানীর নোকরি কি থাকে? নানী তার ভাষায় আরও যা বললো, তা হলো, রামাবতারের জরু মারা গিয়েছে অনেককাল। তার কোনো বালবাচ্চা হয়নি। তখন সিবন দুলারিকে নিয়ে রামাবতারের সঙ্গে, বাঁশবেড়ের এক বস্তিতেই থাকতো। সিবনের বাবা-মা এই চরে প্রথম এসেছিল। চাষবাস করতো, আর বর্ষাকালে ছেলের কাছে বস্তিতে গিয়ে থাকতো। নানী থাকতো তার নিজের ব্যাটার কাছে হাজিনগরে। কারণ, তার ব্যাটা হাজিনগরের মিলে কাজ করে। কিন্তু 'বেটয়োকে বহু' 'সাসুকে' দেখতে পারে না। নাতিরাও সেই রকমই। অতএব, নিজের বেটি দুলারির আশ্রয়েই তাকে আসতে হয়েছে।

উনোনের আগুনের আলো ছাড়া আলো নেই। ভাঁটার ঢেউয়ের ধাক্কায় চরের পাড়ে কেবল ছলছল কলকল শব্দ। মাঘের আকাশ শরতের মতন কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণ বাগিচায় অজস্র ফুলের মতন নক্ষত্রের ঝিকমিকি। তার মাঝখানে নানীর জীবন কাহিনী, তার স্বরে শোনাচ্ছে যেন এক বিধবা বৃদ্ধার দুঃখ গাথার মতন।

'যব হরদেও বিমুখ হওত, তব জোয়ানীকে নাথ্‌ছোড় যাতানি।'…বিমুখ শব্দ অবাঙালীর মুখে এই প্রথম শুনলাম।

'যখন মহাদেব বিমুখ হন, তখন যুবতীর স্বামী তাকে ছেড়ে যায়।' নানীর একটি কথাতেই তার জীবনের সব দুঃখের কাহিনী স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতীয় জীবনের যে কোনো নারীর পক্ষেই বোধহয় এইটি চরম ব্যথা, লাঞ্ছনা আর অসম্মানের কথা।

নানীর সামান্য জীবনকাহিনীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই, রামাবতারের প্রসঙ্গও সে টেনে নিয়ে এলো। যার জরু বাল-বাচ্চা নেই, তার সব থেকেও কিছু নেই। বাঁশবেড়ের বস্তিতে তার ঘর আছে। কিন্তু সে এখান থেকেই কারখানায় যায়। বস্তির ঘরে থাকে না। খালি ঘরে একটা লোক থাকে কেমন করে? তবে হ্যাঁ, সে আর একবার শাদী করতে পারতো। সবাই তাকে বলেছে। সে করেনি। কেন করেনি? তা কে বলবে? রামাবতার শাদী না করায় কেউ খুশি হয়নি। নানীর পছন্দ না, সে এই চরে এসে পড়ে থাকে। কোনো রকমে নোকরিটা বজায় রেখেছে, তাও অনেক কামাই করে। আর গাঁজা ভাঙ মদ খায়।

নানী এই পর্যন্ত বলে থামলো। তাকালো দুলারির দিকে। মনিয়া বোধহয় কোনো কাজে চালার ভিতর গিয়েছে, লক্ষ্য করিনি। দুলারির তরকারি কোটা শেষ। সুরির এখনও পাত্তা নেই। নানী বললো, 'রামাবতারকে বারে হমে কুছ না কহতানি। হামকে বাতে পরে কেহুকে গোসসা লাগে কি দুখ পাওয়ে, ই না চাহতানি।'

নানী কথাগুলো বললো দুলারির দিকে তাকিয়ে, তারপরে দূরের পশ্চিমে। দুলারি যেন না তাকাবার ছলেই পলকে একবার আমাকে দেখে নিল। এখন তার মুখে হাসি নেই। রাগও নেই। একটু বা গম্ভীর। সে উঠে চলে গেল চালার ভিতর। মুহূর্তেই নানী আমার হাঁটুর কাছে আঙুলের খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'বেটি হমারি জরু সিবনকে। অওরত আপনেকে বুঝ সমঝেবেনি তো কে সমঝাওবে?'

নানীর কথা শেষ হবার আগেই মনিয়া একটি ছোট চৌকা লণ্ঠন এক হাতে, অন্য হাতে দড়িতে ঝোলানো একটা চায়ের পেটির মতন কাঠের বাক্স নিয়ে চালা থেকে বেরিয়ে এলো। নানী তৎক্ষণাৎ গলা খুলে যা বললো, তার অর্থ, ভরতও বাঁশবেড়ের চটকলে মাসে দু মাসে দু-তিন হপ্তা বদলি কাজ করে। বস্তিতে রামাবতারের ঘরের লাগোয়া তার ঘর। ভরত ওর বাপের ঘরটাই রেখে দিয়েছে। কেন না, সেই ঘরেই তো ভরতের জন্ম হয়েছে না?

নানীর হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন এবং আগের কথার খেই ধরতে আমাকে বেগ পেতে হলো। ভরত যে চটকলে বদলি কাজ করে, এ খবর নতুন। নতুন সবটাই। সুরির বিয়ের যোগসূত্র খুঁজে পেতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। একদা সকলেরই লক্ষ্য ছিল, চটকলের কাজ। এখনও সে সম্পর্ক একেবারে ঘোচে নি। সিবন তার জীবন শুরু করেছিল চটকলে। চরে আসবার আগে হয় তো সিবনের বাবাও চটকলেই কাজ করতো। সিবন ছাঁটাই হয়ে চরে এসেছে, ভরত এখনও মাসে দু মাসে দু-তিন হপ্তা বদলি কাজ করে। বাঁশবেড়ের বস্তিতে ঘরও আছে। কিন্তু দুলারি উঠে যাবার পরেই, চুপিচুপি কথাগুলোর স্রোত কোন দিকে? দুলারি বসে থাকতেই বলেছিল, রামাবতারের ব্যাপারে সে কিছুই বলতে চায় না, কারণ তার কথায় কেউ রাগ করে বা দুঃখ পায়, সে চায় না। এ কথা বলার আগে সে দুলারির দিকে একবার তাকিয়েছিল। তারপরে দুলারি ঘরে চলে যাবার পরেই, সেই চুপিচুপি কথা তাও আমার হাঁটুতে খোঁচা দিয়ে, 'দুলারি আমার বেটি, সিবনের বউ। স্ত্রীলোক নিজে বুঝে সমঝে না চললে কে তাকে বোঝাবে?'...

কী এর অর্থ? নিতান্ত হিং টিং ছট? সকলের অবর্তমানে, হঠাৎ নানী চুপি চুপি ধাঁধার কথা বলবে, এমন বুদ্ধা সে না। জগৎ সংসারকে সে যুবতীকাল থেকে অনাথিনীর চোখে দেখে এসেছে। আমার মনে অকারণ ধন্দ ধরাবার পাত্রী সে না। প্রসঙ্গ ছিল রামাবতার। ঘোষিত নীতি কারোকে সে রামাবতারের কথা বলে দুঃখ দিতে চায় না। তারপরেই ঝটিতি চুপিচুপি দুলারির বুঝে-সমঝে চলার কথা। কথা নাকি ষোল ধারায় বহে। এ কোন ধারায় বইছে?

ধারাটা এমন কিছু অস্পষ্ট না। কথার ধারায় পরকীয়া প্রেমের ছটা চাপা নেই। একমাত্র রামাবতারকেই চোখে দেখিনি, আর আর সবাইকেই দেখেছি। আমার কানে আরো বাজছে, 'সিবন আর রামাবতার দোস্ত।' আমার চোখের সামনে সিবনের মূর্তি ভেসে উঠলো। শক্ত সমর্থ চওড়া শরীর বিরাট এক জোড়া গোঁফ। 'রাম রাম' বলে নমস্কার জানিয়েছিল। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ। ভরতের জন্মের আগে থেকে যদি রামাবতারের সঙ্গে তার দোস্তি, তবে কি সে দোস্তের চরিত্র জানে না? ঘরনীর মন বোঝে না?

প্রশ্ন যেখানে, জবাবও সেইখানে। সেই জন্যই কি দুলারিকে এখনও মনিয়ার সঙ্গিনীর মতন দেখায়? যদিও সে ভরত, গোবিন, হুরির মা তবুও কি তাই তার চোখের তারায় এখনও কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝিলিক। অথচ তার কথাবার্তা আচরণে কোথাও বাচালতার প্রকাশ নেই। কেবল বয়সের তুলনায় যা অধিক সেটা তার নায়িকা রূপ।

দুলারি দেখা দিল চালার দরজায়। হাতে হামানদিস্তা। দৃষ্টি আমার দিকে। আমি চোখ তুলে তাকালাম। দুলারি সহসা চোখ সরালো না। কয়েক মুহূর্ত আমার চোখে চোখ রেখে, এগিয়ে এলো উনোনের দিকে। সময় বহে যাবার পরে, আমি চমকে উঠলাম। আবার তাকালাম দুলারির দিকে। সে একটা বড় লোহার তাওয়া উনোনে তুলে দিচ্ছে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। মনিয়া অবাক চোখে একবার দেখলো আমাকে, তারপর নানীকে। এবার মনিয়া কোথাও থেই হারিয়েছে।

আমি শুনছি, চরের পাড়ে পাড়ে জলের ছল ছল শব্দ। তারা ভরা আকাশ। বেঁটে ঝাড়ানো গাছটার উঁচু ডালের পাতায় হালকা বাতাসের দোলানি। আমি একটা সিগারেট ধরাবার আগে, নানীর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। নানী সিগারেট হাতে নিয়ে বললো, 'অব না পিওব বাবা, বাদে পিইবেনি।'

আমি সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগে, আর একবার পাঞ্জাবির হাতা

সরিয়ে দেখলাম। রাত্রি সাড়ে আটটা। ইতিমধ্যে তুলারি গরম তাওয়ায় শুকনো লঙ্কা ছেড়েছে। বাতাসে তার ঝাঁজ। আমি দু পাশের চালাঘরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলাম। নানী জিজ্ঞেস করলো, 'কহাঁ চলত হো বউয়া।'

বললাম 'আসছি।'

যেমন কর্ম, তেমন ফল, কথাটা জানি। কিন্তু ভাগ্যটাকে বোধহয় একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। নিজের নাক কেটে তো পরের যাত্রা ভঙ্গ করিনি। নিজেরই যাত্রা ভঙ্গ করেছি। নাক যদি কাটা গিয়ে থাকে, নিজেরই গিয়েছে। এপার ওপারের মূলের কূলে যাওয়াতে, অনেকদিনের হাতছানির সাড়া দিয়ে এলাম। এমন বলতে পারবো না, গঙ্গার বুকে সবুজ রেখাটি আমাকে কোনোদিক থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু মূলে আর অকূলে রূপের ভেদে, চলমান জীবনের সুরে কোথায় একটা মিল রয়েছে। না হলে এই নির্বিবিলি চরের বুকেও জীবন বিচিত্রার এমন নাটকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো না।

দেখলাম, যে খাটিয়াটা সুরি প্রাক সন্ধ্যায় পেতে দিয়েছিল সেটা এখনও সেখানেই রয়েছে। আমার দৃষ্টি পশ্চিমের কূলে, যেখানে রাস্তার ধারে টিম টিম করে বিজলি বাতির বিন্দু জ্বলছে। ওখানেই আছে সেই ঘাট, যেখান থেকে ভরত পাটনীর নৌকায় এসেছিলাম। খাটিয়ায় বসবো ভেবেও, আমি আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে সাবধানে পা বাড়ালাম। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, কিন্তু পায়ের নীচে দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। একটা টর্চ লাইট থাকলে ভালো হতো। সে কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। অতএব সাবধানে চলছি। এ চলাটাও অর্থহীন। পশ্চিমের সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেই ভরতরা নৌকা নিয়ে ফিরে আসবে না।

পায়ের নীচে মাটির ঢ্যালা। ভয় হচ্ছে, পাছে কোনো শস্য নষ্ট করি। খানিকটা যাবার পরেই, মনে হলো সুরি আমার পাশ থেকে বলে উঠলো, 'কহাঁ যাতানি?'

আমি চমকে প্রথমে পিছন ফিরে তাকালাম। তারপরেই অন্ধকারের আবছায়ায়, আমার ডান দিকে দেখলাম, সুরি দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'ঘরে কি পিছে খাড়া বা।' সুরি জবাব দিল, 'তুহকে ইউর যায়ে দেখুতো চল আইলান। কহাঁ যাতানি?'

বললাম, 'কোথাও না, এমনি একটু পাড়ের কাছে যাচ্ছিলাম।'

ঝুরি কোনো কথা বললো না। অন্ধকার যতোটা মনে হয় ততোটা না। ঝাপক বলে নিকষ কালো। আকাশের নিচে মাঝ গঙ্গায় আকাশ ভরা তারার আলো যেন অন্ধকারকে অনেকখানি হালকা করে দিয়েছে। আমি ঝুরির চোখ মুখ স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই চরের ধুলামাটির শস্য আর সরষের এবং নারকেল তেলের মিশ্রিত একটা গন্ধ পাচ্ছি, আর ওর হাতের কাঁচের চুড়িতে কি তারার ঝিকিমিকি? চুড়িগুলোতে অস্পষ্ট ঝিলিক দিচ্ছে। আমার মনে হলো ঝুরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো ওর অভ্যস্ত চোখ এ অন্ধকারে আমার থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে।

আমি আবার পা বাড়াবার উদ্যোগ করে বললাম, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো?'

'আরে, তুহকে দিমাক খারাপ ভইল কা?' ঝুরি অনায়াসেই আমার একটা হাত টেনে ধরলো, 'ই কা তুহকে সহরেকে রাস্তা বা? গিরল যাই তো কা হোই?'

কথাটা হয় তো মিথ্যা না। কিন্তু আমার অস্বস্তিটা পতনের আশঙ্কার থেকে বেশি। রাত্রের নিরালা চর। ঝুরির বয়স যাই হোক। ওর মা নানী ভউজীর চোখে দৃশ্যটা কি খুব সহবত দেখাবে। অথচ ওর যা গোসা দেখেছি, জোর করে হাত টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করতেও দ্বিধা করছি। ও তখন বলতে আরম্ভ করেছে, 'এত্তি পরবন্ধ করতানি, তো তু কাহেঁ চল যাওবেকে মতলব করতানি?'

'পরবন্ধ' শব্দের অর্থ কী? অনুরোধ? আমি জানি, শিল্পাঞ্চলে এ জাতীয় ভাষা অনেকের মুখে শুনি, কিন্তু আমার পক্ষে তাদের সঠিক ভাষা বলা সম্ভব না। পঞ্চাশ দশকের স্মৃতিই কেবল আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না। আমার মতন কোনো বাঙালীর পক্ষেই, বিহারের বিভিন্ন দেহাতী ভাষাকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব। ব্যাকরণের তো কথাই নেই। আর বাজার চলতি বাজার হিন্দির তো কোনো মাথা মুণ্ডুই নেই। বললাম, 'মতলব তো কিছু করিনি। থাকবো ভেবে তো আসিনি।'

কথাটা বলতে বলতেই হোঁচট খেলাম। ঝুরি শক্ত হাতে আমাকে সামলে নিয়ে হেসে উঠলো, 'দেখলেবানি কি? বাঙালীবাবু আমার কথা কাঁহে না মানছে?'

আমি পতন থেকে সামলে ওঠবার আগেই, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বাঙলা বলতে পারো?'

'থোড়া থোড়া সাকতবা।' হুরি হেসে জবাব দিল, 'হামিনলোগ সব বাঙলা বুলি জানি। বাঁশবেড়িয়া, শাগঞ্জ হালিসহর, সবহি জায়গে 'পর আমার বহুত বাঙালী দোস্তানি আছে। উলোখ কহুঁ আমার কথা না বুঝে, না বুলতে জানে। আমি জানে। তুমি রামপরসাদকে মন্দির কথুন গেইছ?'

রামপ্রসাদের মন্দির না বলে, আমরা ভিটেই বলি। বললাম, 'অনেকবার গেছি।'

'আমি হর হপ্তেমে এক দো রোজ যাই।' হুরি ওর নিজের মতন বাঙলায় বললো, 'উধারে আমার পাঁচ সাত দোস্তানি আছে। আমার সাথে এ চৌরে পরে বেড়াইতে আসে।'

হুরির বাঙলা কথা শুনে ভরতের বাঙলা বুলি আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আমি পদে পদে বুঝতে পারছি, একলা চলতে গেলে ইতিমধ্যেই আমার কয়েকবার পতন ঘটতো, আর তার চোট সামলাবার জন্য অন্ধকার চরে আমাকে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। হুরি এখন আমার একটি হাত ধরে নেই। কাঁধের চাদরটা ও অন্য হাতে মুঠি পাকিয়ে ধরেছে। সেই সঙ্গে পাঞ্জাবির গলাটাও। আমার শরীরের সঙ্গে ওর শরীরের স্পর্শে আমার যদি বা অস্বস্তি হচ্ছে, ওর কোনো সংকোচই নেই। সংকোচের অবকাশ কি ওর শরীরে মনে একেবারেই অনুপস্থিত? অথচ, আমারই অস্বস্তি না হবার কথা। কিন্তু সংবাদগুলো সবই নতুন, যদিও আশ্চর্যের বা অবিশ্বাস্য মোটেই মনে হচ্ছে না। চরের বুকে বাস বটে, মূলের কূলে যাতায়াত আছে। জন্মকাল থেকে বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা। বাঙালী সই সখী না জোটাটাই অস্বাভাবিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হুরি মানে কী?'

'হুরি?' ও হেসে উঠলো, 'হুরি না কহ, হুরী।' দীর্ঘ ই-কারটাও টেনে আওয়াজ করলো, 'হুরী তো পঞ্ছী আছে বাঙালীলোগ পাখী বলে।'

হুরি না, হুরী। তাও আবার পাখী। মনিয়াকে ময়না ভেবেছি, কারণ ওটা ওরকম জানা। হুরী নামে কোনো পাখীর নাম আজতক শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী পাখী?'

'উ আমি জানি না।' হুরী জবাব দিল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'হুরী, তুমি তো আমাকে কখনো দেখনি,

আমাকে থাকতে বলছো কেন ?'

ঝুরী কোনো জবাব দিল না। বরং এবার যেন ও নিজেই হোঁচট খেতে গিয়ে সামলে নিল, আর ওর নারকেল তেলের গন্ধ খোঁপাটা আমার কাঁধে ঠেকলো। আবার কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারো নি ?'

'কী কথা ?' ঝুরীর স্বরে যেন অন্যমনস্কতা।

আমি আমার কথার পুনরুক্তি করলাম, 'তুমি আমাকে কখনো দেখনি, জানো না, তবু আমাকে থাকতে বলছো কেন ?'

ঝুরী পরিষ্কার ওর নিজের ভাষায় জবাব দিল, 'হমে না জানত।'

অদ্ভুত উক্তি। ও জানে না, কেন আমাকে থাকতে বলছে। তারপরই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কেন মনে হলো, তোমার ভউজী বললে আমি থাকবো কী না ?'

'উ হমেসে স্বরতবালী না ?' ঝুরী বললো, এবং অন্ধকারেই আমার মুখের দিকে তাকালো।

ঝুরীর তাকানোটা আমার অনুমান, কিন্তু ওর কথার মধ্যে যে একটা গুরুতর ইঙ্গিত ছিল, সেটা মিথ্যা ভাবিনি। ইঙ্গিতটাকে গুরুতর বললো কী না, বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওর কথার মধ্যে কোথাও দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। একে ঈর্ষা বলবো, না সহজ প্রকৃতি বলবো ? ওর মনে হয়েছে মনিয়া ওর থেকে সুন্দরী, অতএব আমি তবে তার কথায় চরে রাত্রিবাস করতে পারি। ঈর্ষা হোক আর প্রবৃত্তিজাত হোক, এ আচরণকে আমি 'রমণী ধরম' মাত্র বলতে পারবো না। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বোধহয় সমান। কেবল বয়স আর অভিজ্ঞতা মানুষের বাহ্য প্রকাশকে সংযত করে। মনের তলিটা বাজে একই তালে। ঝুরী ওর বয়স আর অভিজ্ঞতার ওজনে, নিজেকে প্রকাশ করেছে।

আমার চোখের সামনে মনিয়ার স্বাস্থ্যোন্নত শ্যামাঙ্গিনী মূর্তি ভেসে উঠলো। ঝুরীর থেকে সে সুন্দরী কী না জানি না, তার কৌতুকদীপ্ত চোখ, চর শিউরে তোলা হাসি, সবই পুরুষের প্রথম নজর কাড়ার চুম্বকে ভরা। অন্তত মনে মনে এ কথাটা স্বীকার না করলে, নিজের কাছে মিথ্যাবাদী হতে হয়। কিন্তু রূপের ভেদে মনের গতি নানা ধারায় বহে। প্রকৃতির দুরন্ত আয়ুধ মনিয়ার সর্বাঙ্গে। এমন কি তার চোখে মুখে কথায় বলায়। যে কারণে মনে হয়েছিল এমন রমণীর চলার দাপেই বোধহয় দামিনী কাঁপে। কিন্তু ঝুরীকে প্রথম দর্শনেই বুঝেছি, ওর কিশোরী শরীরে ও মনে প্রকৃতির সকল আয়ুধ, মহা সমারোহে

ওর ধমনীতে সংকেত দিয়েছে।

আমি ওদের দুজনের রূপের বিচার একবারও করি নি। রমণীর-চরিত্র ভেদে, দুজনকে আলাদা করে দেখেছি। আমি হেসে বললাম, 'তোমাকে কে বলেছে, মনিয়া তোমার থেকে সুন্দরী?'

'আমি সমঝতে পারি', সুরী বললো।

অন্ধকারে এখন আর অনুমান না, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সুরী আমার মুখের দিকে দেখছে। ও কি অন্ধকারেও আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে? আবার হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি তো দেখছি, তুমি অনেক বেশি সুন্দরী।'

সুরী আমার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ঝুট কাঁহে কহতানি?'

'না, মিথ্যা বলিনি। আমি জানি, তুমি বড় হলে আরও সুন্দরী হবে।'

সুরী কোনো জবাব দিল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লো। আর এগোবার উপায় নেই। দেখলাম, আমাদের পায়ের নীচে, জলের স্রোতে আলোর রেখা। ছল্‌ছল্‌ শব্দ বাজছে। আলোর রেখা কি ওপারের আলোর না তারার বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, চরের বুকের এই খেলাটা সংসারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে না, অবাস্তবও না। আকস্মিকতার চমক আছে, তথাপি জীবনটাকে তার আপন আলোয় দেখলে, স্থান ও কাল ভেদে, এ একটা জীব ধর্মের সহজ খেলা। কিন্তু কবির ভাষায় 'সহজীয়া' করণ কারণ না।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপচাপ। অনুভব করছি, চরের মাটিতে শস্য ফলানো কিশোরীর হাত ভিজে উঠছে। হঠাৎ পিছন থেকেই মনিয়ার চেনা স্বরে গানের গুনগুনানি শোনা গেল। কথাগুলো দ্রুত, কেবল শুনতে পেলাম, 'লে আওল ফুলহার···দেই ওরতারি···।'

আমি ঝটিতি ফিরে দাঁড়ালাম। মনিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু সুরী আমার হাত আরও শক্ত করে ধরলো। মনিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে চলে যেতে লাগলো। তার মিলিয়ে যাওয়া অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। সুরীর শক্ত করে ধরা হাত কিঞ্চিৎ নরম হলো। ডেকে বললো, 'কা বাতাওয়ে আইলবানি হোই ভউজী?'

একটু দূর থেকে মনিয়ার হাসির ঝংকার শোনা গেল, তারপরে, 'কুছ না ননদী, পঞ্ছী ধায়ে মন হরই······।'

সুরী ফিক করে হেসে উঠলো। আমার হাত ধরে ফিরে যেতে পা বাড়িয়ে আবার ডেকে উঠলো, 'এ ভউজী, যা বোলাওত কি?'

'মনলা বিধিলেকেবারে, লাস্থ তোহে যায়ে কহতানি কি তুহে না।

দেখলেন' বা।'

মনিয়ার স্বর ভেসে এলো, 'হম বোলাওত।'

সুরী আমাকে নিয়ে চলতে চলতেই, এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'কুছু না কহে, হমে ষাত্তানি।' সুরীর কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে একাধিক পুরুষের গলা ভেসে এলো। তার মধ্যে, সব থেকে চড়া আর মোটা স্বরে গান ভেসে এলো, 'রাঘব রাম কহ্‌লে যাই, জগ' পরে অওর রহু না।'…

সুরী বলে উঠলো, 'বাপু ভাইয়ালোগন আ গেইলান। চাচা গানা গাওত।'

বুক থেকে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠে এলো। যাক, আমার পাটনী আর নৌকা আসছে। অন্ধকারে ঘড়িতে এখন ন'টা। ওদের আসতে আসতে সাড়ে ন'টা। তারপরে……

তারপরে সবটাই হিসাবের বাইরে। চরের পুরুষরা ফিরে এসে আমাকে দেখে প্রথমটা থ! তারপরে প্রায় এক সঙ্গে নানী, ছুলারি, মনিয়া আর সুরী কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। ওরা যে কে কী বললো, প্রায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখলাম, পুরুষের দল চর গঙ্গা আকাশ কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। খানিকটা অনুমান করা গেল, আমার চরে থেকে যাওয়াটা তাদের চোখে পড়েনি বলেই হাসির হররা।

হররার পরেই বোধহয় গর্‌রা। কারণ এমনিতেই রামাবতার আর সিবনকে আমার আদৌ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। রামাবতার দীর্ঘদেহী, তামাটে রঙের তার মাথার চুল বড়, গোঁফজোড়াও বিরাট, এবং চুল গোঁফের রঙও তামাটে দেখলাম। তার আর সিবনের চোখ ছুটি বেশ লাল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ ছুজনে ছুদিক থেকে আমাকে ধরে একেবারে মাটিতে বসে পড়লো। সিবন তো আমার গলা জড়িয়েই ধরলো, বললো, 'ও রউয়া, আজ রাত্তেমে তোহে ছোড়েব নাই। হামলোগনকে সাথে রহল যা।'

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই রামাবতার আমার হাঁটুর ওপর প্রায় মুয়ে পড়ে বলল, 'হ, রউয়াকে আজ ছোড় না যাইল, পাকড়ি রাখ লেইবান।'

রমণী মহলে হাসির ধুম। আর আমার ঘ্রাণে দেশী সুরার প্রবল গন্ধ। রামাবতার সিবন, ছুজনেরই। ছুপুরের সিবন, আর এই সিবন, আকাশ পাতাল তফাত্‌। ভরত আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার সেই বাঙলা বুলি ছাড়লো, 'কাঁহে যাইবেন বাবু, হামিনলোগ গরীব হইতে পারে-হ, আপনি

হামিনলোগের মেহমান আছেন। ভগবান আপনাকে রাখিয়ে দিছে, নানী মাতারি বলছে, আজ থাকিয়ে যান।'

কথাবার্তা চলছিল, দক্ষিণের উনোনের ধারে নিকানো অঙ্গনে। ভরতের চোখ লাল না। তার ভাব ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বাপ চাচার সঙ্গে পান করে আসে নি। গোবিন্ হাসছে লাজুক লাজুক। বছর পনর ষোল বয়সের ছেলেটিরও মনের কথা চোখ খুলে ফুটেছে, কেবল কথাই নেই।

কিন্তু কাকে কী বলবো। সকলে এক সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে। নুরীর চোখ আমার চোখের দিকে। কিন্তু রামাবতার আর সিবন এর পরে আমাকে বোধহয় মাটিতে শুইয়ে ফেলবে। তারা এখন কেবল আমাকে জড়িয়ে ধরে রউয়া রউয়া ক'রে যাচ্ছে। আমি দুলারির দিকে তাকালাম। সে মজা দেখছে। মনিয়া নুরীর পাশে দাঁড়িয়ে, এখন ওর কোলে নেংটিটা জেগে উঠে, বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখছে। শাদা কালো পাহারাদারটি একবার রামাবতারের মুখ চাটছে, আর একবার সিবনের। আর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে নানা রকম শব্দ করছে। মাতাল দুটির সেদিকে খেয়ালই নেই।

ভরত মায়ের দিকে ফিরে বললো, 'এ মাতারি, এ দুনোকো তু ঘর কাঁহে না লে যাতানি? বাবুকে তখলিব্ হওতানি।'

দুলারি এগিয়ে এলো। দু হাত বাড়িয়ে ডাকলো, 'শুনহো, তু দুনো ঘরে চলতানি, উঠ, উঠ হো।'

ভোজবাজীর মতন কাজ হলো। দুজনেই মুখ তুলে তাকালো। ঘাড়ের ওপর দুজনের মাথাই যেন বাতাসে দুলছে। দুজনেই দুলারির দুহাত ধরে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মুখের বুলি এক, 'রউয়াকে ছোড়ব না।'

'হঁহ, ঠিক বা। আর দুনো ঘরে চলতানি।'

দুলারি দুজনকেই দুহাত ধরে, পশ্চিমের বড় চালায় ঢুকে গেল। ভরত এসে আমার পাশে বসলো। ইনিও দেখছি গন্ধমাদন। ওরে, সরাব না গঞ্জিকা। হাসতে হাসতে, বললো, 'বাবু, ভগবানজীর মর্জির ঔপর কিসিকে কথা চলে না। নাহি তো, আপনাকে ছোড়ে গেইলাম কী করে, আপনে বলেন।'

মনিয়া ধমকের স্বরে বললো, 'আর উঠতানি। বাবুকে ভুখ্ লাগলবা, খানা দেওবানি। তু লেড়কাকে ঘরে পরে লেই যাহ।'

'হঁ হঁ।' ভরত উঠে মনিয়ার কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে, পুবের একটা চালায় ঢুকে গেল। নানী হুঁকা টানছে, আর হাসছে। বললো, 'মনিয়া,

বাবুকে সাথে হমে ভি খানা দেই দে।'

সুরী ছুটলো পশ্চিমের চালায়। চোখের পলকেই বেরিয়ে এলো হাতে একটি ঝকমকে কাঁসার থালা আর গেলাস নিয়ে। মনিয়া হেসে আমার দিকে একবার তাকিয়ে, পশ্চিমের চালাতেই ঢুকলো। উনোনের ধারেই ভোজ্য বস্তু সব রয়েছে। রুটি আর তরকারি। সুরী থালায় এক গোছা রুটি আর এক পাশে গাদা খানেক তরকারি বেড়ে দিল আমার সামনে। ইতিমধ্যে কখন মাটির কলসী বাইরে এসেছে, দেখি নি। জল গড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ই শহর কলেকে পানী না।'

নানী এসে বসলো আমার পাশেই। মনিয়া একটা এলুমিনিয়ামের থালায় রুটি তরকারি বেড়ে নানীর সামনে দিল। ঘটিতে করে জল দিল।

কোথা থেকে কী ঘটে গেল, কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। আমার সামনেই ভরত আর গোবিন খেয়ে নিল। নেংটিটার খাওয়া বোধহয় আগেই হয়ে গিয়েছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, এ রুটির তরকারির স্বাদ আলাদা। তরকারির মসলাটা কি জানি না। তবে দুলারির হাতে মাথে অনেক ভোজবাজী।

পশ্চিমের বড় চালায়, দক্ষিণের বেড়া ঘেঁষে, ভরত নিজে আমার খাটিয়া পেতে দিল। তারপরে সে যখন কাঁথা বালিশ বিছানা টেনে আনলো, আমি বাধা না দিয়ে পারলাম না। খোলা আকাশের নীচে শুতে পারি সত্যি। কিন্তু জীবন ধারণের সব ছক পেরিয়ে আসতে পেরেছি, তা বলতে পারবো না, ক্ষেত্র বিশেষে বিছানার থেকে ভূমি শয্যা সহনীয়, কিন্তু বিছানা না।

আমি আমার পশমী চাদরটা সব ভাঁজ খুলে গায়ে চড়ালাম। শোবার উদ্যোগ করতেই, সুরী ছুটে এলো। নাকে গন্ধ লাগলো ন্যাপথলিনের। ঘরে আলো না থাকলেও, বুঝতে পারলাম ওর হাতে রয়েছে বড় একখানি মোটা আর ধোয়া বিছানার চাদর। দ্রুত হাতে সেটি পেতে দিল খাটিয়ার ওপর। আর বালিশের মতন একটা কিছু। হাত দিয়ে মনে হলো, একটা চৌকো পুঁটলি। সুরী বললো, 'গন্ধা কিছু নাই আছে, সব নয়া কাপড়ার পুঁটলি।'

অতঃপর আর কোনো কথা চলে না। সুরী কেবল আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু স্বরে বললো, 'হরদেওকে কৃপা।'

চরের হাতছানিটাই এতকাল দেখে এসেছি। সেই ডাক যে এমন ঘটনা ঘটাবে, ভাবতে পারি নি। এ চর কি অঘটনঘটনপটীয়সী?

আমি শোবার পরেও, বাইরে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। দুলারি কে

কোথায় গেল তুজনকে নিয়ে, কিছুই জানি না। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। ঘরের মধ্যে কোথায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই চৌকো লণ্ঠনটিই মনে হলো। তার আলোয় দেখলাম, পাশাপাশি ছুটো খাটিয়ায় ভরত আর গোবিন শুয়ে আছে। আরও খানিক উত্তরে, মাটিতে পাতা বিছানার ওপর সিবনকেও চিনতে পারলাম।

খাটিয়া থেকে নেমে চালার ঝাঁপে হাত দিলাম। টান দিতে বুঝলাম, কোথাও আটকানো আছে। হাতড়ে পেলাম, একটি কঞ্চির সঙ্গে দড়ির ফাঁস লাগানো। ঘুম আসছে না। রাতের চরটা দেখবার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠছে। নিঃশব্দে দড়ির ফাঁস খুলে বাইরে এলাম। আকাশের কৃষ্ণ স্বচ্ছতায় কেমন একটা কুয়াশার ঝাপসা ছায়া। তারাগুলো আবছা দেখাচ্ছে। আমি পায়ে পায়ে পুবের দিকে গেলাম। মূলের কূলে রাস্তায় তেমনি আলো। পুবে কিছু অন্ধকার। পশ্চিমে ডানলপের কুঠির আলো উজ্জ্বল। তারপরেই চোখে পড়লো, পুব দিকে, নদীর বুকে নৌকায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কুতু আর বটা কি জাল টানছে? সম্ভবতঃ।

হঠাৎ স্পর্শে চমকে উঠলাম। শাদা কালো পাহারাদার আমার পায়ের কাছে এসে, ল্যাজ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এখন আর আমি শত্রু নেই। ওর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে, আমার চোখ পড়লো ঝাড়ালো গাছটির নীচে। সেখানে গায়ে গায়ে পাশাপাশি ছুটি মূর্তি। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। কারা?

অবাক হবার অবকাশ পেলাম না, মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে আছে তুলারি আর রামাবতার। কিছুই জানি না, তুলারির জীবনটা কোন্ চালে চলে। তবে, এটা বুঝেছি, জীবনে সবকিছু বলে কয়ে ছকে চলে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃতি তার আপন হাতে কিছু গড়ে তোলে। তুলারির তু হাত বাড়িয়ে তুই পুরুষকে নিজের গায়ে টেনে নিয়ে চলে যেতে দেখেই বুঝেছিলাম জীবনটা দলিলপত্র না।

তবুও হায় মূলের কূলের মানুষ, আমি যেন লজ্জায় আর সংকোচে কুঁকড়ে গেলাম। আগে জানলে কখনও ঘরের বাইরে আসতাম না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তার থেকেও সাবধানে চালার ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। কোনোরকমে ঝাঁপের ফাঁস পরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো, দেখলাম, পাশের খালি খাটিয়ায় তুরী

বসে কী যেন একটা সেলাই করছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ভেবেছিলাম, সকালেই চরের পর্ব শেষ। তা হলো না। মাতাল কেউ ছিল না বটে। কিন্তু এক রাত যদি থেকেই গেলাম, আর একটা বেলা নয় কেন? কিন্তু খেতি চাষবাসের কাজ? আজ ছুটি। রামাবতার কাজ কামাই করেছে। মনিয়ার পরিষ্কার উক্তি আমি নাকি গত রাত্তে সুরীর কথায় থেকে গিয়েছি। আজকের একটা বেলা, সকলের কথা রাখতেই হবে।

সম্মোহন বলবো, না সংক্রমণ বলবো, জানি না। রাজি হয়ে গেলাম। কুতু আর বটা তখন জাল টেনে মাছ তুলছে। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, অবাক। ভাবতে পারি নি, আজ সকালেও আমাকে দেখবে। আমার লক্ষ্য ওদের মাছের দিকে। কারণ, আগেই জেনে নিয়েছি, সিবনের পরিবারের সকলেই মৎস্যাসী। কিন্তু দু একটি মাঝারি বোয়াল ছাড়া, সবই ছোট মাছ। দুটি বোয়াল কিনে নিয়ে এলাম। কুতু বটাও কৌতূহল দমন করতে পারলো না। সিবনদের চালাঘরের সীমানায় দুজনেই এলো। বটা হেসে বললো, 'বাবু বুঝি অগো লগে চড়াইভাতি করবেন?'

বললাম, 'একরকম তাই।'

দুলারি তার সেই নিয়ে ছুরি মাছ কাটতে শুরু করলো। বটার চড়াইভাতি কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। ঘর ছাড়া জীবনে, এ আমার একটা নতুন স্বাদ। মন-ভাসির টানে চরে ঠেকে যাওয়া এক নতুন রঙ্গ। তবে, সেই কথাটাই মনে মনে বারে বারে বললাম, 'মানুষ, তোমার রূপের তুলনা নেই। জীবনের শেষদিনেও যেন তোমাদেরই নমস্কার করে যেতে পারি।'

আমাদের চরের ভোজনপর্ব শেষে, এবার বিদায়ের পালা। ভরত পাটনী প্রস্তুত। নানী চোখের জল মুছছে। মনিয়া হাসতে পারছে না। দুলারি যেন এক অলৌকিক দেবীর মতন বারে বারে আমার সঙ্গে চোখাচোখি করলো। আর নিমন্ত্রণ জানালো, সুরীর গাওনার সময় যেন আমি আসি। ফাগুয়ার সময় একবার খবর নিলেই গাওনার দিনটি জানতে পারবো।

কিন্তু সুরী কোথায়? মনিয়া পুবের একটা ঘর দেখিয়ে বললো, 'উ ঘরকে ভিতর না।'

আমার এখন আর সংকোচ নেই। পুবের সেই ঘরে গিয়ে দেখলাম, সুরী বেড়ার গায়ে মুখ চেপে, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না। ডাকলাম, 'সুরী।'

ও ফিরলো না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, ডাকলাম, 'সুরী।'

ও ফিরে তাকালো। লাল চোখ ছুটো ভেজা। হাসবার চেষ্টা করলো। তারপরে বললো, 'সাচ্ কি তুমি আমার গাওনায় আসবে?'

বললাম, 'আসবো, তোমার মাকে বলেছি।'

'আমাকে বল।' নুরী বললো।

বললাম, 'তোমাকেও বলছি।'

নুরী তখন ওর বাঁ হাতের মুঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তা হলে এটা রাখ, গাওনার সময় এসে আমাকে দিও।' ও মুঠি খুলে আমার সামনে ধরলো।

দেখলাম, নতুন এক প্যাকেট সিঁতুর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কেন দিচ্ছ?'

'তাহলে তুমি কথা রাখবে।' নুরী বললো, 'সিন্দুর নিয়ে কেউ ঝুটা বলে না।'

এই কথা শোনার পরে হাত বাড়াতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। তারপরে সিঁতুরের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে পকেটে রা'লাম। তাকালাম নুরীর মুখের দিকে। কিশোরীর মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা নামিয়ে নিল। আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ভরতের সঙ্গে নৌকায় যখন উঠলাম, তখন জোয়ার চলেছে। উজানের টানে এসেছিলাম, উজানের টানে নিয়ে যাচ্ছে। নৌকা ভাসলো। সকলেই চরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। হয় তো আমার প্রাণের শক্তি কম। চরের ওপরে সারি সারি মূর্তিগুলো চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল, কাঁপতে লাগলো। মনে মনে বললাম, 'আবার আমার কথা যদি না রাখতে পারি, ক্ষমা করো।'...

ক্ষমা পেয়েছি কিনা জানি না। তবে স্মৃতির পটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনো বুকের কাছে তু'হাত জড়ো করি।